CUL-HOL999-38-P36/42
P 36,142

সাহিত্য ৩১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা।

দেহের ও দেশের আত্মা।

ভক্ত রামপ্রসাদের কথা কহিতে যাইয়া একটা তত্ত্ব সিদ্ধান্তের মধ্যে পড়িয়া পড়িলাম; কেন না সে বড় কথাটা—রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকীর্ত্তনে গোঁজা করিয়া কুটাইয়া গিয়াছেন। উত্তরপাড়ার মনীষী ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলিতেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন কি কাব্যাংশে, কি ভাবাংশে বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব ও অতুল্য সামগ্রী। এমনটি হয় নাই, বুঝিবা হইবে না।

তন্ত্র বলেন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই সজীব, সকলের মধ্যেই জগৎ-জননী আদ্যাশক্তি বিরাজমানা। আমার দেহের মধ্যে যেমন পদ্মনালের সূত্রাকার বিষতন্তুবৎ,—আদ্যাশক্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তেমনই আমার জন্মভূমিতে আমার আর্য্যাবর্ত্তে,—আমার পৃথিবীতে আমার মা সর্ব্বময়ীরূপে বিরাজমানা। আমার দেহমাতৃকাকে চিনিতে পারিলে দেশমাতৃকাকে চিনিতে পারা যায়, বিশ্ব-মাতৃকাকে চিনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, উক্ত হইয়াছে,—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং; কিং স্তূয়সে তদা॥"

অর্থাৎ সৎ হউক, অসৎ হউক, ভাল হউক, মন্দ হউক, এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, তাহা তুমিই, সকল শক্তির আধাররূপা ভূমিই আদ্যাশক্তি; অতএব তোমার আর স্তব করিব কি? সুতরাং তন্ত্র বলিতেছেন, দেহমাতৃকাকে সর্ব্বাগ্রে না চিনিতে পারিলে দেশমাতৃকাকে কোনক্রমে চিনা ও জানা যায় না। দেহমাতৃকাকে চিনিবার ও দেখিবার প্রথম কথা হইল গর্ভধারিণী জননীর পূজা ও সেবা। যিনি দশমাস দশদিন গর্ভে ধরিয়া আমার আত্মাকে মানবদেহের আশ্রয় দিয়াছেন, যাঁহার স্তন্য পান করিয়া আমার সে দেহ বর্দ্ধিতায়তন ও পুষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই জননীর দেহজননীর অংশরূপিণীরূপে—সজীব দেবতারূপে পূজনীয়া।

পরিণত পরে যে দেশের জল-বায়ুতে থাকিয়া, যে দেশের খাদ্যজাত শস্যাদি ভোজন করিয়া, যে দেশজাত গবী-কুলের ক্ষীর-নীরধারা পান করিয়া আমার জননী এবং আমার মাতামহকুল পুষ্ট, আমার জনক ও পিতৃকুল অব্যাহত ধারায় সঞ্জীবিত, সেই দেশের মাতৃ বা জননী-শক্তির পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। দেশ-মাতৃকার পূজা করিতে হইলে, ষোড়শোপচারে তাঁহার সম্বর্দনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ছয়টি কাজ করিতে হয়। (১) সূতিকাগার ও ভূমিষ্ঠ হইবার স্থানের পূজা, (২) যে গ্রামে জন্ম, সেই গ্রাম সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বাস্তু দেবতা-গণের পূজা, (৩) গ্রাম্য গবীকুলের সেবা ও পূজা, (৪) গ্রামের নদ নদী তড়াগ বাপী সকলের জলশুদ্ধি ও পূজা (৫) গ্রামের বনস্পতি ও বৃক্ষগুল্মাদির পরিপুষ্টি সাধন, (৬) গ্রাম্য দেবতা ও তীর্থাদি, সিদ্ধ-সাধকগণের আসন সকলের প্রদক্ষিণ ও পূজা, (৭) গ্রাম্য প্রধানগণের, পাঠশালার এবং আখড়ার গুরু মহাশয় হইতে অধ্যাপক আচার্য্য পর্য্যন্ত সকল সজ্জন-পরিজনের আরাধনা, (৮) ধাত্রী পূজা। এই অষ্ট প্রকারের সাধনা শেষ হইলে পরে স্বীয় মাতামহ এবং পিতামহকুলের পরিচয় লইতে হয় এবং তর্পণ করিতে হয়। এই সকলের সমবায় প্রভাবে তোমার দেহগত জীবাত্মার পুষ্টি এবং বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। ইহাদের খবর না পাইলে আত্মপরিচয় ত ঠিকমত হয় না। আমার দেহতেই যে আমার দেশের অণুপরমাণু হইতে পর্ব্বত-সাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তুই বিদ্যমান, আমার ব্যষ্টিগত মন-বুদ্ধি মেধায় আমার দেশের আপামরসাধারণের, অপচ হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলের মনোগত সংস্কার বিদ্যমান, আমার এই চৌদ্দ পোয়া দেহ আমার দেশের জন্মভূমির আর্য্যাবর্ত্তের microcosm বা সংক্ষিপ্ত-সার। আমার জন্মভূমি, আমার দেশ, আমার আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত সপ্তসিন্ধুরঞ্জিত ভারতভূমি, আমার—macro cosm, আমার আমিত্বের বিরাট অভিব্যক্তি। আমি স্বরাট, আমার আর্য্যাবর্ত্ত ভারতবর্ষ আমার পক্ষে আমার বিরাট। কাজেই দেহাত্মবোধ না হইলে দেশাত্মবোধ ঘটে না, আমার মনুষ্যদেহের আত্মাকে না দেখিতে পাইলে দেশের আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না। খাঁটি patriot হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আত্মস্থ, আত্মদর্শী, সত্যব্রত হইতে হইবে।

কয়টা জননী ?

জান কি আমাদের কয়টা জননী আছেন ? তন্ত্র এই কয়টি জননী বা মাতৃকার উল্লেখ করিয়াছে :—(১) গর্ভধারিণী জননী, (২) ধাত্রী বা স্তন্যপায়িনী

[redacted]

[redacted]

যে দেশে রজনী নাই মা,
সে দেশের ভাবুক দেখেছি,
আমি,—কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।"

ইহার ব্যাখ্যা কঠিন, সাহিত্যে স্থান কুলাইবে না। পার ত মাতৃপূজা বুঝিবার চেষ্টা কর।

এইরূপে রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকীর্ত্তনে অর্থবাদের আবরণে দেহাত্মবোধ এবং দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। সে কালীকীর্ত্তনের পঠন-পাঠন নাই, বুঝিবা কালীকীর্ত্তন পুস্তকখানি নির্ভুল করিয়া কেহ ছাপেও নাই। উত্তরপাড়ার ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে একখানি পুরাতন কালীকীর্ত্তনের পুথি দেখিয়াছিলাম। তাহা কেনও আছে কি না, পাঠে কি আছে কি না বলিতে পারি না। এই কালীকীর্ত্তনে উমার লীলা বর্ণনা আছে, উমা পাটেশ্বরী অধ্যায়ে দেহাত্মবোধ ও দেশাত্মবোধের পরিচয় ও অনুরক্ষা বর্ণনা আছে। তাহারই সংক্ষেপে সামান্য ভাবাংশের আবৃত্তি করিলাম মাত্র।

এ হেন ভাবুক কবি, তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সেন হালিসহর গ্রামে দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালীকীর্ত্তনের লেখক রামপ্রসাদ, প্রসাদী মালসী বা সঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ, সরল গ্রাম্য বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব ভাবরাশির সঞ্চয়ী রামপ্রসাদ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর চিরধনী—পূজ্য, পূজ্যতম বরেণ্য। তান্ত্রিক সাধনা বুঝ আর নাই বুঝ, ভক্তিতত্ত্ব বুঝ আর নাই বুঝ, ভেদ করিয়া যাহার আত্মার ঊর্দ্ধগতি হয়, সে কত বড় সাধক তাহার ধারণা করিতে পার, আর নাই পার, রামপ্রসাদের গানের মহিমা ত বুঝিবেই, রামপ্রসাদের ভাবের মর্য্যাদা ত করিবেই; কেন না, তুমি যে বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষা যে তোমাদেরও ভাব-জননী। অতএব এত বড় ভাবুকের, এমন সামান্য সরল কবির সমাদর বাঙ্গালী মাত্রকেই করিতে হইবে।

কালী কেমন ?

বাঙ্গালার দুর্গা পেত্নিমা-পূজা প্রচলনের পর হইতে, পটুয়াদিগের গ্রহণী বৃদ্ধির পর হইতে বাঙ্গালীর বর্ণ পরিচয় লোপ পাইয়াছে। খৃষ্টানের আগমনবার্ত্তীশের কালের পর হইতে শ্রীচৈতন্য-সেবকগণের অভ্যুদয়ের পর বাঙ্গালায় মাটির প্রতিমা গড়িয়া পূজার প্রচলন পড়িয়াছে! ইহা

পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থের গৃহে তাম্রটাটের উপরে ইষ্টদেবীর যন্ত্র অঙ্কিত বা খোদিত থাকিত এবং সেই যন্ত্রের উপরে হোমাদি হইত, প্রতিমা পূজা হইত না। বাঙ্গালায় যে সকল পুরাতন প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মন্দির আছে, কি শাক্ত কি বৈষ্ণব, সকল দেবপ্রতিমার আসনের উপরে একটা করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত আছেই। গড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে বেদীর উপরে তান্ত্রিক যন্ত্র পাইবে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রত্নবেদীর উপরেও তান্ত্রিক যন্ত্র আছে। বাঙ্গালী পূর্ব্বে পূর্ণরূপে তান্ত্রিক ছিল—যন্ত্রোপাসনা করিত। বরেন্দ্রীর জগৎরাম রায় বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে মাটির নির্ম্মিত সিংহবাহিনীর পূজা আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর এই সংস্কার দৃঢ় ছিল যে, দশমহাবিদ্যার রূপ প্রকট করিয়া কেহ পূজা করিতে নাই। কালী দশমহাবিদ্যার অন্য বিদ্যা, কালীমূর্ত্তি গড়িয়া কেহ পূজা করিত না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্ত্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক সমাজ অনেক দিন চলেন নাই; লোকে "আগমবাগীশী কাণ্ড" বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত। বিশেষতঃ স্বয়ং মূর্ত্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করার কথা নহে, তাই বাঙ্গালী উহার অনুসরণ করে নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের পর হইতে বাঙ্গালায় কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়। মহারাজ ব্যবস্থা দেন যে, কুম্ভকারে কালীমূর্ত্তি গড়িয়া দিলে এবং স্বয়ং অথবা শিবকে দেবকে প্রতিনিধি করিয়া কালী পূজা করিলে কালী পূজা করা হইবে। এখন সে ব্যবস্থাও উপেক্ষিত,—এখন কুমারটুলি হইতে মাটির কালীমূর্ত্তি আনাইয়া যে কোন পুরোহিতের দ্বারা পূজা সম্পন্ন করান হয়। কিন্তু তন্ত্রের বিধান হইতেছে এই যে, কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি আদ্যা বা মহাবিদ্যার পূজা কেবল তাহারাই করিবেন—যাঁহারা ঐ সকল বিদ্যার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত। এ পূজা স্বয়ং করিতে হয়, নিজে অপারগ হইলে মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রতিনিধি করিয়া পূজা করাইতে হয়। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় সাধকেই পূজা করিবার অধিকারী। ভক্ত রামপ্রসাদ আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্বয়ং কালীপূজা করিতেন।

আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত বাবু মহল সাধনা-পূজাসম্বন্ধে এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য খবর রাখেন না বলিয়া, অবান্তর হইলেও খবরগুলা দিয়া রাখিলাম। তোমরা পাদ্রীদিগের মুখে যে জাতিভেদের পরিচয় শুনিতে পাও বা পৌত্তলিকতার সমাচার জানিতে পাও, তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কখনও ছিল

না। বরং এখন বাবু-মহলে ইংরেজের আইন আদালতগ্রাহ্য হিন্দু আইনের প্রভাবে কতকটা সেই জাতিবিচার ও পৌত্তলিকতা প্রচলিত হইয়াছে বটে; পরন্তু এই উদ্ভট প্রচলনের মূলে বাবু-মহলের অজ্ঞতাই প্রবল হইয়া আছে। তোমরা দেবদেবীর প্রণামপদ্ধতি ভুলিয়াছ, পূজা-প্রকরণের অর্থবোধ তোমাদের নাই, সে পুরাতন ভাষাবোধও নাই, তাই ভ্রান্ত ধারণা বশে তোমরা যা-তা করিয়া বস! এ জন্য পাত্র অপরাধী নহে, সমাজও অপরাধী নহে। যাউক, এখন আসল কথাটা বলিব।

বর্ণপরিচয়।

আমাদের আধুনিক বাঙ্গালীর বর্ণপরিচয় লোপ পাইয়াছে, ভাষাজ্ঞান ক্ষীণ হইয়াছে। কালীরূপের কোন বর্ণনায় তিনি মসীরূপিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই, তবে তাঁহার বর্ণ মসীময় হয় কেন? উত্তরে বলিব শ্যামা—শ্যাম বোরা, ভীমা প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা ভুলিয়াছি। তন্ত্রে আছে মা কালী,—

"কালাভ্রশ্যামলাঙ্গীং বিগলিতচিকুরাম্।"

অর্থাৎ কালরূপী মেঘের ন্যায় শ্যামলাঙ্গী কালী। কালের বা সময়ের মেঘই বা কেমন? তাহার বর্ণই বা কেমন? ভক্ত কমলাকান্ত গান করিয়াছিলেন,—

"নব সজল জলদকায়,
দেখিলে আঁখি জুড়ায়।"

নব সজল জলদের বর্ণ কি মসীবর্ণ? ঘনঘোর মসবর্ণ দর্শন করিলে ত নয়ন জুড়ায় না, উহাতে ত স্নিগ্ধতা নাই। অতএব বলিতেই হইবে, বাঙ্গলার পটুয়াগণ কালীমূর্ত্তিকে যে বর্ণে রঞ্জিত করেন, মায়ের শ্যামার সে বর্ণ নহে। ইংরাজীতে যেমন dark শব্দের প্রকৃত দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা আমাদের বোধগম্য হওয়া কঠিন, আমাদেরও তেমনি শ্যাম শব্দের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা সহজে বোধগম্য হয় না। নব সজল জলদ শ্যাম, নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, ঘনশ্যাম, চিদ্‌ঘন শ্যাম, তপ্তকাঞ্চনশ্যাম, নবোৎপল শ্যাম—কত রকমের শ্যামবর্ণ যে আছে, তাহা শেষ করিয়া উল্লেখ করা চলে না। এই শ্যামশব্দের ব্যাখ্যার উপরে আমাদের বহু দেব-দেবীর ও অবতার সকলের বর্ণপরিচয় নির্ভর করিতেছে। অথচ শ্যামরূপ যে কেমন রূপ, তাহাই আমরা জানিতে, বুঝিতে ধারণা করিতে ভুলিয়াছি।

কালী মূর্ত্তি।

কালীমূর্ত্তি যে কেমন, তাহার নির্দ্ধারণও কঠিন। প্রত্যেক পুরাণে ও তন্ত্রে কালীর ভিন্ন ভিন্নরূপবর্ণনা আছে, অনেক ক্ষেত্রে কতকটা বিরোধী বর্ণনাও আছে। এই বর্ণনার সামঞ্জস্য ঘটান বড়ই কঠিন। তবে একটা বিষয় ঠিক যে, কোন কবি, কোন পুরাণ, কোন তন্ত্র কালীকে মসীবরণা বলেন নাই, নীল-বর্ণের উল্লেখ আছে বটে, সে কেবল তারামূর্ত্তির বর্ণনায়, শ্যামারূপে নহে। কালীর দুই মূর্ত্তি—এক রণরঙ্গিনী, অপর মহাবিদ্যা বা আদ্যাবিদ্যা। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আদ্যাবিদ্যার রূপবর্ণনা আছে। আমাদের হালিসহর গ্রামে বল্লদেঘাটার ঘাটের উপরে যে অতি পুরাতন সিদ্ধেশ্বরী কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তিনি শবশিবপ্রধাথিনী, অসিধারিণী রণোন্মাদিনী কালী নহেন, ছোট মেয়েটি সিংহাসনের উপরে বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদ অনেক শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের কোন গানেই কালীর ভীষণ ভৈরবী সৃষ্টিধ্বংসকারিণী মূর্ত্তির বর্ণনা নাই। এখন যে শ্যামা-মূর্ত্তির পূজা হয়, তিনি শ্মশানকালী, পূর্ব্বে কখনই ঐ মূর্ত্তির পূজা গৃহস্থগৃহে হইত না। রামপ্রসাদ স্বজীবনে উমার তিনরূপের সাধনা করিয়াছিলেন, উমা হৈমবতী, উমা মহেশ্বরী বা পার্ব্বতী এবং উমা শর্ব্বাণী। সে বার্ত্তা তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য "কালী কীর্ত্তনে" প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী ছিলেন না; তিনি গৃহী ছিলেন; সুতরাং শ্মশানকালীর উপাসনা করিবার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কালীর যে যন্ত্র ও মন্ত্র, সে সমস্তই যে গোপ্য, তাহার অন্যতম আধুনিক কালী নহেন। রামপ্রসাদ কালীকে মনোমোহিনী রূপেই সাজাইয়া ছিলেন, কখনও ঘোরা—ভীমারূপে দেখেন নাই, দেখিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"কে রে মনোমোহিনী ঐ? কে রে দৈত্যদলনী নলিনীনয়না স্থির দামিনী ঐ?" তবে রামপ্রসাদ তাঁহার লিখিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষাংশে শবসাধনার বর্ণনা ইঙ্গিতে দিয়াছেন, তাহাতেও কালীর রূপ বর্ণনা নাই। অতএব কালীর মূর্ত্তি বর্ণনা ঠিকমত করিতে পারিলাম না। নীলকণ্ঠ কালীর রূপ বর্ণনা একটু করিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"ঐ শ্যামা গুণধামা বারণ মানে না রে,—
রণে-রণরঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে
সমরে মগনা কালী করালবদনা ঐ।

বরমাল্য কণ্ঠকোলী ভর্তা শোভে মনোহর,
মুণ্ডমালা গলে দোলে, করে অসি এলোকেশী, উলঙ্গিনী ঐ !"

শ্যাম ও শ্যামা।

রামপ্রসাদই বাঙ্গালার প্রথম কবি ও সাধক, যিনি শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথমে গান করিয়া গিয়াছেন,—

"তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে,
নাচ দেখি উমা !
ব্রজে যেমন নেচে ছিলে
হয়ে বনমালী,—
অসি ছেড়ে বাঁশী ধরে,
মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা প'রে,
তেম্‌নি করে নাচ না কালী !"

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের মুখে, পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে এ গান যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে একটা স্থায়ীভাব আসন বিস্তার করিবেই। ইহা ছাড়া রামপ্রসাদের গান—"হৃদয় ব্রহ্মমন্দির দাড়া মা বিতথ হয়ে" "নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী বলি যা রাসবিহারী" প্রভৃতি সঙ্গীতের গান অতি উচ্চ ও অনুপম। এই ভাবসমন্বয় ধরিয়া পরে দাশরথি মহাশয় গান বাঁধিয়া গিয়াছেন—

"জান না রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥"

এই পরমকারণটা যে কি ও কেমন, তাহা বুঝাইতে পারিলে শ্যাম-শ্যামার ঐক্য, ভেদ ও সাম্য ভাব ঠিকমত বলা হইতে পারে। যাঁহারা রামপ্রসাদের গান, কালী প্রভৃতি অভিনিবেশসহ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের কাছে পরম ওঁকারের ব্যাখ্যা ব্যর্থ হইবে। রস লইয়াই শ্যাম ও শ্যামার ভেদ, বস্তুগত্যা উভয়েই এক ও অভিন্ন, উভয়েরই চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর রূপ। সে রূপ কেমন বলিতে পারিলাম না, সাধক গান করিয়া গিয়াছেন,—

"রূপসাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হলো।
এবার বা আসা হয় বিফল।
ভাবি যাই চুপে চুপে যাই বা কিরূপে,
ছ'ঘাটে বাটি বসিল।
সেথা নাই গুরু-চেলা বিদ্যুতেরই খেলা,
ঘাটে যেতে, আমার
মন মাঝী, হারি মানিল।"

মন-মাঝী হারি মানিয়াছে—রূপবর্ণনা করিতে পারিলাম না।

ভাবরূপা মহামায়া।

আসল কথাটা কি জান? আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে কি বৈদিক যুগে কি তান্ত্রিক যুগে খাঁটি পুতুল পূজা ছিল না, এখনও নাই। বৈদিক যুগে যজ্ঞাদি হইত, হোম হইত, কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইত না; কেবল যজ্ঞের শেষে পূর্ণাহুতি দিবার পরে ধ্যান করিতে হইত—যে, ইন্দ্রাদি যজ্ঞীয় দেবতা দিব্যালঙ্কারভূষিত হইয়া, হোমাগ্নির স্রুচীবনী শিখাকে অবলম্বন করিয়া, অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন। বৈদিকযুগে মূর্ত্তি দেবতা-দের ছিল না; প্রত্যেক অগ্নিহোত্রী দ্বিজ-গৃহ মন্দিরতুল্য ছিল। তান্ত্রিক যুগেও ঐ বৈদিক পদ্ধতি অনুসৃত হইত, কেবল তফাৎ ছিল এই যে, বৈদিক যুগে বেদী বানাইয়া তাহার উপর ঘৃতাদির অঙ্কন করিয়া যজ্ঞবিশেষের হোম-কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইত; আর তান্ত্রিক যুগে তামের টাটের মধ্যে নানাবিধ যন্ত্র অঙ্কিত বা খোদিত থাকিত, সেই টাট এঁকি করিয়া তান্ত্রিক যজ্ঞ করিতে হইত। এই টাটকে তাম্রকুণ্ড বলিত; তামের কুণ্ড না থাকিলে বিল্বের বা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠের কুণ্ড গড়াইয়া লইতে হইত। তান্ত্রিক যজ্ঞের সময়ে বীজমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বীজগত দেবতার ধ্যান করিতে হইত। তন্ত্র প্রত্যেক মন্ত্র সহ এক একটি রূপের ধ্যান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, জপযজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে ধ্যানগম্যামূর্ত্তি সাবয়বা ও সজীব হইয়া সাধকের সম্মুখে অবতীর্ণ হন। প্রত্যেক যজ্ঞের শেষে যজ্ঞপ্রধানা দেবতাকে সাবয়বে ফুটাইতে পারিলে যজ্ঞ পূর্ণ হইল, মনে করিতে হইবে। কালীতারা কমলা জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বহুতর-সংখ্যক ধ্যানের দেবতা, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই; একই মহামায়ার আদ্যাশক্তির

জপ-যজ্ঞের প্রভাবে ভাবের ও রসের অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই ব্যঞ্জনা সাধকের হৃদয়াকাশে সর্ব্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে। প্রথমে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ কখন দেখা দেয়, কখন বা লোপ পায়; শেষে জপ সিদ্ধি ঘটিলে স্থির দামিনীর তুল্য সে রূপ হৃদয়ে স্থায়ীভাবে বিরাজ করে। এ রূপ প্রকাশ করিতে নাই, কেবল নিম্নস্তরের অধিকারীর সাধনাসৌকর্য্যার্থে এক একটা মোটা ধ্যানরূপের বর্ণনা করিয়া রাখিতে হয়। সাধকের মন অতিমাত্রায় চঞ্চল হইলে প্রতীকের হিসাবে, আলম্বনের উপায়স্বরূপ মাটির বা পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া সম্মুখে রাখিতে হয়। মন-মাতঙ্গকে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে, স্থির রাখিবার চেষ্টায় মূর্ত্তিকে আলানস্বরূপ রাখিতে হয়; তাই রামপ্রসাদই বলিয়া গিয়াছেন,—

"কালীরূপ আলানে মনমাতঙ্গকে জোর বেঁধেছি।"

তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, মা আমাদের শতরূপা-কোটিরূপা মহামায়া; জগতে যত সাধক, মায়ের আমার তত রকমের রূপ। দেহগত, জন্মগত, বাসনাগত পার্থক্য হেতু মায়ের রূপ প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক মনুষ্য-দেহভাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকট হইয়া থাকে। তাই মায়ের একটা ধরা-বাঁধা রূপ কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সাধক-সমাজকে দেখাইতে নাই। সকল পুরাতন মন্দিরে দেবতার রূপ নাই, আকার-অবয়ব নাই,—আছে কেবল একখানা প্রস্তর খণ্ড, সেই প্রস্তর খণ্ডের পশ্চাতে বা উপরে থাকে কেবল খোদিত বা অঙ্কিত যন্ত্র। পরবর্ত্তী সাধক বা সেবায়তগণ সেই পাথর-খানার উপরে সোনার বা রূপার হাত পা বসাইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রতিমা বানাইয়া রাখেন। কাশীর অন্নপূর্ণা একখানা পাথর মাত্র, সেই পাথরের মাথায় একটা সোনার মুখ ও দুই পার্শ্বে সোনার হাত বসান আছে। কোথাও বা ভিখারী শিব, কোথায় বা দর্বী ও স্থালী, আর কোথায় বা সে সিংহাসন, পদ্মাসন। বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরেও ঐ একখানা যন্ত্রলিখিত পাথরই আছে, তাহাকে পাণ্ডারা যখন যেমন অভিরুচি তেমনই একটা রূপ দিবার চেষ্টা করে। ঘরের কাছে কালীঘাটের মা কালীর দিকে তাকাও, দেখিবে একখানা কষ্টিপাথরের উপরে একটা নাক বসাইয়া রূপার চোখ আঁটিয়া, সোণার জিহ্বা দিয়া, সিন্দূররাগে কতকটা করাল বদনের ছাঁদ ফুটাইয়া, সোণার চারি হাত এবং সোণার মুণ্ডমালা গাঁথিয়া এক অপরূপরূপা কালী বানান হইয়াছে। উহার নাই পদতলে শবরূপ শিব, নাই নরকর কটি, নাই ডাকিনী যোগিনী; মহাবিদ্যা কালীর ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তি উহা নহে, কোন

পুরাণ-বর্ণিত প্রতিমাও উহা নহে। উহা যন্ত্র এবং যন্ত্রের সাক্ষী স্বরূপ একটা প্রতীক মাত্র। তারাপুরে যাও, দেখিবে মায়ের মন্দিরে,—

"নীলবরণী নবীনা রমণী,
নাগিনাজড়িত জটাবিভূষণী;
লীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথনিভাননী।"

এমন তারামূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে না। আছে কেবল একখানা পাথর, একটা মুখ এবং বসন ভূষণ। কাশীর দুই চারিটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরে বেদীর উপরে, যন্ত্র শিলায় আসনের পার্শ্বে একটা বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আসলে মূর্ত্তিপূজাটা বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তি। মহাযানী, বজ্রযানী এবং কালচক্রযানীদের প্রভাবে এক সময়ে উত্তর ভারতের সকল স্থান পাথরের প্রতিমায় পূর্ণ হইয়াছিল। এ প্রতিমার ধার বেদও ধারে না তন্ত্রও ধারে না। বেদ ও তন্ত্র কেবল মন্ত্র এবং যন্ত্র লইয়া ব্যস্ত। যাহা বলিলাম, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিবে কি?

যেমন পুরাতন মাতৃমন্দিরে, তেমনই শিবের মন্দিরে, কোনমন্দিরেই রূপময়ী দেবতা প্রতিষ্ঠিতা নহেন। শিবের মন্দিরে বিরাজ করেন কেবল অনাদিলিঙ্গ, কোনখানে পৌরীপট্ট সমেত, কোনখানে শেষ নাগবিজড়িত একলিঙ্গ। তন্ত্রে আছে, শিবের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে নাই,—শিব যে সর্ব্ব! মায়ের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত দেখি নাই; মা যে আমার শর্ব্বাণী। মজার কথা দেখ, শিব বা মায়ের প্রণামের মন্ত্রে কোন প্রকার রূপের নির্দ্দেশ নাই।

শিবের প্রণাম মন্ত্র এই,—

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

অথবা

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

ইহার কোনটাতেইত রূপ বর্ণনা নাই, পুঁতুলের প্রতি নমস্কার নাই অথচ প্রত্যেক হিন্দুকেই মাতৃমন্দিরের সন্নিধানে আসিলেই এই দুইটার একটা মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নমস্কার করিতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সাধক এবং

কবি নিজের ভাবানুকূল মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া ইষ্টদেবতার গুণগান করেন বটে, পরন্তু তাহা সাধনা নহে, কেবল সাধনার রোচক মাত্র। এই সকল ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া অভিনিবেশসহ কি বেদ, কি তন্ত্র, কি পুরাণ, কি উপনিষদ পাঠ করিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন আমাদের হিন্দু শাস্ত্র পুতুল পূজার সমর্থক নহে। আমাদের আছে ভগবানের নাম ও রূপ, এ-রূপ আকার নহে, মূর্ত্তি নহে, 'প্রতিমা' নহে। উহা যে কি, তাহা বুঝান কঠিন। তন্ত্রের একটা স্বতন্ত্র-অভিধান আছে, তাহাতে তন্ত্রোক্ত সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা আছে। সে তন্ত্র-কোষের প্রচারক নাই; গতিকেই মাসিক কাগজের সন্দর্ভে সকল কথার ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়।

মা আমাদের ভাবরূপা মহামায়া। তাই ভক্ত গান করিয়াছেন, "কখন কি ভাবে অভয়া দেখা দেও মা হৃদয়মাঝে।"—বলা ত যায় না মা কতরূপে, কত ঢঙে সাধকের হৃদয়-আকাশে বাসেল্যুবিকাশের ন্যায় ফুটিয়া উঠেন। এই অজ্ঞেয়তা মায়ের রূপে আছে বলিয়া মা আমাদের শ্যামা। আমাদের দেশ যে শ্যামের দেশ। ইহার নীলগগন নিত্য শ্যামায়মান, ইহার গিরিশ্রেণী শ্যাম-লতায় নিত্য আচ্ছন্ন, ইহার বন উপবন লতা গুল্ম পত্র পল্লব অপূর্ব্ব শ্যাম-শোভায় নিত্য বিরাজমান, ইহার নদনদী তড়াগপল্বল সর্ব্বদা নীলাম্বু-পূর্ণ, ইহার শস্য ক্ষেত্র সকল সদাই শ্যাম-আস্তরণে আবৃত,—এ দেশের নরনারী স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত শ্যাম লাবণ্যে যেন ঢল ঢল করিতেছে,—এমন শ্যাম-শ্যামার দেশে, শ্যাম-শ্যামার সঙ্গীতের স্বর লহরীতে নিত্য মুখর গগন পবনের ভিতরে আমাদের কর্ম্ম দেবীই ভাবরূপা মহামায়া ঘোরা, ভীমা, শ্মশানকালীরূপে প্রকট হইয়া আছেন। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে শ্মশান, প্রত্যেক সরিৎপ্রবাহ চিতাচুল্লির অঙ্গারস্তূপ বহন করিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছে,—ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখ এমন হাসি মাখা বাঙ্গালা দেশে কাহারও মুখে হাসি নাই, সবাই শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত বা নিত্য চিন্তিত। মা আমার কঙ্কালীর ঘরে ঘরে কেবল মরণের অভিনয়ই করিতেছেন। সাধকের কর্ম্মকাণ্ডেই এমন মাতৃভাবের একটা বিকট বিকাশ। যেমনা, বাঙ্গালা যে কৃষিকার্য্য ভুলিয়াছে, রামপ্রসাদই গান করিয়াছেন, "মন তুমি কৃষিকাজ জান না, এমন মানব জমীন রৈল পতিত আবাদ কর্লে ফল্তো সোনা।" চল-চল কৃষক প্রধান, সাধক প্রধান রামপ্রসাদের অঙ্গনে যাইয়া দাঁড়াই, যদি পুরুষকারের হলচালনা প্রভাবে আবার আমরা সোণা ফলাইতে পারি। কি বলিব মা, রামপ্রসাদের সঙ্গে গলা মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

"ধন্যদারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে ?
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ?
জন্মে জন্মে বিকায়েছি ভব রাঙ্গা পায়।
বলিবার কথা নয়, বলা নাহি যায়॥
অধমে করুণা কর কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসী পুত্র হই॥

অন্তিমের পথে।*

প্রভু গো !
(আজি) তোমারই শরণ লয়েছি।
দেখ ! সব মুছে ফেলে হৃদয় আঁধারে,
তোমারই মূরতি এঁকেছি।
জীবনের পথে তোমারে ভুলিয়ে,
কত যে বেদনা পেয়েছি ;
দিশেহারা হ'য়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
(কত) নয়ন-সলিলে ভেসেছি।
আকুল হৃদয়ে "নাথ নাথ" ব'লে,
(আবার) যখনই তোমারে ডেকেছি ;
চির শান্তিময় চরণ তোমার,
তখনই হৃদয়ে পেয়েছি।
তুমি বিনা—কেহ— নাহি আপনার,
বারে বারে নাথ ! বুঝেছি ;
(আজি) সবারে ত্যজিয়ে সাথে সাথে তাই,
অন্তিমের পথে চলেছি।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
'সৎসঙ্গ'-সম্পাদক।

* এই কবিতাটী সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী সঙ্গীতে রেকর্ড করিয়াছেন।

দুঃস্বপ্ন।

—:*:—

রাত্রি আমি ভালবাসি, বড় ভাল বাসি। পুরুষ রমণীকে যেমন ভালবাসে, মুষ দেশকে যেমন ভাল বাসে, তেমনি গভীরভাবে আমি রাতকে ভালবাসি। আমি শরীরের প্রতি অণুপরমাণু দিয়া, প্রতি অঙ্গ দিয়া, চক্ষু,নাসা, কর্ণ সব দিয়া রাত্রির অন্ধকার ভালবাসি। সকালের পরিষ্কার আকাশে মিষ্ট সূর্য্যালোকে গরমের দিনে ভরতপাখী আনন্দে গান করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া যায়, আর রাত্রির বিজন অন্ধকারে পেঁচারা কালর গায়ে আরও কাল দাগ কাটিয়া অনন্ত অন্ধকার দেখিয়া মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়—সেই অশুভ ধ্বনি দূর হতে দূরান্তরে প্রতিধ্বনি তোলে।

দিনের আলোকে আমি কেমন হাঁফিয়ে উঠি—কেমন পীড়াদায়ক, কোলাহলপূর্ণ দিনগুলি! বিছানা ছেড়ে উঠতে আমার একটুকুও ইচ্ছা করে না—অতি অনিচ্ছায় উঠি। কেমন একটা অবসাদ সর্ব্বদাই দিনে আমার চারিদিকে ঘিরে থাকে। চলাফেরা ঘোরা, কথাকওয়া, খেয়াকপ্পা, এমন কি ভাবনাটা পর্য্যন্ত—ভাবতে আমার অতি অস্বস্তি ও কষ্ট বোধ হয়। মনে হয় যেন একটি গুরুভারের বেদনা বোধ করছি।

সূর্য্য যখন ডুবে যেতে আরম্ভ করে,—ধীরে ধীরে আমার আনন্দ ফিরে আসে। আমার সমস্ত কর্ম্মপ্রবনতা অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করি। যতই ঘোর হতে থাকে, আমি অন্য লোক হয়ে যাই, আমার সুখ, শক্তি, যৌবন, মনুষ্যত্ব সব ফিরে আসতে আরম্ভ করে। আমি তাকিয়ে দেখি কেমন করে ধীরে ধীরে আকাশ থেকে অন্ধকার ঝরে পড়ছে, সমস্ত সহরকে দুর্ভেদ্য এই অন্ধকার ঘিরে ফেলছে, সমস্ত বাড়ী ঘর, বড়, ছোট, সাদা, কালোর ঘন আবরণে ঢাকা পড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বিড়ালের মত ছাদে ছাদে পেঁচারা যেমন আনন্দ চীৎকার করে বেড়ায়, তেমনি অন্ধকার দেখে আমারও ইচ্ছা করে প্রাণভরে আনন্দে চীৎকার করে উঠি, ভালবাসার অদম্য বেগ রক্তস্রোতে আগুন জালিয়ে তোলে।

কখনও কখনও প্যারীর সহরতলীর অন্ধকারে বা কখনও কখনও বিজন বনের গভীর অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়াই, আমার আশে পাশে

আমারই জাতীয় নিশাচর কত পশু পক্ষী বেড়ায়—আর পাখী-চোরের দল তারাও সেখানে দেখা দেয়।

প্রবল ভালবাসার বেগের মাঝে মৃত্যু উঁকি ঝুঁকি দেয়। কিন্তু আমার মনের মাঝে যে কি হচ্ছে তা কি করে বলব? কেমন করে বলব আমার সব ইতিহাস বলতে পারব—কে জানে পারব কি না। তবে যা বলি তাই শুনে যাও।

এই গত কাল—গত কালই কি? হাঁ এই গত কালই সূর্য্যাস্ত তখন হয় নাই। কতক্ষণ সে রাত্রি ছিল, জানি না, বলিতে পারি না—তোমরা কি কেউ বলিতে পার?

হাঁ—সে কালই—খাবার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। বেশ রাত্রি,—শান্ত কিন্তু গরম। বুলভার্দের দিকে যাইতেছিলাম—মাথার উপরে আকাশে একটা কালের স্রোত বহে চলেছে; তারা নক্ষত্র চিক্ চিক্ করিতেছে; আমার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরের কালো আকাশের জলস্রোত ও নক্ষত্রমালা ঘুরে ফিরে আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু হইয়া চলিয়াছে।

সবই সেই অন্ধকারে উজ্জ্বল—আকাশের অগণ্য তারকা ও নীচে মহরের বহু গ্যাসবাতী সব মিলে আলোর হোলী জাগাইয়াছে। রাত্রির এই মৃদুমন্দ আলোকমালা দিনে আকাশ আলোর চেয়ে কত সুন্দর!

বুলভার্দের কাফেগুলি আলোতে ঝলমল করিতেছে; কত লোক বসিয়া বসিয়া মদ খাইতেছে, হাসিতেছে; কত লোক চলিয়া যাইতেছে। আমি কিছু ক্ষণের জন্য একটা থিয়েটারে ঢুকিয়া পড়িলাম—কোন্ থিয়েটারে কে জানে নাই। থিয়েটারের ফুট লাইটের সারি, ব্যালকনির ঘেরা আলোকমালা কাচের উপরে পড়িয়া এমন সব আলোকের ঐশ্বর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, এক দণ্ড আমি সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না।

আরও একটু আগাইয়া চাম্পস এলিসিসে পৌঁছিলাম। কাফেগুলিতে তখন কনসার্ট বাজিতেছে। মনে হইল সমুজ পত্রগুচ্ছের মধ্যে এই কনসার্টের বাজনা যেন আশ্চর্য্য করিতেছে। চেষ্টনাটগুলির উপর আলোক পড়িয়াছে—মনে হইতেছে যেন চেষ্টনাটগুলিতে রঙ ধরান হইয়াছে—তাহা হইতে কেমন একটা শীতাভ আলোক নির্গত হইতেছে। বৈদ্যুতিক আলোগুলি দীপ্তিহীন আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়া চন্দ্রের মত দেখাইতেছে বা প্রকাণ্ডাকৃতি মুক্তার মত বোধ হইতেছে।

আমি আর্ক দি ট্রাইম্ফএর তলায় গিয়া দাঁড়াইলাম—সম্মুখে এভিনিউ—বিস্তৃত এভিনিউ প্যারী অবধি গিয়াছে—দুধারে তারার ও গ্যাসের আলোর মালা দুলিতেছে। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ—কে উহাদের ওখানে অনন্ত বিস্তারে যেমন তেমন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে?—উহাদের খবর কে জানে?—আমাদের কত বিস্ময়, কত স্বপ্ন, কত কল্পনার বিষয় ওরা!

বয় দি বোলনে পৌঁছিয়া বহুক্ষণ—বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। হঠাৎ কিসের প্রেরণায় সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল—হঠাৎ এ প্রবল প্রেরণা কেন বোধ করিলাম। এ তো যে সে প্রেরণা নয়, মনের এ যেন বিকার—প্রায় উন্মাদের বিকারের মত।

আরও বহুক্ষণ ধরিয়া বহুদূর চলিলাম। তারপর ফিরিতে—আরম্ভ করিলাম। কখন যে আবার আমি আর্ক দি ট্রাইম্ফের তলায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। সমস্ত নগর তখন সুষুপ্ত—খণ্ড খণ্ড ছেঁড়া পাঁজা মেঘ—গাঢ় কাল মেঘ ধীরে ধীরে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিতেছিল।

সেই সময় আমি প্রথম বোধ করিলাম অসম্ভব কিছু ঘটিবে। রাত্রি কেমন ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল, আমার চারিদিকের বাতাস জমিয়া উঠিতেছিল। রাত্রি—অন্ধকার রাত্রি, আমার প্রিয়, অতি প্রিয় রাত্রি আবার হৃদয়ের চারিদিকে ঘিরিয়া জুড়িয়া বসিতেছিল। এভিনিউ জন প্রাণিশূন্য কেবল দূরে দুজন পুলিস ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; গ্যাসবাতীর ক্ষীণালোক রাস্তায় পড়িয়াছে—বাতিগুলির নিবু নিবু অবস্থা—সেই ক্ষীণালোকে দেখিলাম এক সারি শাকসব্জীবোঝাই গাড়ী হলিসের দিকে ধীর মন্থর গতিতে চলিতেছে। গাড়োয়ান সব্জীর উপর ঢলাইয়া পড়িয়াছে—এমন ভাবে সে সব্জীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখা যাইতেছে না। গাড়ীর ঘোড়াগুলি আগের গাড়ীর পেছন পেছন ধীরে ধীরে ফেলিয়া চলিয়াছে রাস্তার ওক্তায় তাদের চলার জন্য একটুকুও শব্দ হইতেছে না। রাস্তার আলো নানারকম সব্জীর উপর পড়িয়া নানারকম রঙ প্রতিফলিত করিতেছে—আর সেই নানারঙের গাড়ীর সারি—কেউ বা আগুনের মত লাল, কেউ বা রূপার ন্যায় সাদা, কেউ বা মরকতের মত নীল। গাড়ীর অনুসরণ করিয়া খানিকক্ষণ চলিলাম। তারপর ঘুরিয়া কয়রালি হইয়া পুনরায় বুলভর্দে ফিরিয়া আসিলাম। বুলভর্দ এখন শ্রান্ত—কর্ম্মক্লান্ত জনমানবহীন,—আলোকবিভূষিত কাফেগুলি নিস্তব্ধ, মাত্র যে দু'চারিজনের দেরি হইয়া গিয়াছিল,তাহারা ব্যস্তভাবে বাড়ী ফিরিতেছিল। প্যারীর এমন জন মানবহীন অবস্থা, এমন

নিস্তব্ধতা—আমি কোনও দিন দেখি নাই। পকেট থেকে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিলাম দুটা বাজিয়াছে।

কেমন কিসের একটা প্রেরণায় চলিতেছিলাম। চলিতে চলিতে ব্যাঙ্কাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কেমন একটা বিরাট অন্ধকার—সেখানে তার চকচকে ঝক্‌ঝকে স্মৃতিস্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত সেই বিরাট অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। আকাশের নক্ষত্রের মেলা সেই বিপুল অনন্ত মেঘভারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—সেই অন্ধকারে সর্ব্বব্যাপী মেঘরাশি যেন পৃথিবীকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

আবার ফিরিলাম—আমার আশে পাশে দ্বিতীয় কেউ নাই। প্লেস চাটুতে একটা মাতাল আমাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ মাতালটার স্খলিত পদশব্দ শোনা যাইতেছিল। কাউবরতে আমার পাশ দিয়া একখানা ছক্করগাড়ী সীননদীর দিকে চলিয়া গেল। গাড়ীখানাকে ডাকিলাম, কে শুনিতে পাইল না। ফ্লড্রাওয়টে একটী রমণী ঘুরিতেছিল, সে আমাকে দেখিয়া কহিল—"মঁসিয়ে, আমার একটা কথা আছে, শুন না" তার হাত থেকে বাঁচিবার জন্য আমি দ্রুত চলিয়া আসিলাম। ভডভেলিতে দেখিলাম, নর্দ্দমার মধ্যে নামিয়া একটি ছেঁড়া-কাপড়-ফুড়ুনী ময়লাস্তূপে ছেঁড়াকাগড়ের টুক্‌রা খুঁজিতেছে—তার ছোট হাতলণ্ঠনটি মাঝে মাঝে দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ক'টা বেজেছে বল্‌তে পার কি বাছা?"

সে বিড়বিড় করিয়া কহিল—"আমার তো ঘড়ী নেই বাপু কি ক'রে বল্‌ব তা?"

হঠাৎ তাকাইয়া দেখি, গ্যাসবাতীগুলি সব নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িল বৎসরের এ সময় খরচ বাঁচাইবার জন্য প্রভাতের পূর্ব্বেই বাতী নিবাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের তখনও বহু দেরী।

মনে করিলাম—যাক্‌গে হাস্পিসের দিকেই যাওয়া যাক্, সে দিকে কিছু জীবনের সাড়া পাওয়া যেতে পারে।

আমি রওনা হইলাম; কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রেডিট লায়ওনিসের সাম্‌নে যাইতেই একটা কুকুর ভীষণভাবে ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। আমি ঘুরিয়া রু, ডি, গ্রামণ্টের পথ ধরিলাম। আমি তখন

পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি—এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক যায়গায় আসিয়া পড়িলাম—এইতো বাউণ্ডারী—বাউণ্ডারীর লোহার রেলিঙ্। সমস্ত প্যারী ঘুমন্ত—কি গভীর ভীতিপ্রদ সে নিদ্রা। দূরে একখানা ছকরগাড়ী খট্‌খট্ করিয়া চলিয়াছে, বোধহয় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে ছকর গাড়ীখানা দেখিয়াছিলাম, সেই গাড়ীই এই। গাড়ীখানা ধরিতে চাকার শব্দ শুনিয়া পেছন পেছন ছুটিলাম, কিন্তু গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবার পথ হারাইয়া ফেলিলাম।

এ কোথায় আমি আসিয়া পড়িয়াছি? নির্ব্বোধের দল রাত থাকিতে কেন বাতী নিবিয়ে দেয়। পথে কেউ নাই, এমন কি চোরেরাও বাহির হয় নাই, লম্পট বিড়ালও নি-চুপ। সব চুপচাপ।

পাহাড়াওয়ালারাই বা কোথায়? মনে করিলাম তাদের কাউকে ডাকি। প্রাণপণ শক্তিতে ডাকিলাম, কেহই জবাব দিল না।

আবার ডাকিলাম—আমার স্বরে প্রতিধ্বনি উঠিল, সেই দুর্জ্জেয় মৃত্যুর মত ভীষণ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিতে আমার শব্দ পারিল না।

আমি মরিয়া হইয়া কহিলাম—'কে আছ কোথায় বিপন্নকে সাহায্য কর' কেহই আসিল না। কটা রাত্রি তখন দেখিবার জন্য পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিলাম, কিন্তু পকেটে দিয়াশলাই নাই কি দিয়া দেখিব? কিন্তু সেই ক্ষুদ্র যন্ত্রের টিক্ টিক্ ধ্বনি আমার প্রাণে বল আনিল। তবুও তো প্রাণের কিছু সাড়া পাওয়া যাইতেছে—আমার নিঃসঙ্গ ভাবের কিছু কাটিয়া গেল। কি অদ্ভুত রহস্য ইহার! আবার সেই বিপুল অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম; পাশের দেওয়ালে লাঠির ঠোকা দিতে দিতে পথ চিনিয়া চলিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আকাশের দিকে চাহিতেছিলাম, যদি আলোর সঙ্কেত পাওয়া যায়; কিন্তু আকাশের সব কাল—মসীবর্ণ কাল—নীচের সহরের চেয়েও অন্ধকার।

তখন ক'টা বাজিয়াছিল জানিনা, আমি চলিতেছিলামই—সময় আমার কাছে অনন্ত বোধ হইতেছিল। পা আর চলিতে চাহিতেছিল না, বুক দপ্ দপ্ করিতেছিল, ক্ষুধায় পেটের নাড়ী অবধি জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল।

মনে করিলাম এবার যে বাড়ী সামনে পাইব, তাহারই কড়া নাড়িব। কড়া নাড়িলাম—ভীষণ শব্দ করিয়া কড়ার শব্দ সেই বিশাল বাড়ীতে—প্রতিধ্বনি তুলিল—সে বাড়ীও মানবহীন।

তবুও অপেক্ষা করিলাম, কেহই আসিল না, কেহই উত্তর দিল না। আবার কড়া নাড়িলাম, আবার কড়া বাজিয়া উঠিল, কেহই আসিল না।

আমার কেমন একটা ভয় করিতে লাগিল। আমি দৌড়াইয়া গিয়া পরের বাড়ীর কড়া অন্ততঃ নিশবার নাড়িলাম—কেহই জাগিল না, কেহই সাড়া দিল না। একে একে আরও বহু বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলাম, লাথি, ধাক্কা, লাথি, বাড়ি, কিল, ঘুঁসি কত মারিলাম, কেহই উঠিয়া আসিল না, দরজা খুলিল না। হঠাৎ বোধ করিলাম হালিসে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই অতবড় বাজার চুপ চাপ, গতিহীন, অচঞ্চল, নির্জ্জন—একখানা গাড়ী নাই, মানুষ নাই, দোকানে জিনিসের স্তূপ নাই, ফুলের চেড়ি—নাই। সব খালি—প্রাণ হীন, ভাঙ্গা—মৃত্যুর কোলে যেন সব ঢলিয়া পড়িয়াছে।

আমার ভয়ানক ভয় করিতে লাগিল—এ কি সব, এর মানে কি—হে ভগবান্!

আবার চলিলাম, কিন্তু ক'টা রাত্রির কিছুই জানি না আর কেই বা বলিয়া দিবে তা'! টাউয়ার ক্লকগুলিও বাজিতেছে না। মনে করিলাম ঘড়ীর কাচখানা খুলিয়া ফেলিয়া হাত দিয়া কাঁটা অনুভব করিয়া বুঝিব সময় কত, কাঁটা স্পর্শ করিয়া দেখি অনেকক্ষণ ঘড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জানিবার আর কোনও উপায় নাই—সহরেও সব নিশ্চুপ—আলোকেশহীন, বাতাস থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সব নিস্তব্ধ—দূরের হুকরের শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছে না—কিছুরই শব্দ নাই।

আমি নদীতীরের পাকা রাস্তায় দাঁড়াইয়া; নদী থেকে তুষারশীতল ক্লান্তি-অপহারক হাওয়া উঠিয়া আসিতেছিল।

সীন নদ কি চুপ করে নাই? সে কি সত্যই বহিয়া চলিয়াছে?

দেখি সত্যি কি না—সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া চলিলাম—পোনের তলার নদীর গভীর গর্জ্জন আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল...আর ছ'এক সিঁড়ি...তারপরই বালুকা...তারপর...তারপর গভীর জল...আমি জলে পা ডুবাইয়া দিলাম...হাঁ, হাঁ নদী বহিয়া চলিয়াছে সত্যই...কি বিষম ঠাণ্ডা জল জমিয়া যাইবার যোগাড়...প্রায় মৃত্যু শীতল!

বোধ হইতেছিল সেখান হইতে আর উঠিতে পারিব না...সে শক্তি আমার নাই...ঐখানেই আমার মৃত্যু নিশ্চয়...আমি মরিব...মরিব...ক্ষুধায়...শ্রান্তিতে ...ক্লান্তিতে...শীতে...। *

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী

* ই, মে, মোপাসাঁর গল্প হইতে।

পুস্তক কীট।

অধ্যয়ন অথবা ব্যবসায় হিসাবে যাহাদেরই সহিত পুস্তকের সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগকে কোন না কোন সময় পুস্তক কীট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এই শ্রেণীর কীটের দৌরাত্ম্যে যে কত মূল্যবান্ পুঁথিপত্র বিনষ্ট হইয়াছে, কত বহুকালসাধ্য কষ্টলব্ধ জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমাদের দেশের জল হাওয়া সাধারণতঃ কীটবংশের সমধিক বৃদ্ধির অনুকূল—সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশে পুস্তককীটসমূহ যে অধিকতর ক্ষতি সাধন করিবে, তার আশ্চর্য্য কি? সামান্য জীব হইলেও নানা শ্রেণীর পুস্তক-কীটসমূহের জীবন বৃত্তান্ত ও নিবারণের উপায় সাধারণের অনুশীলনযোগ্য। নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক-কীট যে বিশেষ ক্ষতি সাধন করে, তাহা আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি।

Anobrium paniceum নামক কীট শুধু পুস্তকে নয়, পাউরুটিতেও পাওয়া যায়। অনেক পাঠকই বোধ হয় অবগত আছেন যে, কীট জীবনের চারিটী সোপান দেখিতে পাওয়া যায়—১ম ডিম্ব; ২য় কীড়া (শুঁয়া পোকা); ৩য় পুত্তালিকা (গুটি) এবং ৪র্থ পতঙ্গ। বর্ত্তমান কীটকে আমরা রুটিপোকা নামে অভিহিত করিব॥ এই রুটিপোকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পতঙ্গ অবস্থায় পূর্ণাবস্থায় ইহা প্রায় ১/১২ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ঈষৎ ধূসরবর্ণ এবং কতিপয় দৈর্ঘিক রেখাসম্পন্ন। ইহাদের ক্ষুদ্র ডিম্বগুলি পুস্তকের পত্রপ্রান্ত-সমূহের মধ্যে খোলা বুজের ভিতর কিম্বা বাঁধাইর ছিন্ন স্থানের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। প্রসবের সময় হইতে ৫।৬ দিনের মধ্যেই ডিম্ব ফুটিয়া কীড়া বাহির হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই লেইর দাগ ধরিয়া বাঁধাইর ভিতর ছিদ্র করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ইহারা শ্বেতাভ ধূসরবর্ণ, গোল, সামান্য পরিমাণে বক্র এবং ১৩টি অংশবিশিষ্ট অবয়বযুক্ত। ইহাদের ধূসরবর্ণের মস্তক শাঁইস আবৃত এবং চোয়াল এত দৃঢ় যে, লৌহবৎ কঠিন পদার্থ ব্যতীত অপর সকল দ্রব্যই ইহারা অনায়াসে চর্ব্বণ করিতে পারে। কীড়া, কাগজ, চামড়া, কাষ্ঠ—সমুদয়ের ভিতর দিয়া সমান ছিদ্র করিতে থাকে। ছিদ্র পথ দিয়া দূরীর মিশ্রিত

শ্বেতবর্ণ যে পদার্থ বাহির হয়, উহাই পুস্তক-কীটের ধ্বংসকার্য্যের চিহ্ন। বাহির খোসা ছাড়িয়া, ক্রমশঃ ছিদ্র বড় করিয়া কীড়া জীবনের তৃতীয় সোপান অর্থাৎ গুটি অবস্থায় আইসে। তিন সপ্তাহ এই অবস্থান অতিবাহিত হইবার পর পতঙ্গ বাহির হয়। গুটি পুস্তকের মলাটের বহির্ভাগের এত সন্নিকটে থাকে যে, পতঙ্গ অতি অল্প আয়াসেই বাহিরে আসিতে পারে, কিন্তু অনেক সময় ইহারা বাহিরে আসে না, ছিদ্রের ভিতরেই জোড় বাঁধে এবং আবার ডিম্ব-প্রসব করে। এই কীটের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় কার্ব্বন ডাই সলফাইড (Carbon Disulphide) প্রয়োগ। কোন একটি রুদ্ধবায়ু সিন্দুক অথবা আলমারিতে বহিগুলি সাজাইয়া সর্ব্বনিম্নে কোন প্রকার অগভীর পাত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কার্ব্বণ ডাইসলফাইড রাখিয়া বেশ করিয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ৩৬ঘণ্টা এ অবস্থায় থাকিলে কার্ব্বণ ডাই সলফাইড বায়ু পুস্তকাদির সর্ব্বত্র প্রবেশ করিবে; কারণ ইহা অতি সহজেই উপিয়া যায়। আর ইহার সংস্পর্শে আসিলেই কীট যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, মরিয়া যাইবে। কার্ব্বন ডাইসলফাইড প্রয়োগে দুইটি বিষয় মনে রাখা উচিত। প্রথমতঃ ইহা সহজদাহ্য ও অগ্নিসংস্পর্শে আসিলে আওয়াজ হইয়া জ্বলিয়া উঠে, সুতরাং দিনের বেলায়, কিম্বা যেখানে আলোক লইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানেই প্রয়োগ করা ভাল। দ্বিতীয়তঃ ইহার গন্ধ অতি জঘন্য, সিন্দুক অথবা আলমারি খুলিয়া কিছু সময় রাখিয়া তাহার পর পুস্তকাদি ঘরে আনা ভাল।

P 36,142

এই রুটি-পোকার আর একটি নিকট আত্মীয় আছে। তাহা কিন্তু পুস্তকাদি কাটে না। কেবল দেরাজ আলমারির তক্তা প্রভৃতি নষ্ট করে। অবশ্য বহির মলাটে কাঠ থাকিলে তাহা দৃষ্ট এড়াইয়া যায় না।

Dermestes আর এক জাতীয় পুস্তক কীট। এই জাতীয় পোকা কোন কোন স্থলে 'কালকুটুরে' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জাতীয় পোকা কঠিন পক্ষবিশিষ্ট এবং কীড়া লোমযুক্ত। বর্ষার অনতিপূর্ব্বেই ইহাদের স্ত্রীপোকা পুস্তকাগারে প্রবেশ করে ও পুস্তকের ধারে (বিশেষতঃ যে সমুদয় পুস্তক গ্রন্থে সংলগ্ন থাকে) ডিম্ব প্রসব করে। কীড়া বাহির হইলেই ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু কটিপোকার ন্যায় 'কালকুটুরে' পোকা দীর্ঘ, ঋজু ছিদ্র করে না। ইহাদের ছিদ্র অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইহারা কাগজই বেশী নষ্ট করিয়া দেয়। বেনজিন (Benzine) অথবা কার্ব্বণ ডাইসলফাইড

কাইরু প্রয়োগ দ্বারা কিম্বা কোন পাত্রে পনির রাখিয়া ফাঁদ পাতিয়া উহাদিগকে ধরিয়া বিনষ্ট করাই উহাদের আক্রমণ নিবারণের একমাত্র উপায়।

Anthrena নামক আরও এক কঠিন পক্ষবিশিষ্ট কীট পুস্তকাদি কাটিয়া নষ্ট করে; কিন্তু ইহারা লোমযুক্ত চামড়া, পশম, সংরক্ষিত জীবাদির অবয়ব (Stuffed animals) অধিক পরিমাণে পছন্দ করে এবং এইরূপে প্রদর্শনী-গৃহাদিতে প্রদর্শিত পশু পক্ষী প্রভৃতির দেহ নষ্ট করিয়া দেয়।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, অযত্নরক্ষিত পুরাতন পুস্তকাদি খুলিলে এক প্রকার চাকচিক্যময় লম্বা পক্ষবিহীন কীট নয়নপথে আসিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে Lepisma বলেন; কিন্তু ইংরাজীতে ইহার নাম 'Silver fissh' অর্থাৎ রজত মৎস্য। ইহার মস্তক বড়, তাহার পর দেহ ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়া শেষে তিনটি কঠিন কেশে (Bristle) পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেহসংযুক্ত আঁইস চাকচিক্যময় এবং এই কারণেই ইহার নাম রজত মৎস্য হইয়াছে। রজতমৎস্যের জীবনে সোপান নাই—অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই। পুস্তকাগার ব্যতীত ভাণ্ডারে ও রন্ধনগৃহেও ইহার প্রাদুর্ভাব কম নহে। সকল প্রকার আটা ও শিরীষ রজতমৎস্যের উপাদেয় খাদ্য এবং এই সমুদয়ের অভাবেই ইহারা মূল্যবান্ পুস্তকাদি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেয়। একটি পাত্রে কাগজের উপর লেই রাখিয়া তাহার উপর কীট প্রবেশের উপযোগী ছিদ্রযুক্ত একটি ছোট বাক্স উল্টাইয়া রাখিলে ইহাদিগকে অনেক সংখ্যায় ধরিতে পারা যায়। এরূপ ফাঁদ অন্ধকার কোণেই পাতা ভাল। পুস্তকসমূহ আলমারি হইতে বাহির করিয়া মাঝে মাঝে রৌদ্রে ও হাওয়ায় দিলে রজত মৎস্যের উপদ্রব অনেক পরিমাণে কম হয়। ইহাদিগকে ধরিয়া ক্লোরোসিল পূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

Psoques নামক আর এক প্রকার জীব পোকা (Lice) প্রথম বর্ষার সময় যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তকাদি নষ্ট করে। ইহাদের কিন্তু এক প্রবল শত্রু আছে—ইহা ইকুন জাতীয় এবং বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে Cheyletus eruditus বলেন। ইহার অবয়ব কোমল, ডিম্বাকার, চোয়াল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং পদদ্বয় বক্র নখরযুক্ত। অনেকে ইহাকে পুস্তক কীট বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক ইহারা পুস্তককীটের শত্রু। অনেক জীব পোকাই ইহার বলপ্রস্ত হইয়া পুস্তক ধ্বংসকার্য্যে বিরত হয়।

আমাদের চিরপরিচিত আরশুলাও পুস্তকের কম শত্রু নহে। নূতন নূতন পুস্তকের বাঁধাই যে ইহারা কিরূপে বিশ্রী ও নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা অনেকেই জানেন। Insut powderএর চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে আরশুলা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া যায় এবং সেই সময়ে ইহাদিগকে একত্র করিয়া বিনাশ করিতে পারা যায়। বারুদের ধোঁয়াতেও ইহারা মরিয়া যায়। আটা ও গুড়ের সহিত সোহাগা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া উহা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিলে অনেক আরশুলা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বশেষে এতৎপ্রসঙ্গে উইয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। সযত্নরক্ষিত সরকারি পুস্তকাগারাদিতে ইহার উপদ্রব কম হইলেও প্রতি গৃহে কিছু না কিছু কাগজপত্র উই দ্বারা বিনষ্ট হয়। একবার পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলে উই নির্ম্মূল করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীর প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিয়া এবং মাঝে মাঝে মিথিলেটেড স্পিরিটে Corrosive sublimate গুলিয়া পুস্তকাধার প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিলে উইএর উপদ্রব অনেক পরিমাণে কমিতে পারে।

পুস্তক এবং কাগজ পত্রাদির অনিষ্টকর যাবতীয় কীটের উল্লেখ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা সাধারণের মনোযোগ এই শ্রেণীর কীটের উপর আকর্ষিত হইলে এবং ইহাদের জীবনবৃত্তান্ত ও নিবারক উপায়ের চর্চ্চা হইলে আমরা সুখী হইব। Indian Museumএর কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ অনিষ্টকারী পুস্তক-কীট সমূহের আকার, প্রকৃতি, আপেক্ষিক প্রাদুর্ভাব নিবারণ প্রথা প্রভৃতি সম্বলিত একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করিলে সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে। ব্যবহারিক কীটতত্ত্বে পুস্তক-কীটের স্থান নেহাত নিম্নে নয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

প্রেমের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কি সুন্দর রাত্রি!" জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, ঘুমন্ত সুন্দরীর মুখের হাসির মত নৈশপ্রকৃতির চারিধারে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীরের পাহাড় পর্ব্বত, জল, স্থল জ্যোৎস্না মাখিয়া যেন হাসিতেছে। কাশ্মীরের রূপসী নদীর তীরে বসিয়া দুই তরুণী নৈশপ্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিতেছিল। দু'জনে সমবয়সী, অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু অবস্থায় দু'জনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দুজনের সাজসজ্জাও বিভিন্ন। একজনের পরণে জাফরাণ রঙের প্রায়জামা, আসমানি রঙের পেশোয়াজ, বক্ষঃস্থল জরির ফুলকাটা কাঁচলি-আবৃত; তদুপরি ফিরোজা রঙের ওড়না। কোমল রক্তাভ চরণযুগলে সাচ্চা জরির কাজ করা বক্রশীর্ষ চটিজুতা। অপরার সাধারণ রকমের সাজসজ্জা, পায়ে চটিজুতা। রূপের আলোকে দু'জনী তরুণী যেন জ্যোৎস্না-সরোবরে প্রস্ফুটিত হাস্যোজ্জ্বল পদ্মের মত দেখাইতেছে। একজনের নাম নুরুন্নেহার ও তাহার সঙ্গিনীর নাম আসমানী।

নুরুন্নেহার এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, আনন্দে মেহেদিপাতারঞ্জিত হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার চাঁদের শোভা! কি সুন্দর রাত্রি"। সঙ্গিনী বলিল, "চমৎকার। বড় মধুর রাত্রি! কি মধুর রাত্রি আসমানি!" দিল্লি, আগরা যমুনার ধারেও ত বেড়িয়েছি, "আসমানি বলিল, কৈ সেখানে ত এমন মধুর জ্যোৎস্না হয় না"। নুর বলিল, ঠিক বলেছিস্ আসমানি, এখানকার সবই যেন মধুর—নুরের কথায় বাধা দিয়া আসমানি বলিল, "কেন হবে না, দিল্লি আগরা সম্রাটের নিপুণ শিল্পীরা বানিয়েছে, আর কাশ্মীর প্রকৃতি-রাণী নিজের হাতে গড়ে মনের মত ক'রে সাজিয়েছে।"

নুরুন্নেহার নয়নে নৈশ প্রকৃতির চারিধারে নয়ন বুলাইতে বুলাইতে নুর সোচ্ছ্বাসে বলিল "ঠিক বলেছিস্, আসমানি, প্রকৃতি সুন্দরী আপনার মনের মত করেই কাশ্মীরকে সাজিয়েছে; বেহেস্ত যদি থাকে ত কাশ্মীর! ঐ শোন, আসমানি, চারিধারে কি মধুর রাগিণীর হিল্লোল বয়ে যাচ্চে।" স্থিরকর্ণ হইয়া নুর যেন কার সুদূর-সুরের অজানা রাগিণী শুনিতে লাগিল।

নুর আসমানীর [illegible] আয় আসমানি, এ দিকে একটু বেড়াই" বলিয়া উঠিয়া দাড়াইতেই, সঙ্গিনী আসমানী বলিল "আর বেড়াতে হবে না, ঐ বোধ হয় রোস্তম আলি সাহেব আসছেন।" "তাহলে আমরা উপত্যকায় গিয়ে তাঁর অপেক্ষা করি" বলিয়া নুর অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পরেই অশ্ববল্গা অশ্বের খুরে নৈশ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এক দিব্যকান্তি বীরমূর্ত্তি [illegible] অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে করিতে সহাস্যে বলিল "আমার বোধ হয় খুব দেরী হ'য়ে গেছে না—নুর?" পরে আসমানীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "তোমরা বোধ হয় খুব ভাবছিলে, না?" আসমানী নীরবে নতমুখে বলিল, "যাই আমি পাল্কী ঠিক করিতে বলিগে," আসমানী ত্বরিতগতিতে চলিয়া গেল।—

"ইয়ে মেরি পেয়ারে নুর!" বলিয়া রোস্তম সোহাগে নুরের কণ্ঠালিঙ্গন করিল। নুর সপ্রেম কটাক্ষে মৃদু হাসিয়া রোস্তমের বিশালবক্ষে মস্তক রাখিল। কিন্তু বড় মজা ঘটিল অধরপুটে আপন পিপাসাতুর ওষ্ঠ মিলাইল। রোস্তম গেয়ে উঠে রোস্তম বলিল, নুর! প্রকৃতই তুমি নুর! বেহেস্তের নুর! ইয়ে মেরি পেয়ারে নুর!" নুরের স্বভাবরক্তিম গণ্ডযুগল সোহাগের বাতাসে আরও রাঙ্গা হইল।

"প্রিয়তম! আজ আমরা পদব্রজে যাইব, দেখ কি সুন্দর আজিকার রাত্রি!" নুর রোস্তমের হাত ধরিয়া বলিল।—রোস্তম নৈশপ্রকৃতি চারিধারে নয়ন বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আজিকার রাত্রি বড় মধুর, কি চমৎকার শোভা হয়েছে। পদব্রজে তুমি কি যেতে পারবে? না কাজ নেই নুর!"

"ঐ তো সামান্য পথ, প্রিয়তম! তোমার সঙ্গে যাবো, আমার কষ্ট কিসের; চল আমরা অগ্রসর হই।" নুর রোস্তমের হাতের মধ্যে নিজ হস্ত রাখিয়া পরম নির্ভরের সহিত পদব্রজে অগ্রসর হইল।

রোস্তম সহাস্যে বলিল, আজ দেখছি কাশ্মীরের পাষাণ পথ নিজবক্ষে আমার প্রিয়তমার কোমল পদচিহ্ন ধরিয়া ধন্য হইবে। নুর সপ্রেমকটাক্ষে রোস্তমের দিকে তাকাইল।

পথে যাইতে যাইতে তাহারা শুনিতে পাইল, যেন কার বুকফাটা [illegible] বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। তাহারা যতই অগ্রসর হয়, সুর ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে; তাহারা শুনিল, কে যেন উদাস সুরে গাহিতেছে,—

হাঁ, তুমি এ সব খবর কি ক'রে জানবে? তুমি নদীর তীরে, হ্রদের ধারে নারনার অর্ধ্বর সঙ্গীত কাকলীর মধ্যে আপনা হারিয়ে বেড়াও, তুমি এসব খবর কোথা থেকে শুনবে!"

"মেরি নীল কবুতর! বল না কি হয়েছে" নুর রুমেলির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "কি হয়েছে দিদি, আমি কি শোন্‌বার যোগ্য নই?" নুরের মুখে চোখে অভিমানতরঙ্গ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রুমেলি হাসিয়া বলিল "তবে বলি শোন।" রুমেলি বলিতে লাগিল, "এ বড় তাজ্জব ঘটনা, জানি নুর, এরকম বোধ হয় কেউ কখনও শোনেনি; দিল্লি আগরার চোরেরা হীরা জহরৎ মণি মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান্ জিনিষ জ্যান্তমানুষের কাছ থেকে বেমালুম চুরি করে আর এখানকার চোরে মরামানুষের কবর খুঁড়ে তার মূল্যবান্ অলঙ্কার চুরি করে! এ বড় তাজ্জব ব্যাপার! এরূপ একটা ভদ্রবেশী চোর সে দিন ধরা পড়েছে।"

"য়্যাঁ বল কি? তাজ্জব বলে তাজ্জব।" নুর সবিস্ময়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, পরে রুমেলির মেহদিপাতারঞ্জিত চম্পকাঙ্গুলি লইয়া আপন রেশমী ওড়নার আঁচলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "তুমি কারকাছে শুনলে দিদি, বল না।—রুমেলি বলিল, "সহর কোটাল মোবারক আলির বিবি ফতেমার কাছে। দেখছি, দিল্লি আগরার চোর আর এই কাশ্মীরের চোর, এ দু'জনেই বড় মজার চোর"! রুমেলি হাতে তালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। উচ্চ হাস্যে কক্ষটী মুখরিত হইয়া উঠিল; হস্ত সঞ্চালনে রুমেলির হস্তস্থিত হীরামণিমুক্তাখচিত রত্নচূড়, তর্জ্জনী, মধ্যমাঙ্গুলির হীরকাঙ্গুরী প্রভৃতি স্বর্ণভূষণের মিলন দেহলতা সহিত একতালে নাচিয়া হাসিয়া উঠিল! গৃহদেওয়াল-বিলম্বিত স্বর্ণফ্রেম মণ্ডিত বৃহৎ উজ্জ্বল মুকুর প্রমোদচঞ্চল যুবতীর হাস্যোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি, স্বর্ণভূষণের উজ্জ্বল দীপ্তি আপন বক্ষে ধারণ করিয়া সেও যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

"কি তাজ্জব ব্যাপার!" নুর আপনার ক্রীড়াচঞ্চল হস্ত রুমেলির চম্পকাঙ্গুলি হইতে মুক্ত করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ বড় তাজ্জব ব্যাপার!" "সম্রাট শিকার হতে ফিরলেই তার বিচার হবে" রুমেলি বলিল "চোর মিনারের শেষের দিকের ঘরে বন্দী আছে। সহরকোটাল বন্দীকে দিল্লিতে পাঠাইবার অনুমতি প্রার্থনা করায় সম্রাট নিজে জানিয়েছেন, কাশ্মীরেই তার বিচার হবে; শুনলুম ভাল।—"

"তা যদি হয় দিদি" নুর বলিল—"আমার মনে হয়, এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে; সে কখনও চোর নয়; হ্যাঁ, দেখ, ভাল কথা মনে পড়েছে, সে দিন আমরা যখন রাত্রে রূপসীর তীর থেকে ফিরছিলুম, কোথা থেকে সঙ্গীতময় বিষাদবাগিণী ভেসে—" নুরের কথায় বাধা দিয়া রুমেলি বলিল, "হ্যাঁ, আমি রোস্তমের মুখেও একথা শুনেছি!" সে বলছিল "আদানার সমাধিপ্রাঙ্গণ থেকে ঐ সুর ভেসে আসছিল"।

"সম্রাট কবে ফিরবেন দিদি?" নুর রুমেলির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সোহাগে সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "সম্রাট কবে ফিরবেন দিদি?"

রুমেলি নুরের মনোভাব বুঝিয়া বলিল, "তোর যে আর দেরি সইছে না নুর"। রুমেলি হাসিতে হাসিতে নুরের গোলাপিগণ্ড টিপিয়া বলিল, "নুর! সম্রাটের খবর চাই না,—সম্রাটের দেহরক্ষী, আমার ভগ্নীর আদরের "বুলবুল চিড়িয়া" রোস্তমআলি সাহেবের খবর চাই!—কোন্ খবরটা আগে চাই নুর!"

রুমেলি বীণা লইয়া পুনরায় মধুর কণ্ঠে গীত আরম্ভ করিল,—

আবর্ বাহার গিরিআঁ, ওবুনে চশম্ খুঁ বেশাহাম।—
বুলবুল ববাগ্ নালা, আশক্ বসদ কে গাঁহাম। *

"হায় মেরি নীলকবুতর! চুপ্ চুপ্!" বলিয়া নুর আপন ওড়নার অঞ্চল দিয়া রুমেলির মুখ—চাপিয়া ধরিল।

নুর বলিল, "এতো শুধু আমার কথা নয়, দিদি, এতো তোমারও বিরহতাপিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। শুধু আমিই একা নয়—তুমিওত দিদি বিরহের গান গাচ্ছ! শাহজামল সাহেব কবে ফিরবেন, কিছু শুনলে কি দিদি?" দু'জনে নীরবে রহিল।

---

*সরস বসন্তে পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল; এই বসন্ত-বাসরে বঙ্গদেশের আদেশে মেঘ অনিচ্ছাসত্ত্বে বারিবর্ষণ করিতেছে, যেন সেও কাঁদিয়া ধরা ভাসাইতেছে। বাগানে বুল্ বুল কাঁদিতেছে, প্রেমিক হৃদয় এই বর্ষণ দেখিয়া সেও কাঁদিতেছে।—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারত সম্রাট সাজাহান বাদসাহের বড় ঋতু যাপনের জন্য ভারতের নানা স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাটের গ্রীষ্ম ও বসন্ত যাপনের জন্য কাশ্মীরের উপত্যকায় কয়েকটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ইহাদের কোনটির নাম ছিল, "আরামবাগ," "মিশিতবাগ," "কোনটীর নাম, "মতিমহল" "বসন্তমহল"। সম্রাট্ গ্রীষ্মকালে "আরাম" বা "মিশিত বাগে" এবং বসন্তে "বসন্তমহল" অথবা "মতি-মহলে" যাপন করিতেন।—এই অট্টালিকাগুলির পাদমূল ধৌত করিয়া স্বচ্ছতোয়া রূপসী নদী—নিপুণা নর্ত্তকীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; বসন্তমহল—আলোকমালা পরিয়া যেন অলঙ্কার-মণ্ডিতা হাস্যোজ্জ্বল রূপসীর মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যার নহবৎধ্বনি হইয়া গিয়াছে। স্বর্ণরেখারঞ্জিত বসন্ত-মহলের বিচিত্র কক্ষগুলি সুগন্ধি দীপোজ্জ্বলিত। চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত গন্ধদীপের সুমধুর সুবাস, অগুরু চুয়া চন্দন লোবান প্রভৃতির সুবাসের সহিত পুষ্প-সৌরভ মিশ্রিত হইয়া বসন্তমহলকে বেহেস্তে পরিণত করিয়াছে।

বসন্তমহলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের কক্ষ হইতে রমণী কণ্ঠনিঃসৃত-মধুর সঙ্গীত-লহরী বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে। যে কক্ষবাতায়ন দিয়া সঙ্গীতের মধুর-রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছিল, সে কক্ষটী নয়নমনোহর আসবাবে পরীপাটীরূপে সজ্জিত।—কার্ণিসে কার্ণিসে রঞ্জিত প্রস্তরগাত্রে নিপুণ শিল্পীর সুচিত্রিত কৃত্রিম লতাপুষ্পের চিত্রলেখা; ইহাদের ঠিক নীচেই নাগকেশর-চম্পকের কৌশলময় গ্রথিত মালা দুলিতেছে; কোন্‌টী কৃত্রিম, কোন্‌টী সজীব, ধরিবার উপায় নাই। সবই যেন সজীব মূর্ত্তিমান্ বলিয়া ভ্রম হয়। গৃহের চারি পার্শ্বে চারখানি কলঙ্কশূন্য বৃহৎ উজ্জ্বল মুকুর। চম্পক এবং নাগকেশরের মিশ্রিত তীব্র মধুর সুবাসে কক্ষটী আমোদিত। বসোরার চিত্র বিচিত্রিত বিস্তৃত কার্পেট নিজবক্ষে কক্ষনিবাসিনীর শুভ্র রক্তিম চরণযুগল বহিবার জন্য হর্ম্ম্যতলে বিস্তৃত। স্ফটিকাধারের উজ্জ্বল আলোক গৃহ-আসবাবের উজ্জ্বল শোভাকে আরও সজীব ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। কক্ষনিবাসিনীর নাম রুমেলি। রুমেলির কনক-

রূপসাগরী তার সুকুমার পুষ্পপেলব দেহভার চারিধারে ভরিয়া উঠিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন পুষ্পিতা ব্রততী।

হর্ম্ম্যতলে বিস্তৃত কার্পেটের উপর বিস্তৃত কাশ্মীরি গালিচার উপর বসিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া রুমেলি বীণার ঝঙ্কারের সহিত আপনার মধুর কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিতেছে। রুমেলির কনক লাবণ্য-খচিত যৌবনের কনকমাধুরী, চক্ষু বিশ্বাস ভরে সম্মুখস্থিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া কক্ষটীকে যেন আরও উজ্জ্বল মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া নুরনেহার আপন কক্ষেই ছিল। একাকী থাকিয়া তাহার কিছুই ভাল লাগিল না; আপন মনে বলিল, "যাই দেখি দিদি কি করছে।" নুরনেহার রুমেলির কক্ষের রেশম পরদা সরাইয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল।—তাহাদের যে কথাবার্ত্তা হয়, পূর্ব্বপরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

নুর ও রুমেলি দুই ভগ্নী; নুরের স্বামী রোস্তম আলিসাহেব সম্রাটের দেহরক্ষী হইয়া সম্রাটের সহিত শিকারে বহির্গত হইয়াছে। রুমেলির স্বামী শাজামাল সম্রাটের আদেশে কাবুল বিদ্রোহদমনে যাত্রা করিয়াছে। রুমেলি সম্রাটের সহিত কাশ্মীরে আসিয়াছেন। দুইজনেই স্বামি-বিরহে কাতরা; দুই ভগ্নীর অবস্থাই সমান। রুমেলির মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতে দুই ভগ্নীর বিরহতপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

কাঠের তরী।

["সোণার তরী"র অনুকৃতি।]

গগনে নাহি রে মেঘ, ভারি ফরসা।
ফসলের আর কিছু নাহি ভরসা।
বৃথাই লাঙ্গল ঠেলা,
আভাঙ্গা মাটীর ডেলা
ক্ষেত—ভরা আছে মেলা। এ যে সহসা
ভেঙ্গে চুরে চাকলেতে না যায় চষা।

দুই খানি বড় ক্ষেত, আমি একেলা ;
কিছুতে না হয় শেষ; চষি দু'বেলা।
পরপারে দেখি দূরে,
গাছপালা গেছে পুড়ে,
কত খাটি রোদ্দুরে, না করি হেলা।
এ পারে দু'খানি ক্ষেত, আমি একেলা।

লগী-ঠেলে তরী বেয়ে কে যায় পারে ?
লগী দেখে মনে হয়—চিনি উহারে।
শীর্ণা নদী, অল্প জল;
হাতে বেশী নাহি বল;
তাই তরী টল মল করে দু'ধারে।
লগী দেখে মনে হয়—চিনি উহারে।

ওগো ! তুমি কোথা যাও, কোন্ বিদেশে ?
আমি যে আসামে যাবো কুলীর বেশে,
বড়ই দুর্ভিক্ষ হবে,
এ দেশে কে আর রবে ?
সাথে মিলে যাবো সবে আমরা হেসে,
খানেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

ওগো ভাই আড়কাঠী ! তরণী'পরে
লয়ে যাও আরো কুলী ডোঙ্গাটী ভরে;
এত কাল নদীকূলে,
যাহা নিয়ে ছিনু ভুলে,
তা তো ধ্বংস সুদে-মূলে; খাব কি ক'রে।
এখন আমারে লও করুণা ক'রে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী,
অতি সস্তা কুলী দিয়ে ফেলেছি ভরি।
ভরী যায় নানা ঠাটে,
রোদ্দুরে মাথা ফাটে,
শূন্য নদীর ঘাটে রহিনু পড়ি;
ঢের কুলী নিয়ে গেল কাঠের তরী।

শ্রী

আমার স্বপ্ন।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি।)

প্রবৃত্তিপুর-রাজের বংশাবলী ও তাহাদের বৃত্তান্ত তোমায় কিছু কহিতেছি শ্রবণ কর। অধর্ম্ম-রাজ-ভার্য্যা হিংসার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। পুত্রের নাম 'অনৃত', কন্যার নাম 'নির্ঋতি'। 'নির্ঋতি'র স্বামীর নাম 'মৃত্যু'। 'মৃত্যু'র ষোলটী সন্তান। সকল গুলিই অতীব কৌশলী, মায়াবী ও চতুরচূড়ামণি। তাহাদের মধ্যে দশজন মনুষ্যের দশ ইন্দ্রিয়ে, একজন মনে, একজন অহঙ্কারে ও একজন বুদ্ধিতে অতিগোপনে বাস করিয়া তাহাদের বিনাশ জন্য তাহাদিগকে অসংখ্য কুকাজে নিয়োজিত করে। পরে 'দুঃখ' আপনার মাতা 'বেদনা' ও পুত্র 'ব্যাধি' 'জরা', 'শোক' ও 'তৃষ্ণা'কে সঙ্গে লইয়া সেই দুষ্কর্ম্মিগণকে আক্রমণ করে। শেষে 'নির্ঋতি'র জ্যেষ্ঠ পুত্র 'ভয়ে'র নিকট লইয়া গিয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা দেয়। 'ভয়' আবার উক্ত দুষ্কর্ম্মিগণকে কিছু দিন পরে 'মৃত্যু'র নিকট প্রেরণ করে। কেহ কেহ বলেন, 'নরক' নামে 'মৃত্যু'র আর এক পুত্র আছে। দুষ্কৃত ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর তাহার সন্নিধানে প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব দুষ্কার্য্যের ফল ভোগ করে; 'নরক'কে লইয়াই 'নির্ঋতি'র ষোল সন্তান। এক দিন শিশুকালে ইনি একটী নরমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতেছিলেন, এজন্য নাম রক্ষিত হইয়াছে 'নরক'। যে মায়াপ্রভাবে অখিল সংসার বিমুগ্ধ, সেই 'মায়া'দেবী তাঁহার পত্নী। ইঁহারই শক্তিবলে মানুষ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। ইনি স্বেচ্ছাচারিণী, সর্ব্বত্রগামিনী ও নিতান্ত দুর্দ্দমনীয়া। 'বেদনা', 'ভয়'র ভার্য্যা। দেবী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলে আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইল; আমি কহিলাম—'মাতঃ, আমায় ক্ষমা করুন; আপনাদের প্রসাদবলে কোন স্থানে যদিও কিছু আশঙ্কা নাই সত্য, কিন্তু সে স্থান দর্শনে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি তথাকার 'দুঃখ,' 'ব্যাধি,' 'বেদনা' ইত্যাদি অনেককে চিনি। দেখিয়াছি—'শোক' ও 'ভয়ে'র মূর্ত্তি; দেখিলেই প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করে। তথাকার সকলেরই নাম ও

অগ্রাবলী সবিশেষ আমার স্মরণ হইতেছে। তাহারা অতীব দারুণ ও ভয়ঙ্কর লোকে না বুঝিতে পারিয়াই—আপন অদৃষ্টদোষে তাহাদের অধীন হয়! না বুঝিতে পারিয়াই—আশু সুখকর কুকর্ম্মে রত হইয়া পরিণামে অবিরত ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে থাকে। ধিক্ সে মূর্খগণকে, যাহারা স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এমন অধর্ম্মরাজের দূতাদির আপাতমনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পরিণামবিরস বিষয়ে ব্যাপৃত হয় এবং আপন দুর্দ্দশা আপনি আনয়ন করে। আমি ভক্ত-যোগী, কত না দুষ্কার্য্য করিয়াছি,—কত অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে মাতঃ, আপনাদের কৃপাবারিবর্ষণেই আমার পরিতপ্ত হৃদয় সুস্নিগ্ধ হইল। জানি না, আপনাদের নিবাসভূমিস্পর্শে কত আনন্দই না সম্ভোগ করিব? অনুগ্রহ করিয়া বলুন, 'নিবৃত্তিপুর' আর কত দূরে অবস্থিত? 'প্রেয়ঃ-পথে' গমন করিতে আমার নিতান্ত আশঙ্কা হইতেছে। গন্তব্য স্থানে সত্বর চলুন। আজ আপনাদের 'নিবৃত্তিপুর' পর্য্যবেক্ষণ করাই আমার মহদুদ্দেশ্য।

দেবি, আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর প্রদানে কৃতার্থ করুন। শুনিলাম নির্ঋতির ষোল সন্তান,—পঞ্চদশ জনের পরিচয় পাইলাম, অবশিষ্ট এক পুত্রের পরিচয় কি? দেবী উত্তর করিলেন,—'বৎস, নির্ঋতির অন্য পুত্রের নাম 'দুঃসহ' সে সাতিশয় ক্রূরস্বভাব ও কঠিনহৃদয়। কেহই তাহার প্রভাব সহ্য করিতে পারে না, এজন্য তাহার নাম 'দুঃসহ' হইয়াছে। লোক যখন স্বয়ং অধর্ম্ম-অন্তিকে উপস্থিত হয়, তখনই তাহার দর্শন পায়। তাহার পরিবারবর্গের বৃত্তান্ত বহু বিস্তৃত ও বিস্ময়কর। তাহারা সকলে জগতে 'পাপাচার' নামে খ্যাত। 'নির্ঋতি'র যে কয়েকটী পুত্র মানুষের দশ ইন্দ্রিয়াদিতে অবস্থিতিপূর্ব্বক মানুষকে বিবিধ কুপথে চালিত করে, ইহারা তাহাদেরই আত্মীয় থাকিয়া মানুষকে কুকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পরামর্শ দেয় এবং পথের সুসঙ্গতা দেখায়। ইহাদের মধ্যে, 'নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্মৃতিহারা, বিদ্বেষিণী, বিরূপ, বিকৃত, কলহা, প্রকাশ ও অপকার, এই কয়েকটি প্রধান।—আরো যে সকল পরিবার আছে, সকলের নাম ও পরিচয় প্রকাশের অবসর নাই। ঐ দেখ, আমাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া বিরাগের ভ্রাতা দম ও যম এবং ভগ্নী ভক্তি আসিতেছেন। ইহাঁদের তিনজনকে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট কর। নতুবা ঐ যে সুধাধবলিত অট্টালিকার উন্নতাংশ মেঘবৎ দৃষ্ট হইতেছে, উহার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পাইবে না। ঐটীই মহারাজ ধর্ম্মরাজের নিবাসপুরী। উহা বহু দূরস্থিত বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ঐ বৃক্ষের অন্তর্গত

স্থানেই বিদ্যমান আছে। ঐ গৃহের নাম আনন্দধাম। পরম কারুণিক পরমেশ্বর প্রত্যেক মানুষকেই উক্ত আনন্দধামের সুখ ভোগের শক্তি দিয়াছেন; কিন্তু কি পরিতাপের কথা, অধিকাংশ মানুষই মহতীমায়ার মোহিনী শক্তির প্রভাবে আনন্দধামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুমান করিতে অক্ষম। বিরাগের উক্ত ভ্রাতাদ্বয় ও ভগ্নী ভক্তির কৃপালাভ করিতে পারিলে, ঐ স্থানে অনায়াসে প্রবেশ করিবে এবং অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। বলা বাহুল্য, দমযুক্ত ব্যক্তির ইহ পর লোক আয়ত্ত। দমরহিত ব্যক্তির ঐহিক পারত্রিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। দম পরমমঙ্গল্য; পরম পবিত্র; যাহা কিছু মনে উদয় হয়, দম প্রভাবে সমস্তই লাভ হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত-সারথির সৎপথানুযায়ী জ্ঞান-রথে যিনি গমন করেন, তাঁহাকে কামক্রোধাদি কোন শত্রুই পরাজয় করিতে পারে না,—যদি পঞ্চইন্দ্রিয় অশ্বগণ সেই রথকে প্রেয়ঃ-পথে লইয়া না যায়। বৎস, ঐ সাধুসেবিত সৌধমধ্যে প্রবেশ মাত্রেই তোমার সকল শ্রান্তি ক্লান্তি বিদূরিত হইবে; নয়ন মন পবিত্র পরিতুষ্ট হইবে। বিবিধ মণি-মাণিক্য (সুবৃত্তিসমূহ বিভূষিত) সুবর্ণাসনে (দেহমধ্যে) স্বীয় শরীর শোভায় সমুজ্জ্বল করিয়া 'ধর্ম্মদেব' সমাসীন আছেন; দেখিলে তুমি তৎক্ষণাৎ পূর্ণকাম হইবে। শ্রদ্ধা, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মেধা, লজ্জা, দয়া, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তিনাম্নী দ্বাদশজন রমণী রমণীয় ছাঁদে ধর্ম্মদেবের সন্নিধানে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন। ইহাঁরা সকলেই আমার সপত্নী। সকলেই শান্তশিষ্ট ও সুস্বভাবা। তুমি আমার কৃপায় সকলকেই চিনিতে পারিবে। তাহার পর যে প্রণালীক্রমে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহাও তোমাকে শিক্ষা দিতেছি অবধান কর।

প্রথমতঃ মেধা দেবীর উপাসনা করিয়া, তৎপুত্র শ্রুতের শরণাপন্ন হইবে পরে 'ধৃতি' ও তাঁহার পুত্র নিয়মকে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রিয়া দেবীর পরিচর্য্যা করিলে ক্রিয়ার পুত্র 'নয়' ও 'বিনয়'কে প্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য, এই ক্রমে ক্রিয়ার সাধন না করিলে ক্রিয়ার তৃতীয় পুত্র দণ্ডকে পাইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ যখন তোমার উপর 'নয়' ও 'বিনয়' অনুগ্রহ করিবেন, তখন লজ্জা দেবী স্বীয় স্বভাবগুণে স্বয়ং তোমার প্রতি

---

* অন্তঃকরণ দমনের নাম 'দম' বাহ্যইন্দ্রিয় দমনের নাম 'যম'। অন্তঃকরণ দমিত হইলে বাহ্যেন্দ্রিয় দমন স্বতঃসিদ্ধ। অতএব একশব্দ দ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হইতেছে। সুতরাং ইহার উভয় ভ্রাতাই একার্থ, কেবল নাম মাত্র বিভিন্ন।

কৃপাবলোকন করিবেন। বৎস, তখন তুমি যথার্থ শ্রীলাভে ধন্যমান্য হইবে। কিন্তু সাবধান, ঐশ্বর্যমদে পুত্র যেন তোমাকে বাধ্য না করে। সে কালে তুমি তুচ্ছ নিষ্ঠুর তাঁহার পুত্র সন্তোষকে ভিক্ষা দিয়া ভদ্রাদেবীর সহিত [illegible] দেবীর আশ্রয় লইবে। তাঁহার অনুগ্রহে ধর্ম্ম তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলে এই সরলা ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিবে। [illegible] সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট ও পরিপুষ্ট হইলেই প্রথমে কীর্ত্তি পরে তাঁহার পুত্র যশঃ তোমাকে কৃপা করিবেন। বৎস, কীর্ত্তি আর যশ উভয়েই অতি [illegible] পরম প্রতিসুখকর বিবিধ সুমিষ্ট বাক্যবচনে সুপটু; সে সকল বাক্য শুনিতে তুমি সতত বিরত হইবে এবং স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর থাকিবে। [illegible] সিদ্ধিদেবী তোমার তপস্যার কঠোরতাতে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। সিদ্ধিদেবী তোমাকে তপস্যার সুখকে লাভ করিবে। বৎস, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, [illegible] প্রভাবে সমস্ত লাভ হয়, অতএব তুমি ইহাদের সন্তুষ্টির জন্য যত্নবান হইতে থাকিবে। তাহা হইলে তুমি এ ভবারণ্যের মধ্যে অভাব শব্দের আর শুনিতে পাইবে না। অধিক কি, তাঁহাদের কৃপাতেই তুমি 'শান্ত' দেবীর কৃপালাভে চিরদাস করিতে পারিবে। তখন তুমি আপন অন্তিম অনুভব করিতে অপার আনন্দনীরে আপ্লুত হইতে থাকিবে।

দেবীর এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং উপদিষ্ট পথ [illegible] রাখিয়া আমি ধীরে ধীরে অরণ্যমধ্যে অগ্রসর হইলাম। তখন আমার [illegible] আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়া দেবী প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। সহসা বামদাকৃতি এক ব্যক্তি আমার সম্মুখীন হইলেন। [illegible] সন্নিকটে হইতে বড় দূর নিরীক্ষণ করিতেছেন। চক্ষুর [illegible] ও [illegible] দৃষ্টির সহিত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। আমাকে তাঁহার [illegible] কথা বলিতে হইবে বলিয়া পথে দেখিলাম, তাঁর এমন শক্তি আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে [illegible] দেখিতে পাইতেন। তাঁহার যেন বাহ্যদৃষ্টি [illegible] পরিচয় পাইলাম। অনেক বিষয়ে জানিবার আছে, তাহাতে [illegible] হইল। আমার অত্যন্ত সময়ের তাঁর বড় মূল্য। তাঁহার ইচ্ছায় বিলম্ব [illegible] কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি আমার অভীষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমার [illegible] কথার সারমর্ম্ম এই যে, সাধনে যে পথে [illegible] তাহা উৎকৃষ্ট ও [illegible] পথ নহে। তিনি বলেন – আমার [illegible] আইস, আমি তোমাকে [illegible] পথ দেখাইয়া দিতেছি – [illegible]

পরমানন্দে থাকিবে। তথায় আমি পৌঁছাইয়া দিতে পারি। আমি বলিলাম,—'না মহাশয়, আমি নিবৃত্তিপুরের পথিক, আমি সেইখানেই যাইব। শুনিয়াছি, এখানকার সুখভোগরত হইলে, আর সে নিবৃত্তিপুরে যাওয়া হইবে না। শুনিয়াছি তথাকার সুখ ভিন্ন অন্য কোন স্থানের সুখ নিত্য ও পবিত্র নয়। অন্য যাবতীয় সুখ নিবৃত্তিপুরের নিত্য সুখের পক্ষে বিষম বিঘ্ন-গিরিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া সকলের নিবৃত্তিপুরের পথরোধ করিয়া আছে।' আমার এই অভিপ্রায় শ্রবণে কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশে সেই বামনাকৃতি পুরুষ কহিলেন,—কি? কি? সুখী লোকে কি ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না? ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে, এখানকার সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সে সব শাস্ত্রবচন একালে আর খাটে না। এখনকার লোক সব সুশিক্ষিত হইয়াছে, শাস্ত্রকারদের চাতুরী, ব্রাহ্মণদের স্বার্থ, সব উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। সুখভোগও হইবে এবং ধর্ম্মসাধনও হইবে, এইরূপ শিক্ষা এবং বিশ্বাসই এ যুগের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ,' 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ' আর একালে নাই, ও সকল 'ফাজলমী' আর এ সুশিক্ষার কালে চলে না। চল আমার সঙ্গে চল, চিরকাল সুখে থাকিবে। ধর্ম্মও থাকিবে! তোমার ধর্ম্ম কোথায় যাবে?' আমি কোন মতেই তাঁর কথায় সম্মত না হওয়ায়, তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহ পুনশ্চ আমায় কহিলেন,—কি? আমার কথা অমান্য? আমায় সামান্য জ্ঞান কর? দেখিব, তুমিই বা কেমন নিবৃত্তিপুরে উপস্থিত হইতে পার! এই কথা বলিয়া সেই বামনদেব কিয়ৎকাল নীরব থাকিলে, সহসা একটি বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিলম্বে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না একটি তরুণীর আগমন হইল। বৃদ্ধার কি ইঙ্গিত মাত্রে যুবতী একখানি গান গাহিল।

"খঞ্জনযুগল হেরি বদনকমলে।—
ভূপতি না হইলে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল হেরিয়ে তা' হরিল,
লাভ ত হইল ভাল বিনা মূলে কিনিলে॥"

আহা কি মধুর গান! কি মিষ্ট স্বরলহরী দশদিকে প্রবাহিত হইল! গানের ভাবচাতুর্য্যই বা কেমন সুন্দর! অতি মনোহর, অতি মনোহর! গানখানি সমাপন করিয়া রমণী আমায় চিরপরিচিতের ন্যায় আহ্বান আদর করিতে লাগিল,—

এসো এসো বঁধু এসো
আধ অ
নয়ন ভ'রে তে
অনেক দিবসে মনের
তোমা ধনে কি

প্রিয়, এস্থানে আর কেন? এসো তোমা দুটী কথা কহি। তোমার সুমিষ্ট রচন বিন্যা য়! বদনকমল বিলোকনে মন নিয়ত ব্যাকুল সমার ফলে তোমায় পাইলাম। কত পাইলাম, কত অনুসন্ধানে এখানে উত্তর করিলাম;—যুবতী, তুমি রূপবতী; আমি কখন তোমায় চিনি না। অতএব তোমার সহিত নিভৃত আলাপ বিড়ম্বনার বিষয়, ইহা বিবেচনা করি।—আমায় ক্ষমা কর! একমাত্র নিবৃত্তিপুরে গমনে প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোথায় যাইতে বসিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। শুনিয়াছি, প্রাণী মাত্রের নিবৃত্তিই মহাফল। রমণী অমনি ব্যস্ততা সহ কহিল,—"সে কি প্রিয়, সে কি? আমি কি তোমার অহিতের কথা কহিতে পারি? তাহা হইলে তোমায় প্রিয় সম্বোধন করাই আমার প্রলাপবাক্য! তুমি যেখানে যাইবার বাসনা করিয়াছ, যে সুখলাভের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছ, তাহা অতি সুবিবেচক ও বিজ্ঞের কার্য্য। তাহাতে আমি বাধা দিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইব কেন? আমি তোমার অনিষ্ট করিব বলিয়া তোমার যে একটা ধারণা হইয়াছে বুঝিলাম, ইহাতেই আমি দারুণ দুঃখ অনুভব করিলাম। প্রিয়ছে, বঁধুছে, কদাচ এমত বিবেচনা করিবে না। আমার সরল অন্তরে ব্যথা প্রদান করিবে না! এসো, এসো, তোমায় যাহা বলি, তাহাই কর। বেশী সময়ও নষ্ট হইবে না, অধিক রাস্তা অতিক্রমের কষ্ট অনুভবও করিতে হইবে না,—ঐ আমার বিশ্রামনিকেতন, নিকটেই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিবে এসো! তোমায় পথশ্রান্ত দেখিয়া আমার অতিমাত্র ক্লেশ বোধ হইতেছে; ক্ষণেক বিশ্রাম করিবে এসো!" আমি তখন বিশেষ চিন্তিত হইলাম, চিন্তা দ্বারা কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারিলাম না। ভাল একবার জিজ্ঞাসাই কেন করি না? রমণীর পরিচয়টাই বা কেন লই না? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া দেখি, কেহই নাই? সে বামনাকৃতি পুরুষও নাই, সে বৃদ্ধাও নাই?

আমার অন্তরে যেন একটা প্রীতির সঞ্চার হইল। রমণী রমণীয়ছাঁদে পুনরপি আমায় কহিতে লাগিল,—এসো, মনোমোহন, এসো, তোমার মিষ্ট কথায় আমি বড় তুষ্টি লাভ করি। বেশী নয়, আর অতি অল্পসময় মাত্র তোমার সঙ্গ ভোগ বাসনা করি, অধিক সময় গত করিয়া তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে বাসনা করি না। তোমার নিবৃত্তিপুর গমনে বাধা অনুযোগ থাকিবে। প্রিয়তম, তুমি আমার এ আশালতায় নৈরাশ্যবজ্র নিক্ষেপ করিবে না। বেশীদূর নহে, ঐ নিকটে—ঐ নিকটে। তোমার মধুমাখা—অমিয়মাখা বাক্যে আমায় যত আনন্দ দাও বা না দাও, ঐ উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলে তোমার যে শ্রান্তি ক্লান্তি বিদূরিত হবে, দেহ মন সুস্থ সবল হবে; সেই আমার প্রচুর পুলক, তাতেই আমি কৃতার্থ হব। স্বার্থে নয়—তোমার সুস্বার্থে আমার এত আশা; সেইজন্যই এত অনুসন্ধানে এতদূর আসা।—তুমি আমার কথা রক্ষা করিবে, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। বাস্তবিক বুঝি রমণীর কিছু মনোমোহিনী শক্তি আছে, আমি আর বেশী প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না! ভাবিলাম, আমিও রহিলাম, আমার নিবৃত্তিপুরও রহিল; রমণীর যখন এতটা নিঃস্বার্থ প্রীতি, তখন টুকু উপরোধ অনুরোধ, তখন ভাল, একবার দেখাই যাক্ না,—উহার উদ্যানটা কেমন সুখদায়ক! আমি নিজে শক্ত থাকিলে কে নোয়াইবে? পুনরায় নিজ গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেই চলিবে। জীবন ধারণ করিয়া যতদূর যাওয়া যায়,—সকল বিষয়ের তথ্য জানা আবশ্যক। তাতে আশা মিটে, ভোগ হয়, তবে সাবধান থাকিতে হইবে, তাহাতে মগ্ন হইব না। তথায় গিয়া বেশী সময় গত করিব না! কেবল উপরোধ-রক্ষা মাত্র! এই যাওয়া,—এই আসা! ইত্যাদি রূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি, সেই উপবনের মধ্যেই রহিয়াছি। কখন যে আসিলাম তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। আহা সেই মঞ্জু কুঞ্জে কত ফুল, কত পাতা, কত ফল, কত প্রকারের তরুশ্রেণী শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রত্যেক বৃক্ষলতা জলপূর্ণ আলবাল দ্বারা বেষ্টিত। তলদেশ অতি সুশীতল। নানা বিধ বিহগকুল কলস্বনে গান করিতেছে। মৃদুল পবন এককালে বিবিধ পুষ্পের সুগন্ধ ও রেণু নাশিয়া পথিকদের আনন্দ বিধান করিতেছে। কতকগুলি পরিচারিকা আসিয়া আমায় কত প্রকারে সেবা করিতে লাগিল। কেহ বা ব্যজন, কেহ বা অঙ্গে অনুলেপন, কেহ বা সুমিষ্ট কন্দমূল ফলপূর্ণ পাত্র সযত্নে আমার সম্মুখে উপস্থাপন করিল এবং ভক্ষণ জন্য আমায় বারবার উপরোধ করিল। কেহ বা পাদসম্বাহনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল। কে

কোন, রমণী রমণীয় পুষ্পমাল্য আনিয়া কত আদরে আমায় উপহার দিল। আনিলাম, এই সমস্ত পরিচারিকাই উপবনের এই যাবতীয় বৃক্ষলতার পরিচর্য্যা-কারিণী। ইহাদের যত্ন ও পরিচর্য্যাগুণে বৃক্ষাদির পত্রটি পর্য্যন্ত সহসা ম্লান হয় না। অকস্মাৎ দেখি, সম্মুখে এক মনোহর দিব্য সরোবর। বিবিধ সুগন্ধি জলজ কুসুমে সুশোভিত। নির্ম্মল কাকচক্ষুবৎ জলরাশির প্রতি দৃষ্টি করিলে স্বতঃই অবগাহনের ইচ্ছা হয়। আমারও তাহাই হইল। অন্যের বিনানুরোধে অন্যের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সরোবর মধ্যে অবতরণ করিলাম। সে সময় সুসময় কি অসময়, ইহার চিন্তনেও আমার অবসর হইল না।

জলরাশির স্নিগ্ধতা-সৌগন্ধ-মনোহারিতা-গুণে তথা হইতে উঠিতে আর আমার ইচ্ছা হইল না। কখন সন্তরণ, কখন নিমজ্জন, কখন দুই হস্তদ্বারা জলরাশির উৎক্ষেপণ ইত্যাদি প্রকার জলক্রীড়াতে আমার কতদিন গত হইল, তাহা বলিতে পারি না। দীর্ঘ দিন যে অতীত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত। তথাপি দিন যেন পলকে ফুরাইল। উত্তম হইল! একদিন সহসা আমার জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হইল। আমি সরোবরতটে যেন কত সঙ্কটে পতিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি; এ আমার কি হইল? কাহার কথায় কোথায় আসিলাম? কে আমার সর্ব্বনাশ করিল? হায়, হায় একজন নিঃসম্পর্কীয়া পরকীয়া রমণীর দু'টা মিষ্ট কথায় বিমোহিত হইয়া আমি চিরবাঞ্ছিত বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম? ধিক্ আমায়! এ অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? ওই সেদিন জনৈক পরিচারিণীপ্রমুখাৎ যে কথা শুনিলাম, এত দিনে তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম। পরিণামে আমার অশেষ পরিতাপ আছে! সে দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, পরিচারিণি, এখানে অন্ধ, কুব্জ, বধির, কাস, কি জ্বরাদি কোন রূপ পীড়াক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দেখি না কেন? তোমরা এখানে কতদিন বাস করিতেছ? বোধ করি তোমরা কখন কোন অসুখের কথা অবগত নহ। পরিচারিণী সহাস্যে কহিল,—"প্রিয়, আমরা এস্থানে কতকাল বাস করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না! তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ, আমরা কখনও কোন অসুখের কথা অবগত নহি। আমরা চিরযৌবনা ও চির-সৌন্দর্য্যশালিনী। এখানে যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই সুবলকায় ও রূপবান্। বিরূপ বিকৃত ব্যক্তির এখানে অধিকার নাই। এখানে আগমন করার পর যদি কেহ বিরূপ বিকৃত কি পীড়াগ্রস্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। কি সর্ব্বনাশ! কি

সন্ধানের কোথায় পাইব কি [illegible] বলিয়া দেবে? এ সময় ওঙ্কার দেবীও আমাকে অকূল পাথারে কোথায় গেলেন? তাঁহার কাছে কি আমার কোন অপরাধ হইল? তাঁহার উপাসনার কি কোন অঙ্গহানি হইয়াছে? তিনি একবার দেখা দিয়া একবার দেখ, তোমার দেহের ভার কেন [illegible] ঐ একে পাইলে আর কি তোমার কল্পনালোক রচিতে পারিবে না? আমার তোমার প্রদত্ত সেই মহামূল্য বস্তু দুইটী যে কখন কোন্ দুর্ভেদ্য [illegible] গিয়াছে, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না"। "আমি এইরূপে [illegible] ভাবিতে ভাবিতে [illegible] দেবী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, 'কেন, বৎস আমায় ডাকিতেছ? আমি এই [illegible] তুমি তোমার কর্ত্তব্যের সমাচার পাইয়া আসিতেছি। বাছা, [illegible] ভয় করিতেছ? তা তোমারই বা দোষ কি দিব? এ সংসারের [illegible] ! আমাই মায়ায় ভিন্ন, বিশেষ সম্বন্ধনতা বলিয়া, তোমা [illegible] প্রলোভন জয় করিতে পারে না। জয় করা ত দূরের কথা, চিনিতেও পারে না। পরে পরে পদস্খলন, পদে পদে বিড়ম্বন! বিশেষতঃ ঐ যে চিত্তবৃত্তি [illegible] করিয়া, প্রলোভনদিগের প্রেরিয়িত্রীরূপিণী হইয়া, যাহার [illegible] সর্ব্বাধিকারের যুগের ন্যায় তুমি এই প্রলোভনোদ্যানের অন্তর্গত 'প্রেম' নামক [illegible] নিমন্ত্রিত হইয়াছ, সে ত না, ঐ কামিনীর নাম 'ভ্রান্তিমায়া'। [illegible] অসাধ্য কিছুই নাই। সে মানুষের ভাঙ্গ গড়িতে যেমন পারে, [illegible] অধিকারের সংযোজনও তেমনি করিতে পারে। আমি দেবীর সান্ত্বনার [illegible] হইল কহিলাম,—মাতঃ, আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আমার যে [illegible] বলিয়া দিন। দেবী কহিলেন,—বৎস, ভয় নাই, আমি যখন আসিয়াছি তখন তোমার সকলই সফল হইবে। [illegible] মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। [illegible] যেমন উহাদের [illegible] দেখিয়া তাহার যেমন ফল হয় না, সেইরূপ উপদেশাবলী [illegible] কেবল শ্রবণ করিলে কোন ফল দর্শে না। একণে যেরূপ বলি [illegible] এইটী [illegible] মন্ত্র লও। এই বলিয়া দেবী, সেই মনোহর [illegible] কহিলেন, "বৎসে, অদ্য হইতে অনিত্যানন্দ তুমি [illegible] সঙ্গিনী হও, [illegible] তোমার [illegible] রক্ষা করিবে। সর্ব্বদা [illegible] ইহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিও, কদাচ [illegible] পরিত্যাগ করিও না। [illegible] বন্ধন কর। নিবৃত্তিপুরে [illegible] চেষ্টা কর। তুমি [illegible]

একমাত্র কর্ণী! দয়া করিয়া যাহাকে সন্ধিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দাও, সেই ধন—সেই ভাগ্যবান্। কোথায় রক্ষিদ্বয় কোথায় আছে? এই যাত্রীটীর মতন ধন রক্ষা কর! তৎক্ষণাৎ উন্নতবক্ষঃ দৃঢ়কায় বিপুলবিক্রম দুই-দুয়া পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। অবগত হইলাম, ইহাদের একটীর নাম 'সাহস', অপরটীর নাম—'অধ্যবসায়'। পূর্ব্বদৃষ্ট বামনাকৃতি পুরুষটীর নাম 'তর্ক', প্রাচীনার নাম 'যুক্তি'! দেবী কহিলেন, এই তর্ক ও যুক্তির কৌশলেই তুমি ঐ রূপবতী নারীর মায়ায় পতিত হইয়াছিলে! শুধু তুমি কেন, ইহাদের প্রয়োচনায় অনেকেই অনেক সময় সুপথ ভ্রমে কুপথে পতিত হয়। ঐ রূপবতী নারীর নাম ভালবাসা। সে তোমায় উপযুক্ত বস্তু দেয় নাই! 'তর্ক' ও 'যুক্তি'র মতানুযায়ী অসার বস্তু দিয়া তোমায় ভুলাইয়াছিল। এখন অবধি সে আমার আদেশে তোমায় সুযোগ্য বস্তুই প্রদান করিবে। এই ধর, সেই পূর্ব্বের 'প্রেম' ও 'পবিত্রতা'! যাও—ঐপথে; আমি অন্য যাত্রীর অনুসন্ধানে চলিলাম। এই বলিয়া দেবী চলিয়া গেলেন।

তখন আমি 'প্রেম' ও 'পবিত্রতা' ধারণ করিয়া 'সাহস' ও 'অধ্যবসায়' সহ নির্দ্দিষ্টপথ লক্ষ্যপূর্ব্বক যাইতেছি। অরণ্যের কিছু দূর যাইতে না যাইতে দূর-দৃষ্টবলে আমার এক বিষম বিড়ম্বনায় পতিত হইলাম। তিনজন বলবান্ ব্যক্তি আসিয়া আমার গতিরোধন করিল এবং 'তোর কোথায় কি আছে? সমস্ত দে' এই বলিয়া আমায় তাড়না করিতে লাগিল। আমার যেখানে যাহা লুকায়িত ছিল, সমস্তই অপহরণ করিয়া লইল। সেবে এক জন কহিল,—'এ-কে একেবারে হত্যা কর'! আর একজন কহিল,—'না হত্যা করিয়া কি ফল হইবে? ইহার সঞ্চিত সমস্ত ত পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই বৃক্ষলতায় বন্ধনপূর্ব্বক এইস্থানে রাখিয়া যাওয়া যাক। তাহারা তাহাই করিয়া, আমাকে অরণ্যের কতকগুলি লতিকা দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণেকপরে উক্ত তিন-জনের মধ্যে এক ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"আহা, তোমায় বড় বাজিয়াছে বটে? এসো এসো তোমায় বন্ধন খুলিয়া দি। এই বলিয়া সে ব্যক্তি সযত্নে আমার দারুণ বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং কহিল—'দেখ ঐ যে পথ দেখা যাইতেছে, ঐ পথানুসরণে গমন করিলেই তোমার অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিবে। আমি বিশেষ উপকৃত হইয়া সবিনয়ে কহিলাম, 'মহাশয়, আপনি যদি আমায় এত অনুগ্রহ করিলেন, তবে আপনিও আসুন। তিনি শশব্যস্তে কহিলেন,—'না—না—না আমার যেখানে যাবার অধিকার

নাই। তবে তোমায় পথ দেখাইয়া দিলাম, তোমার বন্ধন-মোচন করিলাম, এই পর্য্যন্ত! তোমার লক্ষ্যস্থল আর বেশী দূরে নয়। তুমি আমাদিগকে চিনিতে পার নাই?—আমরা তিন-জনে চিরকালই তোমার সঙ্গে আছি। আমার নাম 'স্বত্ব', আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। যে তোমার বন্ধন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহার নাম 'রজঃ,' যে ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছিল, তাহার নাম 'তমঃ'!

স্বত্ব আমাকে এই কহিয়া যেমন বলিল, 'ঐ যে রজঃ আর তমঃ পুনরায় এই দিকে আসিতেছে।' এই কথা শুনিয়া আমি গুপ্ত হইবার বাসনায় যেমন বৃক্ষান্তরালে যাইতেছি, অমনি বৃক্ষশাখাঘাতে আমার মস্তক চূর্ণিত হইল। হায় আমার সুখের নিদ্রাও ভঙ্গ হইল। জানি না কতদিনে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে?

কি কষ্ট! কি কষ্ট! স্মরণ করিলেও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়! আক্ষেপ অনুতাপে অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হয়। সেই ভূতভাবন পতিতপাবন পরাৎপর পরমেশ্বরের মাননিনির্ম্মিত অমল মন্দিরে হতভাগ্য আমি স্বপ্নেও প্রবেশ করিতে পারিলাম না!

শান্তি—শান্তি—শান্তি হায়!

শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল।

এক সত্য।

এই সূর্য্য-করোজ্জ্বল বিশাল ধরণী,
চারিদিকে মহাসিন্ধু ঘেরা;
বাতাসে বাতাসে এর অনন্ত রাগিণী
তবে কেন কেঁদে মরে এরা?

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অজয় অ-শোক
জেগে আছে মহান্ মিলন;
ক্ষয় নাই, ক্ষান্তি নাই, কেন মিছে শোক
হতাশায় মিছে এ রোদন!

কে কারে হারাল হায়, কে বলিবে তারে
এ বিশাল মহা পারাবার ;
ক্ষুদ্র জলবিম্ব-সম নিমেষে মিশায়
কত প্রাণ, অন্ত নাহি তার।

তা'বলে কি পেল লয় অণু পরমাণু ?
তারা কি জগতে আর নাই ?
আকাশে বাতাসে দেখ সে গেছে ছড়ায়ে
অসীম অনন্ত তার ঠাঁই।

যাহারা এখানে ছিল, এখানেই আছে,
হয় তো হয়েছে দ্বীপান্তর,
আজ যে যেথায় ছিল কাল হোথা গেছে
তবে কেন কাঁদে এ অন্তর।

আপনার চেয়ে যারে বেসেছিলি ভাল,
সে যদি দূরেই চলে যায়,
তা বলে সেই কি তোর হয়ে যাবে লয় ?
চির প্রিয়ে হারাবি হেলায়।

মৃত্যু কোথা—মৃত্যু কই, মৃত্যু কারে বলে,
চলে গেলে সেই কি মরণ ?
মিছা মিছি কেঁদে কিরে ফিরাইবি তারে,
মিছে দুখে করিবি বরণ ?

জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে জীর্ণ বাস সম,
চলে প্রাণ নূতন আধারে ;
আদরে বিদায় দাও দিয়ো না কো বাধা—
পিছু হতে ডেকোনা কো তারে।

ওই সে মিলায়ে গেল দিক দিগন্তরে,
আকাশে মিলাল তার প্রাণ,
চাঁদের কিরণে তার রূপের মাধুরী—
মুখেতে হাসিটি তার দান।

তীব্র দীপ্ত রবিকরে ঝলিছে মহিমা—
স্পর্শ তার আগে সখীরবে,
সে আজ জগৎ ব্যাপী বিশাল মহান্,
ক্ষুদ্র হয়ে যে ছিলরে ঘনে।

ওরে মন, শুদ্ধ হও, মোছ আঁখি জল
মিছে ব্যথা কোরনা রচনা,
অসীম ধরণী হতে আহরি' সম্বল
শীর্ণ-প্রাণে জাগাও সান্ত্বনা।

ফুল ফুটে ঝরে মরে ধরণীর বুকে,
তা'বলে কি হোল তার লয়?
বিশাল ধরায় তার অন্য-কাজ আছে
এতে কভু নাহিক সংশয়।

অনাদি অনন্ত কাল একই নিয়মে—
চলে ধরা লয়ে বর্ষ মাস,
পুরাতন চলে গিয়ে ফিরে আসে পুনঃ,
নব রূপে তারি পরকাশ।

যা ছিল সকলি আছে হারায়নি কিছু—
মরণেরে কেন এত ভয়,
সে শুধু—যা কিছু ছিল জীর্ণ পুরাতন—
তাহার নূতন অভ্যুদয়।

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে দেখ শুধু
বেদনা ব্যর্থতা কর দূর,
ওই শোন নিশি দিন বাজিছে নিয়ত
কি মহান্ মিলনের সুর—

জন্ম মৃত্যু কিছু নাই, নাই সুখ দুখ
সকলি একের রূপান্তর;
যা কিছু সকলি গিয়ে মিলিবে সেথায়
এক সত্য জাগে নিরন্তর।

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

পিতৃ-স্মৃতি।

মনে হয় ডাক ছেড়ে কাঁদি একবার!—
কোথা তুমি গেলে পিতা, এখনও তোমার চিতা
জ্বলিতেছে দাউ দাউ বক্ষে অভাগার।
এখনও সে নদী তীর, সেই সন্ধ্যা সুনিবিড়
প্রত্যূষে আনিয়া দেয় কি যে হাহাকার!
এখনও চখের কাছে, নীরবে জাগিয়া আছে
দগ্ধ কাষ্ঠ, চিতাভস্ম, শূন্য অন্ধকার!
চলিয়া এসেছি দূরে— বিজন সে শক্রপুরে
তোমারে একেলা রেখে সহিব আমার।
আমরা নিকটে নাই—, পাবে যত্ন কার ঠাই!
রয়েছে আত্মীয় যারা—শত্রু ত তোমার।
তাই সদা আঁখি ঝুরে, মনে হয় ফিরে ঘুরে,
দেখে আসি প্রাণ ভরে সে তীর্থ আমার।
হায় না ফিরিবে ঘরে সৈকত শয্যার পরে
ঘুমায়ে পড়েছ পিতঃ, জাগিবে না আর!
আমি হতভাগ্য হীন, তোমার স্নেহের ঋণ—
কই হল একবিন্দু সাধ্য শোধিবার!
তা নাহলে স্বর্ণ মঠ— স্মৃতির অক্ষয় বট
রচিয়া দিতাম পিতঃ উদ্দেশে তোমার!
জানি না, জানি না হায় এখনো কি অভাগার
দেখিছ প্রীতির চক্ষে স্নেহ—পারাবার!
কে বলিল—দেহান্তরে যদি দেখা হয় পরে
পুত্র বলে মুছাবে কি তপ্ত আঁখিধার!

কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এল

গঙ্গা-দেবী।

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে!
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে!
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে
মম মতি-রাস্তাং তব পদকমলে।"

গঙ্গার হিম-আলয় হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরে উহার সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত, যে পরিমাণ ভক্তজন উহাকে পতিতপাবনী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে পৃথিবীর অন্য কোনও নদীর সে পরিমাণ ভক্ত নাই। সুতরাং উহার সলিলের পাবনত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত উহার চতুর্দ্দিকে বহু কাহিনী পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

আদি-নিবাস স্বর্গ হইতে গঙ্গার ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার যে কাহিনী—সে কাহিনী মহামায়ার আবির্ভাব রূপক মহাকাব্যের ন্যায় শ্রুতিমধুর ও স্বতঃই পাপাক্রান্ত মানবের মনোমোহন করিয়া থাকে।—প্রাচীনতম বৈদিক যুগে এ কাহিনীর উৎপত্তি না হইয়া থাকিলেও ঋগ্বেদের একটি ঋকে (১০।৭৫।৫) যেন উহার আরম্ভের আভাস সূচিত হইয়াছে—উহাতে গঙ্গার সহিত অন্যান্য কয়েকটি বৈদিক ভারতের নদীর (১) একত্র আবাহন দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতে ও পুরাণে এই উদ্ভবকাহিনী পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; তাহাতে গঙ্গার পবিত্রতার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এরূপ শ্রদ্ধার সহিত ঘোষিত হইয়াছে যে, জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধামাত্র বোধ করে নাই—তাহারা তৎসান্নিধ্যে বাস করিতে, স্নেহপূর্ণ মাতৃক্রোড়ের ন্যায় তটীরে দেহরক্ষা করিতে স্বতঃই সমুৎসুক।

---

(১) অন্য নদীগুলির নাম,—যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু (Sutlej) পরুষ্ণি (Ravi) অসিক্নি (Chinab and Asecsines) বিতস্তা (Jhilum) এবং আর্জিকীয় Rig-Veda—Muller Original Sanskrit Texts Part II—p. 355 f

গঙ্গায়, মাতৃরূপে—'গঙ্গামাই' রূপে—জনগণ স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী কল্যাণদায়িনী-রূপে কল্পনা, পরবর্তী আর্য্য-উপনিবেশিকগণের আধ্যাত্মিক আদেশের পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহারা যে তত্ত্বের সাধনা ও প্রচার করিতেন, তাহা জগজ্জননী মহাশক্তির উপাসনা;—ভারতের আদিম নিবাসিগণ বৈদিক আচারে অনধিকারী থাকিলেও তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা নির্বাচনায় বৈদিক আচার তাহাদের পক্ষে স্পষ্টতই অনুপযোগী হইলেও ঐ উপাসনা—ইহার মনোমোহন সারল্যের জন্য—আদিমনিবাসী বর্ব্বরদিগের নিকটও সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল। এইরূপে গঙ্গাদেবী সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি জনগণের ভক্তির প্রাবল্য আজও সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে—ভারতের গীতি-কবিতাকে সমৃদ্ধ করিয়া কবিগণ এখনও তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করিতেছেন।

বুদ্ধের জাতককাহিনীতে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর উদ্ভবক্ষেত্রে তীর্থযাত্রার বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই সাধারণ ভাবের গঙ্গাপূজার প্রাচীনত্ব সূচিত হয়; (২) কালক্রমে গঙ্গার মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়া গঙ্গার অর্চ্চনাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গঙ্গাকে সম্পূর্ণরূপে শৈব উপাসনাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার পক্ষে বহু প্রযত্ন সত্ত্বেও, 'গঙ্গা-মাই' অদ্যাবধি অনাম্প্রদায়িক রহিয়া গিয়াছেন—সকল সম্প্রদায়ের উপাসকগণের ভক্তি সমভাবে আকর্ষণ করিতেছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই গঙ্গার পূজা পরিশেষে সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়াছে।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গঙ্গামূর্ত্তির ও গঙ্গাপূজার মূল নির্দ্ধারণ করিতে হইলে গঙ্গা-প্রবাহিত প্রদেশেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। উদ্ভব-বৃত্তান্ত কালক্রমে লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যাওয়ায়, গঙ্গার মূর্ত্তি-খানি ও তাহার ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয় গঙ্গার ও তাঁহার ভগিনী যমুনার অবস্থা—একইরূপ। কোন কোন সুধীজন, একেত্রেও ঐ মূর্ত্তির আদর্শ দেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়াছেন।

অজন্তার প্রাচীর-গাত্রে যে সকল নাগনাগিনীর চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রুণ্ওয়েডেল সাহেব, একটু জোর দিয়াই বলিয়াছেন—এ শ্রেণীর মূর্ত্তি পাশ্চাত্য এশিয়ার আদর্শ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে

(২) 'Jataka' Cambridge Translation II. 1

[illegible] মানুষের [illegible] মৎস্যের ন্যায় পুচ্ছ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এ সকল মূর্ত্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে, ঐ সকল
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কিন্তু সাধারণ ভাবে বরুণের বৃহত্ত্ব নির্দ্দেশ ব্যতীতও, ঋগ্বেদের কোনও কোনও অংশে দেখা যায় "তিনি ঋতিক্, তিনি দ্যুলোকে প্রবাহিত করেন, এবং পাপের বন্ধন উন্মোচন করেন"। হপকিনস্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন,—ঋগ্বেদের শেষ শাখায় বরুণের কোনও পৃথক স্তোত্র নাই। তাহা হইতেই তিনি এইরূপ উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন যে,—তৎপূর্ব্বেই "বিশ্বপ্রকৃতিতে এক অদ্বিতীয় বিরাটপুরুষের স্বরূপ-দর্শনবাদ (panthcistiemonism), বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা ক্ষেত্রে ভগবানের নানামূর্ত্তি দর্শনবাদে (pantheism) রূপান্তরিত হইতেছিল, সুতরাং বরুণ ঊর্দ্ধদেশ হইতে অধোদেশে অবরোহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বরুণ দেবতা অদ্ভুপতি।(৬)

বরুণ-উপাসনার মূল নিঃসংশয়রূপে বৈদিক হইলেও, তাঁহার উল্লিখিত অবরোহণের পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিভাত হয় না। অদ্ভুপতি স্বরূপ তাঁহার নূতন পদমর্য্যাদার পরিচয় দিবার নিমিত্ত শিল্প তাহার পারিপার্শ্বিক ভাবে কয়েকটি নদীমূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতঃই অনুভব করিয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনা আসিয়া শিল্পের এই প্রয়োজন পূরণ করিলেন, এবং অদ্ভুপতির রথবহনে নিয়োজিত ফেনশুভ্র হংসের কল্পনা ও রূপের ন্যায়, এই গঙ্গা যমুনার কল্পনা ও রূপও, বরুণ-দেবতার মূর্ত্তিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল।

এই সকল সারিদেবীর সর্ব্বপ্রথমে প্রতিমায় আকারিত হইবার মূলে বরুণ-মূর্ত্তির সহিত সংস্রব ব্যতীত, কোনও স্বতন্ত্র কল্পনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ-বরুণমূর্ত্তির অস্তিত্বসূচক সাহিত্যিক প্রমাণের (৭) অভাব না থাকিলেও, কার্য্যতঃ ঐরূপ কোনও বরুণমূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বরুণ তাঁহার এই উন্নত আসন হইতে যেন আরও নামিয়া আসিয়াছেন।—অদ্ভুপতিরূপে তাঁহার বিশেষ-পূজার্চ্চনা একরূপ বিস্মৃতির মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর তিনি মন্দিরের বহির্গাত্রে কুলুঙ্গীর ভিতর দিক্‌পালরূপে আসন পাইয়াছেন এবং তাঁহার সহচর মূর্ত্তি—গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি—মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দ্বারপালের গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়াছে।

বরুণের সহচরীত্ব হইতে মন্দিরের দ্বারপালত্ব এই যে রূপান্তর,—ইহা নিশ্চয়ই ক্রমঃ বিকাশের একটি প্রত্যক্ষ ধারা। উভয়তই, গঙ্গা ও যমুনা—স্ত্রীমূর্ত্তি গঙ্গা মকরের উপর এবং যমুনা কূর্ম্মের উপর দণ্ডায়মানা। সহচরী মূর্ত্তিতে

(৬) Religions of India p. 65.

(৭) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—৩য় খণ্ড, ৫২ অঃ।

গঙ্গা যমুনার [illegible] চামর দুই [illegible] যাত্রা [illegible] নাই ;—এই চামরই [illegible] সেবার সাধনভক্তি পরিচর্য্যার নিদর্শন।

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যে মন্দিরের দ্বারদেশে দ্বারপাল মূর্ত্তি অধিকার লাভ করিয়াছে। দ্বারপাল কোথায়ও ক্রূর, কোথায়ও বা [illegible], কোথায়ও সমুন্নত, কোথায়ও বা বামন, কোথায়ও সৌম্য, কোথাও বা ভীষণ। এ সকল মূর্ত্তির জন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলেও, ইহাদিগের [illegible] নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা উহাদের পরবর্ত্তী পরিণত বিকাশেই পরিচয় প্রদান করে।

[illegible] অপসারণ, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের শোভা সম্পাদন [illegible] প্রাকার হইতে [illegible] বিভেদ প্রদর্শনের নিমিত্ত, মন্দিরের বাহ্য [illegible] ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছে। তাই [illegible] বিভেদের অথবা অনন্তভীরু দুর্ভাগার, কৈবল্যমুক্তার বা মোক্ষলাভের [illegible] উচ্চ। [illegible] উপদেবতা যম ও [illegible] মূর্ত্তি গৃহীত [illegible] বিভিন্ন [illegible] পথে দ্বারদেবতাদের উদ্দেশ করিয়া, [illegible] এবং [illegible] আইনায় ব্যবহৃত করিয়াছে।

এই দ্বারদেবতাগণের মূর্ত্তির [illegible] তিন প্রকারের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, ঐহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ;—এই তিনেরই উদ্দেশ্য [illegible] মঙ্গলের সাধন। ঐহিক,—অমঙ্গলকে [illegible] করিয়া, নৈতিক—[illegible] শাস্তিপ্রদান বিধান করিয়া অমঙ্গলের মূলে প্রবল নিরাশ [illegible] আধ্যাত্মিক—পারিপার্শ্বিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিবে যে, অমঙ্গল [illegible] সাহস করিবে না। গঙ্গা যমুনার মূর্ত্তি এই শেষোক্ত [illegible] দ্বারদেবের মূর্ত্তি,—তাই এ সকল মূর্ত্তিতে এমন কমনীয় দেবত্বশ্রী ও সৌম্য [illegible] পরিলক্ষিত হইয়াছে, যাহা মুগ্ধ না করিয়া বরং আকর্ষণ করিয়া থাকে।

হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও গঙ্গা-যমুনার [illegible] মূর্ত্তির [illegible] একটা মূল্য আছে। সাম্প্রদায়িক ধরণও [illegible] ভিন্ন মন্দিরের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দেবতা হইয়া থাকে। যথা—বিষ্ণুমন্দির [illegible] দেবতা গরুড় বিষ্ণু, শিবমন্দিরের দ্বার দেবতা নন্দী-মহাকাল। [illegible] গঙ্গা-যমুনাকে দ্বারদেবতার স্থান দেওয়া হইল, তখনও প্রকৃত [illegible] বিচ্যুতি হইল না। শিল্পশাস্ত্র অনুসারেই নন্দী-মহাকালের [illegible] [illegible] হইয়া থাকুন কিন্তু গঙ্গা-যমুনার [illegible] [illegible]

রহিল,—তাহার ফলে গঙ্গা-যমুনা মূর্ত্তিতে মানুষী আদর্শ বিকাশ লাভ করিয়াছে। গঙ্গা যমুনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে সকল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বার-দেবতার আকারে; তাহা হইতেই, কেহ কেহ বলিয়াছেন,—'বৈদিক দেবতা আসিয়া কিরূপ ভাবে বিশুদ্ধ বৈদিক দেবতামণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল!—ইহা তাহারই নিদর্শন। স্যর আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম বিবেচনা করেন,—গুপ্ত যুগের মন্দিরনির্ম্মাণ বিষয়ে সাতটা বিশেষত্ব আছে। গঙ্গা-যমুনার মূর্ত্তিকে দ্বারদেশে স্থাপন তাহার অন্যতম। (৮)

গুপ্তযুগের মন্দিরদ্বারে, কখনও বা শোভাসম্পাদনের উদ্দেশ্য কখনও বা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুশাসন, প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ক্রিয়া-কাণ্ডের ব্যবস্থা অনুসারে দ্বারদেবতার স্থান দ্বারফলকের নিম্নদেশে হওয়াই বিধেয়। ভূপালরাজ্যে বেসনগরের সান্নিধ্যে উদয়গিরি পর্ব্বতে একটি মন্দিরের দ্বারফলকের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত, মকরোপরি দণ্ডায়মানা সুগঠিতদেহা, সুরুচিসূচী অলঙ্কারবিভূষিতা একটি গঙ্গামূর্ত্তি এবং তদঞ্চলে প্রাপ্ত দ্বারফলকের নিম্নদেশে অবস্থিত ঐরূপ আর একটি গঙ্গামূর্ত্তি ভিনসেণ্ট স্মিথ এক সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। (৯) উভয় মূর্ত্তিই একযুগেরই মূর্ত্তি—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভকালের মূর্ত্তি;—সে যুগপরিবর্ত্তনের যুগ—তখনও এই সকল দ্বারদেবতার স্থান সম্বন্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

এই দুইটি মূর্ত্তির বেশভূষা দেখিলে ইহাদিগের আসন যে বিশেষ পবিত্রতার পরিচায়ক উচ্চ আসন, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং যে সকল গঙ্গামূর্ত্তি স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্ররূপে পূজা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের আবির্ভাবকাল ইহার পরবর্ত্তী যুগে, ইহা অনুমান করিতে হয়। গুপ্তযুগের গঙ্গা-যমুনা মূর্ত্তিতে শিল্পাদর্শের একটি উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে,—এ শিল্পাদর্শ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্যই বিশেষ ব্যাকুল, পরন্তু যে পবিত্রতার বিষয় লইয়া পরবর্ত্তী যুগে কতই জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে, সেই অসাধারণ পবিত্রতার ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এ শিল্পাদর্শ বিশেষযত্ন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গুপ্তযুগের হিন্দুশিল্পী যক্ষিণীর স্থলে সমশ্রেণীর বরুণমূর্ত্তিকে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পাইয়া থাকিবে; যক্ষিণীগণ প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবেশদ্বারে

(৮) Cunningham, A. S. R. IX. 42.

(৯) History of Fine Art in India and Ceylon. p. 160.

দ্বারপালরূপে কাল্পনিক মকর পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১০) গুপ্তযুগের মন্দিরদ্বারে দ্বারদেবতারূপিণী গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি কোনও কোনও বিশেষত্ব প্রকাশ করে, ইহারা সাধারণতঃ দণ্ডায়মানা, ইহাতে প্রতিমা-তত্ত্বের কোনও প্রয়োজন সাধিত হয় নাই, ইহা দ্বারা নবীন শিল্পরচনাপদ্ধতির উপর প্রাচীন শিল্পরচনা পদ্ধতির প্রভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১১)

গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম্ম—উভয়ই বাহন বাহিকের সমধর্ম্মী উপযোগী; মকর—সমুদ্রের সহিত গঙ্গার সম্বন্ধ সূচিত করিতেছে, কূর্ম্ম—অকূল সমুদ্র দূরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিতি সূচিত করিতেছে। কূর্ম্ম অল্পায়াসে সুপরিচিত জলজন্তু, যমুনায় এখনও উহার প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু গঙ্গায় কূর্ম্ম কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কূর্ম্মের বেলায় এমন সহজসাধ্য সুপরিচিত জন্তুর আদর্শ বর্ত্তমান থাকিতেও, শিল্প আপন অলঙ্করণ-ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিমিত্ত মকর ও কূর্ম্ম উভয়কেই কাল্পনিক রূপ দান করিয়াছে।

এথেনসবাসিগণ তাহাদিগের প্রিয় নগরীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে, শিল্প তাহাকে পদমর্য্যাদাবিশিষ্টা যৌবনশ্রীসম্পন্না রমণীর আকারে আকারিত করিয়াছে; সে দেবতা—শৌর্য্যবীর্য্যের ও জ্ঞানের দেবীরূপে তাহাদিগের প্রাকারবেষ্টিত নগরীর কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতেই আমরা এথেনসবাসিগণের ভাবের—চিন্তার ও আদর্শের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি। দো-আবের ও গঙ্গার নিম্ন শাখা প্রবাহিত সমতলখণ্ডের পরবর্ত্তী আর্য্য উপনিবেশিকগণের মনেও গঙ্গা ও যমুনা দিব্য দেবত্বের মনোমুগ্ধকারিণী কল্পনা উদ্রিক্ত করিয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল যে গঙ্গাই দেবীপদ লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। ইলোরার কৈলাস-মন্দিরের দেবায়তনে নদী দেবতার যে সকল ভাস্করমূর্ত্তি অবস্থিত আছে, তাহাতে গঙ্গাকে মকরের উপর, সরস্বতীকে শতদলের উপর এবং যমুনাকে কূর্ম্মের উপর দেখিতে পাই; এতদ্ব্যতীত উপরে, সাতটি কুলুঙ্গীর ভিতরে সাতটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহারা সম্ভবতঃ আর্য্যাবর্ত্তের শস্যশস্যদ্বিধায়িনী সপ্ত নদীর প্রতিরূপ মাত্র।

এইরূপে ক্রম-পরিণতির ফলেই অবশেষে স্বতন্ত্র-পূজায় গঙ্গামূর্ত্তির [illegible]

(১০) Ibid, p. 74. সুদর্শনা যক্ষীর (ভরহুত) চিত্র দ্রষ্টব্য।

(১১) Ibid, p. 74, and JCO Copinath Rao's Elements of Hindu Iconography. Vol. II. Part II. plate CLV. নিদর্শনগুলি তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

[illegible]

(১৩) Gopinath's Elements of Hindu Iconography Vol. II, part i.

(১৪) Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. VII, p. 61.

(১৫) Ibid Vol. III, p. 88.

মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বিষ্ণু ও শিব উভয়ের সহিতই গঙ্গা সম্বন্ধ-যুক্ত; কারণ গঙ্গা 'শিবা' ও 'নারায়ণী' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উক্ত বিংশাক্ষরীমন্ত্র এইরূপঃ—

"ওঁ নমঃ শিবায়ৈ নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ স্বাহা"। ব্যাস এ মন্ত্রের ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দ, এবং গঙ্গা ইহার দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (১৫) পূজাপদ্ধতি যে পরবর্ত্তী কালে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহা একটা কথা বিবেচনা করিলে সহজেই ধরা পড়িয়া যায়; গঙ্গার জন্য কোনও পৃথক্ যন্ত্র কল্পিত হয় নাই; সাধারণ পূজার জন্য যে যন্ত্র পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, গঙ্গাপূজার যন্ত্রের আবরণরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে। (১৫) গঙ্গার ধ্যান এইরূপ :—

"ত্রিভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতাং
রত্নকুম্ভমিতীষ্টোভ্যবরদাভয়সংকরাম্"।

ইহার পরবর্ত্তী পূজাপদ্ধতিতে—যাহা এখন গঙ্গাপূজায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—ঐ ধ্যানকেই বিবৃত করিয়া উহার মর্ম্মার্থ কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে; যথা :—

"শুক্লাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণাপূর্ণনির্ভরাম্।
সুগন্ধাবাসিতভূপৃষ্ঠাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্॥
ত্রৈলোক্যানমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।"

ইহাতে গঙ্গার দৈহিক ও আন্তরিক সৌন্দর্য্যের কথা, এবং তাঁহার ভক্ত দেবতা ঋষিগণের কথাই বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। কোনও ধ্যানে গঙ্গার পতিতপাবন শক্তির উল্লেখ নাই বা ইঙ্গিতও নাই। যে স্তবে ও প্রণামমন্ত্রে গঙ্গার এই পতিতপাবনত্ব ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ :—

"সদাঃপাতকসংহন্ত্রী সদোদ্যুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা পুনাতি পরমা নিতঃ॥"

একক্ষেত্রে এক সত্যকার দেবতার সন্দর্শন ঘটিয়াছে,—এ দেবতা কোনও কাল্পনিক স্বর্গের দেবতা নহে, কোনও গূঢ় মনোভাবরূপের দ্বারা তাঁহার

(১৫) Encyclopædia of Religion and Ethics p. 1158. প্রবন্ধের পৃষ্ঠা ৯৪—৯৫।

আবাহন করিতে হয় না। এ দেবতার কল্যাণ [illegible] আমাদিগেরই দ্বারের সম্মুখ দিয়া এ দেবতা প্রেম আকারে বহিয়া যাইতেছে সকল মানুষের বিরোধ করিয়া, শস্য সম্পদ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া, মানুষের ধর্মাচরণের মার্গ প্রদান করিয়া, বহিয়া যাইতেছে। ইহা নাই এমন স্থান পৃথিবীর কোথাও নাই। যে মোহে পড়িয়া ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান আপনাদিগের বিশ্বদেবতা খ্রিষ্টদেবের অপেক্ষা এথেনিউসের অবতার ঈডিপাসকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল, এ গঙ্গায় সে মোহ আছে। অতএব, যে দেশে বিশ্বদেবতার [illegible] অবিশ্বাস্য, এবং সেই ধার্মনিক তত্ত্বমূলে সোশিয়লিজম্ প্রভৃতি যে দেশের ভূবিদিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, সে দেশে যে গঙ্গা পরম পবিত্র বলিয়া স্বীকৃত ও বর্ণিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই।

এইজন্য, যে দেশে সুনিয়ন্ত্রিত ধার্মনিক তত্ত্বের অভাব, এবং সেই ধার্মনিক তত্ত্বমূলক [illegible] ভক্তির ভক্তি থাকে,—সেই দেশে গঙ্গা মুক্তির সন্ধানে উপায়ান্তর (কারণ চাহিয়া) বলিয়া বীকৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে। ইহাই গঙ্গা পূজার ক্রম বিকাশ। চরমোৎকর্ষ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

এই প্রকার ক্রমবিকাশে, ধার্মনিক প্রথম অবস্থাকার্যারোচিত বলিয়া পরিচিত যে গঙ্গাতত্ত্বের প্রেমিক উক্ত হইয়াছে, তাহারই পরবর্তী কোন, কাব্যিক সন্নিবেশের মাহাত্ম্যে যে "নিমমেঘ" সুপ্রসিদ্ধ—ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহা [illegible] উহার বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং "নিমম" অর্থ যে স্থানে যে ভাবে বুঝিতে হয়, "মহিম্ন স্তবের" অনুবাদক আবার ও সেজন্য প্রভৃতি উহার ইংরেজি করিয়াছেন। পৌরাণিক কাহিনী বেদের [illegible] প্রভৃতি, সমাজ দেবতাদের পূজা গৃহীত ও অভিভূত হইয়া উহার [illegible] হইয়াছে, কতক গুলি তন্ত্র গ্রন্থ অবশ্য, গঙ্গাকে মুক্তিদাতৃত্বে [illegible] উপায়—এইরূপ সঙ্কলনগৃহীত পৌরাণিক?) বিশ্বাসকে অধিকতর করিয়া তুলিয়াছে।

অতএব গঙ্গা দেবতা-ভাবে গঙ্গামূর্তির যে ক্রমপরিণতি, তাহার প্রধান দ্বারদেবতার রূপে দুই হস্ত: দক্ষিণ হস্তে বরাভয়ের নিম্নাংশে উন্নত করয়-নালের পরিচয় জানের নিমিত্ত দ্বারদেবতাকাহিনী গঙ্গার দুইটি অবয়ব নির্দেশ করিতে [illegible] ভুলিয়াছে,—কমণ্ডলু ধারী, এবং করতলে রত্নকুম্ভ এবং মধ্যাদার ভাবটীকে প্রকাশ করিয়া তুলিবার নিমিত্ত যেচ্ছচ্ছত্র আনিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।

এ যুগের বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরের দ্বারদেবতার নিম্নে [illegible] মনিহার-

[illegible] গঙ্গার যথোপযুক্ত [illegible] করিয়া [illegible] নানারূপ আকারেই গঙ্গাকে আবাহিত করিবার [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]

অঙ্কনার প্রতিযোগিতায় [illegible] আবির্ভাব ঘটিয়া ছিল,—তখনও দ্বিতীয় [illegible] (বাঙ্গালার) [illegible] সাম্রাজ্যের প্রথম-খণ্ডের যবনিকা পড়ে নাই।

[illegible] গুপ্তযুগের [illegible] আমাদের [illegible] করিয়াছে। [illegible] মজ্জাগত [illegible] [illegible] আকাশে [illegible] [illegible] [illegible]

উল্লিখিত হইয়াছে। (১৬) মকরের একমাত্র প্রতিশব্দ—হিংস্রদংষ্ট্রক—অর্থাৎ যে প্রাণী দন্তাঘাতে অপরের প্রাণ নাশ করে। (১৭) অভিধানে মকর জলজন্তু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, (১৮) কিন্তু সুশ্রুতকার মকরকে পরিষ্কারভাবে সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (১৯) সুশ্রুতের যে অধ্যায়ে পঞ্চাম্বুচর বিচার আছে, মকরের ব্যাখ্যা সেই অধ্যায়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় তিমি ও অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্যের সহিত একত্র মকরও উল্লিখিত হইয়াছে, এবং মকর জন্তুর ভিতর উহা স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা হইতেই অনুমান হয়,—ভারতীয় শিল্পে মকরের মূর্ত্তি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রীতি বিভাগের অনুমোদিত, ও সম্পূর্ণ কল্পনামূলক হইলেও, মকর নিতান্তই কাল্পনিক জানোয়ার নহে।

ভারতীয় শিল্পে প্রথমতঃ মকরের মুণ্ডই ব্যবহৃত হইত;—মকরমুণ্ড শোভাসম্পাদনে নানা ভাবে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিত, তাই উহা দ্রি পরিকল্পনায় পরিণত হইয়াছিল। মকর যখন পরবর্ত্তীকালে ক্রমে ব নির্দ্দিষ্ট হইল, তখনই শোভাসম্পাদনে কার্য্য ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণে উহার পূর্ণাবয় প্রদর্শনের প্রয়োজন হইল। শোভাসম্পাদনেই হউক, বা প্রতিমানির্ম্মাণেই হউক পূর্ব্বতন কল্পনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া মকরকে যতটা মৎস্যের সাদৃশ্য দেওয়া যাইতে পারে, প্রথম নিদর্শনগুলিতে তাহাই দেওয়া হইয়াছে। মিথুনী যে জলজ আদৌ পদ নাই, কাল্পনিক ব্যবস্থায় তাহাতেও দুইটি অথবা চারটি পদ যুক্ত হইয়াছে; প্রথমতঃ শোভাসম্পাদনের সার্থকতার নিমিত্তই এই কাল্পনিক ব্যবস্থা অবধারিত হইয়া থাকিবে, এবং পরে বাস্তবরূপে মকরের সুপ্রসিদ্ধ দ্বিভিভঙ্গী প্রদর্শনের প্রয়োজন হওয়ায় ঐরূপ কাল্পনিক ব্যবস্থা রক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়া আসিতেছে।

মৎস্যের আকার হইতে চতুষ্পদের আকারে উঠিয়াই এই নি বিবর্ত্তন বিরাম লাভ করে নাই; পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের উ উহা স্বকীয় প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে; সুশ্রুতের প্রাচীন শ্রেণীবিভাগে মকর প্রধান জন্তুমধ্যে গণিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে ম কুম্ভীরের ন্যায় পদযুক্ত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। (২০)

(১৬) পঞ্চতন্ত্র।

(১৭) দল্হন রচিত সুশ্রুতের টীকা। (১৮) অমরকোষ ১।১০।২০।

(১৯) সূত্রস্থান, ৪৬ অ। (২০) ভাবপ্রকাশ ১ম খণ্ড, ২ অ।

মকরচিহ্নীয় একটি প্রবন্ধে কাজেনস্ সাহেব কতকগুলি মকরের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার কোনও নিদর্শন অথবা বাহনরূপী কোনও মকরমূর্ত্তি স্থান পায় নাই। কিন্তু কাজেনস্ সাহেবের প্রকাশিত নিদর্শনগুলি তথাপি সুনির্ব্বাচিত। (২১) মহাবোধি, ভারহুত ও সাঁচী হইতে প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি গৃহীত হইয়াছে। সে সকল নিদর্শন সৌন্দর্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত,—তাহাদের দুইটি অথবা চারিটি পদ আছে, মৎস্যের ন্যায় পুচ্ছ আছে, কুম্ভীরের ন্যায় মুণ্ড ও শুণ্ড আছে, হস্তিসদৃশ দন্ত আছে, এবং কোনও কোনও স্থলে গায়ের কতকাংশে মৎস্যের ন্যায় আঁইষ আছে। অপর নিদর্শনগুলি মথুরা, আইহোলী, কালেড়ী, অজন্তা ও বোরোবুদোর হইতে সঙ্কলিত। গৌড়ীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি কালে বা তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালার বাহিরে সর্ব্বত্র যেরূপ পরিকল্পনা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল নিদর্শনে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; বাঙ্গালায় যে বিশেষ মকরমূর্ত্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সহিত উহাদের সাদৃশ্য নাই বলিলেই হয়।

কাজেনস্ সাহেব কর্ত্তৃক মহাবোধি হইতে যে পোটীনক্স নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার রচনাকাল অনুমান ২৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ। উহার একটি শুণ্ড আছে, এবং শুঁড়ের উপরে একটি বিন্দু আছে, শুণ্ডটি উর্দ্ধে বাঁকিয়া উঠিয়া পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, শুণ্ডের এই বঙ্কিমতা উহার গলদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে মৎস্যের পরিকল্পনার সহিত উক্ত নিদর্শনের মকরত্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী নিদর্শন ভারহুত হইতে গৃহীত, উহা আবার বিশিষ্টরূপে কুম্ভীরের ন্যায়। মথুরার মকর সম্বন্ধে ভোগেল পরিকল্পনা [illegible] প্রাণী, কুম্ভীরের অপেক্ষা মৎস্যের সহিত উহার অধিক সাদৃশ্য। [illegible] একটি নিদর্শন স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন উহার চিত্র তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে (২২) এই সকল প্রাচীন নিদর্শন মকরকে জলজন্তু বলিয়াই সূচিত করে। [illegible] শতাব্দীর পর হইতে মকর সম্বন্ধে একটা বিশেষ অর্থদ্যোতক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে,—মকরের শুঁড় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে, শুণ্ডটি অন্তর্হিত বা বিরল পরিমাণে বাকিয়া অধোমুখী হইয়াছে, এ পরিকল্পনা হস্তীর ন্যায়

(২১) A. S. R. (1903-4)

(২২) Cunningham's Report Vol. X. Plate I. Fig 1.

চতুষ্পদের সহিত সুসঙ্গত। এই চতুষ্পদী রূপ বাঙ্গালার শিল্পে-ক্রমমুক্ত আজ হইয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এই সকল মকর মূর্ত্তি দেখিলেই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রসাধন-সামগ্রীলাভের নিমিত্ত অসংখ্য অভিনবতর চেষ্টা প্রারব্ধ হইয়াছিল। সে সকল চেষ্টায় কোনও স্থায়ী ফল লব্ধ হয় নাই; প্রসাধন-বিলাস তখন ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছিল, এবং সেই প্রসাধন বিলাসের সহায়তার নিমিত্ত মকরপুচ্ছের ক্রমশঃ বিবর্ত্তন সাধন করা ও মকরের ক্রমশঃ বিস্তৃত করাই ঐ সকল চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রাচীনতম কালের বা এই পরিবর্ত্তনের যুগের কোনও নিদর্শন বাঙ্গালায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু উড়িষ্যার শিল্পে যে মকর দৃষ্ট হয়, তাহা খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বের; তৎপ্রদেশে মধ্যযুগে মন্দির বা সিংহদ্বারের প্রসাধনে মকরের যে মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সহিত উহার সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। রাজগিরি পর্ব্বত-গুহায় মকরের প্রাচীন নিদর্শন, এবং বর্ত্তমান মন্দির শিখরে মকরের নূতন রূপ,—দুইটি বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী ও বহু শতাব্দী ব্যবহিত দুইটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ সূচিত করিতেছে—ইহাদিগের ভিতর শিল্পগত অনুষ্ঠানের কোনও সংযোগসূত্র থাকা অনুমিত হয় না।

প্রাচীন নিদর্শনগুলিকে পুরাপুরি ভাবতান্ত্রিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহাদিগের অভিব্যক্তি ভাবতান্ত্রিক হইলেও, মূলতঃ তাহারা নিসর্গানুগত—সে পরিকল্পনার মূলে একটা জলজন্তু। মধ্যযুগে বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় যে মকর সৃষ্টি প্রচলিত ছিল, তাহার উদ্ভব অন্যরূপ। তাহাকে বিচার মূলক রচিয়াছে মনে হয়, পুরাতন কল্পনায় তাহা বহু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। প্রাচীন কালে চিত্রের সাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত কেবল মাত্র প্রসাধন-সামঞ্জস্যই লক্ষ্যের বিষয় ছিল, এবং একারণে অবয়ববিশেষের অসামঞ্জস্য পরিণতিও অনায়াসেই গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক কালে মকরকে বাহনরূপে দৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে তদনুরূপ আকার প্রদানের নিমিত্ত মকরের পরিণতিকে ন্যূনাধিক সুসঙ্গত করিবার অভিলাষে পুরাতন আকারের পুরাতন ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে। এই নূতন আদর্শের প্রভাবে মকরের রূপে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, প্রসাধনকার্য্যের মকর মূর্ত্তিও সে প্রভাবের বহির্ভূত নহে।

গুপ্ত যুগের প্রথম হইতেই মকর দ্বারদেবতার বাহনরূপে দৃষ্ট হইলেও এবং তাহারও পূর্ব্বে মকর বহির্দ্বার মূর্ত্তির বাহনরূপে দৃষ্ট হইলেও, সে সকল যুগের

স্বাধীন-সম্প্রদায়শক্তির প্রকৃত উৎসস্বরূপিণী গঙ্গা পৌরীয় সাম্রাজ্যের শিল্পকলার
বিশেষোক্ত আকার লাভ করিয়াছে,—বরেন্দ্রের গঙ্গামূর্ত্তির মধ্যে [illegible]
দর্শনরূপ, তাহার অলঙ্কাররাশি সম্পদের নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শন, তাহার [illegible]
ভারতীয় সত্তা—শক্তির ব্যঞ্জনা করিয়া এক অভিনব শ্রী আনিয়া দিয়াছে।

ওপ্ত যুগেই যে ভারতের প্রকৃত জাতীয় শিল্পের যুগ,—ইহা [illegible]
সকলেই স্বীকার করেন. ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম [illegible]
একদল মনুষ্য ও হাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সাড়ে তিন শত বর্ষ কাল ধরিয়া [illegible]
বিদ্যমান ছিল এবং হর্ষের ও পুলকেশীনের রাজত্বকাল ও ঐতুসের [illegible]

গোস্বামীপ্রেস নিদর্শন এবং বরেন্দ্রের নিদর্শন—দুইটি ভিন্ন [illegible]
দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশ্রেণীর নিদর্শন, যদিও উভয়েই তুলনায় [illegible]
নিদর্শন বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। প্রথমোক্তটি যে [illegible]
নিদর্শন—সে শিল্পযুগ সার্দ্ধত্রিশত বর্ষ ধরিয়া বিদ্যমান ছিল; [illegible]
ইহার [illegible]—সে শিল্পযুগের ব্যাপ্তিকাল প্রায় পঞ্চশত বৎসর।

[illegible] পণ্ডিতসমাজে ইহার অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। [illegible]
কাল [illegible] হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তদতিরিক্ত কোনই আলোচনা হয় নাই।

বরেন্দ্রের গঙ্গামূর্ত্তি দৈর্ঘ্যে মকরসহ ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি—উহার [illegible]
সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত আলোচনা আজিও হয় নাই। কথিত আছে [illegible]
যে গঙ্গামূর্ত্তিটী পুরীর জগন্নাথমন্দিরের ভোগমণ্ডপের দ্বারে [illegible]
আছে, বরেন্দ্রের এ মূর্ত্তি তদপেক্ষাও বৃহত্তর। উহার মুখে [illegible]
[illegible] মূর্ত্তি, উহাদিগের ভিতর যে মৌলিক সম্বন্ধের পরিচয় [illegible]
[illegible] করিবার উপায় নাই; তবে পুরীর নিদর্শনটিকে [illegible]
অপরটী হইতে বয়সে বড় বলিয়া অনুমান হয়, এবং বরেন্দ্রের [illegible]
[illegible] পুরীর নিদর্শনেরই অধিক অনুগমন করিয়াছে।

[illegible] চন্দ্রগুপ্তপুরাতে প্রবেশ করিতে হইলে যে [illegible]
[illegible] হয়, তাহাতে কতকগুলি ক্ষীণ স্তম্ভ আছে; তাহার [illegible]
[illegible] অলঙ্কারবিশিষ্ট; সেই সকল স্তম্ভের উপর মকরমূর্ত্তি [illegible]
[illegible] দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। ইহা পঞ্চম শতাব্দীর [illegible]
[illegible] নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শেষের [illegible]
নিদর্শনে দেবীকে উত্তর দেশেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, সুতরাং [illegible]
[illegible] প্রবেশ পর্য্যন্ত উহাই গঙ্গার সুনিয়মিত স্থান বলিয়া [illegible]

পারে; অবশ্য তাহাতেও উহাই লক্ষিত হইবে। গুপ্তযুগে সরাবরই আদর্শ প্রত্নতাত্ত্বিকপ্রাপ্তিত অপেক্ষা বেশীর ভাগ সাধনমূলক ছিল বলিয়াই দৃষ্ট হয়। দ্বারফলকের নিম্নদেশে যখন ঐ সকল মূর্ত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, তখনও প্রথম নিদর্শনগুলিতে প্রসাধনের ইচ্ছাই প্রকৃষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির সহিত পরবর্ত্তী মূর্ত্তিগুলির পার্থক্য সহজেই লক্ষিত হইবে।

তিরোগাতে প্রাপ্ত গঙ্গাযমুনামূর্ত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে স্যর আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন—"গঙ্গা ও যমুনামূর্ত্তির সম্মুখ ফলিই তাহাদিগের রচনারীতিতে অদ্ভুত বিশেষত্ব রহিয়াছে, এবং তাঁহারা দ্বারফলকের বহির্ভাগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন"। পরে, (৪৬ পৃষ্ঠায়) তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন—"গঙ্গা কুম্ভীরের উপর দাঁড়াইয়া আতাফল চয়ন করিতেছেন।" আর যমুনা কূর্ম্মপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আম্রফল সংগ্রহ করিতেছেন।" গুপ্তযুগের এই সকল নিদর্শনের স্থিতিভঙ্গী ও কর্ম্মোদ্যমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে—এ যুগের শিল্পাকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্যই ব্যাকুল ছিল, এবং সে সৌন্দর্য্য দৈহিক সৌন্দর্য্য, ও সে সৌন্দর্য্য দেবীমূর্ত্তি অপেক্ষা নর্ত্তকী মূর্ত্তিতেই সমধিক প্রকাশযোগ্য। বরেন্দ্রের গঙ্গা প্রতিমার স্থিতিভঙ্গী ও কর্ম্মোদ্যমে সুচারু সংযমের পরিচয় রহিয়াছে, এবং তাহা উপরোক্ত মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর।

অতএব, গৌড়ীয় শিল্প পরবর্ত্তী কালে ক্রমবিকাশ লাভ করিলেও, উহাকে পূর্ব্বতন শিল্পের অবনত আকার বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। এ বিষয়ে গৌড়ীয় শিল্প সযত্ন আলোচনার ও গবেষণার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এ শিল্প,—পরিকল্পনায়, ভাবৈশ্বর্য্যেও কলাকৌশলে, মূলতঃ বাঙ্গালার শিল্প; ইহার আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই উহার মধুর অন্তরাত্মার সন্ধান লাভ ঘটিবে এবং তাহাই আমাদিগকে আমাদিগের স্বদেশের শিল্পচেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া, আমাদিগের অধুনা মৃত না হইলেও মরণোন্মুখ শিল্পাদর্শকে অনুকূল পথে ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত করিতে পারিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

তিব্বৎ ও বঙ্গদেশ।

—:০:—

আবার বুঝি বিস্মৃত অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়!—বৌদ্ধযুগে এবং তন্ত্রপ্রাধান্যকালে তিব্বৎ ও ভোটানের সহিত বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালী জাতির ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল। বাঙ্গালার অনেক পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া পালি এবং সংস্কৃত ভাষার প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ এবং তন্ত্র-ধর্ম্ম প্রচারকার্য্য বাঙ্গালীই তিব্বতে এবং চীনে করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শ্রীপর্ব্বত শ্রীজ্ঞান (নাস্তিক ভট্টাচার্য্য) তিব্বতীদিগের গুরু ও পূজ্য ছিলেন। তিব্বতের ডেঙ্গুর ইত্যাদির পরে-ইয়োরোপের মনীষিগণ জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছেন, বৌদ্ধ বাঙ্গালী পূর্ব্ব এশিয়ায় ধর্ম্ম এবং সভ্যতা কেমন সুন্দরভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। আবার তান্ত্রিক যুগে অনেক বৌদ্ধ তান্ত্রিক বাঙ্গালায় আসিয়া গুরুগিরি করিয়াছিলেন। গুরু দুম্-পা বা গুরু দুম্বো তিব্বতের বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। নেপাল, তিব্বৎ এবং ভোটানের অনেকে উদ্বৃত্ত বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; এই সকল দেশের অনেক শব্দ, কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার স্থান পাইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সমাজের মধ্যে যাঁহারা উদ্‌যোগী, তাঁহারা নেপাল-ভোটান-তিব্বৎ পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। এই সকল দেশে ভ্রমণ করিলে কাহারও জাতি যাইত না, কেহ সমাজচ্যুত হইত না। রাজা রামমোহন তিব্বতে গিয়াছিলেন বলিয়া কখনই একঘরিয়া হন নাই। তিব্বতে ও চীনে বাঙ্গালার সন্ন্যাসীদিগের বড়ই সমাদর ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত এই সমাদর পাইয়া আসিয়াছিলেন। দৈব বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ সকল বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত ছিল, তখন "মাশিষ্ঠ পদ্ধতি" অনুসারে চীনের ও তিব্বতের নারীকে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতেন। তন্ত্রে "চীনাচার" বলিয়া একটা সাধনার পদ্ধতিই আছে।

মোগল-পাঠানের প্রাধান্য কালে বাঙ্গালার সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মুসলমানগণ বৌদ্ধদিগকে বড়ই ঘৃণা করিতেন; উহারা মূরুৎ-পরস্তী বলিয়া মুসলমান মাত্রেই উহাদিগকে স্পর্শ করিতেন না। বিশেষতঃ

[illegible] তিব্বতী ও ভোটিয়াদিগের সংস্পর্শে আসে যাহারা [illegible] করে, সেই শতাব্দীর বাঙ্গালার মুসলমান সুবাদারগণ তিব্বতীদিগের বাঙ্গালায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি নেপাল ও সিকিম হইতে গোর্খা ও ভোটিয়াগণ উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে আপতিত হইয়া লুটপাট করিতেন। ইহার পূর্ণিয়ায় এবং রঙ্গপুর ঘোড়াঘাটায় মোগলদিগের দুইটা বড় ছাউনী ছিল, এবং এই দুই স্থানের সৈন্যের সাহায্যে মোগলগণ বাঙ্গালাদেশকে রক্ষা করিতেন। মীর কুমলার বিপুলবাহিনী কেবল আসামের দুর্গদোষে নষ্ট হয় নাই; বোধ হয় অহমীয়াগণ মীর জুমলার বাহিনীকে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়াছিল।

বাউল যে পুরাতন ইতিহাসের কথা। জাতিতত্ত্বের দিক দিয়া বলিতে হইলে সত্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, বাঙ্গালার বহু জাতির মধ্যে তিব্বতের ও ভোটানের শোণিত এখনও প্রবাহিত; পক্ষান্তরে বাঙ্গালার খাঁটি বাঙ্গালীর শোণিত এখনও তিব্বতের বহুস্থানে সজীব ভাবে প্রবাহিত। বাবুর দল পতিভোদ্ধার করিতে বড়ই সমুৎসুক, অথচ তাঁহারা বঙ্গদেশের জাতিতত্ত্বের খুঁটী নাটীও জানেন না, বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক যুগে বাঙ্গালার কতটা শোণিত সমন্বয় ঘটিয়াছিল, তাহার খবর রাখেন না। বাঙ্গালার ধর্ম্মতান্ত্রিক ছাঁচিবিচার ও বিন্যাস, কান্যকুব্জের, মিথিলার এবং অন্ধ্রের ও উৎকলের ব্রাহ্মণগণ আসিয়া করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা অধিকাংশে নব্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা হইয়াছিল। এই নব স্মৃতির বিধান দিয়া বাঙ্গালার তান্ত্রিক সমাজ শোভনভাবে মান্য করিয়া কখনই চলেন নাই। এই তত্ত্বটী রাজা রামমোহন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

যাউক পুরাতন কথা। এখন এত কথা বলিবার কেন—ভাল ও [illegible] নামার দল এখন শাস্ত্রকুলের সহিত—বিশেষতঃ বাঙ্গালার সহিত [illegible] চালাইতে চাহে। ভোটান রাজ্যের অধিকারিগণ ঐ রাজ্যের মধ্যে ইংরেজ [illegible] প্রবেশ বাঙ্গালীর অনাধে যাতায়াত করিবার অনুমতি দিতে [illegible] চাহিতেছে, ভোটিয়া ও নেপালে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, [illegible] প্রান্তরে খনিজ দিবার আয়োজন হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, [illegible] কর্ম্মী ভোট, গোর্খা, নেপালী ও তিব্বতীগণ ইংরাজের পক্ষে [illegible] ইংরেজও অন্যদিকে ইহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লইতেছেন। সিকিম রাজ্য ত [illegible] ইংরেজের আমাদ বাগান পরিণত হইয়াছে, বহু বাঙ্গালী সিকিমে যাইয়া চাকরী ও দোকানদারী করিতেছে। ইদানীং ভোটদের আমদানির সংখ্যা বাড়িতেছে

মহাকালের মন্দিরে এখন একজন বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক কর্ত্তা ! নেপালও বাঙ্গালীকে অবাধে স্থান দিতেছেন। মোট কথা এই,—এই সকল পার্ব্বত্য দেশ এতকাল বাঙ্গালার পক্ষে দুরধিগম্য ছিল, এইবার এই সকল দেশে বাঙ্গালী ও ইংরেজ অবাধে গতাগতি করিতে পারিবে। ইংরেজ শাসনের আলোকে এই সকল দেশের শাসন-পদ্ধতি, বিচার-আচার পরিবর্ত্তিত হইবে। বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে এই সকল দেশের জাতি সকলের সহিত পাকা রকমের ইনিষ্টি প্রণয়ের জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছেন। তিনি ভোটানে যাইতেছেন, কেবল অজানা দেশ দেখিবার উদ্দেশ্যেই নহে ; তাঁহার ভোটান দর্শনের অন্তরালে একটা বড় রাজনীতিক উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা গোটাকয়েক পুরাতন ইতিহাস-কথার আবৃত্তি করিয়া রাখিলাম। কলিকাতায় তিব্বতের ও সিকিমের অনেক মানুষ বাস করে ; তাহারা এই সমাচারে অতি মাত্রায় আনন্দিত হইয়াছে। একটা নূতন যুগ, নূতন ভাব, নূতন সম্বন্ধের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইহা হইতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির কল্যাণই হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাই পাঠকগণের বোধসৌকার্য্যার্থে এত কথা কহিয়া রাখিলাম।

মন্থনে

করবে মথন, করবে মথন
দুখের সাগর ভ্রান্ত—
যত পারে উঠুক গরল
হ'সনা পরি শ্রান্ত !
দেখ্‌বি কে এক মধুর প্রাতে
লয়ে সুধার ভাণ্ড-হাতে
আপনি রমা উদয় হবেন
নাশি গৃহের ধ্বান্ত—
মরণ নাহি ছোঁবে তোরে—
নীলকণ্ঠ ঐ আড়াল করে'
দাঁড়িয়ে আছেন গিল্‌তে গরল
উরে ধরার পাত্র !—

কবিশেখর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ

ফুলের মামলা

একদিন বেল, চাঁপা, গোলাপ ও গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলেরা কে বড়, এই নির্দ্ধারণার্থে—মামলা করিতে গেল—ব্রহ্মার আদালতে।

বেল ফুল প্রথমেই ব্রহ্মাকে গিয়া বলিল—"আমি ভোরের ফুল, অতি পবিত্র। শুদ্ধ সাত্ত্বিক লক্ষণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ শিখায় আমাকে স্থাপন করেন—আমার আসন সর্ব্বোচ্চে।" ব্রহ্মা শুনিলেন এবং শিরোদেশ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

পরে চম্পক—আসিল, ব্রহ্মার চরণাগ্রে তাহার কোমল চম্পকাঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল—"আমি চম্পক। আমাকে কে না আদর করে? আমার সৌরভগুণে সকলেই মুগ্ধ। রূপে গুণে আমার তুল্য জগতে কে আছে? আমিই সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ"।

এইবার গন্ধরাজ—গর্ব্বসহকারে বলিল—"আমার নামেই আমার পরিচয়। আমি সকল ফুলের রাজা। আমার গন্ধ জগতে অতুলনীয়"।

পরে রক্তিত-কপোলে গোলাপ আসিয়া বলিল—"সকলের বক্ষে আমার আসন। সৌরভে সৌন্দর্য্যে—আমার সমকক্ষ কে আছে? যদিও আমার জীবন কণ্টকময়—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। মহাজনেরা কে কবে নিষ্কণ্টকে সুখের শয়নে জীবন অতিবাহিত করে! আমিই পুষ্পরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী"।

অবশেষে পদ্ম আসিল। স্বাভাবিক বিনয় ও লজ্জায় পদ্মের মুখকমল—লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"পদ্ম! তুমিও কি পুষ্প-সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার প্রয়াসী? তাহা শুনিয়া পদ্ম বিনয়-সৌরভ-সহকারে ব্রহ্মার পাদ পদ্মে পড়িয়া বলিল—"আমি অতি হীন, দৈবীবলপূর্ণ স্থলিন স্থানে আমার জন্ম। জলের উপর আমার জীবনটুকু সর্ব্বদাই টল্ মল্ করিতে থাকে! কি সৌন্দর্য্যে কি সৌরভে আমি অতি যৎ সামান্য। ঐ চরণ-কমলে চির দিন সেবক হইয়া থাকি, ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা"।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া বলিলেন—"কমল তুমিই ধন্য। তুমিই সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ। তোমার সৌরভ ও কমনীয় সৌন্দর্য্য জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। হে পদ্ম! পুষ্পরাজ্যে আজ হ'তে তোমার পদ সকলের উচ্চে"।

ব্রহ্মার বিচারে পদ্মের জয় জয়কার পড়িয়া গেল। দেবঋষি-চরিগণ পদ্মের গুণ কীর্ত্তনে রত হইলেন। পদ্মের সুখ্যাতি জগতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অন্য ফুলের নাম কয় বার কয়টা লোকে করিয়া থাকে? কিন্তু পদ্মের উপমা লোকের মুখে মুখে। "মুখকমল", 'করকমল', 'হৃদয়কমল', 'চরণকমল' প্রভৃতি সকলই পদ্মের সহিত উপমিত।

শ্রীঅতুল নাথ ঠাকুর।

হেমন্ত।

কণ্ঠের ভূষণ তার নর-অস্থি মাল,
মৃত্যুর বরণ করি ভুলিয়াছে জ্বালা।
কুজ্ঝটিকার ভস্ম মাখি' শুভ্র কুশাসনে
হেমন্ত মোহন্ত রাজ বসি' শান্ত মনে।
শিরে শোভে তরুরাজী—জীর্ণ পত্র জটা,
পড়েছে রৌদ্র আভা—আপিঙ্গল ছটা;
নাহি হেথা বজ্ররব ত্রাসে বিভীষিকা,
নাহি এবে বিজলীর হিংসানল-শিখা;
থেমেছে ঝটিকা ঝড় মুছে গেছে গ্লানি,
বিরাজে বিরাগ-ভরা শান্তি শুভ-বাণী।
সন্ধ্যার গৈরিক রঙ্গে শোভে শুভ্র বেশ,
মুদিয়া কমল আঁখি ধ্যায় কমলেশ।
লইয়া মঙ্গল গুচ্ছ শালি ধান্য শীষ।
সবারে মোহন্তরাজ বরষে আশিষ।

শ্রীঅতুল নাথ ঠাকুর

নূতন খাতা

সূত্র ও রোগের সূত্রপাত --

ব্রাহ্মণদের সেই বামনে সূত্র নিয়ে এই ইংরাজ আমলে একটা ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে দেখা যাইতেছে। পুরাকালের ব্রাহ্মণরা যদি এ সময়ে এদেশে এসে জন্ম নিতেন ত তাঁহারা অবাক্ হইয়া যেতেন। তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবিতেন যে, আমরা সোনা রুপার হার ছেড়ে যৎসামান্য সূতো গলায় পরলুম এ কথা যে, কেহ বলতে পারবে না যে, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্যাগী এইটুকুর জন্যই সূত্র ধারণ করেছিলাম। কিন্তু আজ ইংরাজ আমলে কি জানি কোন শিক্ষার প্রভাবে সেই সূতোটুকুর জন্যও ইহারা ভাইয়ে-ভাইয়ে যেরূপ হিংসা ও কলহ করিয়া মরিতেছে।

কৈ ইংরাজ-আমলের পূর্ব্বে ত হিন্দুজাতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সূত্র লইয়া কোন ঝগড়ার কথা শোনা যায় না। তখন ত বৈদ্য কায়স্থরা মহামহা উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, কৈ ব্রাহ্মণেরা ত তাহাদের কোনও অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিয়া ছিলেন বলিয়া জাতীয় সাহিত্যে তাহার নিদর্শন নাই। বণিকরা তখন ত বাণিজ্যবিষয়ে পটুতা দেখাইয়া পূর্ব্বকালে বরঞ্চ বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বৈদ্যরা যে পুরাকাল হইতে গলায় সূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সে কালের ব্রাহ্মণেরা কোনই আপত্তি তুলেন নাই। অথচ আজ সেই সূত্র লইয়া ভাইয়ে-ভাইয়ে যেখারেষি হিংসারোগ দেখা যায় কেন? আসল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে একটা তীব্র অবজ্ঞার ভাব আমাদের অন্তরে রোপিত হইয়াছে, যাহার বিষময় ফল হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা বড়কে বড় বলিয়া মান্য করিতে শিক্ষা করি নাই।

একালে আমরা ঈশ্বরকে মানিতে শিখা করি না। গুরুজনদের মানি না, ব্রাহ্মণদের মানিতে চাহি না, রাজাকে অবজ্ঞা করি! এই তীব্র অবজ্ঞার ভাবই আমাদিগের জাতীয় শরীরে নানা রোগের সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছে।

রোগের ঔষধ

সামান্য সূত্র লইয়া আমাদের জাতীয় শরীরে যে তীব্র হিংসাবিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার প্রতীকারের জন্য ঔষধপ্রয়োগের ইহাই প্রকৃত সময়। আমাদের মনে হয় সমাজের সকল বিভাগই ইচ্ছা করিলে সূত্র ধারণ করিতে পারেন তাহাতে কোন বাধা নাই। তাহাতে দেশে অধিকাতররূপে সূত্র প্রচলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ঘরে ঘরে চরক চলিবে। যেমন উড়িষ্যাবাসী গণ্ডমেৎ কৃষিজীবীরা কণ্ঠে সূত্র ধারণ করে, বঙ্গে বৈশ্য জাতি বহুকাল হইতে সূত্রধারণ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের যোগী জাতি অল্পদিন হইতে কণ্ঠে সূত্র পরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাবান্ কায়স্থরাই বা বাকী থাকেন কেন? ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান যখন দেশে সকলের মধ্যে বাঁটিয়া হইয়া পড়িয়াছে, সমাজের বড় ছোট সকল ভাই যখন তাঁহাদের জ্ঞান ও কার্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত সূত্রেই বা সকলের অধিকার না থাকিবে কেন? এই সূত্র ধারণ লইয়া যখন ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য রূপ বিষাক্ত শোণিতে আমাদের জাতীয় শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে, তখন সেই সূত্রে সকলের অবারিত অধিকার দিয়া উহাকে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে তবে রোগ দূর হইবে। ঔষধ হইলেই অল্প বিস্তর একটু তিক্ত আস্বাদ হয়, এই ঔষধও কাহারও কাহারও নিকট তিক্ত লাগিতে পারে; তাহাতে কিছু আসে যায় না। যখন দেখি এই ব্যবস্থা জাতীয়শরীরের পক্ষে মহোপকারী। আমরা দিন ক্ষণ দেখিয়া এই সময়ই ঔষধ সেবনের প্রশস্ত সময় বলিয়া জানিয়াছি। ঝগড়া জিনিষটাই খরচের খাতে গিয়া পড়ুক আমাদের নূতন খাতায় ব্যয়বাহুল্য আর যেন না দেখিতে হয়।

অনুপান

সকলেই জানেন অনুপানের গুণে ঔষধ সমধিক গুণাক্রান্ত হয়। সমগ্র জাতীয় সমাজের পক্ষে সূত্রধারণরূপ যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল, তাহার অনুপান কি হইতে পারে? আমার মনে হয় সমাজের বিভিন্ন বিভাগের পক্ষে বিভিন্ন অনুপান হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে অনুপানের ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের যাহারা উপযুক্ত চিকিৎসক বা নেতৃস্থানীয়, তাঁহারা সেই সেই বিভাগের

উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিবেন। একটা উদাহরণ দিতেছি—বাণিজ্য শ্রেণীর অধিকাংশ ভাগের জন্য সূত্রের সঙ্গে সুবর্ণ বা রৌপ্য খণ্ড সংযোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন ইত্যাদি, যেমন ধনপ্রিয় শিষ্যের তাহাদের সঙ্গে ক্ষুদ্র লৌহ কৃপাণ রাখিয়া থাকেন। সমাজের বিভিন্ন বিভাগের লক্ষণ যাহাতে পরিস্ফুট হয়, সূত্রের সঙ্গে সেইরূপ কোন চিহ্ন রাখা দরকার। এইরূপে অনুপানের গুণে সূত্ররূপ ঔষধের ব্যবস্থা হইলে জাতীয় সমগ্রবীর্য্য হইতে হিংসা-বিষ বিদূরিত হওয়ায় উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সবল হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সূত্র ও ঘড়ীর পেণ্ডুলম।

সমগ্র জগতে ভগবানের এক নিয়ম কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাই। ঘড়ীর পেণ্ডুলম এদিকে যতখানি যায়, ও দিকেও যদি ততখানি যায়, তবে ঘড়ীর কাঁটা ঠিক চলে। তেমনি কালের ঘড়ীতেও দেখ যত ঘণ্টা দিন, তত ঘণ্টা রাত্রি, যত দিন শুক্লপক্ষ, তত দিন কৃষ্ণপক্ষ, যত কাল উত্তরায়ণ তত কাল দক্ষিণায়ন। বিশ্বে প্রত্যেক ব্যাপারে এইরূপ দোলন চলিতেছে দেখিতে পাই। সূত্র বিষয়েও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইংরাজরাজত্বের শুক্ল পক্ষ বা উত্তরায়ণ কালে যেমন ব্রাহ্মসমাজে উপবীতের দেশী সূত্র ছিন্ন করিবার ধুম পড়িয়াছিল, আজ ইংরাজরাজত্বের দক্ষিণায়ন বা কৃষ্ণপক্ষ, বিদেশী সূত্র ফেলাফেলি দিবার ধুম পড়িয়াছে। সে কালে স্বদেশী বর্জ্জন চলিয়াছিল আর এ সময়ে বিদেশীবর্জ্জনের কাল পড়িয়াছে।

নন্-কো-অপরেশন বা অসহযোগ

মহাত্মা গান্ধির আদিষ্ট অসহযোগ বা নন্-কো-অপরেশন কিন্তু নূতন নহে, ইহা ভারতের চিরন্তন বস্তু। ভারতের মুনিঋষিরা সংসারের সঙ্গে অসহযোগ অবলম্বন করিয়া সদা সর্ব্বদা বনে গিয়া বাস করিতেন। সেখানে খাবার অভাব হইলে ফল মূল খাইতেন, বস্ত্রের অভাব হইলে বৃক্ষবল্কল পরিধান করিতেন। আবার রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে রাজার শরণাপন্ন হইতেন। বর্ত্তমান যুগের অসহযোগও অনেকটা—সেই ধরণের। আমরা বিলাতী বস্ত্র ছাড়িয়া খদ্দর পরিতেছি, বিলাতী বিলাস সামগ্রী ত্যাগ করিতেছি,

রাজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহিতেছি না, অথচ বিপদে পড়িলে রাজার শরণাপন্ন না হইয়া যাইতে পারি না। আসল কথা অসহযোগ আসে বৈরাগ্য হইতে। ঋষিরা সংসারে বীতরাগ হইয়া তবে অসহযোগ অবলম্বনে একাকী বা সজ্ঞানে বনবাস করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাই তাঁহাদের মুখোচ্চারিত বৈরাগ্য-মূলক শাস্ত্রবাক্য আজ হিন্দুহৃদয়ে অসহযোগকে সর্ব্বদাই জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে।

"এক এব প্রজায়তে জন্তুঃ এক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতম্॥"

এই শাস্ত্রবাক্যে অসহযোগ ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

মহাত্মা গান্ধি সেই ঋষিদের বৈরাগ্যমূলক অসহযোগকে—রাজনৈতিক ব্যাপারে আনয়ন করিয়া ভারতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। এই রাজনৈতিক অসহযোগেরও উৎপত্তি বৈরাগ্য হইতে। সংসারের নিয়ম এই যে, যাহা বেশী পরিমাণে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহাতেই বৈরাগ্যের ছায়া আসিয়া পড়ে। ইংরাজের প্রথম আগমনে যে নূতন হাওয়া আমাদের দেশে বহিয়াছিল, তখন সে হাওয়ায় দেশ শুদ্ধ লোক আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, পরে যখন সে আনন্দ ক্রমাগত উপভোগ করিয়া বৈরাগ্যের চড়া পড়িয়া আসিল, তখন সে আনন্দস্রোত অন্য পথে ধাবিত হইতে চাহিল। স্বদেশী আন্দোলন তাহার গতি পরিবর্ত্তনের সূচনা। যে বিদেশী ভাবে যে বিদেশী বিষয়ে লোকের আনন্দ পূর্ব্বে উথলিয়া উঠিত, এখন উহাতে আর কেহ সে আনন্দ অনুভব করে না। সেখানে বৈরাগ্যের চড়া আসিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। এই বৈরাগ্য হইতেই বর্ত্তমান অসহযোগের সূত্রপাত। উহা সেই অবধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া যেন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।

তবে কি অসহযোগের স্রোত পূর্ব্বের আনন্দপথে আনিবার কোন উপায় নাই? আছে বৈ কি? কিন্তু সে উপায় রাজার হাতে। এক কাদা-কাটি কল দ্বারা রাজা যদি সেই বৈরাগ্যের চড়া কাটিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দস্রোতের গতি ফিরাইতে পারেন, তাহা হইলেই অসহযোগের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সে কাদা-কাটা কল কি? প্রজারঞ্জনের জন্য রাজার স্বার্থত্যাগই সেই কল। প্রজারঞ্জনের জন্য রাজপক্ষীয়দের সমস্ত অহঙ্কারমলিনতা দূর করিতে হইবে, এ সকলই কাদা বৈ আর কি? ইম্পিরিয়ালিস্‌মএর চূড়ায় উঠিয়া বসিয়া

কিসে প্রজারঞ্জন ব্যাপার সহজসাধ্য হইবে না। আইন-কানুনের অন্তে পাকুকনা যাহা রৌদ্রের তাপে তপ্ত হইয়া, চোখ ঠিকরাইয়া দিতেছে, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এত আইন্ জাল কেন? তাহাত বুঝিতে পারি না। প্রজারা যদি সত্যপ্রিয় ও রাজভক্ত হয়, তাহা হইলে আইন-জাল রূপ এই চোরা বালির প্রয়োজন কি? প্রজারা যদি রাজভক্ত না হয়, তাহা হইলে রাজার গৌরব কোথায়?

আমাদের দেশে এক্ষণে যুবরাজ আগমনের উদ্যোগপর্ব্ব চলিয়াছে। আমরা গত বৈশাখ মাসে নূতন বর্ষ আরম্ভে লিখিয়াছি যে, এক শুভ মহূর্ত্ত আসিবার সময় আসিতেছে। আশা করি, আমাদের যুবরাজই সেই শুভ-মহূর্ত্ত উৎসব সমারোহে সম্পন্ন করিয়া লইবেন। আমাদের অসহযোগ ভুলিবার সময় আসিতেছে। সে দিন ঘরে ঘরে সহকারপত্র* দোলায়মান হইবে। সে দিন দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট বসিবে। সে মহূর্ত্তের দিনে প্রকৃতই দেশের জাতীয় নূতন খাতা খোলা হইবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ ঠাকুর।

* সহকারপত্র এ স্থলে দ্ব্যর্থ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থ আম্রপল্লব, দ্বিতীয় অর্থ সহযোগ বা সহযোগ বিষয়ক পত্র।

বৈঠকী।

বিধাতা যা করেন তাহাই ঘটে। ভাবিয়াছিলাম এবার কার্ত্তিকের সংখ্যাটা কার্ত্তিকের শেষেই বাহির করিয়া দিব। কিন্তু তাহা পারিলাম না, নিজের দেহগত রোগের জন্য পরিলাম না; লেখকগণের ঔদাসীন্যেও কতকটা পারিলাম না।

* * * * *

একটা কথা কিন্তু বলিয়া রাখিব। মাসিক পত্র খবরের কাগজ নহে; উহা মনীষার মঞ্জুষা। মাথা কুটিয়া, যা তা করিয়া যে উহাকে মাসের ১লা তারিখে বাহির করিতেই হইবে, এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়মাধীন আমরা থাকিতে পারি না। তিনটা তে-রঙা বা পাঁচরঙা ছবি দিতেই হইবে, তিনটা বা দুইটা রিরংসার পোষক ছোট গল্প প্রকাশ করিতেই হইবে, আর রবীন্দ্রনাথের "হংকমলে" চারিটা ছোট কবিতা—কেবল অনুপ্রাস বিন্যাসে আদিরসের ঝাড়ু কুড়ু ঘটান যায়, এমন কবিতা দিতেই হইবে—এমন দাসখৎ লিখিয়া মাসিকপত্র চালাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহাকে আমরা মনীষার স্বৈরাচার বলিয়া থাকি।

* * * * *

যাউক কার্ত্তিকের কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব ঘটায় আমরা গ্রাহকবর্গের নিকট কতকটা অপরাধী নিশ্চয়ই, তবে সে অপরাধ একেবারেই হেলাফেলার নহে;—এতএব ক্ষমার্হ। বিজয়ার পরে এই প্রথম সন্দর্শন, বিজয়ার অভিবাদন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি না করিয়া গোড়ায় ত্রুটি স্বীকার করিলাম, ক্ষমা চাহিলাম। কারণ ইহা মনে জানে বেশ জানি যে হিন্দু ও বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা সকলে এমন সাক্ষাৎকারের কালে আমাদিগকে ক্ষমা করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।

* * * * *

বিজয়া—আর সে বিজয়াসম্মিলন হইবার নহে। তেমন করিয়া বিজয়া করিবে কে? কাহার উৎসাহে ও প্রেরণায় তেমন বিজয়া মিলন হবে

সুরেশের কি আছে? থাকিলে কি আমার এই দুঃখের বোঝা বহিতে হইত? ভাব ও ভাবে ত ফরমাইস মত বাহির হয় না, উহার উদ্রেক চাহি, সঙ্গম প্রয়োজন। সে কাজ করিবে কে? সুরেশ যে নাই! কাহার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কাহাকে সর্ব্বাগ্রে আলিঙ্গন করিব? তাহার দাদাকে কোন পদ্ধতিতে ঘাটাইয়া মাতাইয়া ভাব আদায় করিতে হয়, তাহা যে সুরেশই ভাল জানিত তা নাই, আমাদের বিজয়ানন্দবিহারও এবার হইল না।

* * * * *

এমনই দিনকাল পড়িয়াছে যে, রাজনীতির চাটনী ছাড়া অন্য সাহিত্য বাজারে বিকায় না। রাজনীতি বা পলিটিক্স বলিলে যাহা বুঝায় এখন সে অর্থে আমাদের শিক্ষিত সমাজে ঐ দুইটী শব্দের প্রয়োগ হয় না। রাজনীতি বা পলিটিক্স যেন ব্রিটিশবিদ্বেষের নামান্তর হইয়াছে। এই হেতু আমরা পদে পদে ঠক্কিতেছিও!

* * * *

আমার বা আমাদের জাতিগত কল্যাণ সাধনে আমরা তৎপর থাকিবই। এই সঙ্কল্প স্থির থাকিলে অন্যে কিছু বলিতে কহিতে পারে না। আমার কল্যাণ সাধন করিতে যাইয়া যদি পরোক্ষে অন্যের অকল্যাণ হয়ত হউক,—কল্যাণ হয়ত আরও ভাল; পরন্তু আমি বা আমরা তনু মন ধন এক করিয়া আমার বা আমাদের কল্যাণ সাধনে রতী থাকিবই। আমরা এইটুকু বুঝি এবং উহাকেই আমাদের পলিটিক্সের বেদী বলিয়া জ্ঞান করি।

* * * *

এই কল্যাণ সাধন জন্য আমার জাতির এবং সমাজের চারিদিকে গণ্ডী কাটিয়া দিতে আমরা প্রস্তুত। বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে হইলে সে গণ্ডীর প্রয়োজন। এই গণ্ডী-অঙ্কনকে নন-কো-অপরেশন বল—বলিতে পার। কেহ ঐ গণ্ডীকে বিদ্বেষবিষ্ফুলিঙ্গের ক্ষেত্র বানাইয়া তোল কেন! স্বীকার করি সমবের আধিক্যে নীচের সামগ্রীকে বড় সুন্দর দেখে; পরন্তু সেই হেতু পরের মুখ ত দেখিতে নাই। আমার ভাল, সুতরাং তোমার মরটাই মন্দ,—আমরা এমন মনোভাবের উদ্রেক করিতে প্রস্তুত নহি।

* * * * *

এই যে পলিটিক্স চর্চ্চার গোড়া হইতে কেবল শুনিয়া আসিতেছি,—ভারতের ভাগ্য, বড় দুর্দ্দিন,—আমরা ভারতবাসী অধঃপাতে গিয়াছি—যাইতেছি—

বাইবেল। ইত্যাকার আবহাওয়ার মধ্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের বুক দিয়া অহরহ কেন বাহির হইয়া থাকে, তাহার নিদান বলিতে পারি। উহা জাতি-বৈরের ফল, আর ইংরেজ বা ইয়োরোপের সহিত পাল্লা দিয়া আমরা চলিতে পারিতেছি না বলিয়া ক্ষোভের পরিচায়কও বটে। কাজেই বলিতে হয়, ইয়োরোপ ও মার্কিণের সভ্যতার ও সমৃদ্ধির সহিত গান্ধীজীর নামান্তরই হইল আমাদের ইংরেজি আমলের পলিটিক্স চর্চ্চা। উহার বনীয়াদে আছে জাতিবৈর, উহার ব্যঞ্জনা ঘটে ব্রিটিশবিদ্বেষে ও ঈর্ষ্যায়।

* * *

এমন পলিটিক্স আমাদের দেশে ও সমাজে পূর্ব্বে ছিল না। আমাদের লাঠিবাজীর পলিটিক্স ছিল। দ্বিতুনীর পর্য্যন্ত সে লাঠিবাজী চলিয়াছিল। এখন-কার যে পলিটিক্স, তাহার চর্চ্চা যত বাড়িবে, ততই সমাজের বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবল হইবে, কর্ম্মশক্তির হ্রাস হইবে এবং সামান্য কর্ম্মব্যাপারে কর্ম্মীর দল অহঙ্কারে ও মাৎসর্য্যে-মাটিতে পা-দিবেন না; অথচ রামদাস স্বামীর কাল হইতে রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্য্যন্ত আমরা ভারতবাসী যে রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, তাহার মূলমন্ত্র ছিল—মানুষ গড়া। নূতন ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া, সমাজকে ওলট-পালট করিয়া নবশক্তির উন্মেষ সাধন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে মানুষ গড়িয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ এপন্থে গান্ধীপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করেন এবং শিখ সম্প্রদায় গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন ঠিক পন্থা ধরিয়াছিলেন, কেবল পরবর্ত্তী বাঙ্গালীপ্রধানগণের ত্রুটিতে সে পন্থা ব্যর্থ হইয়াছিল।

* * *

রাজা রামমোহন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে মূল করিয়া যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার ও সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা পরে ৺ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুসরণ করেন নাই। তিনি উপনিষদের বেদীর উপরে, নানকপন্থার আদর্শে ব্রাহ্ম সমাজকে গড়িয়া তোলেন। পরে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলভুক্ত ইংরাজি নবীশ ব্রাহ্মরা সকলে দেবেন্দ্রনাথের দল ছাড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের গঠন করেন। উহা প্রথমে খৃষ্টান আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইয়োরোপের অনুচিকীর্ষার ফলে উহা বিলুপ্ত হয়। পরে কেশবচন্দ্র বীশু প্রমাদ বুঝিয়া শিখসম্প্রদায়ের আদর্শে নব-বিধানের উদ্ভব ঘটান। পরন্তু ভক্ত ইয়োরোপের প্রথম অনুচিকীর্ষায় বঙ্গের বাঙ্গালা ইলমল করিতেছিল। সে মাদকতার কালে নব-বিধান টিকিল

না বিশেষতঃ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের দলভুক্ত মনীষী ও মনস্বী লেখকগণ অন্ত কমটির নরপূজার পালিশ দিয়া হিন্দুয়ানী বুঝাইতে ছিলেন। নবীনচন্দ্র কাব্য-গাথায় তাহা বেশ ফুটাইয়া গিয়াছেন। এক দিকে ব্রাহ্ম সমাজের Iconoclasm এবং Eclecticism অন্য দিকে নব্য হিন্দুর Humanitarianism এবং ফরাসী সাম্যবাদ; এই দুই সঙ্ঘাতে মানুষ গড়ার কাজ বন্ধ রহিল; পরন্তু এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি বাঙ্গালায় হইয়াছে। এইবার মানুষের গড়ন আরম্ভ হইবে কি?

* * * *

কাজেই বলিতে হয়, আমাদের বাঙ্গালার সাহিত্যের স্তরে স্তরে রাজনীতি মাখান জড়ান আছে। ৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী কাব্য হইতে নবীন চন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, অমিতাভ পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের গদ্যে-পদ্যে এক ধারা বহিয়াছে; পরে রবীন্দ্রনাথের যুগে সে জাহ্নবী ধারা ফীতোদরা হইয়া পঞ্চার তরঙ্গভঙ্গ বিকাশ করিতেছে, কদাচিৎ বা-মেঘনার গাম্ভীর্য্য ও অপ্রমেয়তার পরিচয় দিতেছে। ধারার গতিপ্রকৃতি একই আছে বটে, কেবল বিকাশভঙ্গী স্বতন্ত্র ও অধিকতর পরিস্ফুট! অতএব বাঙ্গালার সাহিত্য চর্চ্চা করিতে হইলে রাজনীতি চর্চ্চা অনিবার্য্য। ভূদেব, বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ হইতে দ্বিজেন্দ্র লাল, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে সমসময়ের রাজনীতির বিশ্লেষণ করিতেই হইবে। সে রাজনীতির পুটের মধ্যে সমাজ নীতি আছে বটে; পরন্তু প্রকৃত ধর্ম্মনীতি ও সাধন-নীতি নাই। তাই বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্য analytic এবং Didactic পরন্তু constructive ও synthetic নহে। সাহিত্যের এই দোষ যতদিন সামলাইতে পারা না যাইবে, ততদিন মানুষের গড়ন হইতে পারে না।

* * * *

মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ এক হিসাবে অনেকটা constructive বা গড়নে উপযোগী; তবে সে অসহযোগ Non-co-operation নহে, তাহা পেহ্লাদের বা ভড় ভরতের সংযম-সাধনের আধুনিক অবস্থানুকূল অসহযোগের আকারান্তর হইবেই। আর একটা দোষের কথা এই, মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ বাঙ্গালা সাহিত্যের মূলমন্ত্রের বিরোধী। যদি মহাত্মা পুরাতন গোড়ামী ও আচার ধর্ম্ম চালাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কি ফল হইত বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই কয়টা কথা কহিয়া রাখিলাম, একবার ভাবিয়া দেখিবে কি?

সাহিত্য ৩১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

স্মৃতি-পূজা।

(সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)

কবিবর নবীনচন্দ্র মহাভারতী-লিখিত 'সাসারামের রোজা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে প্রবন্ধে তিনি 'শেরশাহ' শের আফগানকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন—তাই 'শেরশাহ ও শের আফগান কি অভিন্ন?' এই নাম দিয়া আমি উক্ত প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ লিখিয়া সাহিত্যসম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া-ছিলাম। এক দুই করিয়া প্রায় ৬ মাস চলিয়া গেল, আমার ঐ প্রতিবাদ বাহিরও হইল না বা ফেরৎও আসিল না। আমার অভিভাবকস্থানীয় কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—'সমাজপতি তাঁহার দলের লোক ভিন্ন অন্য নামজাদা লেখকের লেখা পর্য্যন্ত ছাপাইতে চাহেন না, তা আবার নূতন লেখক তুমি, তোমার লেখা!'

কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিয়া পরে সম্পাদক সুরেশ বাবুর নিকট চিঠি লিখিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন—'আপনার প্রতিবাদ ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু ১৩০৮ সালের প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ৫ বৎসর পরে ১৩১৩ সালে প্রকাশ করার কোন সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি না, বলিয়া ফেরৎ দিলাম—ক্ষমা করিবেন।'

সুরেশ বাবুর এই উত্তর পাইয়া আমি যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ না হইয়াছিলাম, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব একটুও কমে নাই; বরং সেই বারই আমি 'সাহিত্যে'র গ্রাহক হইলাম আর সেই 'সাহিত্যের' মাসিক সমালোচনা পড়িয়াই তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার একটা আন্তরিক আগ্রহ হইতে লাগিল। সে সুযোগ ঘটিল ৪।৫ বৎসর পরে ১৩১৮ সালের শেষ ভাগে চুঁচুড়ার ৫ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনক্ষেত্রে।

[illegible] মিলনে পাঠ করিবার জন্য [illegible] করিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রধান নবীন সংঘের [illegible] ছিল। [illegible] কবি [illegible] কুমার [illegible] 'মানব বন্দনা' নামক [illegible] সুরেশ বাবু নিজে [illegible] করিবার জন্য [illegible] আসিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্য [illegible] যোগদান [illegible] সভা। কবিতা আক্রান্ত করিয়া সর্ব্ব প্রথম [illegible] নবীন কবি [illegible] [illegible] কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করায় বহু সাহিত্যিক [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] আসিয়া একেবারে প্রতিনিধিদিগের [illegible] বসিয়া [illegible] —সুরেশ বাবু ইহাঁদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি এই [illegible] ব্যবহারে এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি [illegible] চাঁচাইয়া [illegible] বলিয়া উঠিলেন—"নামজাদা কবিদিগের কবিতা বহির পড়িয়া আর [illegible] পাঠের বাকি হইবে কিনা এক না [illegible] কবিতা?" সভিকেও যেন [illegible] [illegible] হইয়া উঠিল। তখন সম্মিলনের সভাপতি [illegible] [illegible], "সমাজ [illegible] [illegible] এদিকে আসুন! এদিকে আসুন!" বলিয়া বিশেষ [illegible] [illegible] সুরেশচন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] —শেষে বড়বাবুর উপরোধ অনুরোধে তিনি সভাপতির [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন, তাহার পর তিনি কবিতা [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার পুষ্ট বদন হইতে বড়াক্ষরে কবিতা 'মানব বন্দনা'র [illegible] [illegible] সেই আদিযুগে যবে অহঃ [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] সেই মুহূর্ত্তেই যেন সমস্ত সভাস্থলের উপর দিয়া [illegible] প্রবাহিত হইয়া সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ করিয়া দিল। আমি সে ভাবে মত্ত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] —শ্যামার নয়নে [illegible] [illegible] [illegible]

হঠাৎ তাহার কার্য্য বন্ধ হওয়ায় সকলেই কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। জল্পনা চলিতে লাগিল—নানা লোকে নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। আমি এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সহিত ছিলাম। সেখান হইতে সুরেশ বাবুর নিকট যাইয়া অতি সন্তর্পণে বলিলাম—'এখন আর 'সাহিত্যে' পূর্ব্বের ন্যায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনা দেখি না কেন?' বিরাট পুরুষ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'দেখ্‌বেন কি ক'রে? লিখি না বলিয়াই দেখেন না!' 'লেখেন না কেন?'—'লিখে কি হ'বে? যাদের উদ্দেশ ক'রে লেখা হয়, তা'রা কি এ সমালোচনা গ্রাহ্য করেন?'—'তা করেন ব'লে কি!' 'না মশায়, অমন ভাব রাখা কথা বল্‌বেন না।' আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—'তাই ব'লে কি আপনার কর্ত্তব্য আপনি করবেন না?'—'কর্ত্তব্যটা কি আমার একার, আপনারা আর কেহ কেহ ত একার্য্যে অগ্রসর হ'তে পারেন।'—'আমাদের লেখায় কি কোন কাজ হয়?'—'কেন হবে না বলুন ত? যদি সরল ভাবে খাঁটি কথা লিখ্‌তে পারেন, তবে কেন কাজ হ'বে না, অবশ্যই হবে—আমি বলি আপনারাও জন কয়েক আমার সঙ্গে লেগে যান—আমিও দোসর পাব, আপনাদেরও শক্তি বাড়্‌বে।' একটু পরে আমি বলিলাম—'দেখুন, লোকে আপনার একটা বদনাম দেয় যে, আপনি নিজের দলের লোকের লেখা ভিন্ন অন্য কোন লোকের লেখা 'সাহিত্যে' প্রকাশ করেন না—নামজাদা লেখক হ'লেও নহে। একথা কি সত্য?'—'যা এ বলায় আমি অস্বীকার করি না। আমার দলের লোকের ভিতর-বাহির আমি সব জানি, তাঁরা যা লেখেন, তা'ও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারি—লেখার দোষ ত্রুটী থাকলে তা'ও নিজ ইচ্ছামত একটু আধটু পরিবর্ত্তন করে নিতে পারি—তাদের উপর সে আব্দার আমার চলে—কিন্তু অন্য লেখকের দোষ ত্রুটী-গুলিতে হাত দিতে গেলেই তাঁরা অপমান বোধ করেন, বলেন 'না মহাশয়, আমার লেখা একটুও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করবেন না।' অথচ কিছু দোষ লেখা যেমন পাওয়া যায়, তেমন ভাবে ছাপানও চলে না, কাজেই গত্যন্তর বিহীন হ'য়ে অপরিচিত লেখকের লেখা লইব না, এইরূপই নিয়ম করে রেখেছি, তবে মধ্যে মধ্যে দু'একটী 'উদীয়মান নূতন লেখকের লেখা লইতেও যে ত্রুটি হই, তা নহে।'

ইহার একটু পরেই সভাপতি সেই গৃহস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'আপ একবার বিপদ্‌বারণ নারায়ণকে স্মরণ করুন,

দেখি ঝড়-বৃষ্টি কোথায় থাকে।" সুরেশচন্দ্রের কথায় কি ছিল জানি না, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার কথায় সকলেই উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণ! নারায়ণ! ধ্বনিয়া উঠিলেন। নারায়ণের বিচিত্র লীলা, তাঁহার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কি যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া রৌদ্র উঠিল। সুরেশচন্দ্র সাফল্যজনিত গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—'আপনারা দেখুন ব্রাহ্মণের বাক্য খাটিল কি না—দেখুন কলিতে এখনও ব্রাহ্মণদেব জাগ্রত আছেন কি না।

প্রথম দিন সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পরই সুরেশ বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় দিন আর আইসেন নাই—এই হইল তাঁহার সহিত প্রথম দেখা।

তাঁহার সহিত শেষ দেখা হইয়াছিল, গত বৎসর বর্ষাকালে দৌলতপুরে, সেখানে তিনি ব্যারিষ্টার শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া দাড়াইলে, তাঁহার জন্য ভোট সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছিলেন। সুরেশ বাবু আসিয়া বক্তৃতা করিবেন এই সংবাদ পাইয়াই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৌলতপুর উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা যখন সেখানে যাইয়া পৌছিলাম, তখন শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা চলিতেছিল। তাহার পরেই সুরেশবাবু উঠিলেন। দশ বৎসর পরে আবার সুরেশ বাবুকে দেখিলাম! শ্রীযুত ব্রজলাল শাস্ত্রী দৌলতপুরে কলেজ স্থাপন করিয়াই দেশ বিদেশে ইহা সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাই বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই সুরেশচন্দ্র দৌলতপুরকে 'ব্রজপুর' বলিয়া অভিহিত করিলেন, আর বলিলেন,—আজ আমরা 'ব্রজপুরে' অতিথি, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বয়ং 'ব্রজলাল'ই আজ অনুপস্থিত। যদিও ব্রজলালের উপযুক্ত সহকর্ম্মিগণ আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু তবুও ব্রজপুর আজ অন্ধকার।'

তার পর তিনি বক্তৃতামুখে—

'কীটাকুলিতবার্ত্তাকুরেকাথু বৃষণোপমঃ।
পঞ্চাননাদিনিক্রান্তো ন নিক্রান্তো হুতাশনাৎ॥'

এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধীয় রসাল-গল্পটী বলিলেন—তাঁহার সরস বাক্যভঙ্গীতে বৃহৎ মণ্ডপ মুহুর্মুহুঃ হাস্যরোলে কম্পিত হইতে লাগিল—তাহার পর তিনি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, কি ভাব, কি ভাষা, সে বাক্তৃতার! কি অদ্ভুত তাঁহার বাক্যবিন্যাসকৌশল। প্রকাণ্ড

সভা তাঁহার বাগ্‌বিভব দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিল—আর সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, বক্তা বটে! হাঁ, বক্তা বটে! বক্তৃতা শেষ হইল—সুরেশচন্দ্র আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনও সভাস্থান, প্রকাণ্ড টিন গৃহ যেন গম গম করিতে লাগিল। সভার কার্য্য শেষ হইলে আমি সুরেশচন্দ্রের চরণধূলি লইবার আশায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম; কিন্তু লোকের ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারি নাই। দৌলতপুর হইতে যাইয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন—কয়েক মাস পীড়িত থাকিয়া গত অগ্রহায়ণ মাসে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।—তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ সমালোচকের আসন আজ শূন্য।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।
সম্পাদক, পীতাম্বর লাইব্রেরী, সেনহাটি, খুলনা।

নিঃসম্বল।

অন্তরে বাহিরে মোর কিছু প্রিয়ে নাহি আর,
'আপনার' বলে আজি করিবারে অহঙ্কার!
একাকী আঁধার ঘরে আপনা লইয়া শুধু
একদা ছিলাম পড়ি' মরুভূমি যেন ধূ ধূ!
তুমি কবে দেখা দিলে উষার হাসির মত,
নীরব নিরুম পুরে বাঁশরী বাজিল শত!
ফুটিল কুসুমকলি, গাইল বিহগদল,
বহিল মধুরে বায়, নাচিল তটিনীজল!
সুকোমল ভুজ-ডোরে বাঁধি' মোরে সুনিবিড়
পলকে মুছায়ে দিলে আকুল নয়ন-নীর!
বুকভরা ভালবাসা আমারে করিলে দান,
নবীন চেতনা লভি' জাগিল এ মৃত-প্রাণ!
আনন্দে দেখিনু চেয়ে আমি যে সর্ব্বস্বহারা,—
তুমি শুধু বিশ্বে মোর উদ্ভাসিছ ধ্রুবতারা!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

"হেমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য সাহিত্য"।

যখন ইংরেজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইসলাম ধর্ম্মের একটা আপোষ হইয়া গিয়াছিল; তখন হিন্দুর রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সহিত মুসলমান রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সহিত একটা সমন্বয় হইয়াছিল, এবং হিন্দুর জাতীয় সাহিত্যের কলেবর মুসলমান ভাবপ্রবাহের সংমিশ্রণে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। ইংরাজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিনব পাশ্চাত্যভাব প্রবাহ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল। এই প্রবাহের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক নবজীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভাগীরথী যেমন গিরিমূল হইতে প্রচণ্ডবেগে নির্গত হইয়া, দুইকূল বিধ্বস্ত ও প্লাবিত করিয়া মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনই এই পাশ্চাত্য ভাবস্রোত বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-জীবন ও সমাজ দেহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া জাতীয় ভাবের সঙ্গে মিলিত হইল। জাতীয় ভাবের সঙ্গে মিলিত হইলে ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী বৈদেশিক আদর্শে নিজধর্ম্ম, সাহিত্য, আচার, পদ্ধতি সংস্কার করিতে লাগিলেন। সকল জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীই অধিকতর অনুকরণপ্রিয়; সুতরাং তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও সভ্যতার আস্বাদ পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই সাহিত্য ও সভ্যতায় যাহা কিছু নূতন ও চিত্তাকর্ষক বোধ হইল, তাহাই বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ পাশ্চত্য সাহিত্যের আদর্শে জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন করিতে লাগিলেন এবং বিজাতীয় বৈভবে মাতৃ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। যেই যেই বিষয়ের জন্য বাঙ্গালা-সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় দরিদ্র ও অপূর্ণাঙ্গ ছিল, সেই সেই বিষয়ের যথেষ্ট অনুশীলন ও অনুকরণ হইতে লাগিল। তাই আমরা দেখিতে পাই,—অক্ষয় কুমার দত্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদার্শনিক মতসম্মত গবেষণাপূর্ণ তত্ত্ব সকল লিপি-বদ্ধ করিয়া বাঙ্গালার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। মাইকেল এক ঘেয়ে পয়ার ছন্দের উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং এই একঘেয়েত্ব দূর করিবার জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। তিনি দেখিলেন, সে সুবৃহৎ মহাকাব্য নিকষ

বহু শব্দময় ছন্দে রচনা করিবে। মনের আবেগ উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয় না, তাই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। মিল্টন দেখিয়াছিলেন যে, মহান্ ও গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় নৃত্যময় ও ক্ষীণ মিতাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ উপযুক্ত হয় না, সেই জন্যই তিনি Paradise lost মহাকাব্য প্রণয়নে চির প্রচলিত মিতাক্ষর ছন্দ বর্জ্জন করিয়া অমিতাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত করিলেন। আমাদের কবি মাইকেলও তাঁহার প্রদর্শিত মার্গে অনুগমন করিয়া, অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদ বধ রচনা করিলেন। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে উপন্যাসগ্রন্থের অভাব দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। সুতরাং তিনি পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শে বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি করিলেন। এই প্রকারে বাঙ্গলা সাহিত্য গগনে পাশ্চাত্য প্রভাবসূর্য্য আধিপত্য স্থাপন করিল এবং সেই কিরণজালে সমস্ত গগন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

যখন হেমচন্দ্র বাঙ্গলায় অবতীর্ণ হইলেন, তখন পাশ্চাত্য প্রভাবের যথেষ্ট অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সাহিত্যিকগণের নয়ন হইতে বৈদেশিক মোহ আবরণ আস্তে আস্তে অপসৃত হইতে ছিল। তাঁহারা জাতীয় রচনাপদ্ধতি ও আদর্শকে একেবারে বিসর্জ্জন না দিয়া বৈদেশিক রচনা-পদ্ধতি ও আদর্শের সঙ্গে সমন্বয় করিতে যত্নবান্ হইলেন। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, যে মহাপুরুষ যে কালে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি যতই কেন শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন হউন না, কালের ভাবসমূহ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিবেই করিবে। আমাদের হেমচন্দ্রেরও তাহাই হইল। তিনি দেশীয় ভাব ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলেন ও পাশ্চাত্যভাবসমূহ অলক্ষিত-ভাবে তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া যাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। তিনি সেই ভাবসমূহকে সুমধুর ছন্দোবিন্যাসে ব্যক্ত করিতে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি পরস্বকে নিজস্ব করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে ব্রতী হইলেন। যদিও তাঁহার মধ্যে পরস্ব আছে, তথাপি তিনি এমন সুচতুর ও সুনিপুণভাবে সেই পরস্বকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা তাঁহার কাব্য পড়িয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাই। হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তিনী বাঙ্গলা কবিতার ভাষা, ছন্দোবৈচিত্র্য ও রচনানৈপুণ্য অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি অনুশীলনে প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এপক্ষে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কম সিদ্ধহস্ত নহেন। ভারতচন্দ্রে যেমন পারসী প্রভাব বিলক্ষণ আছে, তথাপি তাঁহার রচনা-চাতুর্য্যে কেহ তাহা সহসা ধরিতে পারে না, সেইরূপ হেমচন্দ্রে

পাশ্চাত্যপ্রভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার কাব্যকে খাঁটি বাঙ্গালা বলিয়াই মনে করি। পাছে পরভাবে তাঁহার নিজস্ব নষ্ট হয়, এই আশঙ্কা হেমচন্দ্রের মনে বহুকাল ছিল। তাই তিনি নিজেই লিখিয়াছেন :—

"শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনা ভেদ হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করি নাই,—সুতরাং এই পুস্তকে (বৃত্রসংহারের) অনেক স্থলে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষা-অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।"

যদিও তাঁহার গ্রন্থে ইংরাজিলেখকদিগের ভাব নিহিত রহিয়াছে, তথাপি তিনি সেই সকল ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া জাতীয় ভাবে পরিণত করিতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার "বৃত্রসংহার" পাঠ করিলে মনে হয় যেন প্যারেডাইজ লষ্টের প্রতিধ্বনি হইতেছে। প্যারেডাইজ লষ্টে সয়তানপ্রমুখ অপদেবতাগণ স্বর্গরাজ্য হইতে পরাজিত ও তাড়িত হইয়া এবং নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া গভীর যাতনাভরে মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়াছেন। এই যাতনার কথঞ্চিৎ উপশম হইলে কিরূপভাবে সেই নষ্ট রাজ্য পুনরায় অধিকার করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমরা হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহারে" ইহার অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। দেবতাগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া পাতালপুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন, সেই মন্ত্রণা করিতে তাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র ইংরাজিশিক্ষার মহিমায় স্বদেশানুরাগে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশ নব সভ্যতা ও শিক্ষার যুগে কি গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে ও মনুষ্যসমাজের কি নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছে? একদিকে ইউরোপের স্বাধীন জাতিরা বিজয়পতাকা উড়াইয়া মহোল্লাসে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, অপর দিকে পরপদানত বাঙ্গালী দাসত্বশৃঙ্খল চরণে বাঁধিয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি দেখিলেন, শুধু নিজকে উন্নত করিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না, সমস্ত বাঙ্গালাদেশকে ও সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। তাই তিনি বজ্রনির্ঘোষস্বরে নিদ্রাগত দেশবাসীদিগকে প্রবুদ্ধ করিলেন। দেশবাসিগণও তাঁহার আহ্বানে জাগরিত হইয়া নিজেদের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিল। হেমচন্দ্রের কাব্য এই স্বদেশ-

প্রেমিকতার ও স্বদেশানুরাগে ভারতপুর রহিয়াছে। এ পক্ষে কোন আর্যবাক্য ইহার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। এই স্বদেশানুরাগ বাঙ্গালী প্রথমেই ইংরাজের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও ইংরাজ ফরাসীবিপ্লবের অবতার নেপোলিয়ানকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি ইংলণ্ডের সাহিত্য ও সমাজ সেই বিপ্লবের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই বিপ্লবের প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান আছে। সেই প্রভাবের ফলেই Romantic Schoolএর উদ্ভব হইয়াছিল। ইংরাজ কবিগণ ফরাসী-বিপ্লবকারীদিগের নিকট হইতে মায়া, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই তিন মহামন্ত্র শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা আবার সেই মন্ত্রত্রয় স্বদেশবাসীকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য মন্থন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই উপঢৌকন সাদরে গ্রহণ করেন এবং তিনি এই মন্ত্রত্রয় দেশবাসীকে বিতরণ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে একখানি মহাকাব্য লিখিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়া উঠাইলেন। তাঁহার দেশভক্তি দেখান নয়, উহা তাঁহার প্রাণের জিনিষ।

হেমচন্দ্রের কাব্যে দেশভক্তির উচ্ছ্বাস ব্যক্তিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু সেই দেশভক্তি অবিমিশ্র নিরবিকার দেশভক্তি নয়, তাহাতে জাতি নৈরঞ্জনিক আশা আছে, দুঃখের তীব্র আর্ত্তনাদ আছে এবং অদৃষ্টাকাশের উষ্ণ নিশ্বাস আছে। বৃত্রসংহারের সর্ব্বত্রই যেন জাতীয়ত্বের ছায়া মণ্ডলী। দেবগণ ক্ষুব্ধ, ভীত, নির্ম্মর্ষ ও চিন্তিত। তাঁহারা পাতালে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, পক্ষবৎ আবাস বহিস্কৃত পতিত হইলেন আর পরাজিত হইলেন। বৃত্রসংহারে কেহই সুখী, কোথাও সুখ নাই, সকলের জন্য সকলের হৃদয়েই প্রজ্বলিত। দেবগণে জ্বালা, ঋষিগণে জ্বালা, ইন্দ্রাণীতে জ্বালা, ঋষিপত্নীতে জ্বালা, বৃত্রে জ্বালা। দেবগণ পরাজিত হইলেন; অমরাবতী হারাইলেন; কিন্তু শঙ্কিত হইলেন না; তাই ঐশিলার অতৃপ্তিজনক এক আশা। এই আশাময়ী কবিতায় আমরা কবিত্বের উপাদান পাই না, চিত্রের কোন ঔজ্জ্বল্য পাই না এবং অকূল দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাইলেও উদ্ধারের কোন উপায় পাই না। কল্পনালোকে, বিধাতার বিধানে বিশ্বাস হয়, মঙ্গলময়ের মঙ্গল প্রতীতি জন্মে, আশার আশ্বাসে হৃদয়ে বল, মনে সাহস, শরীর সুস্থ সবল হইয়া থাকে। কিন্তু বৃত্রসংহারে এই সকল কথা কিছুই নাই। তথায় এই সকল কথা নাস্তিকেরই কথা; কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে শিক্ষিত স্বদেশের সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, ভগবানে ভক্তি নাই এবং নিজ অদৃষ্টে [illegible]

নাই। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী ক্ষণিকমাত্র দুঃখের ছায়াপাতেই অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। আমরা হেমবাবুর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, তিনি বিপদে ও দুঃখে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদর্শিত শান্তির ও সুখের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পাশ্চাত্য কবিদের মত নিরাশসাগরে লম্ফপ্রদান করিয়াছেন। বার্দ্ধক্যকালে অন্ধত্ব ও দারিদ্র্য প্রপীড়ন তাঁহার জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার মর্ম্মভেদী নিরাশার ও দুঃখের করুণ কাতরধ্বনি কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার "চিত্ত বিকাশের" দুইটি কবিতা ও "হতাশের আক্ষেপ" শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। তাঁহার দুঃখের কাহিনীতে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়। তিনি আপনার সতেজ সরল লেখনীতে নিজ দুঃখ প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন,—

"কোথা পুত্র কন্যাদারা, সকলই হয়েছি হারা, গৃহএবে হয়েছে শ্মশান।"

ধর্ম্ম ও ভগবানে বিশ্বাস এবং নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভরতা থাকিলে দুঃখে চিত্ত অবশ ও বিকল হইয়া পড়ে না এবং জ্বালায় ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে কবি হিন্দুর আদর্শ ভুলিয়া দুঃখে ও কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়াছেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত বি, এ।

কোজাগরী।

করি ধরণীর চিত্ত শান্ত সুশীতল
কমলা রাখিলা আজি চরণকমল
মুঞ্জরিত ধান্য শীর্ষে, আনন্দে শিহরি'
ভৃঙ্গরাজ কণ্ঠে কণ্ঠে দিগ্বধূগণ
দিলা মধু 'হুলু' ধ্বনি, ঐক্যতান ধরি'
গাইল বন্দনা ঝিল্লি, অর্ঘ্য নিবেদন
করিল শেফালি বালা, চন্দ্রলোক গলি'
করে দিল সুধাময় জলস্থল নভঃ
অভিনব সুষমায়!
জাগ ফুতুহলি
তন্দ্রাতুর আত্মা মোর! শাশ্বত বৈভব
মুক্ত ওই প্রকৃতির, বিশ্বজিৎ যাগে
মগ্না বুঝি বিশ্বরমা লও অনুরাগে
সারা নিশি জাগি আজ পূর্ণ করি প্রাণ
অজানা দেবের কোন্ অফুরন্ত দান!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

কবিবর ৺ রাধা মাধব মিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

কবি রাধা মাধব যখন "সংবাদপ্রভাকর" পত্রের সম্পাদক ছিলেন, ঐ সময় তাঁহার লিখিত অনেক বড় বড় কবিতা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল কবিতার মধ্যে "পেটের দায়", "রমণী রমণ", "হুক্ কথা" "ক'ষ তবু", "হই মন্দ হ'ব", "পতিব্রতা নারী", "রথ যাত্রা", "হায়রে অভাব," "কলির প্রাদুর্ভাব", "কৃতান্ত ও কামিনী", "নবীন উদাসীনের বিলাপ", "বিরহিণীর খেদ", ও "ধার্ম্মিকা গুণবতী কুলকামিনী" প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার মধ্যে শেষোক্ত কবিতাটী এরূপ হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িলে কবির শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কবিতাটী এত বিস্তৃত যে, উহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উহার রস উপভোগ করান একান্ত অসম্ভব। আর শুধু ঐ কবিতাটীই নহে, কবির উল্লিখিত সকল কবিতাগুলিই অসম্ভবরূপে বিস্তৃত। তজ্জন্য আমরা মাত্র "পেটের দায়" কবিতাটী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

ঐ কবিতাটীর প্রারম্ভ এইরূপ,—

সংসারে পেটের দায়, অতি বড় দায়।
এ দায়েতে ভাল মন্দ, কত কি ঘটায়॥
পেটের দায়েতে সেনা, সমরেতে যায়।
দস্যুরা ডাকাতি করে, পেটের জ্বালায়॥
পেটের দায়েতে মাত্র, চোর চুরি করে।
হয় তো পড়িয়া ধরা, প্রবেশে শ্রীঘরে॥
লেঠেল লইয়া লাঠি, পথে বসে থাকে।
পেটের দায়েতে মারে, বাগে পায় যাকে।
সিঁদেলেতে সিঁদকাটে, পেটেরিতো ভরে।
পেটের দায়েতে লোক, পরধন হরে॥

পেটের দায়েতে লোক, অকালেতে মরে।
বিপরীত আচরণ, অনেকেই করে॥
পেটের দায়েতে লোকে, কেবল মজায়।
পেটের দায়ের মত, আর নাই দায়॥
কি দায় পেটের দায়, হায় কব কায়।
সকল দায়ের চেয়ে, বড় এই দায়॥"

কবিতাটির অন্য স্থানে আছে,—

"ধরাতলে যত কর্ম্ম, করে যত জন।
কেবল পেটের দায়, তাহার কারণ॥
কোন কর্ম্মে থাকে যদি, অন্য অভিপ্রায়।
গোড়ায় পেটের দায়, প্রায় আছে তায়॥
পেটের দায়ের ভয়ে, সমাজ বজায়।
পরস্পর পরস্পরে, সহকার পায়॥
আমরি পেটের দায়, না থাকিলে পরে।
কোন কর্ম্ম করিত কি, নারী আর নরে॥
মহীতে হইত তবে, সবাই সমান।
আপনা আপনি সব, হইত প্রধান॥
এই তো পেটের দায়, সাধে কারো হিত।
আবার সাধন করে, কারো অহিত॥
ন্যূনাধিক হিতাহিত, নিয়ত ঘটায়।
পেটের দায়ের মত, আর নাই দায়॥
কি দায় পেটের দায়, হায় কব কায়।
সকল দায়ের চেয়ে, বড় এই দায়॥"

আর এক স্থানে আছে,—

"নবীনের কুলদারা, নবীনা রমণী।
পিতৃবাসে পিতৃপাশে, থাকিত সে ধনী॥
নবীনা ললনা আহা, অবলা সরলা।
ধর্ম্মপথে ছিল সদা, জানিত না ছলা॥
সবে বলে মানে তার, ছিল না তো মলা।
কি ফল এখন তায়, বিফল তো বলা॥

পিতা আর বিদ্যাভ্যাস, যুক্তি দিল তারে।
যুক্তি পেয়ে, ধর্ম্ম খেয়ে, ভাসে সে পাথারে॥
তাহার সতীত্ব রত্ন, মহামূল্য ধন।
মাহাত্মের করে, আহা, হইল নিধন॥
মা বাপের পরামর্শে, গেল তার মান।
কুল গেল, ধর্ম্ম গেল, শেষে গেল প্রাণ॥
রোয়েছে পেটের দায়, ইহার গোড়ায়।
পেটের দায়ের মত, আর নাই দায়॥
কি দায় পেটের দায়, হায় কব কায়।
সকল দায়ের সেরে, বড় এই দায়॥ ইত্যাদি।

কবি রাধামাধব যখন প্রভাকর সম্পাদন করিতে ছিলেন, তখন দৈনিক সংবাদ প্রভাকরের এক সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ সাপ্তাহিক সংস্করণের নাম হয় "সংবাদ-দ্বিজরাজ" এই সংবাদ 'দ্বিজরাজে' 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত অধিকাংশ বিষয়ই প্রকাশিত হইত। তাহা ভিন্ন কিছু কিছু নূতন বিষয়ও উহাতে প্রকাশিত হইত। ১২৭৩ সনের ২২শে জ্যৈষ্ঠ সোমবারের 'সংবাদ দ্বিজরাজে' জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস' পত্রে প্রকাশিত একটী ইংরেজী কবিতার নিম্নলিখিত অনুবাদটী প্রকাশিত হইয়াছিল যথা—

সেই ব্যক্তি সুখী মাত্র হয় এ সংসারে।
প্রেয়সীর আজ্ঞা যেই শিরোধার্য্য করে॥
বিবাহজনিত ভোগ অর্থে না যাহারে।
তার সম দুঃখী নাই পৃথিবী ভিতরে॥

ধরণীতে আদমের নাহি ছিল সুখ।
যদবধি অদর্শন ছিল নারীমুখ॥
যে অবধি হেরিলেন রমণীর মুখ।
আনন্দে ছিলেন তিনি নাহি ছিল দুখ॥

স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যুবতী কামিনী।
সত্যপ্রিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা সুপ্রিয়বাদিনী॥
কপটতা প্রবঞ্চনা গর্ব্ব অভিমান।
রমণী মানস-ক্ষেত্রে নাহি পায় স্থান॥

কে পারে বর্ণিতে কত রমণীর গুণ।
সরলতা মধুময় হৃদয় প্রসূন॥
অতুল্য কামিনী মুখে কপট বচন।
বিচারে কদাপি নাহি হয় দরশন॥

রমণীর আত্মা যিনি না ভাবেন সার।
তাঁর তুল্য ভূমণ্ডলে নাহিক অসার॥
একক জীবন যিনি ভাবেন আঁধার।
সংসারের মধ্যে তিনি গুণের আধার॥

চোরা নিবাসী
শ্রীঅধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতা ভিন্ন প্রভাকরে বাহিরের লোকের লিখিত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাও প্রকাশিত হইত। ১২৬৬ সালের ১লা মাঘ তারিখের প্রভাকর পত্রে বহরমপুরের খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রামদাস সেন মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল যথা,—

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ইতিপূর্ব্বে প্রভাকরে আমি কতিপয় গ্রন্থের সমালোচনায় রচনাবিষয়ে বঙ্গ কবিগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সর্ব্বপ্রধান বলায় প্রভাকরের মেদিনীপুর পত্রপ্রেরক মহাশয় আমার সমালোচনা পক্ষপাতদোষে দূষিত হইয়াছে বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি মেঘনাদবধ কাব্য মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে বোধ হয় কখন আমার প্রস্তাবে দোষারোপ করিতেন না। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা বিচক্ষণবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেক মহাশয়গণ ইতিপূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা ললিত, মনোহর ও বালক বালিকা, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জক এবং তাঁহার নিকট পদ্য-লিখনের ধারা শিক্ষা করিয়াই প্রযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব মিত্র, ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বসু প্রভৃতি অনেক মহোদয়গণ অধুনা কবি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে সহস্র বার স্বীকার করি, বিশেষতঃ তাঁহার হাস্য ও করুণ রসবর্ণন বিষয়ে একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু তিনি বীর করুণা রস ও স্বভাবের শোভা বর্ণন বিষয়ে

তাদৃশ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, এ সকল বিষয়ে যাইবেল মধুসূদন যত দাক্ষিণ্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আহা তাঁহার রচনা যে স্থলে পাঠ করা যায়, সেই স্থলেই একবালে মোহিত হইতে হয়। পাঠকগণ নিম্নস্থ কবিতা গুলি একবার পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার কবিতানিচয় কিরূপ চমৎকারিণী ও মনোহারিণী,—

"অস্ত গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
ললাটে তারারতন ফুটিল কুমুদ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কুজনী পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠগৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হম্বারবে।
আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী, বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,
সুস্বনে সখার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুমি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রাদেবী, ক্লান্ত শিশুকুল,
জননীর ক্রোড়নীড়ে লভয়ে যেমতি,
বিরাম, অলজদল খেচর ভূচর,
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।"

"আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা হুযমে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি,
ঝরিল শিশির নীর, কে পারে কহিতে,
কতদূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুখী,
মলিনবদনা; মরি মিহির বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে,—
ভোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা;
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে,
এ পরাণো দহিছে লো বিচ্ছেদ অনলে,
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি,
অহরহ অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি,

আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে,
পাইবি বেমতি, সতি তুই) প্রাণেশ্বরে ?"
"কোটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা কোটা,
সীমন্তে; সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা !
"হাসি দেখা দিলা উষা উদয় অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী সুজনিল পাখী,
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, গাইল চৌদিকে
মধুজীবী মৃদুগতি চলিলা মর্ম্মরী
তারাদলে লয়ে সঙ্গে, উষার ললাটে
শোভিল একটী তারা, শত তারা ভেদে
সুনীল কুন্তলে ফুল, নবতারাবলী"
"উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচল,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত আহা, পদ্মযোনি বেন,
উন্মীলি নয়ন দেখে সুপ্রসন্ন ভাব,
চাহিলা মহীর পানে, উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে
উৎসবে মঙ্গল বাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বর লহরী,
নিকুঞ্জ বিমল জলে শোভিত নলিনী,
স্থলে সম প্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
"রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম মন্দিরে,
রাঘেন্দ্র, রাখেন দেব খুলি সযতনে
কিরীট, রাখিলা খুলি অস্তাচল চূড়ে
দিনান্তে দিনরতন তমোহা মিহিরে.
দিনদেব, তারাদলে পাইলা রজনী,
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি !"
"স্থানেস্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগী হাস্তর যা

হোমর, মিল্টন, সেক্সপিয়র, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি সেকাল প্রধান কবিগণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রস্তাব সকল রচনা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মাইকেলও বঙ্গ ভাষায় সেই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, "যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম্ম তাদৃশং ফলতে" লিখিত হইয়াছে, তখন দত্ত কবি কবিতা সকল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে কখনই দোষী করা উচিত নহে, বিশেষত মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষরে কবি স্বীয় মনের ভাব অতি উত্তম রূপে প্রকাশ করিতে পারেন।

মাইকেল ইতর ভাষার সঙ্গে সাধুভাষা প্রয়োগ করায় তিনি কখনই সমাজে দোষী হইতে পারেন না, কেন না এরূপ ইংলণ্ডীয় অনেকানেক কবিগণও ব্যবহার করিয়াছেন। দত্ত মহোদয়ের অমিত্রাক্ষর রচনায় যে রূপ ক্ষমতা মিত্রাক্ষর রচনারও সেইরূপ ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মাঙ্গনা কাব্যের ১৮টী প্রস্তাব পাঠেই বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। তাহা, ব্রহ্মাঙ্গনার শেষ প্রস্তাবটী কি মনোহর, তাহা পাঠ করিবা মাত্র জয়দেবের কবিতা স্মৃতি পথে উদিত হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের এরূপ কবিত্ব থাকাতেই আমি তাঁহাকে প্রধান কবি বলিয়াছি। ইহাতে প্রভাকরের পত্রপ্রেরক আমাকে কি জন্য দোষী করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না ইতি।*

শ্রীরামদাস সেন।

সাং বহরমপুর।

কবি রাধামাধব "সংবাদ প্রভাকর" ও "সংবাদ বিভরাণ" ভিন্ন "সুধাকর" নামক এক খানি পাক্ষিক পত্রেরও সম্পাদক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর সুযোগ্য সম্পাদকের অভাবে উহা সুপরিচালিত হইতেছে না দেখিয়া উক্ত পত্রের পরিচালক মধুরা নাথ ধর্ম্মা মহাশয় কবি রাধামাধবকে এই পত্রের সম্পাদক নিয়োজিত করেন। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে "সুধাকর" রাধামাধবের সম্পাদকতায় নূতন সাজে নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়। সুধাকরের শীর্ষ দেশে এই শ্লোকটী লিখিত ছিল যথা,—

"ভো ভো বিচিন্ত্যবিধয়ামৃতভূরিপাণ-পর্য্যুৎসুকাঃ সুজনযুগ্মমনশ্চকোরাঃ।
মাল্যং বিধীদত যতোঽস্ত তমঃ সমূলমুন্মূলয়ন্ প্রণয়বেদ্মি সুধাকরোঽয়ম্॥"

* দুঃখের বিষয় আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও প্রভাকরের সে মাহাত্ম্য পত্র প্রেরকের লিখিত রামদাস বাবুর সমালোচনার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধটী সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

'সুধাকর' পরিচালক মথুরানাথ শর্ম্মা মহোদয় কবি রাধামাধবকে সম্পাদক নিযোজিত করিয়া তৎসম্বন্ধে সুধাকরে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যথা,—

"বিজ্ঞাপন"

সাধারণ জনসমাজে এতদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য যে, এই সুধাকর পত্র ইতিপূর্ব্বে কয়েকবৎসর প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করে নাই। পরে আমার অনবকাশ প্রযুক্ত ইহা বন্ধ হইয়া থাকে, অধুনা আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব মিত্র মহোদয়ের সাহায্য ভরসায় পুনর্ব্বার সুধাকর উদিত করিয়া ইহার স্নিগ্ধ কিরণে গ্রাহকগণের অন্তঃকরণ সুশীতল করিতে উদ্যত হইলাম। এবারে ইহাতে অধিকাংশ পদ্য লেখাই আমার উদ্দেশ্য; তজ্জন্য রাধামাধব বাবুকেই সম্পাদকতাকার্য্যের ভার দিয়া স্বয়ং সহকারিতা অবলম্বন করিলাম। এক্ষণে কৃতকার্য্য হওয়া কেবল গ্রাহকদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ফলতঃ কৃপানিধানের কৃপা ও গ্রাহকবর্গের স্নেহের গৌরব থাকিলেই বোধ হয় অবাধে সুধাকর উদিত হইয়া মানবগণের মনোরঞ্জন করিবার বাধা ঘটিবে না, সুতরাং গ্রাহকদিগের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ এককালেই দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা। ইতি

সাং ১লা বৈশাখ, অব্দ ১২৭৭।

শ্রীমথুরা নাথ শর্ম্মা।

"সুধাকর" কলিকাতা মৃজাপুর ২নং হলওয়েল লেনস্থ প্রকৃত যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। বলা বাহুল্য যে, সুধাকর পদ্যময় পত্র ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সে যুগে শুধু পদ্যময় পত্রও গ্রাহকগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এ যুগে কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে পদ্যময় "বীণা" পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছিল। বীণার পদ্য বিষয় ভিন্ন বিজ্ঞাপনগুলি পর্য্যন্ত কবিতায় প্রকাশিত হইত। কিন্তু বীণার তানে বঙ্গীয় পাঠক মনোযোগী না হওয়ায় বীণা অকালে নীরব হইয়া যায়। সুধাকরে রাধামাধবের বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বিষয়গুলি এমন কি, সাময়িক ঘটনাগুলি পর্য্যন্ত সুধাকরে কবিতায় প্রকাশিত হইত। পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা ঐ সকল কবিতার কিছু কিছু সূচনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দুই বিবাহ বিষম দায়।

দুই বিবাহ ধরায়। দুই বিবাহ ধরায়।
অতিশয় অসঙ্গত, সন্দেহ কি তায়॥
দুই বিবাহ যে করে। দুই বিবাহ যে করে।
পশুর অধম সেই, অবনি ভিতরে॥
রঙ্গভরা বঙ্গদেশ, রঙ্গভরা বঙ্গদেশ।
বঙ্গে কত রঙ্গ আছে, বিশেষ বিশেষ॥
নয় সামান্য এ রঙ্গ, নয় সামান্য এরঙ্গ।
এক পুরুষের হয়, দুই নারী সঙ্গ॥
ইটী নিতান্ত কুরীতি, ইটী নিতান্ত কুরীতি।
রয়েছে ইহার সহ, অনিষ্টের ভীতি॥
এ যে প্রথা সৃষ্টিছাড়া। এ যে প্রথা সৃষ্টিছাড়া।
কুপ্রথা ধরায় বুঝি, নাই এর বাড়া॥
ইটী যাবে কি সহজে। ইটী যাবে কি সহজে।
একটী ছোঁড়ার দোষে, দুটো ছুঁড়ী মজে॥ ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাধামাধবের এক একটী কবিতা অতি বিস্তৃত সুতরাং কোন কবিতার সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা একেবারেই অসম্ভব।

ইং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখ কলুটোলার অতুল ধনী ও জমিদার এবং শীরাস্ ফ্রী কলেজ নামক বিদ্যালয়ের সংস্থাপক মতিলাল শীল মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবি রাধামাধব শীল মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সুধাকর পত্রে নিম্ন লিখিত কবিতা প্রকাশ করেন যথা,—

ধন্য বাবু মতিলাল, বঙ্গের ভূষণ।
পর উপকারী কই, তাঁহার মতন॥
অতুল গৌরব তাঁর, অতুল গৌরব।
শীল বংশোজ্জ্বলকারী, শীল বংশোদ্ভব॥
কি এক অতুল কীর্ত্তি, করিয়া স্থাপন।
চিরকাল হয়েছেন, যশের ভাজন॥
রাখিয়া গেছেন বোলে, কীর্ত্তি কমনীয়।
হোয়েছে তাঁহার নাম, প্রাতঃস্মরণীয়॥

যে ধনেতে নাহি হয়, পর উপকার।
সে ধন তো ধন নয়, সন্দেহ কি তার॥
ধরাতলে পরহিত, করিতে সাধন।
প্রয়োজন হোয়ে থাকে, ধন আর মন॥
মন আছে ধন নাই, কি করিবে সেই।
ধন আছে মন নাই, অপরূপ এই॥

ইত্যাদি।

১২৭৭ সালে রেভারেণ্ড জে, ভন নামক এক খৃষ্টান পাদ্রীর চক্রান্তে পড়িয়া গণেশসুন্দরী নাম্নী এক হিন্দুবিধবা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রাধামাধব সুধাকরে নিম্নলিখিত কবিতা প্রকাশ করেন যথা,—

গণেশসুন্দরী ধনি, বল শুনি সুলোচনি
কেমন করিয়া, জননী ত্যজিয়া
হোলে যীশুপরায়ণী॥
ভাল বিদ্যা শিখেছিলে, কুলেতে কলঙ্ক দিলে
হায় হায় হায়, ভুলে ছলনায়
ভাল লালে প্রকাশিলে॥
কাঁদিছে জননী তব, সদা মুখে হা হা রব!
তোমার বিরহে, দুখে দেহ দহে,
তিনি প্রায় যেন শব॥
কি দশা হইল যার, ভাবিলে না একবার।
মার মায়া ভুলে, ভাল ধ্বজা তুলে,
শুধিলে মায়ের ধার॥
বড় অপরূপ যুক্তি, যাকে মেনে গাবে মুক্তি।
এ কেমন কর্ম্ম, এ কেমন কর্ম্ম,
এ তো নয় উক্তি॥

* * * * * *

হবে সুখ ভোগ না না, টেবিলে খাইবে খানা,
গিরিজায় যাবে; ঘ. খাওনি থাবে,
ছুঁতে রবেনা মানা।

ফিরিব সে আর কোরে, যাইবেক জাত মোরে,
যেতে ইহা যথা, যেতে পারে তথা,
মোলে হেত হবে গোরে। ইত্যাদি।

গণেশ সুন্দরী অল্প কিছু দিন পরেই খৃষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসেন। তখন আবার রাধামাধব সুধাকরে এই কবিতাটি লেখেন যথা,—

খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম পরিহরি, গণেশসুন্দরী।
ফিরিয়া এসেছে পুন, অনুতাপ করি॥
কুহকে ভুলিয়া গিয়া, শেষ না ভাবিয়া।
কত কাণ্ড করা গোলো, কুলে কালী দিয়া।
পাদরির মায়া কিছু, না বুঝিয়া ধনী।
একেবারে আপনাকে; মজাকে আপনি॥
হায় হায় কাঁদিতে হইল অনিবার;
হাসিল সকল লোক চরাচরে সার।
বিধুমুখী ম্লানমুখী, পতিত বিপাকে।
কার সাধ্য এখন, আশ্বাস দেয় তাকে।
দিবানিশি সহচরী, মনস্তাপ নয়।
না বুঝে করিলে কাজ, এই দশা হয়॥ ইত্যাদি

রাজাবলী ১২৭৭ সালের ৯ই শ্রাবণ রবিবার মহাভারতপ্রকাশক ধর্ম্মসভা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পরলোক গমন করেন। তদুপলক্ষে কবি রাধামাধব সুধাকর পত্রে এক গদ্য শোকগাথা প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে শেষ ভাগে এই কয় পংক্তি কবিতা ছিল যথা,—

হা! কালীপ্রসন্ন সিংহ, সিংহের মতন।
যাহার সাহস ছিল, কায় ছিল মন॥
হরিবোলে এ হরিকে হরিবারে হরি।
কত পরি হরি এল, মরি মরি মরি॥

কবি রাধামাধব অতিশয় রাজভক্ত ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি উৎসবকে রাধামাধব এক সুদীর্ঘ শ্লোক কবিতা রচনা করেন। কিন্তু ইহা কোন সংবাদপত্রে বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ঐ কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র যথা,—

৺কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর কয়।
কবিকুল-চূড়ামণি বঙ্গের নিশ্চয়॥
পাঁচটির মাঘ মাসে দশম দিবসে।
পরলোকে গিয়াছেন সময়ের বশে॥
বয়ঃক্রম ছচল্লিশ বৎসর যখন।
হায় হায় করেছেন ভূলোক বর্জ্জন॥
তাঁহার গুণের কথা কে না জানে বঙ্গে।
রচনার গুণপনা গেছে তাঁর সঙ্গে॥
যে সময় যখন যেমন প্রয়োজন।
করেছেন সহজে তেমনি প্রদর্শন॥
থাকিতেন যদি তিনি জীবিত এখন।
করিতেন চিত্রভাবে এ শোক বর্ণন॥
হৃদয় বিদীর্ণকর এ শোক আবার।
যে প্রকার করিতেন গাথি বর্ণহার॥
কেবা আর সেপ্রকার পারে বল ভাই।
তাঁর সমতুল্য কবি বঙ্গে কেহ নাই॥
ছিলেন আমার গুরু গুপ্ত কবিবর।
আমি তাঁর ছাত্র হই অপাত্রে পামর॥
তথাপি করুণা করি দিয়া উপদেশ।
শিক্ষা দেন রচনার পদ্ধতি বিশেষ॥
আমার আদেশ দেন যাবার সময়।
"ত্যজ না রচনাকার্য্য হ'লে ভাবোদয়॥"
তাঁর ভ্রাতৃ অনুরোধে গুরু বাক্য মানি।
রচিলাম প্রভাকর যা পারি যা জানি॥
গুপ্ত গুরু মহাত্মার ছাত্র ছিল যত।
কালবশে সকলেই হয়েছেন গত॥
যদিও অপাত্র আমি যোগ্য ছাত্র নই।
ঈশ্বরের করুণায় আজো বেঁচে রই॥
এখন যে শোক বটে কথার তা নয়।
হলো যাতে সকলেরি বিদীর্ণ হৃদয়॥

মেচে আছি বলে ভাই ওরে আত্মহারি।
কি করি অগত্যা ভাই লেখনীটী ধরি॥
লেখনী ধরিয়া করে নেত্রে ধারা ঝরে।
ভাসিল সুতের দেহ শোকের সাগরে॥

অন্যত্র,—

আঃ মরি দুপুর বেলা শিরোপরি রবি।
দেখেতে ছিলেন যেন জ্যোতির্ম্ময় ছবি॥
হায় হায় অকস্মাৎ এমন সময়।
দৈববশে যদি তার সর্ব্বগ্রাস হয়॥
যেমন জগৎ তায় হয় তমোময়।
আমাদিতে সেইরূপ ঘটিল নিশ্চয়॥
আমাদের মহারাণী রাজরাজেশ্বরী।
দেখাতে ছিলেন দীপ্তি সর্ব্বশিরোপরি॥
এমন সময় হায় ইকি সর্ব্বনাশ।
অকস্মাৎ ঘটিল রে যেন সর্ব্বগ্রাস॥

ইত্যাদি।

সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এবং সম্রাট ৫ম জর্জ্জ যখন যুবরাজরূপে আসিয়াছিলেন, তখন রাধামাধব তাঁহাদের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া দুই খানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে কবি তাঁহার সুহৃদের কৃতজ্ঞতার ও রাজভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কবি রাধামাধব ক্রমান্বয়ে তিনটী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পত্নী ১৩০৯ সালে বৃদ্ধপতিকে ও পুত্রগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। বৃদ্ধ বয়সে এই অসহ্য পত্নী-শোক কবির হৃদয়ে শেল সম বাজিয়াছিল। পত্নীদুঃখকাতর কবি পত্নীবিয়োগ উপলক্ষে একটী সুদীর্ঘ শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতাটীও কোন পত্রাদিতে প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং পূর্ব্বকবিতার ন্যায় ইহাও অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে। উক্ত কবিতার প্রারম্ভটী এইরূপ যথা,—

কেমনে নয়নাল কি বিষম শাল।
ভিন্নদিন কর তোরে নালের জঞ্জাল॥

প্রায় শেষ হয় তব জীবন সময়।
বৃদ্ধকালে ঘটাইলে বিষম প্রণয়॥
চৈত্র পক্ষ দশদিন কুক্ষণে আইল।
রবির বারেয় রবি কুক্ষণে ডুবিল॥
কি কুক্ষণে তেয়াগিল ধরা দিনকর।
আর কি আনন্দকর হবে না তব ঘর॥
কুক্ষণে আইল রাতি ভয়ঙ্করী কায়।
নীরব অবনী হায় দ্বিপ্রহর প্রায়॥
নিস্তব্ধ সমীর যেন নাহি বহে আর।
হেনকালে ভেঙ্গে গেল স্নেহের আগার॥
বিনা মেঘে কুরি হায় অশনি সম্পাত।
ভয়ঙ্করী বিভাবরী হইল প্রভাত॥ ইত্যাদি।

কবি রাধামাধব সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ দ্বিজরাজ ও সুধাকর প্রভৃতি পত্রে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বলিতে কি, একালের রঙ্গকৃষ্ণ রায়ের মত সে কালের রাধামাধবও অফুরন্ত কবিতার খনি ছিলেন। রাধামাধবের আজীবন রচিত কবিতাবলীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক কবিতাই তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছিল। রাধামাধবের লিখিত কবিতা অনেক লোপ পাইয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। নব্য বঙ্গের নবীন পাঠকগণের মধ্যে রাধামাধবের কবিতার সুধাধারা পান করিবার সুযোগ ও সুবিধা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। রাধামাধব সাময়িক বিষয় লইয়া অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য! সাময়িক বিষয় ও উপস্থিত ঘটনা ও আন্দোলনাদি লইয়া কবিতা রচনা করিতে পারেন, এমন কবি বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় একজনও নাই। রাধামাধব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালার কবিত্ব আকাশে রাধামাধবরূপ নক্ষত্রটী অনেক দিন দীপ্তি বিস্তার করিবে।

শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত।

অপরাধী।

কাকার স্বোপার্জ্জিত অর্থে যখন সুরেন্দ্র নাথ এম, এ পাস করিল, তখন তার কাকী মা ধরিয়া বসিলেন, "এইবার বাবা তোকে বিয়ে কর্ত্তে হ'বে। কতদিন আর এরূপ একলাটী থাক্‌বি বল? এখন একটী লক্ষ্মী ঘরে না আন্‌লে, আর আমি একা সমস্ত পেরে উঠিনে। এখন আর অমত করিস্‌নি! কি বলিস্ সুরেন?" হাসি মুখে সুরেন্ বলিল "আমি আর কি বল্‌ব মা, তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর। আমার কোন মতামত নেই"।

সুরেন্ যখন চার বৎসরের, তখন তার মা তাকে তার কাকীমা,—তারাসুন্দরীর হস্তে সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুরেন্দ্রের পিতা এর পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। সেই হইতে সুরেন্দ্র তার কাকীমাকে মা বলিয়া জানে। তারাসুন্দরীরও কোন সন্তানসন্ততি ছিল না; অপত্যধনে বঞ্চিতা হইয়া সুরেন এবং তার আর দুই ভগিনীকে তিনি লালন পালন করিয়া বড় করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের সে দুই ভগিনীই সুরেন্দ্রের বড়, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। তাহারা শ্বশুরালয়ে আছে। সুরেন্দ্রের কাকা বিপিন চন্দ্র বসু দুই শত টাকা বেতনের কলিকাতার অফিসের বড় কেরাণী, তিনিও সুরেনকে পুত্রবৎ স্নেহ পালন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রও কাকা এবং কাকী মাকে ভয় ও ভক্তি করিত, এবং ভালও বাসিত। তাই বিবাহের কথায় ছেলের হাসি-মুখ দেখিয়া, তারা সুন্দরী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং অবিলম্বে কর্ত্তাকে জানাইলেন—বিবাহে ছেলের এখন মত হইয়াছে। অবশ্য, কর্ত্তার এক প্রকার প্রায় স্থিরই ছিল। বিপিন বাবু কলিকাতায় জনৈক বন্ধুর এক কন্যার সহিত অনেক দিন হইতেই কথাবার্ত্তা চালিতেছিলেন। এইবার তিনি মেয়ে দেখিয়া আসিয়া, গৃহিণীকে কহিলেন "মেয়ে বড়মানুষ সুন্দরী নয়, কিন্তু মেয়েটী অত্যন্ত সুলক্ষণা, এমন লক্ষ্মীশ্রী-মেয়ে আমি আর দেখিনি। এমন লক্ষ্মীযুক্তা সুলক্ষণা মেয়ে দেখে আমার অত্যন্ত পছন্দ হ'ল, তাই এই বিয়েই আমি স্থির ক'রে এসেছি"।

স্বামীর কথায় তারা সুন্দরীর মনে একটা খটকা লাগিল। ছেলের চিরদিনই ইচ্ছা ছিল—সুন্দরী বিদুষী বউ ঘরে আনে। এখন এ বিবাহের ফল কি দাঁড়াই

ছেলে কি সুখী হ'বে? কিন্তু তিনি মনের ভাব তৎক্ষণাৎ ভাষায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন—ছিঃ কেন আমি এমন আশঙ্কা কচ্চি। স্বামী যাকে পছন্দ করেন, তাহাতেত আমার অমত হয়নি, তবে আজ কেন এরূপ ভাবছি? কর্ত্তার যখন পছন্দ হ'য়েছে, তখন এমেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হ'বে। তিনি সুরেন্দ্রকে ডাকিয়া মেয়ের কথা বলিয়া শেষে কহিলেন "আমি অন্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, সুরেন! তুমি এ বিবাহে সুখী হ'বে। সুরেন্ মাথা নত করিয়া কাকীমার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

শুভদিনে শুভক্ষণে প্রফেসর শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর সহিত শ্রীমান্ সুরেন্দ্রের শুভবিবাহ কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহান্তে পুত্রবধূ লইয়া বিপিন বাবু বাড়ীতে আসিলেন। পুত্র পুত্রবধূ বরণ করিতে যাইয়া পুত্রের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া তারাসুন্দরীর হাসিমাখা মুখখানি সহসা ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বধূর মুখ দেখিয়া, তাঁহার মুখের সে ক্ষণিক মলিনতা দূর হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"সত্যই এমন লক্ষ্মী বউ পেয়ে আমার ছেলে কখনও অসুখী হ'বে না"। তখন তিনি সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূ আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইলেন।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং স্বামীর স্নেহে যত্নে এক প্রকার সুখেই দুইবৎসর কাটিয়া গেল। হঠাৎ সাতদিনের জ্বরে বিপিন বাবুর মৃত্যু হইল। দিবা রাত্র অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষা করিয়াও লীলা তার স্নেহময় শ্বশুরকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। মৃত্যুর সময় তিনি সুরেন্‌কে নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "দেখ সুরেন্! তুমি আমার এই মা লক্ষ্মীটীকে কখনও মনঃকষ্ট দিও না। এ আমার বড় লক্ষ্মী। তোমার ব্যবহারে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি এখন পর্য্যন্তও ওকে চিন্‌তে পারনি। জানিও সুরেন্ রূপে কিছু নয়, ও শুধু দু'দিনের মোহ। আমি মৃত্যুর সময় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি—সুরেন্ তোমরা দু'জনে সুখী হও।

বিপিনবাবুর মৃত্যুর পর চারি মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তারাসুন্দরী এখনও অত্যন্ত শোকাকুলা। লীলা সকল সময়ই প্রায় তাঁর কাছে কাছে থাকে, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সেও যে এখনও শান্ত হইতে পারে নাই। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর স্নেহই যে সে পিতৃ মাতৃ স্নেহাপেক্ষা অধিক অনুভব করিত। তারও মা ছিল না! আজ ছয় বৎসর হয় তার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তাই শ্বাশুড়ীর স্নেহ সে মায়ের স্নেহের মত অনুভব করিত। তারপর স্বামীও যে তাকে বিবাহ করিয়া তেমন সুখী হন নাই, তাহা সে বুঝিতে পারিত; কিন্তু তার স্বামী তাকে আর অবহেলা

করিতেন না, যথেষ্ট স্নেহ করিতেন সত্য, কিন্তু মনপ্রাণ খুলিয়া যেন তেমন ভাবে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন না। লীলা এ সমস্ত বুঝিয়াছিলেন এবং স্বামীর এই অসন্তোষের জন্য সে দুঃখিতাও ছিল। কিন্তু সে স্বামীকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। বিনয়বাবু ঘরে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য সুরেন্দ্রের অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিশেষ ভাবনা ছিল না, তবে সে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল না। একদিন দ্বিপ্রহরে লীলা তার বসিবার ঘরে বসিয়া, একখানা চিঠি লিখিতেছিল। টেবিলের উপর সামনে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়াছিল। এমন সময় সেই কক্ষে সুরেন প্রবেশ করিয়া "ওকি হচ্ছে, লীলা", বলিতে বলিতে টেবিলের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। লীলা মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে একবার তাকাইয়া আবার চিঠি লিখিতে সুরু করিল। হঠাৎ সুরেন্দ্রের দৃষ্টি সেই খোলা চিঠি খানার উপর পড়িল এবং পড়িবামাত্র সেটা তুলিয়া লইয়া দেখিল, তাতে লেখা রহিয়াছে—

"লীলা! অনেক দিন হইল তোমার কোন সংবাদ জানিনে। তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছা হয়। তুমি কবে এখানে আসবে লিখো। তোমাদের বাসায় যখনই যাই, তখনই তোমার বোন্ বেলা আমাকে বলে মোহিত দা, দিদি এখানে নেই, শ্বশুরবাড়ী আছে; বলে—এখন আর তুমি আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাও না ইত্যাদি। তুমি শিগ্‌গির আস্‌বেত লীলা? তোমরা কেমন আছ? সুরেন্দ্র বাবুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবে। পত্রের উত্তর দিও। আমরা একপ্রকার ভাল। তোমার—শুভার্থী "মোহিত দা"। পত্রখানা শেষ করিয়া লীলার দিকে তাকাইয়া সুরেন্ কহিল "বাঃ! পত্রের উত্তর লেখাও যে হয়ে গেল দেখ্‌ছি"। তারপর পুনরায় কহিল—"দেখ লীলা! আমি মেয়েদের এরূপ অন্য সাথে মেশা মেশা, আর এই প্রকার চিঠি পত্র লিখা পুরুষের মোটেই পছন্দ করিনে। আমার ওসব ভাল লাগে না"। কথাটী বলিয়াই সুরেনের মনে পড়িল—একবার লীলাকে তার পিতৃগৃহ হইতে আনিতে যাইয়া একদিন তারই সামনে কয়েকজন ছেলে, লীলার সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস করিতেছিল, এবং সে তাদের সে আমোদে যোগদান না করাতে তারা আরও কত প্রকার ঠাট্টা করিয়াছিল। সে কথা মনে হইতেই সুরেন্দ্রের মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। গম্ভীর মুখে লীলাকে বলিল "লীলা এই মোহিত ছেলেটি কে এবং তোমাদের সেখানে আরও কয়েকটি ছেলে যে দেখেছিলাম, তারাই বা কে"? লীলা এতক্ষণ লেখা ছাড়িয়া দিয়া, বিস্ময় মুখে চুপ করিয়া বসিয়াছিল; এই বার মুখ তুলিয়া বলিল, 'মোহিত দা কলেজের ২য় ছাত্র

এবং অন্য যারা আসত, তারাও কলেজেরই ছেলে। বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন, তাই আমার পরিচিত। মা ছিলেন না বলিয়া আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গেই সময় কাটাতাম কিনা" এই বলিয়া সে চুপ্ করিল। তারিণী বাবু প্রফেসর ছিলেন। মোহিত ভাল ছেলে বলিয়া তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মোহিত তাঁর দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতির ছেলে, নৈলে তারিণী বাবু তার সঙ্গেই লীলার বিয়ে দিতেন। মোহিতও ছেলের মত তারিণী বাবুর নিকটে প্রায়ই থাকিত এবং আসিত। সে লীলাকেও ভগিনীবৎ স্নেহ করিত। লীলা একথাও স্বামীকে জানাইয়া, পত্র দুইখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নীরবে উঠিয়া যাইতেছিল। তখন সুরেন কহিল—"যাচ্ছ কেন লীলা, বোসনা।" লীলা উত্তর করিল "না এখন আমি যাই মা একা আছেন"। সুরেন বলিল "আমার উপর রাগ করনিত লীলা? মুখে দেখ লীলা, আমি কোন খারাপ কথা বলিনি"। লীলা তখন কহিল, "তোমার উপর রাগ করিব কেন? তুমিত কোন মন্দকথা বলনি। তুমি যা পছন্দ করনা যা ভাল বাসনা তা আমাকে বলে দিয়ে ভালই করেছ। এতে রাগের কোন কথা নেই। মা অনেকক্ষণ একা আছেন আমি এখন যাই" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। লীলা অন্তঃসত্ত্বা ছিল, কয়েকদিন পর সে তার পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। বিবাহের পর মাত্র দুইবার লীলা তার পিত্রালয়ে গিয়াছিল। নিতে চাহিলেও সে শ্বশ্রূষাকারিণীর স্নেহ ছাড়িয়া কখনও যাইতে চাহিত না। লীলার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া সুরেন্ অনেক সময় বিস্মিত এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে। এখনও সময় সময় লীলার কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল, লীলার একটী ছেলে হইয়াছে। শুনিয়া তারাসুন্দরী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন।

তারাসুন্দরীর পিতা গোলকপুর গ্রামস্থ এক অবস্থাপন্ন এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে ব্যবসায় করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং একমাত্র সন্তান তারাসুন্দরীকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উপযুক্ত সৎপাত্রে বিবাহ দিয়াছিলেন। তারাসুন্দরী বিধবা হওয়ার অব্যবহিত পরেই তার মা দুর্গাসুন্দরী তাকে নিজের কাছে নিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তারাসুন্দরী পুত্র পুত্রবধূ এবং স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া সেখানে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। এই সময়ে গ্রামস্থ একটী বিধবার মৃত্যুকালে তিনি তাহার একমাত্র নিঃসহায়া কিশোরী সুন্দরী কন্যা বীণাপাণিকে সজল নয়নে দুর্গাসুন্দরীর হস্তে সমর্পিয়া দিয়া যান। সেই সময় হইতে তিনি এই পিতৃমাতৃহীনা

মেয়েটিকে নিজ কন্যার ন্যায় আদর যত্নে প্রতিপালন করিতেছিলেন। বীণা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে।

কন্যার যৌবনোদয় ও বিবাহযোগ্য বয়স যে দুর্গাসুন্দরীর দৃষ্টি এড়াইয়াছিল তাহা নয়; সে দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট পালিতা হইয়াছে। তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বিরহে একাকিনী কিরূপে এই দুঃখময় জীবন-সন্ধ্যার কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইবে, তাহা ভাবিয়া বৃদ্ধার নয়নকোণে অশ্রু আবির্ভাব হইত। অথচ তাঁহার এই আদরিণী সুশীলা সুন্দরী কন্যাকে যোগ্য সচ্চরিত্র পাত্রে দান করিতে না পারিলে তাঁহার মন কিছুতেই নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইতেছিল না। ইতি মধ্যে কলিকাতা হইতে বৃদ্ধার এক দূরসম্পর্কীয় ভাই কল্পনাইয়াছেন যে,তাহার পরিচিত একটী সচ্চরিত্র ছেলে আছে। ছেলেটী এইবার বি, এ দিবে। মেয়ে পছন্দ হইলে তাহার বিবাহে কোন আপত্তি হইবে না। সুতরাং এই উপলক্ষে বীণাকে লইয়া একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যার ভবনে গিয়া উহাকে বহুদিন পরে দেখিতে পারিবেন এবং ভ্রাতৃনির্ব্বাচিত পাত্রটিকে দেখিয়া আনাইয়া দেখিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

সেদিন বৈকাল বেলা কাকীমার ঘরে বসিয়া সুরেন জলখাবার খাইয়া কাকীমার নিকটে বসিয়া পান খাইতেছিল, তখন তার কাকীমা বলিলেন "একটী ভাল দিন দেখে খোকাদের নিয়ে এসে বাবা, আমি একা আর থাকতে পারিনে" কাকীমার কথায় সুরেন্ বলিল "এইত যোটে তিন মাস হইল মা, এর মধ্যে তাড়ি কি? খোকাও একটু বড় হোক না, তখন আনা যাবে"। "তোমার চিঠি পত্র পাচ্ছ সুরেন্" বলিতে বলিতেই তিনি চাহিয়া দেখিলেন—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটী মেয়ে তার পাশের গোড়ায় প্রণাম করিল এবং অদূরে ম্লানমুখে তার মাতা দাঁড়াইয়া। মেয়েটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি যাহার মাথায় দিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর শান্ত হইয়া তারাসুন্দরী সুরেনকে বলিলেন "সুরেন্! তোর দিদিকে প্রণাম করলিনে বাবা?" সুরেন্ ততক্ষণ নবযৌবন বীণাপাণির দেহের সৌষ্ঠব মন গঠন, ঢাকাকুলের মত গৌরকান্তি এবং চল-চল লাবণ্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়া সেই রূপসুধা একমনে পান করিতেছিল। বীণাও সুরেনের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়াছিল। কাকীমার কথায় লজ্জিত হইয়া সুরেন্ তাড়াতাড়ি আগিয়া দিদিমাকে প্রণাম করিল। কাকীমা মাকে কহিলেন "এই যে খোকা আবার ছেলে মা"। দুর্গাসুন্দরী সুরেনের [illegible]

সস্নেহে চাহিয়া বলিলেন "তোমার কাকীমার কোলেপিঠে হ'য়ে বেঁচে থাক দাদা"। তুমিই ওর সম্বল। তোমার দিকে চেয়েই ও বেঁচে আছে"।

'তা জানি দিদিমা' বলিয়া সুরেন্ কাকীমার প্রতি চাহিয়া বলিল "দিদিমার সাথে গল্পকর মা, আমি ততক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসি", বলিয়া সে চলিয়া গেল। সুরেন্ চলিয়া গেলে তারাসুন্দরী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কে মা"? দুর্গাসুন্দরী তখন বীণার পরিচয় দিয়া মেয়েকে সকল কথা শুনাইলেন। তারাসুন্দরী তখন প্রশ্ন করিলেন "ওরত বিয়ে হয়নি মা, ওত বেশ বড় হয়েছে"। দুর্গাসুন্দরী বলিলেন —ওর বিয়ের জন্যই ত মা এসেছি। মোহিত বলে' একটী ছেলের সঙ্গে আমার এক ভাই ওর সম্বন্ধ উপস্থিত করেছে। সে এবার বি, এ, দিচ্ছে। পরীক্ষা হোয়ে গেলেই ওকে এখানে দেখতে আস্‌বে। বেশত মা মেয়েটী, দেখতে যেন একখানি জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমা। এস বীণা এস এখানে এসে বোস" বলিয়া সস্নেহে তিনি তাকে নিকটে বসাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্র এখন আর সে সুরেন্দ্র নাই। রূপের মোহ তাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। সে সময়মত খায় না, স্নান করে না, রাত্রে ঘুমায় না, তার মন রূপের পিছনে ছুটিয়াছে। আজ এক সপ্তাহ হয় বীণারা আসিয়াছে। সেই প্রথম দেখাতেই সে মজিয়াছিল। তারপর এই কয়দিনে দিন দিন বীণার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। বীণার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি তার হৃদয় ছাইয়া ফেলিল। বীণার কথা সে আর ভাবিত না বীণার সুন্দর মুখখানি দেখার জন্য তার চক্ষু দুইটী চারিদিকে ঘুরিত। দুইটী কথা শুনার জন্য সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ থাকিত। নারী জাতিকে মনে মনে সে ঘৃণা করিত এবং বলিত ইহাদের মত খারাপ লোক জগতে নাই। এরা দুইটী মিষ্ট কথায় পুরুষদের সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে এবং সহজেই বিসর্জ্জন দিতে পারে। ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বীণার উপরও তার এই বিশ্বাস ছিল। তাই তার মন ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ছেলের এরূপ ভাব দেখিয়া তারা সুন্দরী উদ্বিগ্না হইয়া উঠিলেন। ছেলেকে ডাকাইয়া বলিলেন "বৌমাদের এখন আনাই বাবা, আর কতদিন সেখানে থাক্‌বে। নত মুখে সুরেন বলিল, তারও কতদিন থাক্ না মা, বলিয়া তাড়াতাড়ি সুরেন্ চলিয়া গেল। কিন্তু তারাসুন্দরী নিশ্চিন্তা হইতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, কতদিন হয় বৌমা সেখানে আছে, এত দিনত অন্য কোন বার থাকেনি, এইজন্যেই ছেলে এমন মনমরা হইয়া থাকে। ব্যস্ত হইয়া তিনি বধূকে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে বীণাও সুরেনের এ ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। বীণা আইও যেইই সে যখনই সুরেনের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিত, তখনই দেখিতে পাইত সুরেন তার দিকে অনিমিষনয়নে তাকাইয়া আছে। অমনি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। ইহাতে সুরেন্দ্রের মন আরও উত্তেজিত হইত। দিন দিন সে প্রমুত্ত হইতে লাগিল এবং সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সেদিন লীলার আসার কথা, কিন্তু সুরেন্ তাহা জানিত না। এক মাস হয় সুরেন্ আর লীলাকে পত্র লিখেন না। লীলা আসিবে শুনিয়া বীণা খুব আহ্লাদিতা হইয়া লীলার ঘর সাজাইতে ছিল, এমন সময় সুরেন ঘরে প্রবেশ করিল। বীণা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সুরেন্ অগ্রসর হইয়া তার হাত দুটী ধরিয়া ফেলিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল "যেওনা, যেওনা বীণা; আমার প্রতি একটু দয়া কর, দেখ, তোমার ঐ রূপ আমার কি দশা করেছে"। "ছিঃ-ছিঃ একি? আপনার মস্তিষ্কের হয়েছে নাকি? ছেড়ে দিন্ ছেড়ে দিন্" বলিয়া সবলে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বীণা স্তম্ভিতা হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। "বীণা, বীণা, তোমার নামটীও কেমন মধুর, বীণা। তোমার সবই মধুর, তুমিও মধুর। সত্যই বীণা, তোমার ভুবনমোহন ঐরূপ আমায় মুগ্ধ করেছে। আমি আর সহ্য করতে পারিনে বীণা, তুমি অন্ত নিষ্ঠুর হইও না, যদি জান্তে বীণা আমি তোমায় কত ভাল বাসি। বীণা, বীণা, আমার উপর সদয় হও"। বলিতে বলিতে দুইবাহু প্রসারিত করিয়া, বীণাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিল। ত্রস্তে বীণা এক ধাক্কায় সুরেন্‌কে সরাইয়া দিয়া, কোপিতা সিংহিনীর ন্যায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—

"সরে যাও সরে যাও আমার ঐদিকে, এদিকে এসোনা কিন্তু, খবরদার"। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া পুনরায় কহিল "ছিঃ ধিক্ তোমাকে ধিক্ তোমার ভালবাসাকে। তোমার মন এত নীচ? তোমার এমন নীচ প্রবৃত্তি? ধিক্ তোমার মনুষ্যত্বকে। অনেক দিন হতে তোমার এভাব আমি লক্ষ্য করছি, কিন্তু তুমি এত অধঃপাতে গিয়েছ তা কোন দিন মনে করিনি। ছিঃ ছিঃ ভালবাসা বলতে তোমার মুখে বাধলনা? একে তুমি ভালবাসা বল? ভালবাসা কাকে বলে তা জান না? যে প্রকৃতই ভালবাসে, সে ভাল বাসাতেই সুখী হয়। যাকে ভালবাসে তার ভালবাসা না পাইলেও সে দুঃখিত নয়। সে ভাল বাসিয়াই সুখী। প্রাণ উৎসর্গ করিয়াও সুখী। সে কিছু চায় না, সে শুধু হৃদয় দিয়াই সুখী। তার মধ্যে কোন প্রকার পাপ অভিসন্ধি তার মনে

আসে না। তার ভালবাসাই হচ্ছে পবিত্র এবং প্রকৃত ভালবাসা। আর তুমি? রূপের নেশায় বিহ্বল হয়ে পড়েছ; পাপ প্রবৃত্তি তোমার মনে। কি ছার রূপ দুদিনের মোহ মাত্র, এই মোহের নিকটই তুমি জয়ী হ'তে পারলে না, তুমি না মানুষ? তোমার মনুষ্যত্ব কোথায়? ধিক্ তোমাকে।" বিস্মিত, স্তব্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ পুত্তলির মত সুরেন দাঁড়াইয়া রহিল। সে মনে করিয়াছিল সহজে নারীর নারীত্ব বোধ হয় না। কিন্তু আজ নারীদের সে দেবীর আসনে দেখিল। সে যে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছিল, এই নারীই তাকে উদ্ধার করিয়া পথ দেখাইয়া দিল। তখন তার মন কৃতজ্ঞতায় এই নারীরই পায়ের তলায় লুটাইতেছিল। লীলা যে আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তাদের কথা শুনিতেছিল, তাহা বীণার অজ্ঞাত ছিল না! সে ডাকিল "লীলা"

"দিদি" বলিয়া ছেলে কোলে করিয়া সেই কক্ষে লীলা আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন যদি সেখানে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও সুরেন্ এত বিস্মিত হইত না। লজ্জিত হইয়া অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। বীণা তখন কহিল "সুরেন্! লীলার আমি মেসতুত বোন্। আমি ওর বয়ঃজ্যেষ্ঠা, সুতরাং আমি তোমার পূজনীয়া, আমাকে প্রণাম কর"। সুরেন্ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দিদির পায়ে মাথা নত করিয়া বলিল—"আমায় মাপ কর দিদি ছোট ভাই বলে, আমার সকল অপরাধ ভুলে' যাও। তোমার নিকট আজ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'ল। তুমি যদি আমায় দিদি নাও হতে, তবু আমি তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে কৃতার্থ হ'তেম্। ছেলেকে দিদির কোলে দিয়া, লীলাও ভূমিষ্ঠা হইয়া দিদির পদধূলি লইল। দুইজনের মাথায় হাত রাখিয়া বীণা বলিল,—তোমাদের আশীর্ব্বাদ কচ্ছি সুরেন্ তোমরা সুখী হও"। এই বলিয়া শুভ্রসুন্দর শিশুটিকে সুরেন্দ্রের নিকট ধরিতেই খোকা হাসিয়া ঝাঁপাইয়া সুরেনের কোলে গেল। ছেলেকে বক্ষে লইয়া সুরেন্ অদূরে জানালার নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় নীচ হইতে ডাক শুনিতে পাওয়া গেল, "সুরেন্, সুরেন্! দেখে যাও, মোহিত এসেছে" মোহিত এসেছে শুনেই হাসিমুখে, বীণা নীচে নামিয়া গেল। দিদির হর্ষদীপ্ত উজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সুরেন্ জিজ্ঞাসা করিল "মোহিত কে লীলা"? লীলা উত্তর করিল "আমার সেই জ্যাঠতুত ভাই এবং দিদির ভাবী বর"। "ওঃ" বলিয়া সুরেন্ চুপ্ করিল। কিছুক্ষণ পর আবার বলিল "আমায় মাপ করতে পারবে কি লীলা? আমি অত্যন্ত অপরাধী। আবার সমস্ত অপরাধ মাপ করে আ বার তেম্নি ক'রে ভালবাসতে পারবে?

লীলা ! আমার পদধূলি মাথায় নিয়া নীরব কাতরে ক্ষমা [illegible] তুমি হাজার অপরাধ করলেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা [illegible] তা কিছুতেই ভাঙ্গবে না।" এতদিন আমি মোহান্ধ হ'য়ে বৃথাই আশাবায়ু [illegible] ছুটেছিলাম লীলা ! কাকার কথাই সত্য হ'ল লীলা, এতদিন তোমা [illegible] চিনতে পারিনি। তোমার ভালবাসায় আজি আমি ভালবাসতে শিখলেম, [illegible] মানুষ হলেম বলিয়া সস্নেহে সুরেন্ লীলাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। [illegible] মুখ লুকাইয়া লীলা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নীচ হইতে [illegible] ডাক আসিল, তাড়াতাড়ি সুরেন্ ছেলে সোহাগ করিতে করিতে [illegible] চলিয়া গেল।

শ্রীমতী-বিভাবতী [illegible]

শ্যামা পূজায়।

কলুষনাশিনী কালি !
এস এ বঙ্গে আজি মা রঙ্গে
পুণ্য-দীপালী আলি'
দিশে দিশে দিশাহারা
মুছে সুত আঁখিধারা—
দুঃখে দৈন্যে জীবনারণ্যে
নিরখি আঁধার কারা !
তোমার শাণিত খর্পরে
নাশিয়া অসুর দর্প রে
এস মা বঙ্গে চরণভঙ্গে
করুণা-পীযুষ ঢালি' !
কালে কালে কতকাল
আবরিবে মায়া-জাল—
ধর্ম্মে কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে
মুখর মরণ-তাল !
তোমার করাল আস্যে মা,
ঘুচয়ে দানব লাস্যে মা,
এস এ বঙ্গে লইতে রঙ্গে
হৃদয়-রক্ত-ডালি।

শ্রীশৈলেন্দ্র [illegible]

প্রেমের জয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

সহরময় রাষ্ট্র হইয়াছে একজন ভদ্রবেশধারী চোর কবর খুঁড়িয়া সমাধিস্থ কোন স্ত্রীলোকের অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। আগামী কল্য প্রকাশ্য দরবারে তাহার বিচার হইবে, বিচার করিবেন স্বয়ং সম্রাট। দলে দলে জনতা এই বিচার দেখিবার জন্য আসিতেছে। দরবার গৃহ জনতায় পূর্ণ। দরবার গৃহের মধ্যস্থলে মণিমাণিক্য-খচিত কণকৰকারুকার্য্যময় সিংহাসন। সিংহাসনের সম্মুখে দুই দিকে আতর ও গুলাবের দুইটি কৃত্রিম ফোয়ারা, একটি দিয়া গুলাব অপরটি দিয়া আতর ছিদ্র মুখ দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে। সম্রাটের সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে উজির, কাজি ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি—বামদিকে মাননীয় পারিষদবর্গ, আমীর ওমরাহগণের উজ্জ্বল মখমলমণ্ডিত চারু-কারুকার্য্যময় সুখাসন। সম্রাটের সিংহাসনের মস্তকোপরি মখমলের উপর বহু-মূল্য শশ্মাচুমকি কিংখাবের চারু কারুকার্য্যময় চন্দ্রাতপ। দরবার গৃহ-মেজ কাশ্মিরী গালিচায় মণ্ডিত। আতর গুলাব হেনার সুমধুর গন্ধে আমোদিত। দরবার গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিচারদর্শনার্থী সাধারণের মখমলমণ্ডিত আসন। প্রাঙ্গণ গালিচায় মণ্ডিত, উপরে চারু চন্দ্রাতপ, ইহার কারুকার্য্য শিল্পীর মানস প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। চারি ধারে ঝাড়লণ্ঠন শামদান মখমলমণ্ডিত হইয়া শোভা পাচ্ছে। দরবার প্রাঙ্গণে জনসাধারণ বিচারদর্শনের জন্য বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। হাবসী প্রহরিগণ জনকোলাহল থামাইয়া জানাইল—সম্রাট আসিতেছেন। সম্রাট দরবারগৃহে প্রবেশ করিতেই জনসাধারণ ও পারিষদগণ, উজির, কাজি, উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ, আমীর, ওমরাহগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক-যোগে কুর্ণিস করিল; সমস্বরে সকলে সম্রাটের দীর্ঘ জীবন এবং জয়ঘোষণা করিল। সম্রাট আসন গ্রহণ করিলে সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিল।

দরবারকক্ষ নীরব; জনসাধারণের হৃদয় বিচারের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সহর কোটাল যোড়হস্তে আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছিল। উজির সাহেব বন্দীকে দরবারগৃহে আনিবার জন্য সহর-কোটাল মোবারক আলিকে ইঙ্গিত করিলে সে ভূমি প্রণত হইয়া কুর্ণিস করিয়া প্রস্থান করিল। অল্পকাল পরে সহর-কোটাল শৃঙ্খলিত বন্দীকে লইয়া দরবারগৃহে প্রবেশ করিল। বন্দীকে দেখিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যভাব দেখা দিল। সকলেই দেখিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী দিব্য গৌর, উন্নত পেশীপুষ্ট দেহ, তাহার কুসুমের মত সুকুমার মুখশ্রী এখন বিষাদমলিন, চক্ষু দুটি শোকব্যঞ্জক ও অশ্রুভারাক্রান্ত।

বৃদ্ধ কাজি সাহেব স্ফটিকের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সহর কোটালের দিকে তাকাইয়া বন্দীর জবানবন্দী লইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কোটাল বন্দীকে বলিল, "যুবক, তোমার স্বপক্ষে তোমার বলিবার কি কিছু আছে?"

স্তব্ধজনতার মধ্যে এক মহাচাঞ্চল্য বিদ্যুৎস্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া গেল। সকলেই বন্দীর মুখের দিকে চাহিয়া।

বন্দী নীরব নিশ্চল; দৃষ্টিভঙ্গিমা যেন স্বপ্নজড়িমাপূর্ণ;—যেন কোন সুদূর ভবিষ্যতের পা যুবক প্রকৃতিস্থ হইয়া কুর্ণিশ করিল। ধীর অথচ নিনাদ কণ্ঠে বলিল,—"ভারতসম্রাট, সাহান সাহ! অতি সামান্য কথাই এ বান্দার বলিবার আছে"। বন্দী মিনিট দুই নীরব নিশ্চল; দরবার গৃহ ধীরস্থির। বন্দী পুনরায় ভূমি প্রণত সেলাম করিয়া বীরস্বরে বলিল, "ভারতের সম্রাট! সাহান সাহ! যাঁর কবর খনন অপরাধে, আজ অপরাধিরূপে জাঁহাপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান,—সে এ গোলামের প্রিয়তমা। সিরিয়াদেশ এ গোলামের জন্মভূমি। অতি শৈশবে মাতৃহীন হই; আমার স্নেহময় পিতার স্নেহাঙ্কে লালিত পালিত হই। আমার মাতার মৃত্যুতে পিতা যারপরনাই শোকে কাতর হন। ইহার কিছু দিন পরে পিতা তাঁর শৈশব ও যৌবনের সুখস্মৃতিপূর্ণ প্রিয় নিকেতন সিরিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া আগ্রায় তাঁর এক বন্ধুর গৃহে বসবাস করেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার যখন বয়স ষোড়শ বর্ষ, সেই সময় পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পিতা তাঁর সারা জীবনের উপার্জ্জিত ধনসৌলত এক হস্তে—অপর হস্তে আমার হস্ত তাঁর বন্ধুর করে অর্পণ করেন। আমার পিতৃবন্ধু আমাকে অতিশয় স্নেহ যত্নে তাঁর প্রাণসমা দুহিতা লাইলির মত আমাকে পালন করেন। আমার পিতৃবন্ধুও বিণক্‌টীক। ইনি রত্নব্যবসায়ী; প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক।—লাইলিও শৈশবে, মাতৃহীন;—সুতরাং আমরা পরস্পরের ব্যথার ব্যথী হইলাম। লাইলি আর আমি এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত হাসিভাষ খেলিতাম। লাইলিকে আমি যে

কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাঁহাদের! তা তাঁহারা জানান যায় না; সাধ্য নাই! আমাদের এ ভালবাসার ব্যবসায় পূতিগন্ধ ছিল না—আমাদের এ ভালবাসা ছিল উদার। হেনার গন্ধের মত মধুর! লোবান ওগুগুলের মত পবিত্র। হৃদয়ের গোপন পুরীর চিরতৃষ্ণাতুর আত্মার মুক্ত ভালবাসা!

বন্দী পুনরায় নীরব; তাহার বুকে চোখে যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গলীলা নাচিয়া গেল।

দরবার গৃহ পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত, সকলেরই মুখে চাঞ্চল্য ভাব। বন্দী পুনরপি ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল,—ভারতসম্রাট! সাহেনসাহ! তবে এ গোলামের কথা অনুগ্রহ করিয়া শুনুন, সুতুমার জীবন-উষার প্রথম প্রভাতে সবে যে দিন আমার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে লাইলিকে দেখি—সে যেন একটা স্বপ্ন! সেদিনের মধুর স্মৃতি উৎসব রজনীর স্মৃতির মতই মধুর ও উজ্জ্বল। প্রথম দিনের প্রথম দর্শন যেন আমার হৃদয়ে কি যেন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে; সে যে কি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না, আপনারা বুঝুন—সমস্ত হৃদয় দিয়া অনুভব করুন! লাইলিকে দেখিতাম—চকোর যেমন মুগ্ধনয়নে অতিসার রূপ দেখে—ঘূঘুম যেমন তারকার রূপ ধ্যান করে, আমিও সদাই লাইলির রূপের সুরায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। লাইলির সঙ্গ যেন দিন দিন আমায় তৃষ্ণা বাড়াইয়া দিয়াছিল; গাত্র সুখস্পর্শ, মুখস্পর্শ যেন সুখস্বপ্নের মত মধুর! তার সাক্ষাৎ যেন নীরব নিশীথে ইমনের ঝঙ্কারের মত মধুর! আমার প্রিয়তমা লাইলি যেদিন রাগে তাহার লোহাগের বীণ স্নেহ-অঙ্কে লইয়া বাম করে ধরিয়া সবলে গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহার রক্তভরা লীলাচঞ্চল অঙ্গুলিসঙ্কেতে যাদুর ঝঙ্কারের সহিত আপন মধুর কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিত,—

আরুচেহ্ রেয়ে জিবাজেতু রিশকে বুতানে আরবি।
হরচন্দ্, আগফৎ মিকুনম্, চরহসনে আঁবানো তারি॥
তুআন্ত পরী, চাবুকতরী, ওআ্ যরগেওল নাজুক তারী।
ওআ্ হরাচে ওআন্ত বরতরী; হরা আঘাইব দিলবরী।
আলম হামা এগ্ মাত্র তু, গলতে খোদাপরস্তা এতু।
ই নরগিসে (১) রোনাজেতু; আওর দারমুমে দিলবরী॥ (২)

(১) নরগিস পুষ্প পাতার কম্পিতায় চক্ষুর সহিত উপমিত হয়।

(২) প্রিয়তম। আমরী অশ্বারোহিতার মত তোমার তুরঙ্গম দ্রুতগামী, হিংসালোকের

আমার মনে হ'ত যেন হেনার বনে বুলবুলের ঝঙ্কার শুনিতেছি। ধীরে ধীরে আমার হৃদয়পদ্মের দলগুলি আত্মপ্রকাশ করিত। মনে হ'ত যেন সৃষ্টির চারি পাশে অমৃতের ঢেউ বয়ে যাচ্চে; দিকে দিকে স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য-সুষমার সুচারু বিকাশ! মনে হ'তে লাগিল এই বুঝি বেহেস্ত! তাই দিকে দিকে মিলন উৎসব! রঙিন হাওয়ার কাপড়ে ফুলের মত কোমল দেহলতা আবৃত করিয়া পরীরা মিলনের গান গাহিয়া হাওয়ার মত আকাশের কোলে মিলিয়ে যাচ্ছে! তাদের অঞ্চল বাতাসে পুষ্প-মুকুল নয়ন মেলিতেছে, তাহাদের নয়ন কিরণে রূপের আলোয় নীলাকাশ ঝলমল কচ্ছে! চারিধারে যেন কার বাঁশরীর রাগিণী ভেসে যাচ্ছে! এ মিলন উৎসবে বাহিরের জগতের কেহ নাই,—শুধু আমরা দুটিপ্রাণী—আমার প্রেমময়ী লাইলি আর তার প্রেমের ভিখারী আমি। মেরি পিয়ারে লাইলি গাহিত,—

মনতু শুদম্ তুমন শুদি।
মন্ তন্ শুদম্, তুজাশুদি॥ (৩)

আমার মনে হ'ত যেন জন্মজন্মান্তর হ'তে আমাদের দুটি গোপন হৃদয় বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ির মত এক হ'য়েছে! আমাদের দেহের যেন কোন ব্যবধান নাই; আমারি এ দেহ যেন তার প্রাণ!

বন্দী যুবক বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার মুখে চোখে—এমন একটি ভাব ফুটিয়া উঠিল, দেখিলেই মনে হইবে যেন সে গত সুখস্মৃতির দোলায় দুলিতেছে। বন্দী মিনিট খানেক নীরব, নিশ্চল। তারপর ধীরস্বরে বলিতে লাগিল,—জাঁহাপনা! লাইলির পিতার অন্তিম নিশ্বাস হঠাৎ একদিন বায়ুতে মিশিয়া গেল। আবার আমি লাইলির সহিত পিতৃহীন হ'লাম। লাইলির পিতা অন্তিম শয্যায় শুইয়া আমার প্রিয়তমা লাইলিকে আমার হস্তে সঁপিয়া দিয়া জান। স্নেহময় পিতার মৃত্যুতে লাইলি বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। সে একদিন অশ্রুভরা চক্ষে মিনতি জানাইল, যে সে আর এই কোলাহলপূর্ণ আগ্রায় থাকতে

বাক্তির মনে কেবল দুঃখই বাড়ায়। প্রিয়তম! যতই আমি বলি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি উপমা-রহিত, তুমি পরী অপেক্ষাও জানী, তোমার প্রাণ পেলব কুসুমের মত সুকোমল, তোমার সহিত তুলনা করি এমন কোন জিনিষ ইহ সংসারে আমার অগোচর, তুমি নরগিস পুষ্পের মত চমৎকার! রীতিতে পরকী চিত্ত চুরি করিতে শিখিয়াছ, সেই জন্যই বলি হে প্রিয়তম! হে মনোচোর! তোমারি তুলনা তুমিই।

(৩) আমি তুমি হইলাম তুমি আমি হইলে, আমি দেহ হইলাম, তুমি প্রাণ হইলে

পাচ্ছে না, অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে থাকতে চায়। তারপর আমরা কাশ্মীরে আসি, সুষমাময়ী কাশ্মীর লাইলির মানসিক অশান্তি নষ্ট করিয়া পূর্ব্ব প্রফুল্ল প্রকৃতি ফিরাইয়া দিল। রূপসীর উপকূলে উপত্যকার উপর কপোত-কপোতীর নীড় বাঁধিয়া মনের আনন্দে ছিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীত-তরঙ্গের মত ধীর এবং শান্ত হইয়া আসিতেছিল! যুবক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, জাঁহাপানা, সাহানসাহ! খোদাতালা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই। যার সঙ্গ লাভ করি, সেই এ দুর্ভাগাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আমার স্নেহময়ী গর্ভধারিণী, স্নেহময় পিতা, পিতৃবন্ধু সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে। তারপর একমাত্র প্রাণের দোসর, আমার ধমনীর উষ্ণ শোণিত লাইলিকে লইয়া কপোত-কপোতীর মত ছিলাম—প্রেমময়ী লাইলি সেও আমাকে ছাড়িয়া গেল! স্বপ্নভরা দৃষ্টিতে একবার মাত্র আমার দিকে তাকাইয়া স্বপ্নসুন্দরী কোন্ স্বপনের রাজ্যে চলিয়া গেল! বন্দী হস্তস্থিত রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—

লাইলিকে সমাধিস্থ করার দিন হইতে আমি আর আমাদের প্রিয় কুটীরে ফিরি নাই; সেই দিন হইতে পর্ব্বতে, বনে, গান গাহিয়া বেড়াই। লোকালয় জন কোলাহল আমার বড়ই অসহ্য হইত। দিনের আলো শেষ হইলে, রাত্রি আসিলে চোরের মত আসিয়া আমার প্রিয়তমা লাইলির সমাধির উপর শুইয়া থাকি। লাইলির সমাধি আমার জুড়াইবার একমাত্র স্থান, কোন দিন রাত্রে সারেঙ্গ বাজাইয়া সারারাত্র গান গাইয়া কাটাই, প্রাণের বেদনা লাঘব করি, ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা! উষার বাতাস বহিবার পূর্ব্বে, ভোরের আলো ফুটিবার পূর্ব্বে শুকতারার সঙ্গে আমিও আবার বনে জঙ্গলে পালাই।

এক বৎসর হইল লাইলিকে চির দিনের জন্য সমাধিস্থ করিয়াছি; গত চারি দিন পূর্ব্বে এক বৎসর পূর্ণ হয়, দিনের আলো যেন সেদিন আর ফুরায় না—বনে বনে ঘুরিয়া নানা রঙ্ বেরঙের ফুল সংগ্রহ করিয়াছি—আমি আর বিলম্ব সহ্যে পাচ্ছিলাম না—সমস্ত দিন লাইলির চিন্তায় উন্মাদের মত হই; এক বৎসর লাইলিকে দেখি নাই—সেই মধুর মুখখানি দেখিব, সে শুকতারার মত স্নিগ্ধ প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইবে—হায়! খোদা, হায়, মেহেরবান আল্লা!" বন্দী রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভারতসম্রাট! শাহান সাহ! জাঁহাপানা! এই উন্মাদ চিন্তাই, আমাকে আমার নিদ্রার মধুর স্বপ্ন, জাগরণের মধুর কল্পনা—আমার প্রিয়তম লাইলির সমাধি খুঁড়িতে বাধ্য করেছিল; সাহান সাহ! আমি চোর নই, দস্যু বা তস্কর নই,—আমি হৃতসর্ব্বস্ব দুঃখী মাত্র। জাঁহাপনা আমার বিচার করুন!" বন্দী যুবক আভূমি প্রণত হইয়া কুর্ণিস করিয়া অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

দরবার গৃহ এবং প্রাঙ্গণ আশ্চর্য্য রকম শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল; জনসাধারণ যেরূপ উৎকর্ণ হইয়া বন্দীর কথা শুনিতেছিল, যেন তাহারা তন্দ্রামগ্নের মত স্বপ্ন দেখিতে ছিল! বন্দীর কথা শেষ হইতেই তাহাদের চমক্ ভাঙ্গিল স্বপ্নের ঘোর কাটিল! জনতার মধ্যে চিন্তার স্রোত বহিয়া গেল—যেন তাহারা আরও কিছু শুনিতে চায়।

* * * * *

সম্রাটের সিংহাসনের দক্ষিণ ও বাম দিকের পর্দ্দা নড়িয়া, পর্দ্দার আড়ালস্থ মহিলাগণের চাঞ্চল্য ভাব প্রকাশ করিল। সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণের পুরন্ধ্রী, সম্রাটের রঙ্গমহলের অন্তঃপুরিকারাও এই বিচার দেখিতে আসিয়াছেন।

রুমেলি চিন্তামগ্না নুরের গাল টিপিয়া সহাস্যে বলিল, কি নুর! কি ভাবছিস্! দিদি, এ কি সেই লোক, নুর বলিল,—"কিছু দিন পূর্ব্বে রাত্রে কার মর্ম্মভেদী সঙ্গীতের রাগিণী বাতাসে ভেসে যাচ্ছিল,—আমি কেবল সেই কথাই ভাবছি"।

হ্যাঁ, এত সেই লোক! বল্লে ভুল্লি না যে রাত্রে সমাধির উপর সারেঙ্গ বাজাইয়া রাত কাটাই।

নুর নেহার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দিদি, তুমি একে চোর বল? এতো চোর নয়—খোদা এরই ত সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছে; তবুও তোমার রূপম কেমন বিশ্বাসী, এ প্রকৃতই প্রেমিক,—দেখি সম্রাট্ কি বিচার করেন।

যুবকের কথা শেষ হতে না হতে বৃদ্ধ কাজী, "জাঁহাপানা বন্দীর প্রতি কি বিচারের আদেশ হয়" বলিয়া সম্রাটের মুখের দিকে তাকাইলেন। সম্রাটের যেন চমক ভাঙ্গিল; বলিলেন, যুবক, তোমার প্রেমের জয় হইয়াছে! তুমি মুক্ত!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

ভক্তের নিবেদন।

কি নামে ডাকিতে হয়,
পূজে বা কি দিয়া,
কিছুই না জানি প্রভু,
আছি মন নিয়া
বসিয়া তোমার তরে,
চেয়ে পথ পানে,
শুনি সবে বলে তুমি
আছ সর্ব্ব স্থানে।
যে অভাব হয় যার
তুমি কর দূর,
চাহিলেই দাও না কি
দয়ার ঠাকুর!
আজ ইহা, কাল উহা,
কেবল চাহিতে
পাছে তুমি ত্যক্ত হও
ভয় হয় চিতে।
সাধ নাই তাই মোর
ধর্ম্ম অর্থ কামে;
কেবল তোমারে চাই
এ হৃদয় ধামে!

শ্রীভুবনমোহন দাশগুপ্ত কবিশেখর।

বলিদান।

বৈশাখের শেষভাগ ; প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যদেব যে অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন—বেলা তিনটা বাজিতে চলিল, এখনও তার শেষ নাই। মাঝে মাঝে গরম বাতাস গাছ পালা ভেদ করিয়া সাঁই সাঁই শব্দে বহিয়া যাইতেছে, কদাচিৎ কোথাও কোন দুরন্ত গাভী বৃক্ষতলে বসিয়া রোমন্থন করিতেছে, আর মাথার উপর আগুনের হল্‌কা লইয়া তার সায়াহ্নের আহারের কথা ভাবিয়া সোৎসুক-নেত্রে দূরে পর্ণকুটীরে তার খোঁয়াড়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। বিজনের গ্রাম্যপথ নীরবতার কুহকে আচ্ছন্ন; কেবল দূরে বহুভারাক্রান্ত একখানি গোশকট আর চলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তার "ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ঘটাং" শব্দে ক্ষণেকের জন্য পথ মুখরিত করিতেছে। মাঠে জলাভাবে তৃণের নাম মাত্রও নাই ; চতুর্দ্দিকেই ধূ ধূ করিতেছে। জগৎ সংসার নিথর, নিস্তব্ধ ; কেবল এক শ্রীপুরে বোসেদের বাড়ীর বাসন্তী দিবানিদ্রায় প্রশ্রয় না দিয়া কি অপূর্ব্ব জিনিষ রচনা করিতেছিল। সে উহা অন্যের অলক্ষ্যে অনেকদিন হইতেই আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু ইহাতে কোনদিনই তার দুপুরের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় নাই ; কারণ সে যে প্রত্যহই রাত্রে তার বিশ্রামের ক্ষুদ্র অবসরগুলি উহাতেই কাটাইয়া দিত। সজ্জিত প্রকোষ্ঠে একলা সে নিদাঘের দুরন্ত রৌদ্রে যে শিল্প রচনা করিতেছিল, তাহাতে তার চক্ষুর ভিতর দিয়া হৃদয়ের সব তন্ত্রীগুলি একের পর এক বাঁধা পড়িতেছিল; বাসন্তী মখমলের চুড়ার উপর ফুল তুলিতেছে। এক একটী ফুল সে ফোটাইয়া তুলে, আর তার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি সব একই সুরে বাজিয়া উঠে; আশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবার তার গোলাপী আভাসমিশ্রিত কুচি কুচি আঙ্গুলগুলি নূতন ফুলের রচনায় প্রবৃত্ত হয়। সময় নাই যে তার, তা না হ'লে যে নব উদ্যম তার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাতে এতদিনে সে কাজটা একেবারেই সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিত। জগতে উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে কোনকাজই শেষ হয় না ; সে বোধ হয় তাহা জানিত, তাই তার মনটা আজ ক'দিন থেকে ঐ মখমলের গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংসারে অফুরন্ত কাজ, সবই সে নির্লিপ্তভাবে করিয়া যায়, কেবল নিষ্ফল যে

মধ্যমণিই। শিল্পে সে যে কবিত্ব ফুটাইয়া তুলিতেছিল, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া গেল।

বাসন্তীর উৎসাহ বাড়িবার কারণও ছিল; সে যে সেদিন সকালের ডাকে স্বামীর চিঠিতে জানিতে পারিয়াছে যে, তিনি শীঘ্রই কলিকাতা ছাড়িয়া শ্রীপুরে আসিবেন। এতদিন পড়ার খাতিরে কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল, গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হওয়াতে বাড়ী আসা ছাড়া আর উপায় নাই। চিঠিতে কোন্ তারিখে রওনা হইবে, তার কোন খবর ছিল না; কিন্তু মনে তার স্বতঃই উঠিছিল যে, স্বামী দর্শন দুই একদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কাজেই বিপুল উৎসাহে সে তার শিল্পরচনা করিতেছিল; আবার ছয় সাত মাস পরে স্বামীর সহিত দেখা হইবে, এ আশায়ও তার মনটা ভিতর থেকে নাচিয়া উঠিতেছিল। আশায় এত সুখ, জানিনা,—সাক্ষাতে বাসন্তীর হৃদয় কোথায় ভাসিয়া যাইবে! দিন ক'টার পরমায়ু পূর্ব্ব হইতেই চব্বিশ ঘণ্টায় নির্দ্ধারিত না হইলে, সে বোধ হয় উহাদের ঘাড় মট্‌কাইয়া অসময়েই সদ্গতি করিত। বাসন্তী সুখের জন্য লালায়িত; কিন্তু সে ভাবে নাই যে, সুখ চিরদিন কোথাও বাঁধা থাকে না; মানুষ যদি দৈন্যের সহিত সখ্যতা না করিতে পারিত, ত সুখ পাওয়া তারপক্ষে বড়ই দুর্লভ। চিরসাথী যে তাহাকে না চিনিয়া, ক্ষণেকের জন্য অন্যের সঙ্গ লওয়া বাঞ্ছনীয় কি না, বাসন্তী তাহা বুঝিল না; তাই সে আজ স্বামীর আগমনবার্ত্তায় উৎফুল্ল।

২

শ্রীপুরের বোসেরা বর্দ্ধিষ্ণুঘর বলিয়া বহুদিন হইতেই কায়স্থসমাজে পরিচিত; বংশে ষষ্ঠীর কৃপা কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলেও এতদিন লক্ষ্মীর কৃপাকণা হইতে তারা বঞ্চিত ছিল। মাঠে ধান, পুকুরে মাছ ও বাগানের তরীতরকারীতে কোন রকমে তাদের দিন গুজরান্ হইত। আর পিতৃপুরুষদের প্রদত্ত জমী জমাতে ধোপা নাপিতের বাস থাকায় পার্থিব অভাবগুলা কায়ক্লেশে পূরণ হইত। কিন্তু, এ ভাবের ঘরকন্না বেশীদিন টিকিল না। দূরপল্লীগ্রামে থাকিয়াও সহরের বিজয়ভেরী তাদের কাণে পঁহুছিল। সে ভেরী কেবলই অভাবের কথা শুনাইয়া যায়; কিন্তু তাহা কেমন করিয়া মোচন করিবে, সে খবর কখনও দেয় না। বঙ্গের ধনধান্যপুষ্পভরা গ্রামগুলির একে একে উৎসন্ন যাইবার কারণই এই। কিন্তু, বোসেদের বাবুরা অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবিল না; তারা শুধু ভাবিল, নিজের সুখ সে সুখে কতটা শান্তি থাকিতে পারে, তাহাও বুঝিল না। কাজেই অভাবে তাদের স্বভাব নষ্ট হইল। বংশের মধ্যে বিনোদ বাবুই মাথাধরা; তিনিই প্র

দেখাইলেন। কলিকাতায় আসিয়া কি একটা সামান্য ব্যবসায়ে তাঁর বরাত খুলিয়া গেল; রজতমুদ্রার মধুর নিক্কণে একবার মাথা টলমল করিলে আরত রক্ষা নাই। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কারবার করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও দেশে যান, কিন্তু, সে কেবল আর পাঁচ জনের মাথা খাইতে; তারা দেখে বিনোদের অবস্থা, আর ভাবে, আমরাও এমন হইব না কেন? ক্রমে দেশে কায়স্থব্রাহ্মণের সংখ্যা কমিতে লাগিল; সকলেই নিজের মামুলী অদৃষ্ট ফিরাইবার জন্য সহরের দিকে ছুটিল।

বিনোদের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিজয় কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। বাপের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত ছেলেটিও মানুষ হইয়া উঠিতেছে। বি, এ পাশ করিয়া সে এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবটিও বড় মধুর ছিল; তার মত বিনয়ী নম্র ও পরোপকারী তখন দেশে আর কেহ ছিল কিনা, সন্দেহ। আজ কয়েক বৎসর হইল বাসন্তীর সহিত তার বিবাহ হইয়াছে। পিতা মনোমত বউ পাইয়াছেন বলিয়া বড় খুসী; কিন্তু বাসন্তী অনাথা, এ কথা ভাবিয়া মনটা কখনও কখনও তাঁর দমিয়া যাইত। তা' বলিয়া তাহাকে মেয়ের মত স্নেহবদ্ধ করিতে কখন ভুলিতেন না! বাসন্তীও রূপেগুণে অতুলনীয়া ছিল; কাজে কর্ম্মে কখনও সে কাহারও বিরাগভাজন হয় নাই। রমণী রূপে শুধু ঘর আলো করে না, গুণেই তার মাধুর্য্য বাড়ায়। নূতন ঘরে বাসন্তী তার নূতন খেলনা লইয়া কেমন খেলা করিতেছে, যে দেখে তারই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না; তাই তার অদৃষ্টচক্রে আবার কি নূতন করিয়া রচিত হইতেছিল, সে তার কোন খবরই পাইল না।

৩

যথাসময়ে বিজয় বাড়ী আসিল। অনেকদিন হইতেই তার আগমনবার্ত্তায় বাড়ীশুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব ছিল, আজ তাহাকে পাইয়া আনন্দের আর সীমা রহিল না। পূর্ব্ব হইতেই বিনোদ তার সদ্যঃক্রীত জমিদারীর চৈত্রকিস্তির খাজনা দিতে বাড়ী আসিয়াছে, কাজেই শ্রীপুর এখন বেশ সরগরম। কতলোক বিজয়কে দেখিতে আসিয়া তাহাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, এবং বিনোদের ভাগ্যলক্ষ্মী যে বড়ই সুপ্রসন্ন, তাহা তাহার ছেলে হইতেই বুঝা যাইতেছে, তাহাও বলিতে ভুলিল না। কিন্তু, মানুষ যতই প্রখরবুদ্ধি হউক না কেন, সে মানুষ ছাড়া

আর কেহই ত নয়, লীলাময়ের মনে কি আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ক্ষমতাত তার নাই। তাই সে ভাবে এক, আর হয় এক।

বাড়ীর ভিতর মাকে নমস্কার করিতে গিয়া বিজয় আনন্দহিল্লোলের মাঝে গয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে ভাই-ভগ্নীর আনন্দ উৎস তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সেও পরের পর সকলকে আদর করিয়া মার নিকট কত পুরাতন কথা আবার নূতন করিয়া বলিতে লাগিল। মাও তাহা শুনেন' আর হৃদয় তাঁর স্নেহরসে প্লাবিত হইয়া যায়। মার স্নেহে কি সুধা আছে, তাহা ছেলে উপযুক্ত না হইলে বুঝিতে পারে না। বিজয় তাই নিবিষ্টমনে সেই সুধাই পান করিতেছিল। এতটা পথ যে আসিল, তাহাতে তার কোন শ্রান্তি নাই, ক্ষুধা, পিপাসা যা কিছু তার ছিল, সবই মাতৃদর্শনে নিবৃত্তি হইয়াছে। কত কথাই সে মার সহিত কহিতেছে, আর মাও গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একাগ্রমনে উহা শুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ কথাবার্ত্তা আর বেশীক্ষণ চলিল না। শাশুড়ীর আদেশমত পূর্ব্ব হইতেই যে জলখাবারের বন্দোবস্ত ছিল, বাসন্তী উহা বীর পদবিক্ষেপে বোনটার ভিতরে তার লজ্জাবিনম্র মুখখানি ঢাকিয়া স্বামীর কাছে আনিল, ও একখানি আসন পাতিয়া দিয়া আবার ঘর হইতে বাহিরে গেল। বিজয়ের বড় মাথা ধরিয়াছে, সে উহা স্পর্শ করিল না। মা কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু, তার অসুস্থতা দেখিয়া আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। বিজয় নিজ বিশ্রাম কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িল। মাও আবার গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে বেলার আধিক্য দেখিয়া যখন বিজয়ের সন্ধান লইতে গেলেন তখন সে জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছে। জ্বর বেশী দেখিয়া স্বামীর নিকট বাহিরে খবর গেল; কিন্তু, পথের শ্রমজনিত জ্বর বলিয়া সেদিন চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হইল না। বাসন্তী কেবল কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সে বাতাসে রোগ সারে কিনা জানি না, তবে বিজয় কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল; বোধ হয়, উহা রমণীর হৃদয় হইতে বহিতেছিল বলিয়া তার মাথার যন্ত্রণা কিছু কমিল। আশায় উৎসাহে বাসন্তী নবাগত স্বামীর সহিত হৃদয়ের সব দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কথা কহিতে লাগিল; আর তার সযত্নরচিত শিল্প উপহার দিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইল। বিজয় স্মিতহাস্যে উহার কারুকার্য্য অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; মনে হইল, যেন মখমলে ফুলগুলি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত হইয়াছে, চঞ্চল হৃদয়ে নাকের কাছে লইয়া উহাদের আঘ্রাণ লইতে লাগিল। ফুলগুলি এত স্বভাব সুন্দর হইয়াছে যে প্রকৃতির সহিত তাদের বৈষম্য আদৌ নাই। প্রাণ

হইতে গড়া কিনা, তাই তাদের বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে প্রকৃতির সাহচ্য এত সৌসাদৃশ্য ; বিজয় বুঝিল, তাই সে বাসন্তীর চিবুক ধরিয়া হৃদয়ের বিনিময়ে উহা কিনিয়া লইল, কিন্তু, যে অপরিসীম আনন্দ তাঁর প্রাণখানি ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা সুস্থশরীরেই শোভা পায় ; সে উহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। অপরাহ্নে জ্বর বাড়িল ; আর সেই সঙ্গে আবল তাবল বকুনিও আরম্ভ হইল। পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার আসিয়া যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু, বিকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কত ঔষধ, কত পথ্য পড়িল, কিছুতেই রোগও বাগ মানিল না। শয্যাপার্শ্বে মা, বাপ, পরিবারবর্গ সকলেই মুখ দিয়া পড়িয়া আছেন ; কিন্তু, কাহারও কাতরোক্তি, কাহারও প্রর্থনা মঞ্জুর হইল না। বিজয় সংজ্ঞা হারাইল। কত দুঃখকষ্টে সে মানুষ হইয়াছে, বাপ, মা তাই ভাবে, আর কাঁদিয়া আকুল হয়। যখন ডাক্তার কবিরাজ কোন ভরসাই দিল না, তখন তাদের রুদ্ধবারি পাষাণভেদ করিয়া বহিতে লাগিল। তারা ভাবে নাই যে, তাদের এত সাধের ঘরকন্না নগরে উঠিতেই আগুন লাগিয়া ছারখার হইয়া যাইবে! বাসন্তীও দুধের মেয়ে ; পৃথিবীর সুখদুঃখের কোন কথাই সে জানে না ; জীবনে ঘা ত কখনও খায় নাই। আবার এ যে কত বড় ঘা, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিতে পারে না। সে সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল ; মনে করিল, স্বামী রোগে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, আবার সারিয়া যাইবে। জগতে এত বোকা মেয়েও থাকে! বাজ মাথার উপর পড়ছে, সে তখনও বুঝিল না যে, উহাতে তার কি অনিষ্টপাত হইবে। কিন্তু, বিধিলিপি কে খণ্ডাইবে? রাত্রি দ্বিপ্রহরে বিজয়ের ক্ষুব্ধ, তৃষিত প্রাণ চিরশান্তিময়ের রাজ্যে ফিরিয়া গেল। এত আশায় বিধি বাদ সাধিল দেখিয়া বিনোদ ও তার স্ত্রী কাঁদিয়া অধীর হইল, আর স্নেহের পুতলী বাসন্তী আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিল। তার কেবলই ভাবনা যে, জীবনের সাথী হারাইয়া সে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কিন্তু, মৃত্যু কাহারও কোন অভাব বা অভিযোগ ত শুনে না, শুনিলে বোধ হয় অসময়ে বাসন্তীর এমন বিপৎপাত হইত না। জন্মাবধি সে সংসারে একাই ছিল, আবার গ্রহের ফেরে একাই পড়িয়া রহিল। দোসর আর তার ভাগ্যে সহিল না।

৪

কপালের দোষে নিতান্ত আত্মীয়ও পর হয় ; আবার পরও আত্মীয় হইতে নিত্যই দেখা যায়। বাসন্তী অনাথা হইলেও একেবারেই আত্মীয়-বিরহিত ছিল না; অদৃষ্টের ফেরে কেহই তার খোঁজ লইত না। শ্বশুরবাড়ীতে এতদিন

কাহারও কোনও খবর লইবার দরকার না হইলেও সে কিন্তু, সময়ে সময়ে ইহার জন্য শাশুড়ীর নিকট বেশ দু'কথা শুনিত। কথায় কি আসে যায়; ভাগ্যে তার সুখ নাই ভাবিয়া সে নীরব থাকিত।

শ্রীপুরের পাশেই দেবগ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামেই বাসন্তীর কাকা ও কাকী বাস করিত। আজ বিশবৎসর হইল বাসন্তীর কাকী উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার নিকট হইতে বাস্তুভিটা ও তৎসংলগ্ন জমিজমা পাইয়া দেবগ্রামেই অবস্থিতি করিতেছে। বিবাহের পর হইতেই কাকা পত্নীর করতলগত হইলেও তা'র দৃঢ়মুষ্টির কিছু অন্তরালেই থাকিত; কিন্তু, বয়সের আধিক্যে আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইল না; নিঃশব্দে কাকার সব জারি জুরি ঐ মুষ্টির মধ্যেই আসিয়া পড়িল। পত্নীর ইঙ্গিতে সে সকল কাজই করিত, কিন্তু বাহিরে কখনও প্রকাশ করিত না যে, স্ত্রীর আধিপত্য তাহার উপর একটুও আছে। দেবগ্রামে আসিবার আগে স্বভাবটা তার এমন কাদার তালের মত হইতে কেহ কখন দেখে নাই, আর দেখিলেও উহাতে যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় নাই। না হইবারই কথা, সংসারে বাসন্তীর কাকার মত অনেক জীব ত স্ত্রীর ধনে উদরপূর্ত্তি করিতেছে, তার ইয়ত্তা কে করে? আর পয়সা যার, তার ক্ষমতা অসীম, একথা না মানিলে চলিবে কেন? কাজেই বিপাকে পড়িয়া দুর্ভাগ্য কাকার বংশগত যে সদ্‌বৃত্তিগুলি ছিল, তাহা ক্রমশঃ লয় পাইতে লাগিল, সে তার পত্নীর হাতের ক্রীড়নক হইয়া উঠিল। শ্বশুরদত্ত জমা-জমিতে দিন গুজরান্ হইবার ভাবনা ছিল না, কাজেই কিসে স্ত্রীর চিত্ততুষ্টি হইবে, ইহাই কেবল সে ভাবিত। এতদিন ছেলেপুলের পাঠ ছিল না; সম্প্রতি পরিণত বয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া বাসন্তীর কাকী স্বর্গের দ্বার যে কিছু প্রশস্ত করিল; তাহা মনে মনে অনেকবার তোলপাড় করিত; আর আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে স্বামীর উপর তার আধিপত্য ক্রমশঃই বাড়াইতে লাগিল।

ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া পাশের গ্রামে বাসন্তীর উপর যে ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গেল, সে তার কোন খবরই রাখিল না। লোকপরম্পরায় সে ঐ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছিল বটে; কিন্তু, স্ত্রীর পরামর্শে হৃদয়টা এত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহাতে কোন আঁচড়ই লাগিল না। বাসন্তীর বিবাহের পর সে দুই একবার মাত্র শ্রীপুরে গিয়াছিল, কিন্তু, সে কেবল তার দাদার মৃত আত্মার পরিতুষ্টির জন্য; প্রাণের টানে সে কখনই যায় নাই। তারপর কত মাস কত

বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, দুর্ভাগ্য বাসন্তীর কথা সে স্বপ্নেও ভাবিত না। ভাবনার একটা নিজস্ব ধারা আছে, সেই ধারায় থাকিলেই তবে ভাবনার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ অটুট থাকে; দেবগ্রামে আসিয়া সে ভাবনা ত তার নাই; কাজেই বাসন্তীর স্মৃতি তার হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কতবার কতলোক সামাজিকতার হিসাবে বাসন্তীর এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাহাকে দেখিয়া আসিতে বলিল কিন্তু, সে চিঠিতেও তার খবর রাখিল না। হায়! কি নির্ম্মম সংসারের লোকগুলা! যদি দু'টা সান্ত্বনা-বাণীতে শোকাতুরের শোক নির্ব্বাপিত হয়, তাহাতেও তারা কুণ্ঠিত! মানুষের অভিমান আছে বলিয়া বিপদে সে আত্মীয় স্বজনকে কাছে ডাকে; কিন্তু, যখন শত ডাকেও কাহাকেও পায় না, তখন তার সে অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়। বাসন্তীর অভিমান ছিল কিনা জানি না, তবে যথাসময়ে তার কাকা আসিল না দেখিয়া সে বাত্যাহত তরুর মত আবার নূতন করিয়া আছড়াইয়া পড়িল; ইহা যে দেখিয়াছে, সেই বলে যে, অভিমানের কণা তার হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত ছিল। সে ভাবিল না যে, জগতে কেউ কারুর নয়; ভাবিলে বোধ হয়, শোকে হৃদয় তার নূতন করিয়া উদ্বেলিত হইত না।

৫

পতির দেহান্তরের পর বাসন্তী পুরাতনের স্মৃতিগুলা যথাসম্ভব বক্ষে রাখিয়া শ্বশুরের ভিটায় জীবনের দিনগুলা কাটাইয়া দিতেছিল। প্রথমটা বিনোদ কর্ম্মকাজ কিছুই দেখিবে না বলিয়া ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু মনত আর কারুর বাঁধা-ধরা থাকে না; ক্রমে তার গতি অন্যদিকে ফিরিতে লাগিল। ক্লান্তদেহে মনের অবসাদ ক্রমশঃ অপনোদিত হইলে সে আবার পূর্ব্বেকার মত বিবয় কর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ করিল। ঝড় বহিয়া গেলে সূর্য্যালোকে জগৎ যেমন হাসিতে থাকে, শ্রীপুরে বিনোদের বাড়ীতে তাহাই হইল। ভাই-ভগ্নী সকলেই ক্রমশঃ শোকের কথা ভুলিয়া গেল, কেবল বিনোদের স্ত্রী তার হৃদয়ের যেন নিভৃত কোণে কিছু বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। হাজার হ'ক মা ত বটে; সে কি এত শীঘ্র পুত্রশোক ভুলিতে পারিবে। বাসন্তী ক্লান্তদেহে, অবসন্নমনে গৃহের সব কাজ কর্ম্মই দেখে, ও সকলকার মন যোগাইয়া চলে। প্রতিবেশিনীরা তার গুণগ্রাহী বরাবরই ছিল, এখন আবার তার অবস্থাবিপর্য্যয়ে সহানুভূতির খাতিরেই হউক, বা স্নেহপরবশ হইয়াই হউক, তাকে কিছু অতিমাত্রায় ভালবাসিতে লাগিল। বাসন্তীর ঐটুকুই লাভ। স্বামিসুখে বঞ্চিত হইয়া অভাগিনী পরের ভালবাসার যতটুকু ভাগ বসাইতে পারে, ততটুকুই তার সম্বল।

[illegible] পুত্রশোক আসিয়া হইল না। [illegible] সে তার কাজগুলি বাড়িয়া লইয়া পূর্ব্বের মত দৃঢ়ভাবে চলিতে লাগিল। কেবল একটু মাত্র তার রূপান্তর ঘটিল; আগে যেমন সে বাসন্তীকে আদর যত্ন করিত, এখন তার মাত্রা কিছু বেশী করিয়া দিল। বাসন্তীও সে আদর যত্নে অনেক প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। কিন্তু শ্বশুরত আর বারমাস শ্রীপুরে থাকেন না, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে একটানা যত্ন পাওয়া কিছু দুষ্কর হইয়া উঠিল। বাড়ীতে শাশুড়ী প্রথমটা তাকে যত্ন আত্তির ত্রুটি করে নাই, কিন্তু, অত্যধিক মর্ম্মপীড়ায় বা অন্য কোন অজানা কারণ বশতঃ বাসন্তীকে ইদানীং আর বড় ভাল লাগিত না। তার দর্শনে, তার কাজ, তার কথায় সে জ্বলিয়া যাইত। কেন তার এরূপ ভাবান্তর ঘটিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে তার সদুত্তর দিতে পারিত না; তবে সকলেই বলিত যে, শোকের তাড়নায় তার ব্যবহার ঐরূপ বিসদৃশ হইয়াছে। বাসন্তীও নিত্য গঞ্জনা খাইয়া জীবনটা তার দুর্ব্বিষহ মনে করিতে লাগিল। প্রাণের ছট্‌ফট্‌ানিতে সে কেবল বিনোদের বাড়ী আসার শুভমুহূর্ত্তগুলির কথা মনে করিয়া আশ্বস্ত হইত। কিন্তু, এমন করিয়া ক'দিন চলে; বিনোদত স্ত্রীর হাতের খেলনা; যেমন করে তাকে নাচাইবে, সে তেমি করিয়া নাচিবে। পূজার সময় স্বামীকে পাইয়া সে তার হৃদয়ের সমস্ত দুঃসহ বিনোদের কাণে ঢালিয়া দিল। প্রথমে বিনোদ স্ত্রীর কোন কথাই বিশ্বাস করিল না, কিন্তু যখন নানা ছন্দোবন্ধে সে তার সুদৃঢ় নখ নাড়িয়া স্বামীকে বুঝাইল যে, বাসন্তীর রাজসগণের ফলেই বিজয় অকালে দেহত্যাগ করিয়াছে, তখন তার সকল যুক্তিতর্ক নিমেষের মধ্যে ভাসিয়া গেল। বিনোদ স্ত্রীর গোড়েই গোড় দিল। পুরুষের বুদ্ধিবিচার যা কিছু, সে সব বাহিরেই প্রকাশ পায়; অন্দরে স্ত্রীর চোখের বারিতে যখন উহা সিঞ্চিত হইয়া আসে, তখন পুরুষ তার পুরুষত্ব হারায়,—সে রমণীরও অধম হইয়া যায়। হাবজিৎ তার মনে থাকে না; সে কেবলই রমণীর ফোঁপানিতে আপনাকে ভুলিয়া যায়। দুর্ভাগ্য বিনোদেরও তাহাই ঘটিল। সে আর দুর্ভাগ্য বাসন্তীকে ডাকেনা; তার কোন কথায় কথা কহে না। বাড়ীতে দাসদাসীরাও অবসর বুঝিয়া নিজেদের মনগুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঐভাবেই গড়িয়া তুলিল। বাসন্তী একা,—বাড়ীশুদ্ধ লোক তার বৈরী। এমন অবস্থায় সে তার ভাঙ্গা কপালে আর জ্যোছনার আলোক দেখিবে। হৃদয়ের আবেগে সে দিনরাত কাঁদে; কিন্তু, সে অশ্রুবারি কেহই দেখিতে পায় না। আহারে তার রুচি নাই। কারো তার হাত পা আসে না। সে চায় মুখের দুটা মিষ্ট কথা, কিন্তু, এমনই

অদৃষ্টের লিখন যে, তাও তার ভাগ্যে জুটিল না। দেহপাত করিয়া সে সকলের সেবা করে, কিন্তু, সে সেবায় কেহই তুষ্ট নহে। এত অশ্রদ্ধা, এত অনাদর সে নীরবেই সহ্য করিতেছে; কেবলই ভাবে, নিরাশ্রয়া হিন্দুবিধবার জীবন ইহাপেক্ষা সুখকর নাহ। তাহাতেই তার সুখ; তাই সর্ব্বস্ব দিয়া আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টি করিতে সচেষ্ট। কিন্তু, সংসার ত সব কথা সোজাসুজি বুঝে না, বুঝিলে বাসন্তীর হৃদয় এত উতলা হইত না। অভিমানের কথা ভুলিয়া গিয়া দেবগ্রামে সে তার কাকাকে নিজের অবস্থার কথা সবিস্তার খুলিয়া লিখিল।

৬

মানুষ সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মের কথাকে ভুলিতে পারে না; তাই সে তার কাজের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা কুহকজাল রচনা করে। এ সাচ জনের সহিত লোক ঘর করিতে হয়, সেজন্য সে অধর্ম্মকে কিছু ভীতির চক্ষে দেখে। দেবগ্রামে যখন বাসন্তীর কাকার নিকট চিঠি আসিল, তখন সে অনন্যোপায় হইয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠাওরাইল যে, বাসন্তীকে আনা হইবে না, তবে সেখানে গিয়া তাকে একদিন দেখিয়া আসিবে। এরূপ সিদ্ধান্তের মূলে বাসন্তীর কাকী না থাকিলে, বোধ হয়, সে এতদিনে বাসন্তীকে লইয়া আসিত। সংসারে অশান্তি আনা গোড়াগোড়ি তার ইচ্ছা নয় বলিয়া সে আর স্ত্রীর বুদ্ধির উপর জোর চড়াইত না। কিন্তু, যখন ধর্ম্ম ভাবিয়া সিদ্ধান্তটাকে আর একবার পরীক্ষা করিল, তখন তাতে কি যেন খিয়কিচ্ দেখিল। মনে একবার খট্‌কা বাধিলে কোন কাজই দ্রুত সম্পন্ন হয় না; বাসন্তীর কাকারও তাহাই হইল। পূর্ব্বমন্ত্রে অধর্ম্মের রেখাপাত দেখিয়া সে তার স্ত্রীকে বলিল, "কাজটা আমরা ভাল করছি না; বাসন্তীকে দিন কতকের জন্য আমাদের কাছে লইয়া আসাই ভাল"। হঠাৎ এই বিরুদ্ধবাদে পত্নী তার অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উত্তর দিল, "তোমার বুদ্ধির আর মানুষের বুদ্ধি নয়, ভাসুর জন্য যে পথে যেতে বলব, ঠিক তার উল্টো পথে যাবে, তা আর আমি কি করব।" স্বামীর ভাবনা ইহাতে আবার বাড়িয়া উঠিল। বেচারা কোন্ মূল কিনারা না স্থির করিতে পারিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "দেখ, ছেলেনিয়ে আমরা ঘর করি, বাসন্তীর এ দুঃসময়ে তাকে কাছে না আনিলে বড়ই অধর্ম্ম হইবে"। ধর্ম্মের দিকটা তার স্ত্রীর তত প্রবল না থাকিলেও স্বামীর কথায় অনেকটা কাজ হইল; পাছে ছেলের কোন অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল, "আর তাই হ'ক; আমার কেবল

আশঙ্কা যে, সে কি আমার মন যোগাইয়া এখানে থাকিতে পারিবে?" ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে দেখা যাইবে বলিয়া স্বামী নিরুত্তর রহিল।

শুভদিনে বাসন্তী দেবগ্রামে আসিল; নানা কাজের অজুহাতে তার যে এ পর্য্যন্ত খোঁজ লওয়া হয় নাই, সে কথায় উল্লেখে বাসন্তী কোন অভিমানই করিল না। নিরাশ্রয় হইয়া আবার যে আশ্রয় পাইল, এই তার মহাভাগ্য। জীবনটা যে পরকে উৎসর্গ করিয়াছে; সে যেখানে থাকিবে, সেইখানে সকলেই তার আপন হইবে। এ বিশ্বাসটা নিতান্ত ভ্রান্ত না হইলেও, সে বুঝে নাই যে, মানুষমাত্রেই এক মাটিতে তৈরী নয়। কর্ম্মের ব্যূহের মধ্যে সে দিনাতিপাত করিলেও সে কর্ম্ম পাঁচ জনের কাছে নানা রঙে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। প্রথমটা তার কাকী শাশুড়ীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারের সকল কাজ যে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দিহান হইল না। তার পর যখন দেখিল যে, পুত্র বিপিন নূতন দিদির বড়ই "ন্যাওটা," তখন তার সোহাগ উচ্ছলিত জলের মত দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, বাসন্তীর ঘাড়ে সব ফেলিয়া দিয়া দিন কতকের মত তর্জ্জন গর্জ্জনটা মনের মত করিয়া সাধিয়া লইবে। বাসন্তী কোন কাজেই ত পশ্চাৎপদ নহে, সে সকল কাজই হাসিমুখে করে, আবার অবসর সময়ে ঘরকন্না গুছাইয়াও দেয়। কাকী তার ঘুমিয়ে কই পড়ে, আর যখন একান্ত কিছু ভাল না লাগে, তখন লোকজনের সহিত অকারণ ঝগড়া করিয়া দিনগুলায় সদ্ব্যবহার করে। বাসন্তী কোন কাজ "আর পারছি না" বলতে পারে না; সে তাই নিঃশব্দে গতর ঢালিয়া কাকীর ভ চেষ্টা করে। কিন্তু, অত খাটুনি খাটাত সম্ভবপর নহে; আর তার বয়সটাই বা কি? বিশ বৎসরও পার হয় নাই। চৌচাপটে তার উপর সংসারটা সব চাপাইয়া দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত কাজ হইয়াছে? কাকীর কিছুমাত্র আক্কেল থাকিলে, কচি মেয়েটার উপর এমন জবরদস্তি হইত না। যাহা হউক, কাজে দোষ গুণ ত সকলকারই থাকে; বাসন্তীরও ভুল চুক্ বাহির হইতে লাগিল। দিনের পর দিন যায়, তার দোষগুলা ও গুণগুলা বাড়িয়া উঠে। নিরুপায় সে, করিবে কি? মনে মনে ভাবে, এত করিয়া কাজ কর্ম্ম করি, তবুও কাকীর মন পাই না। গালাগালি, তিরস্কার ক্রমেই তার অঙ্গের ভূষণ হইয়া উঠিল। বিপিত অনেকদিনই তার মুখে বাদ সাধিয়াছেন, সুখ্যাত সে জীবনে চাহে না; চাহে কেবল মুখের দুটা মিষ্ট কথা; কিন্তু, তাহাতেও সে যখন বঞ্চিত হইল, তখন আপনারে যে ক'দিন চলে ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্যগুলি যথাসম্ভব গুছাইয়া

করিতে লাগিল। কাকা তার সব কথাই শুনিতে পাইত, কিন্তু, পত্নীর ভয়ে বাসন্তীকে কোন কথাই বলিল না। ক্রমেই তিল তাল হইয়া উঠিল। বাসন্তী কাঁদে, আর তার চোখের জলে সিক্ত করিয়া দৈনন্দিন কাজগুলা সব সারিয়া যায়। কাজে মন থাকিলেও প্রাণটা তার আই চাই করিতে লাগিল,—কতবার শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, বিপিনের উপর স্নেহপরবশ হইয়া সে মর্ম্মে তার কুলাইল না। সুচতুর পিতৃব্যপত্নী এ বাঁধনের আভাস পাইয়াছিল বলিয়াই গৃহ হইতে বহিষ্করণের কোন কথাই তুলিল না।

৭

রাষ্ট্রনীতিতে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা সকলেই জানেন যে, রাজার আদেশ, তাঁর অসংখ্য প্রজাবর্গের কোন ঐকান্তিক ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র। বাসন্তী যাহাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা কেবলই কামনা করিতেছে যে, সে তাদের গৃহত্যাগ করে; কিন্তু বিপিন এক অন্তরায় থাকায় সে ঘর ছাড়িয়া উঠিতেছে না। দেবতা অন্তরালে থাকিয়া সে কথা শুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, কেমন করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। এমন জোড় করিয়া ভক্তের নিবেদন কতদিন আর তিনি উপেক্ষা করিয়া থাকিবেন? অচিরেই পরিবারের পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। হঠাৎ জ্বররোগে বিপিনের মৃত্যু ঘটিল। প্রথম শোকের উচ্ছ্বাস কিছু উদ্দামবেগে বহিল বটে, কিন্তু, ক্রমশঃ শিশুর সব খেলাধূলাই হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল। বাসন্তীর কাকা শোকে। তীব্র বজ্রাঘাতে দিনকতক একটু অধীর হইলেন সত্য, কিন্তু, তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার অন্য বিপত্তি আসিয়া জুটিল। একেই তার মেজাজটা পূর্ব্ব হইতেই কিছু রুক্ষ ছিল, তার পর পুত্রশোকে উহাতে এমনই একটা অধৈর্য্য ভাব আসিল যে, রাতদিনই উহা সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। আর বাসন্তীর ত কথাই নাই; প্রথমে ক্ষেরে তার দেহ, মন, ক্রমশঃই নিস্তেজ ও নিরুদ্যম হইতে লাগিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিপিনের মৃত্যুতে তার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইলেও আত্মশক্তিতে সে নিজেকে এমন সামলাইয়া লইয়াছিল যে, বাহিরে তার কিছুই প্রকাশ পাইত না। দেহ মন, পাত করিয়া সে কাজ করে; কপালের দোষে কেবল তার কাকী তাকে দেখিতে পারে না। যেদিন হইতে নূতন পাখী শৃঙ্খল কাটিল, সেইদিন হইতে সংসারে তার নির্য্যাতন নানা রকমে বাড়িয়া গেল। কাকীর মুখে কেবলই বকাবকির প্রস্রবণ বহিয়া যায়, কিন্তু দেহের রাণী কখনও বাসন্তী শুনিতে পায় না। অভ্যাসে শেষে কাকীরও ভাবান্তর ঘটিল। সে

কোথায় সে আর কি করিয়া দেবগ্রামে থাকে? কেমনই ভাবে কি করিয়া পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ করিবে। একা সে পেটের ভাতটা কোন রকমে জুটাইয়া লইবে ভাবিল; কিন্তু, কাহার আশ্রয়ে গিয়া উঠিবে? স্ত্রীলোকত কখনও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে পারে না; আর পরিণত বয়সে উহা সম্ভবপর হইলেও এখন ত উহা সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক চিন্তার পর ঠিক করিল, সেই রাত্রেই সে দেবগ্রাম ত্যাগ করিবে। পুঁজির মধ্যে তার পাঁচ সাত টাকা মাত্র সম্বল আছে; উহাই লইয়া সে যেখানে জনসেবার ছত্র আছে, সেইখানে যাবে। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবা মাত্রই সে মনকে যেশ করিয়া গুছাইয়া সকলের অলক্ষ্যে সেই নীরব, নিথর রজনীর ঘোর অন্ধকারে গৃহত্যাগ করিল। বাঁধা পা গৃহের বাহিরে ওরিতগতিতে ছুটিতে লাগিল। বাসন্তী আজ আবার নূতন করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পরদিন প্রত্যুষে তার অনেক খোঁজ খবর লওয়া হইল; কিন্তু, দেবগ্রামে কেহই তার কোন কথা বলিতে পারিল না।

৮

ঘটনাস্রোতে আবহমান কাল হইতে মানুষের সুখ, দুঃখ কত কি ভাসিয়া গিয়াছে, কে তার ইয়ত্তা করে? নিতান্ত নিজস্ব যে গুলা, সেই গুলারই সে দিনকতক ধরিয়া খবর লয়, শেষে যখন নিত্য নূতন চিন্তা আসিয়া তার হৃদয় অধিকার করে, তখন সে আর ঘোঁজের ভিতর ঢুকিয়া অতীতের তল্লাশ করে না। নূতনের রাজ্যে পুরাতনকে আহ্বান করা এক জিতেন্দ্রিয় যোগী ভিন্ন আর কেহ-ত পারে না, তাই মানুষ নূতনেই অযুতুষ্টি লাভ করে। বিজয়ের মৃত্যুর পর বছরগুলা হু হু শব্দে বহিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে তার যত কিছু স্মৃতি সময়ের ঘা খাইয়া মলিন হইয়া আসিল। শ্রীপুরে এখন আর কেহ তার নাম করে না; হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে নামোল্লেখ হইলে চোক্ গিলিয়া জবাব দেয়। বিনোদের বাড়ীতেও ঐ চিরন্তন নীতির অন্যথা হইল না। একে একে বাপ, মা, ভাই ভগ্নীরা সকলেই তার কথা ভুলিয়া গেল,—আর বাসন্তী, সেত কেবল বিজয়ের খাতিরে আদর প্রত্যাশা করিত; যখন সে খাতিরই নাই, তখন আর আগায় জল ঢালিয়া লাভ কি? দেবগ্রামে চলিয়া যাইবার পর শ্বশুরকুলের কেহই তার কোন খবর লইল না। বিজয়ের পাট শ্রীপুর হইতে একেবারে উঠিয়া গেল।

বছর আষ্টেক পড়িয়া বিনোদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে;

সুখ, ঐশ্বর্য্য সবই সে নিজস্ব করিয়া লইয়া গ্রামের মধ্যে বড় ঘরযোগ্য হইয়াছে। আর পত্নী তার ছেলে-মেয়েদের ঘরকন্না যথাসম্ভব গুছাইয়া দিয়া ইহ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য পূজা আশ্রয়ে নিবিষ্টমনা হইয়াছে। কিন্তু ঘরের ভিতর একভাবে দেবতাকে ডাকিয়া তার মনস্তুষ্টি হয় না। সে তাই কয়দিন ধরিয়া তীর্থদর্শনে যাইবে বলিয়া স্বামীর উপর জুলুম করিতেছে। বিনোদ তার কোন সাধেই কখন বাধা দেয় নাই; সে আজ কেন তার আকাঙ্ক্ষাপূরণে অযথা কার্পণ্য প্রকাশ করিবে? কেবল একটা সম্মতিসূচক "আচ্ছা" বলিয়া তীর্থযাত্রার সকল আয়োজন করিতে লাগিল। সপরিবারে তীর্থযাত্রা করা বহুব্যয়সাধ্য হইলেও সে তাহাতে আদৌ কুণ্ঠিত হইল না। পণে, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাইবে, স্থির হইল। বিনোদের সম্মতিতে একেবারে স্বার্থের নাম গন্ধ ছিল না যে, একথা বলা যায় না; সে জানিত যে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" তাই সকল গোছ গাছ সে নিঃশব্দে করিয়া লইল।

শুভদিনে বিনোদ সপরিবারে তীর্থ যাত্রায় বাহির হইল। মেজছেলে প্রকাশ এখন মাথা-ধরা হইয়া উঠিয়াছে; সে পিতার সকল কাজে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। সঙ্গে লোক জনও অনেক, বিদেশে সকলের হেপাজাত করা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু, ভগবৎকৃপায় সবই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। মাসাধিক কাল হইল তারা গৃহত্যাগী হইয়াছে কিন্তু, দেবদর্শনে এমনই তারা উন্মত্ত যে, ঘরের ভাবনা আর তাদের নাই। দেবতার সন্ধানে মন একবার ফিরিলে, মানুষ কি আর পার্থিব সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করে? কত তীর্থই দেখিল, কত দেবদর্শন তাদের ভাগ্যে ঘটিল, নিত্য নূতন তীর্থে কত পুণ্যই সঞ্চিত হইতে লাগিল। দেবতার পূজায় ক্ষুধা তৃষ্ণাত মনে থাকে না। আত্মার পরিতৃপ্তিতে যে সুনিবৃত্তি হয়। বিনোদের পরিবারেরও তাহাই হইল। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যখন তারা হরিদ্বারে আসিয়া পঁহুছিল, তখন সেখানে মেলার মহাধূম। বহু যাত্রীর সমাগম হওয়ায় প্রথমটা আশ্রয় পাওয়া কিছু কঠিন হইয়া উঠিল; কিন্তু পয়সায় কিনা হয়? পাণ্ডারা সবই বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

বাসায় পুঁটলী পাটলী রাখিয়া বিনোদ হরিদ্বারে যাহা কিছু দেখিবার ছিল, সবই দেখিয়া লইল; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ত সহজে মিটে না। স্থানটী বড় মনোরম বলিয়া স্ত্রী আর কিছুদিন থাকিয়া যাইতে বলিল। বিনোদ দ্বিরুক্তি করিল না।

বেশী দিন কোথাও সংসার পাতিয়া থাকিতে গেলেই মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা সব কাজ সম্পন্ন হয় না। কাজ যেমন বেড়ে যায়, লোকের খাটুনিও তেমনি বেশী হয়। বিনোদের সঙ্গে যে সব লোক জন আসিয়াছে, তাদের দ্বারা সংসারের কাজ কর্ম্ম হইয়া উঠে না; কাজেই একটা বাড়তি লোকের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। মেলার সময় লোক পাওয়া দুরূহ হইলেও সুচতুর পাণ্ডার অসাধ্য ত কিছুই নাই। সে কয়েক দিনের মধ্যেই একজন স্ত্রীলোক আনিয়া কাজে বাহাল করিল। স্ত্রীলোকটির মাথা মুড়ান আর সম্বল তার পরিধানে এক পট্টবস্ত্র মাত্র। বয়স তার নিতান্ত কাঁচা না হইলেও, সাতাশ আটাশের উর্দ্ধে নহে। মুখের মধ্যে নাকটি টিকলো, আর চক্ষু দুটী বেশ উজ্জ্বল, দেখিলেই মনে হয়, যেন কত হারাণ কথা ঐ চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। পাণ্ডা স্ত্রীলোকটিকে দিয়া বলিল, "মা সব কাজ এ করিবে; আপনি একটু যত্ন করিবেন, এ বড়ই অনাথা।" বিনোদের স্ত্রী উত্তরে বলিল, "তা বাছা, আমার কাছে যত্ন আমোক্তির ত্রুটি হইবে না, তবে কামগুলি ভাল করিয়া করিও। রমণী কে, বা কোথা হইতে আসিয়াছে, তার কোন খবরই লইল না; রমণীও তার নির্দ্দিষ্ট কাজ গুলি যথাশক্তি করিতে লাগিল। গৃহিণী তাতে তুষ্ট হইলেন কিনা জানি না; কিন্তু, তার খুঁটিনাটি তুলিয়া নবনিযুক্তা দাসীর সহিত তাঁহার কোন বচসা হইতেও শুনা গেল না। ক্রমেই প্রবাসে অবস্থিতির কাল ফুরাইয়া আসিল। যে দিন প্রত্যুষে হরিদ্বার ছাড়িয়া যাইবার কথা, তার পূর্ব্বরাত্রে গৃহিণী যখন রমণীকে ডাকিয়া মাহিনা দিতে গেলেন, তখন সে উহা লইতে রাজি হইল না; কেবল বলিল, "আপনার সেবা করিয়াছি, তার আর পারিশ্রমিক কি? উহাত আমার কর্ত্তব্যের বাহিরে নহে; আমি মাহিনা লইব না।" কথাটা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া গৃহের মধ্যে একটা খুব সোর গোল পড়িয়া গেল। বিনোদ ও ছেলেরা তাকে কত সাধ্য সাধনা করিল, কিন্তু, সে কেবলই বলে "তীর্থক্ষেত্রে কয়দিন আপনাদের সেবায় আমায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উহাই আমার যথেষ্ট পারিশ্রমিক; আর আমি কিছুই চাহিনা, আপনারা যে আমার মা বাপ।' কথা-গুলি বলিয়াই রমণীর চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া ডগ্ মগ্ করিতে লাগিল। সে আবার রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় চিনিতে পারিতেছ না;—আমার গ্রহের ফেরে আমি আপনাদেরই পরিত্যক্তা বাসন্তী।" অপ্রত্যাশিত বাক্যে হঠাৎ বিনোদের চমক ভাঙ্গিল। স্ত্রী তার সজোরে প্রাণের ভিতর হইতে একটা

ধাক্কা খাইয়া ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। যাহা অননুভবনীয়, তাহা কেহ ধরিতে পারে, সে কথা তার মনে স্থান পাইল না। বাসন্তী যে তার পুত্র বধূ, কতকটা ধারণায় আসিলেও সে পূর্ণ সত্তায় উহা বিশ্বাস করিবে কি করিয়া? সেজন্য নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়া বাসন্তীকে যাচাই করিতে লাগিল। কিন্তু, যখন সকল কথার যাথাযথ জবাব মিলিল, তখন আর শোকের বেগ সামলাইতে না পারিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিল। এখন সেখানে দ্বন্দ্বের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নাই; কেবলই প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিতেছে। বিমেশে এমন অচিন্তনীয় ভাবে সে তার আগ্রহ দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুপ্তদেবতার সন্ধানে তার লুব্ধমন আর ফিরিবে না। জীবনে তাকে ছাড়িয়া থাকিবে না, ইহা মনস্থ করিয়া বিনোদ পরদিন প্রত্যুষেই সপরিবারে হরিদ্বার হইতে রওনা হইল। বাসন্তী আবার স্বামিগৃহে ফিরিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলা পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া কর্ম্মমার্গে তার সাধনার পথ ক্রমশঃই প্রশস্ত করিতে লাগিল। সে পথের পথিক শুধু বাসন্তী একা রহিল না; তারই প্রেরণায় শ্রীপুরের জনসঙ্ঘ মাতিয়া উঠিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

সীমুলতলা স্বাস্থ্য কুটীর, E. I. R.

আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব।

গ্রহ নক্ষত্রের স্থিতি, গতি বিধি আর,
বৃক্ষের প্রাণের কথা, মাধ্য আকর্ষণ,
শব্দ আলোকের গতি, ওজনে তাহার,
ধূমকেতু আবির্ভাব, উল্কার পতন,

এ সকল আবিষ্কার হইবার আগে
যেরূপ চলিতেছিল পৃথিবী তখন,
মানবের সুখ শান্তি লয়ে অনুরাগে,
চলিতেছে নহে কিগো এখন তেমন?

বিজ্ঞানের এ রহস্য মানব যখন
জানে নাই,—বুঝে নাই বিজ্ঞানের কথা,
ঈশ্বরে কি ভক্তিমান্ ছিল না তখন,
ছিল না কি সুখ-শান্তি, হৃদে কোমলতা ?

প্রকৃতির এতটুকু ব্যতিক্রম যায়
ঘটে নাই, সুখ দুঃখ উত্থান পতন
চলিয়াছে সম ভাবে, তা' হ'লে ইহায়
সাধিতেছে মানবের কিবা প্রয়োজন ?

এক দিকে,—রোগক্লিষ্ট মানবের নয়ন-আসার
মুছাইয়া প্রদানিতে শান্তি নিরাময়
হইয়াছে এ জগতে যাহা আবিষ্কার
তার সনে সমতুল কি আছে কোথায় ?

ক্ষুধাতুরে অন্নদান, রোগীকে ঔষধ,
নহে কি প্রধান কার্য্য জগতের মাঝে ?
বিপদিতে মানবের যতেক আপদ
আবিষ্কার পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ?

তার ফলে যে মঙ্গল হ'তেছে সাধিত
শব্দ আলোকের গতি, মাধ্য আকর্ষণ,—
হ'তে পারে আবিষ্কার অতি সুচিন্তিত—
রোগ জ্বালা, ক্ষুধা কিন্তু করে না বারণ !

অন্ন, ডাল, ফল মূল যা' ক'রে আহার
রস, রক্ত, মেদ, অস্থি হ'তেছে সৃজন ;
নিত্য ব্যবহার্য্য যাহা রোগে চমৎকার
হরিতকী, বেল, নিম, তুলসী, চন্দন।

যে দেবতা এই সব আবিষ্কার দ্বারা
জগতের ক'রেছিলা কল্যাণ সাধন,
তাঁহাদের নাম ভুলে, অকৃতজ্ঞ মোরা,
চিনিয়াছি হাক্সলি, দেব নিউটন।

শ্রীভুবনমোহন দাস-গুপ্ত।
কবিশেখর ;

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

(শাগ্‌রেদী)

মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ। আমরা মানসীর উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ইহার উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, কোন কোন ধর্ম্মব্যবসায়ী পেটেণ্ট পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ মাসিকের ন্যায় মানসী (পেশাদার) কাগজ নহে, সুতরাং লাভের জন্য ভেজাল চালাইতে, ও গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য, অধিকাংশ গ্রাহকের রুচি অনুসারে, সম্পাদকীয় মন্তব্যের নামে দেশের লোকের নিকট সুখরোচক মিথ্যা কুৎসা বিক্রয় করিতে হয় না। মানসীর প্রবন্ধগুলি সুনির্ব্বাচিত, চিত্রগুলি সুন্দর, রচনায় উচ্ছৃঙ্খল লেখকের যথেচ্ছাচারের কলঙ্ক নাই। প্রথম প্রবন্ধ স্পর্শদোষ, লেখক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ব্রাহ্মণ লেখক সত্যই বলিয়াছেন—"আমরা বিপ্লব চাহি না, চাহি বিবর্ত্তন; পশুবলের প্রাধান্য চাহি না, চাহি সমবায়, যথেচ্ছাচার চাহি না, চাহি সদাচার ও ধর্ম্মপ্রাণতা; ওলিভার ক্রমওয়েলের অন্ধ অনুকরণ চাহি না, চাহি আভ্যন্তরীণ সংস্কার।"

সমস্ত প্রবন্ধের সম্যক্ আলোচনার স্থান এখানে নাই। 'রবীন্দ্র নাথের "সাহিত্যে ছাতুপয়া" নামক উপাদেয় সমালোচনা এখনও চলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা স্থায়ী হইবে আশা করি। 'বৈদেশিকী'তে শ্রীগৌর বাবু কয়েকটি বিদেশী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার রুচির ও বিচারনৈপুণ্যের প্রশংসা করি। তিনি "মানসীর" পাঠকগণকে পাঠশালার শিশুর পর্য্যায়ে ফেলিয়া 'লাভী কাগজ হইতে "চাঁদ দেওয়া দাঁত" ও "রঙ্গীন পুচ্ছের ছবি" বাছিয়া বাহির করেন নাই, চিত্রের উপাদান সঙ্কলন করিয়াছেন। গল্প কয়েকটি যে ভাল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, নির্ব্বাচনের ভার যখন—প্রভা গুহকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপর। মন্দাক্রান্তা ঘোষের হেমচন্দ্র চলিতেছে। লেখকের শ্রমশীলতার প্রশংসা করি; কিন্তু হেমচন্দ্রের বিষয়, উচ্চাঙ্গের জীবনচরিত লিখিতে যে সকল গুণের আবশ্যক, এই প্রবন্ধে তাহার বিশেষ অভাব দেখা যায়। হেমচন্দ্রের রচনা পাঠ করিবার লোকের অভাব এখনও হয় নাই। সুতরাং কাব্য এবং কবি উভয়কেই বুঝাইবার চেষ্টা

হওয়া উচিত ছিল। হেমচন্দ্র মানুষ ছিলেন; কিন্তু লেখকের অতিরিক্ত প্রশংসার আড়ালে সেই মানুষটি যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, প্রথম প্রবন্ধ "কারখানা ও গৃহশিল্প।" অতীতের তরুকারীর আদর গৃহস্থ ঘরে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু কালের আনাজের চিরকালই অনাদর। সুতরাং গোলদীঘির পাড়ের খোলা বক্তৃতা মজলিসে বাহুর বিচারে সম্মানের অগ্রস্থান কেন লাভ করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আজকাল হাওয়া একটু গরম। সুতরাং রাজনীতি-সম্পর্কিত একতরফা বিচারই এখনকার রীতি হইয়াছে। কারখানার হাজার দোষ আছে বটে, কিন্তু দেশ হইতে দু-চার দিনের মধ্যে কলকারখানাগুলি ভাঙিয়া ফেলার সম্ভাবনাও হইতে পারে। বিলাতে কারখানা প্রতিষ্ঠার সূচনায়ই ইহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হইয়াছিল, সে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। ডিফেন্স রস্কিন ও টলষ্টয়ের দোহাই দেওয়া আধুনিক ফ্যাসন হইতে পারে; কিন্তু 'এম্-এ' উপাধিধারী লেখক মহাশয়ের স্মরণ রাখা উচিত ছিল, ডিফেন্সের সময় বিলাতী কারখানার যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং এখনকার দিনে মনুর ব্যবস্থার ন্যায় ডিফেন্সের ও রস্কিনের ব্যবস্থাও ক্ষেত্রবিশেষে বাতিল। ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাসগুলি জমিয়া উঠিয়াছে। মাতৃমঙ্গলের তিনটি প্রবন্ধেই একটি গুরুতর সমস্যার উত্থাপন করা হইয়াছে। অনেক গৃহস্বামীরা এখন ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ের পাদুকার সহিত উপমিত করিতেছেন। লেখকের সহিত আমরাও বলি—"যতদিন ইহার প্রতিকার না হইবে, ততদিন নারীনিগ্রহ সমাজে অবাধে চলিবে,—ততদিন সমাজের ব্যাধি দূর হইবে না,—আপনারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যতই কেন সভাসমিতি করুন না। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদারের "মার্কিণ মুলুক" ও বিনয়কুমার সরকারের "বর্ত্তমান ক্রাইসিস" সুলিখিত নিবন্ধ, নানাতথ্যে পূর্ণ। "পার্জ্জিলিংএ" গল্পটি শেষ হইয়াছে,—লেখকের হাত ভাল। দুই বৎসরের পরে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধমালা "পেশবাদিগের রাজ্যশাসন পদ্ধতি"ও এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। 'জীববিজ্ঞান', 'তাপবিজ্ঞান' ও 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' তিনটি প্রবন্ধই উত্তম। এ সংখ্যায় সাহিত্যসংবাদ বাদ পড়িয়াছে। সূচীর উপর "ভারতবর্ষ" ভালই চলিতেছে।

প্রবাসী অগ্রহায়ণ—পড়িবার মত প্রবন্ধ মোটে একটি—অধ্যাপক রামেন্দ্র

সরকারের "বঙ্গের শেষ পাঠান বীর"। ছেলে ও মেয়ে ভুলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা আছে। বিলাতী কাগজের অনুবাদ ও নকলে সম্পাদক ও তাঁহার সহকারী বর্গের শ্রমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের পাঠকবর্গের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে যে উচ্চধারণা পোষণ করেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল ছবি ও উদ্ভট সংবাদে—যেন পাঠকেরা এখনও সকলেই ঠাকুরমার কোলে বসিয়া রূপ কথা শোনে ছাড়া আর কিছু করিবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা রাখে না। "বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ডক্টর মেঘনাদ সাহার কৃতিত্বের" পরিচয় একটি প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম, এই মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং তাঁহার গবেষণাকার্য্যও চলিয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজে। এইরূপ একটি পণ্ডিত সৃষ্টি করিতে পারিয়া থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত; কিন্তু 'প্রবাসী'সম্পাদক ত দেখিতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কুৎসা কীর্ত্তনেই ব্যস্ত। "শিক্ষা ও সেবা" প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় হাজার বার হাজার জায়গায় যে সমস্ত বাঁধা বুলির আবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র, অবশ্য সেই সঙ্গে ষোল আনা অহিংসভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিন কলম প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই কেবল 'আমি, আমি' ও 'আমার,' তাঁহার ছাত্রগণের গৌরবের কথা তাঁহার ভাষায়—"আমা অপেক্ষা ন্যূন নন।" যেন আমিই সকলের আদর্শ। আমার অপেক্ষা বড় হওয়াতো সম্ভব নয়,—আমা অপেক্ষা ন্যূন না হইলেই মস্ত সম্মানের কথা। প্রবাসীর প্রশংসায় মাত্রা কি এতই উগ্র যে, ষষ্টি বৎসর বয়সেও প্রফুল্লচন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্পাদক মহাশয় একটা ভয়ানক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন—স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য হইবার যোগ্য। এই নবীন আবিষ্কারের জন্য নিশ্চয়ই তিনি বিলাতের রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গোলামীর অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা।

সমাজপতির পত্র।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সহিত সম্মুখ পরিচয় আমার ছিল না। কিন্তু তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং অনেক পত্রাদিও তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হইতেছে তাহা থাকিলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশকামী নবীন লেখকদের পক্ষে বড়ই কার্য্যকর হইত। কিন্তু তখন আমি ছিলাম, এ সকল যে যত্ন করিয়া রাখিবার জিনিষ, তাহা আমার মনে হয় নাই। মাত্র দুইখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাই নিম্নে (বিশেষ ব্যক্তিগত অংশ বাদ দিয়া) মুদ্রিত হইল।

পত্র দুইখানা সম্বন্ধে একটু বলিতে চাই। পত্র দুইখানি সমাজপতি মহাশয়ের নিজহস্তের লেখা নয়, তিনি বলিয়া যাইতেন অন্যে লিখিয়া যাইত এবং লেখা শেষ হইলে তাহা নিজে একবার দেখিয়া স্বাক্ষর করিতেন। সে সময় তিনি অতি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিয়া দিতেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, তিনি বর্ত্তমান বাংলা বানানের অনেক সময় বিরোধী ছিলেন; এইজন্য দেখিতে পাই, তিনি পত্র পড়িবার সময় লেখকের লিখিত 'বাংলা' শব্দ কাটিয়া সেস্থলে 'বাঙ্গালা' শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। এ ক্ষুদ্র ব্যাপারটুকুতেও লক্ষ্য করিবার আছে।

দ্বিতীয় পত্রখানিতে আমি নবীন লেখকদের উৎসাহ না দিয়া এরূপ তীব্র কশাঘাত কেন করেন এবং তাহাতে অনেক নবীন লেখকের উৎসাহ নষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় লিখিয়াছিলাম। তাহারই উত্তর স্বরূপ এই পত্র লেখা হইয়াছে। পত্র দুইখানিতে সমাজপতি মহাশয়ের জীবনীরচকের কোনও বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে এবং তাঁহার সমালোচনার ব্যাপারটা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ইহা মুদ্রিত করা হইল।

১ম পত্র।

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমার শরীর অসুস্থ জানিয়া চিন্তিত হইলাম। * * * * * * * *

জ্যৈষ্ঠের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" তোমার বাদীর ফার্সী কবিতা হইতে অনুবাদিত "সুপ্তি" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার নির্ব্বাচনটি বেশ ভালই হইয়াছে—এরূপ সুন্দর কবিতার অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। আমি রক্ষণশীল, কিন্তু বিদেশী ভাষায় রচিত সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পাদি যে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হয়, ইহাও আমার একান্ত ইচ্ছা—কিন্তু অনুবাদের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা হওয়া চাই। এজন্য আমি মাঝে মাঝে "সাহিত্যে" বিদেশী গল্পের অনুবাদ ছাপিয়া থাকি। সব অনুবাদই যে আমার মনের মত হয় তাহা নয়।

ভাষা লইয়া ছেলেখেলা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আর তিন্নি ভাষা লইয়া নেকামিও আমার সহ্য হয় না। এজন্য তোমাদের নবীন কবির দল আমার প্রতি বিরূপ, কি করিব যাহা মনে সহ্য হয় না, মুখে তাহা সহ্য হয় বলিব কিরূপে? "সাহিত্যে"র সাহিত্য-সমালোচনা যে অনেক সময়েই সুখরোচক হয় না, তাহা আমি বুঝি, কিন্তু তবু আমি বাঙ্গালা ভাষার পবিত্র মন্দিরে প্রেতের তাণ্ডবনৃত্য হইবে, তাহা দেখিতে পারি না। কথাটা তোমার কাণে কর্কশ লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক কথা, বাঙ্গালা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া, বাণীর মন্দিরের দ্বারে, যে সুর-ছন্দোহীন বিকট নৃত্য হয়, তাহা নটনাথের নহে—তাঁহার চেলাদের নৃত্য। * * *

আমার শরীর বেশী ভাল নয়। ভরসা করি তুমি কুশলে আছ। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

১৬।৩।২২। শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

দ্বিতীয় পত্র।

শুভাশিষঃ সন্তু

অনেক দিন তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি বহুমূত্রে অত্যন্ত অবসন্ন, তাহে নানাবিধ কার্য্যে নিতান্ত অনবসর। এই জন্য তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। কিছু মনে করিও না। * * * *

তোমরাও নিশ্চয় স্বীকার করিবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক গতিবিধি সার্ব্বজনীন পূর্ণ হইতেছে। এই সকল অপচারের সত্য সমালোচনা সাময়িকের অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহারা "সাহিত্য পথে নূতন যাত্রী" তাহা অবশ্য তাহাদের রচনা পড়িয়া কখনও কখনও না বুঝা যায় এমন নহে। কিন্তু এখানে ও

প্রবীণ মহাশয় যাঁহারা এমন কাঁচা ও উদ্ভট লেখা ছাপাইতেছেন যে, নবীন ও প্রবীণের পার্থক্য রেখা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নবীনের রচনা তখনকার "বালক বন্ধু"তে ছাপা হইত, এখন "ভারতবর্ষে" প্রচারিত হয়। নবীনের কর্ত্তব্য—রচনার উৎকর্ষ সাধন। নবীন উৎসাহ লাভের যোগ্য, কিন্তু সমালোচনার নিকষে নবীনকে সোনার দাগ উপহার দিয়া উৎসাহিত করিবার উপায় নাই।

আমি ভ্রান্ত হইতে পারি, কিন্তু কাহারও প্রতি অবিচার করিবার আমার ইচ্ছা নাই। "কাব্যি" প্লাবিত বাঙ্গলা সাহিত্যে পাঠকের অপেক্ষা কবির সংখ্যা অধিক, এবং কবিতার সংখ্যাই হয় না। এ অবস্থায় সকলকে উপদেশ দিয়া অগ্রসর করিবার উপায় নাই। অনেকের পক্ষে কবিযশঃ-প্রার্থী হইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইবার উপদেশই হিতকর বলিয়া মনে হয়। "সাহিত্যের" মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় আমি মধ্যে মধ্যে সে চেষ্টাও করিয়া থাকি। আমার সময় অল্প, শক্তি আরও অল্প; এই জন্য আমার অনেক ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা করি কাহাকেও দুঃখ দিবার জন্য তাহা কল্পিত নহে, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আশা করি তুমিও তাহা অস্বীকার করিবে না।

এই বিপুল বাঙ্গালা দেশে তোমার নবীন কবি বন্ধুগণের কবিতার সমাদর করিবার লোকের অভাব হইবে না। আমি যদি না পারি, তাহা আমারই দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে। তোমরা বায়রনের মত সমালোচনায় অসহিষ্ণু না হইয়া যদি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত আপনার পথে আপনি চলিয়া যাও, তাহা হইলে আমরা জয় হই, নিস্তারও লাভ করিতে পারি। * * ০ *

আশীর্ব্বাদ করি তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও। আশা করি কুশলে আছ।

ইতি-(ইং) ৩।৮।১৮ শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুরেশ চন্দ্র সমাজপতি।

শ্রীনলিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, পোঃ—কলমা (ঢাকা)।

সহস্রধারা-দর্শনে।*

—:*:—

[শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ]

থামো, থামো,—কহিও না কথা ;
জনশূন্য নেপথ্যের এ সৌন্দর্য্য, এই গভীরতা,
এই সুরে-ভরা ভাষা, ভাষাহারা সুরোচ্ছ্বাসে সুন্দরের আভাস-বারতা
এই রঙ্গ, এই রশ্মি, আর সর্ব্বোপরি
গিরিঘন বনভূমে পাষাণ-চিরিয়া-ঝরা এ আনন্দ ;—ময়ি, ময়ি, ময়ি,
চক্ষে মোর আসিতেছে জল !
নাচিছে যে বাহু তুলি' বক্ষগুহা-বন্দিনীর দল,—
সংসার ! অধিক নহে, দণ্ডদুই ছুটী,
এ আনন্দে লুটি'
সুন্দরে একটীবার পূজিব কেবল !

* * * *

কি বলিলে ?—'মন্দাকিনী'-ধারা ?
হিমাদ্রি-ধূর্জ্জটী শিরে নৃত্যপরা হর্ষে আত্মহারা
স্বর্গ-গঙ্গা তবে কি রে সপ্তবর্ণে বিরঞ্জিত অপূর্ব্ব এ রূপের ফোয়ারা ?
স্বর্গ গঙ্গা ধরাতল ?—সন্দেহ কি তায়,
বিকায়েছে বহুদিন স্বর্গ যে গো বিশ্বজোড়া আনন্দের পায় !
বিশ্বাস না হয়, দেখ চাহি'—
চুম্বিত-ভূতল-পৃষ্ঠ বক্র ঐ জলধারা বাহি'
নভশ্চ্যুত ইন্দ্রধনু নামি' গিরিকোলে
হেন সুখে দোলে,
যেন তা'র অতীত বা ভবিষ্যৎ নাহি !

* * * *

ঝর্ ঝর্ করিছে প্রপাত ;
একি শব্দ অর্থভরা, শূন্যে শূন্যে কাঁপে দিনরাত !
শৈলে শৈলে নিনাদিত গম্ভীর-মধুর একি অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত !
রে শ্রবণ ! শোন্, শোন, স্তব্ধ হ'য়ে শোন্—
হয়তো বা পাবি এই নিগূঢ় সঙ্কেত হ'তে অপার্থিব কোণে মহাধন,
হয়তো বা,—না, না, কিছু নয়—
চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ শুধু জাগুক অভয়,
আজ শুধু শ্রুতি-পথে হৃদিমূলে ধরি'
এ-সঙ্গীতে আপনার করি'
মনে প্রাণে গেঁথে লই এ-সুরের লয়।

* * * *

সুপ্ত, শান্ত, চিত্রার্পিত সব !
বিস্মৃত-কাকলী পাখী তরুশাখে বসিয়া নীরব !
ঝিল্লীরা ভুলিয়া তান, ভ্রমর—গুঞ্জনগান, শুনিতেছে প্রপাতের স্তব
শৈল-শিরে বিনিশ্চল মধ্যাহ্ন তপন
শয়ান সহস্র-ফণ অনন্ত-নাগের বুকে মাধবে বা দেখিছে স্বপন !
রে নয়ন ! স্তম্ভিত হ'য়ে উঠি চুপে চুপে,
এই বেলা পাশরিয়া—আবেগে-জড়াতে-চাওয়া মূরতির স্তূপে,
ভেদি' রূপ রূপকের তরবারি-ঘায়
আয় চলে আয়
প্রণাম করিবি যদি চির-অপরূপে।

* * * *

চক্ষে যে রে পড়ে বা পলক'
সহস্র-পন্নগ-ফণা মণিময় যেন লক্ লক্,
বর্ণ-রেণু-বর্ণ-মাখা বারি-বিন্দু-পরিধির দিকে দিকে হানিছে ঝলক !
ধরায় ধরায় হেন করিয়া তরল,
যে কোন্ অনাদিশুভ্র রূপজ্যোতিঃ, যে পাষাণ, বর্ণে বর্ণে বিলাইছে বল ?
রূপ, না এ চির দীপ্তি নিখিলের ভিত্তে

চিরারি ভূধর-হিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে গিয়া, বসিতেছে পার কি চিনিতে ?
পারি কিম্বা নাহি পারি, দেখা যাবে—থাক্
আজ শুধু দাঁড়ায়ে অবাক্
ক্ষণেক কাঁদিতে দে রে গাঢ় এ নিভৃতে।

* * *

হে অরূপ ! ওগো স্বর্ণরূপ !
হয় ত এ বেদীমূলে বৃথাই পুড়িল আজ ধূপ ;
হয় ত গেলনা বলা—যে অনুভূতিটী আজি শিহরিছে প্রতি রোমকূপ ;
তবু জানি, স্থির জানি, হে রাজ-ভিখারী,
প্রকৃতির রস-উৎস হেরিয়া ঝরিল চোখে যে দু'বিন্দু বেদনার বারি,
ধন্য লভি' আনন্দের অশ্রু-মুকুতায়
উদাস মধ্যাহ্নখানি জড়ায়ে গড়ায়ে গিয়া ঘুমায়েছে তব রাঙাপায়।
তাই আজি রোমাঞ্চিত অসীম আকাশ
হাস্য-শ্যামা এ ধরণী, এই জলোচ্ছ্বাস,
অপূর্ব্ব-নবীন-প্রেমে চিত্তনদীটীরে মম আলিঙ্গিতে চায়।

———

* আসাম্ অঞ্চলের একটি জলপ্রপাত ; চেরাপুঞ্জীর শৈলমালা হইতে কাননমেখলা তাকাভূমিতে পতিত হইয়া "সন্ধ্যাকিনী" নাম নামে প্রবাহিত।

ভাব-সাধক দ্বিজেন্দ্রলাল।

রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ও আদর্শের সংঘাতে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তখন মনকে সর্ব্বপ্রকার বিক্ষোভ হইতে মুক্ত করিয়া অবলীলাক্রমে কোনো বিশেষ শিল্পীর শিল্প পরীক্ষা করা বা শিল্পজগতে তাঁর স্থান নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায়, এ দেশের কবি ও নাট্যশিল্পিগণের অন্যতম, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পি-শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাদের প্রতি যে আদেশ করা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই শিরোধার্য্য করিয়াছি যে, দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য ও বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব উদ্বোধক আন্দোলন আমাদের চক্ষে এতই পরস্পরসম্বদ্ধ দেখায় যে, দ্বিতীয়টীকে আমরা প্রথমটীর পরবর্ত্তী ঘটনাবিকাশ বলিয়াই মনে করি। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো বিশেষ কাব্য-শরীরের দোষগুণ বিচার বা নাট্যচরিত্রের বিশ্লেষণ ব্যাপারকে কর্ত্তব্যের অঙ্গ না করিয়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির বিশিষ্ট প্রকৃতিটী মাত্র এ প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

দ্বিজেন্দ্র-শিল্পাগারের সহিত আমাদের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় ঘটে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—তাঁর প্রতাপসিংহ নাটকের মধ্যপথে। তখন আমাদের বয়স অল্প, সুতরাং অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত, রাজস্থানের অতীত গৌরবকাহিনী পরিকল্পিত এ নাট্যলীলাকে, রঙ্গালয়ের গৌরব নাট্য হিসাবেই উপভোগ করি—কিন্তু বুঝিতে পারি নাই, যে বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের জন্য, কতকগুলি ঐতিহাসিক নাম ও ঘটনার আচ্ছাদনে, একখানি দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন অনন্যসাধারণ পরাক্রমের উৎস, ও জাতীয় চিত্তনিয়ামক অলক্ত, জাগ্রত মন বিচিত্র ভাব-রূপকে যে প্রচণ্ড চিত্তশক্তি প্রয়োগে সাকার করিয়া চলিয়াছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতেই ভারত নাট্য-মঞ্চে, রক্ত-মাংসে জীবন্ত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিবে।

প্রতাপসিংহ নাটকের দৃশ্যপট, যবনিকা অপসারিত হইবামাত্র আমাদের নয়নসমক্ষে তুলিয়া ধরে একটী কালীমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির নিকটে পুরোহিত; সম্মুখে প্রতাপ ও চতুর্দ্দিকে নতজানু রাজপুত সর্দারগণ। পরক্ষণেই আমাদের আকৃষ্ট করে—প্রতাপের বহ্নিগর্ভ কয়েকটি উক্তি, যার প্রত্যেকটী অক্ষর বাঙ্ময়-বজ্র,

জাতির নাবিকতা-সাধন-যন্ত্রের অন্যতম গুরু দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় শোণিতে রক্তবর্ণ। শেষ-বয়সের 'পরপারে' নামক নাটকখানিতে ভবানীপ্রসাদের মধ্য-দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ একই ধ্যানমূর্ত্তি আমরা দ্বিতীয়বার দেখিতে পাই একটি সঙ্গীতের আকারে; নাটকের পর নাটকে প্রাণঢালা চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টি শেষ করিয়া আসিয়া, এখানে তিনি ভক্তিবিধৌত হৃদয়ে বুঝিবা তাঁহার আরাধ্য মানস-প্রতিমারই পাদপদ্মে দৃষ্টি রাখিয়া আবেগ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিতেছেন—

"চরণ ধরে" আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ না মা,
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা;
একি খেলা খেলিস ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভুবন আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা
এতদিন তো কালী ভীমা, তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হল, এখন মা তোর অসি নামা।
আয় মা অভয়ারূপে, স্মিতমুখে শুভ্রবাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে,
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা, অভয়ে অভয় দে মা
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।"

এই গানটীতে আমরা দেখিতে পাই, যে চিন্ময়ী চেতনাশক্তি লীলা-বিলাসে বহির্বিশ্ব ও অন্তর্জ্জগতকে পরিপূর্ণ করিয়া চিত্রসঞ্চরণ-লীলা,—যাঁহার হাতের অসি, বা অপরাহত-পরাক্রম ইচ্ছাবেগ, আমাদের কামনার পশ্চাতে নিদ্রিত জাগ্রত থাকিয়া এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদিগকে চালিত করে, কাম্য-সংগ্রহে প্রবৃত্তি দেয়—এবং কামনার তিরোধান ও কর্ত্তব্যের উদ্‌ঘাটনে যে বাঁশরীতে পরিণত হইয়া অন্তরের পরিপূর্ণতার মধ্যে আনন্দরাগে বেজে উঠে, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনে ও সাহিত্যে, সেই শক্তিরই সাধক।

আমরা এই প্রবন্ধটীর নাম দিয়াছি "ভাব-সাধক দ্বিজেন্দ্রলাল," সুতরাং ঐ নামকরণ সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। 'ভাব-সাধনা' এই বাক্যটী দ্বারা 'ভাব-বিলাস' নামক আর একটী 'একজাতের কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতের' শিল্প-চেষ্টার পার্থক্য নির্দ্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভাব-বিলাস মানস-সাধনার

নির্জীব করে, হৃদয়বৃত্তিকে শিথিল করে, বিচারবুদ্ধির উপর মোহজাল বিস্তার করিতে থাকে,—কিন্তু ভাব সাধনা মানব হৃদয়কে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, হৃদয়বৃত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করে ও বিচার-বুদ্ধির মধ্যে সংযম ও স্বাধীনতা প্রবাহিত করিয়া দেয়।

২।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য সাহিত্যই যে বঙ্গীয় নাট্য শিল্পাগারে নাট্য শিল্পীর প্রথম আত্মপ্রকাশ, একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। এই আত্মপ্রকাশ শব্দের ব্যঞ্জনা বাহুল্য, আশা করি, এখনকার কালে অনাবশ্যক—সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জানাই আলোচ্য প্রবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট যে, আত্মপ্রকাশমূলক শিল্প তাহাকেই বলা যায়, যেখানে শিল্পীরই আশা, আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা, রুচি, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, ধর্ম্মানুভূতি, নীতিনিষ্ঠা, বা এককথায় শিল্পীরই বিশেষ চিত্তগঠনটী, সমস্তপ্রকার বাহ্যপ্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে তাঁর সৃষ্টিশিল্পে আকার লাভ করে এবং যেখানে শিল্পের দিকে চাহিয়াই শিল্পীর প্রাণে প্রবেশ করা যায়। নিজের আন্তরিক সাধনাকেই শিল্প সৃষ্টিতে বিস্তরণ করিয়া নিজেকে সৃষ্টির অতীত রাখা এই বিশ্বসৃষ্টিতে আত্মবিরত বিশ্বাতীতেরই অনুরূপ; এবং তাহাই যথার্থ কবিসত্তা। অত্যধিক ব্যবহারে 'কবি' কথাটীর মূল্য যদি আমরা অত্যল্প করিয়া না ফেলিতাম, তাহা হইলে এ প্রবন্ধের শিরোনামায় 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল' লিখিলেও ক্ষতি ছিল না। কবির কার্য্য অবশ্য ভাব সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়,—স্বর সাধনা বা সুর-সাধনার অর্থ যেমন স্বর ও সুরের বিচিত্ররূপকে কণ্ঠের আয়ত্তে আনয়ন করা বা কণ্ঠকে তৎসমুদয়ের স্পন্দনের প্রভুত্ব-পদে নিয়োজন করা, ভাব-সাধনাও সেইরূপ মানব বুদ্ধি ও মানব হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও বৃত্তিগুলিকে আয়ত্তে আনা বা নিজের মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে তৎসমুদয়ের উপযুক্ত করিতে থাকা। এ কার্য্যের উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য আয়ত্তীভূত বৃত্তি সমূহ অন্যের মধ্যে প্রেরণ করিয়া, অন্তরের দিকে পরস্পর যুক্ত হইবার কাজে মানব জগৎকে সহায়তা করা—মনের সমতল উন্নত করা—অন্তরের বিবিধ সুপ্ত শক্তিকে কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ও ধর্ম্মক্ষেত্রের দিকে জাগ্রত ও উন্মুক্ত করিয়া তোলা।

বিশেষজ্ঞেরা এই দৃশ্যমান বিশ্বগ্রন্থকে পাঠ করিবার বিধান দিয়াছেন আকাশের দিক্ হইতে, কিন্তু মাটীর দিক হইতে নয়। মাটীর দিকে মানুষ চলিতে পারে, কিন্তু আকাশের দিকে যে মাটীর ঘরে নয় একথাও

সমান সত্য। কোনো কবির শিল্পগ্রন্থ সম্বন্ধেও এই বিধি সমান খাটে। কোন্‌টা আদর্শ চরিত্র, কোন্‌টা স্বাভাবিক চরিত্র, কোন্‌টা সামাজিক চরিত্র, তাহার হিসাব নিকাশ তেমন মূল্যবান্ নয়—যেমন মূল্যবান্ এই প্রাথমিক সত্যটি জানা, যে চিত্রিত যাবতীয় খণ্ড চরিত্রই অসম্পূর্ণ ও খণ্ড আদর্শ এবং তাহাদের অপেক্ষা অনেক বড় আদর্শ, সেই শিল্পি-চিত্তের গভীরটী, যাহা বিবিধ ভাব মূর্ত্তিকে শিল্পপটে সাকার করিতে পারে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্রণ সম্বন্ধেও একথা খাটে; তাঁর বিভিন্ন বুদ্ধি-চালিত ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবলক্ষ্য গঠিত চরিত্র সৃষ্টিগুলির সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের উপর আমরা তাঁর মনের এমন একটী তটরেখা দেখিতে পাই, যাহা স্থিরশান্তির অন্তরস্থ আলো সঙ্গে প্রসারিত নীলাকাশপটখানির অনুরূপ। বস্তুতঃ তাঁর নাটকগুলির ঘাত-বিঘাতের ও জীবনকল্লোলের ভিতর হইতে বারংবার ঐ নীলিমার স্থির শান্ত তটভূমি দেখা দিয়াছে—আর সমস্ত বিচার বিশ্লেষ ও ঘটনা-সংঘাত অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উদ্ভাসিত ঐ শান্তি-প্রতিষ্ঠা মনখানিই তাঁহার ব্যক্তিত্ব-সিদ্ধ বিশেষ সম্পত্তি বা ভাব-সাধনার বিশেষ উপার্জ্জন। ঝড়-বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের পটে দিবা-নিশা-সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা প্রভৃতি সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে আবর্ত্তিত করিয়া, এ যেন আমাদের এই সৌর-জগতেরই উদ্ধশায়ী প্রশান্ত নীলিমাময় অবাধ প্রসারিত সমতল, যার অপরপৃষ্ঠের রহস্য আমাদের অনধিগম্য।

"দম্ভ করিও না; অত বড় হও তুমি,
তোমার চেয়েও বড় আছে বিশ্বতলে;

তুমিও এ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের দাস"—এই উক্তি কবিরই নাটকীয় পাত্র মুখে আমরা শুনিতে পাই, এবং এ উক্তির রূপ যে তাঁহার নিজেরই জীবন দর্শন বড় সত্য, তাহা তাঁহার "প্রবাসে" শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটীতে সুস্পষ্ট দেখি। এই পক্ষে এই কবিতাটীই তাঁহার স্তরে স্তরে বিকাশ-প্রাপ্ত জীবনখানির সঙ্গে পরিপূর্ণ; এবং দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের সহিত কবির ঐ হৃদয়ের দিক দিয়া আমাদের পরিচিত হইতে চান, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঐ জীবন-স্তুতিটী পড়া উচিত।

৩।

কবির ঐ বিশিষ্ট চিদাকাশটীর দিক্ হইতে তাঁহার নাট্যরাজ্যে অবতরণ করিলে যে চরিত্রগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহাদের মতি-গতি ও ধার ধরণার অভিনবত্ব আমাদের সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট করে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারগণের সহিত তাঁহার মানস-বিহার ভূমির সুস্পষ্ট প্রভেদ দেখাইয়া দেয়।

রাজোর প্রতাপ, শক্ত সিংহ আকবর, সেলিম, মানসিংহ, কৌলত, মেহের, হসা, রেনা প্রভৃতি সকল চরিত্রই একটী একটী সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সুপরিস্ফুট, —ঔরংজীব, সাজাহান, জাহানারা, দারা, সুজা, পিয়ারা, দিলদার, যশোবন্ত, মহারাজা প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হইয়া আমাদিগের চিত্তপটে ছায়াপাত করে, আর সে সমস্ত বিশেষত্ব ও সীমাচিহ্ন এতই বিচিত্রমূলী, ও বিরুদ্ধ গুণধর্ম্মী যে আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের বিবিধ সুপ্তবৃত্তি ও ধারণাশক্তি তাদের স্পর্শে যুগপৎ জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে থাকে। তেজস্বিতা ও অমায়িকতা, কাঠিন্য ও কোমলতা তাঁর বীর্য্য-চরিত্র পরিকল্পনা-মাত্রেই যেন তাল ধরাধরি করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁর শক্তসিংহের মানস-ভঙ্গী বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব;—বস্তুতঃ দার্শনিক ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ তীক্ষ্ণবিচারশীল, সুকোশলী অথচ তেজউজ্জ্বল কর্ম্মী চিত্ত এই শক্তসিংহেই আমরা প্রথম দেখি— ইহার মনের একদিক কর্ম্মাভিমুখে, অপরদিক্ বিশ্বঘটনার পাঠক। নারী-হৃদয়,—তাহাও ইনি পাঠ করেন কার্য্যগ্রন্থ হিসাবে, কিন্তু তাহাতে আচ্ছন্ন হন না; রমণীচিত্তের সৌন্দর্য্য ও কামনীয়তায় ইহার মন প্রীত হয়, তৃপ্ত হয়, ওৎসুক্য হয়, জয়ধ্বনিমুখরও হয়—কিন্তু তাহাতে মোহপ্রাপ্ত আসক্ত বা আত্মহারা হয় না। শুধু শক্তসিংহ বলিয়া নয়,—দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের অধিকাংশ নর-নারী-চিত্রই অল্পাধিক পরিমাণে কবিত্ব-মাধুরীময় দার্শনিকতার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। একদিকে, এর বালিকা ইহার মুখে আমরা শুনি—"পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী, তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে—তা, তিনি পিতা আর মোগল শত্রু বলে নয়—তা' এইজন্যে যে, মোগল প্রবল আর পিতা দুর্ব্বল, পিতা আক্রান্ত আর মোগল আক্রমণকারী"—অপরদিকে আবার শক্তসিংহেও দেখি, ঐ বালিকার স্নেহগর্ভ সুপ্রযুক্ত-উক্তিতে নিজের বিচার-বিভ্রম-সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধ, এমন কি সংশোধনেও যত্নবান্ হন, অথচ কোনো মহামান্য কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ অসরল উপায়ে কার্য্যোদ্ধারের ইঙ্গিত করিলে অপমানে তাঁর মুখ রক্তস্রোতরঞ্জিত হইয়া উঠে।

এঁর নাটকে দু'টি বিভিন্নভাবের মহৎ চরিত্র বাহ্যঘটনাধীন হইয়া যখন পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হয়, তখনও পরস্পরের মহত্ত্ব-সম্বন্ধে চেতনা হারায় না। একদিকে আকবরের মুখের উপর শক্ত সিংহও যেমন ফলাফলের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া নির্ভয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন

না, আকবরও তেমনি অন্যদিকে বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া সেই অবসরে ঐ বিশিষ্ট লোকচরিত্রটী অধ্যয়নেরই চেষ্টা করেন। এর মেহেরউন্নিসার নিজের মনই তাঁর নিজের কাছে এতবড় একটা রাজ্য যে তাহা লইয়াই সে মশগুল থাকিতে পারে—এবং শক্তসিংহের মত অপরিচিত পুরুষের সাহচর্য প্রথম দর্শনেও তার ব্যক্তিত্ববুদ্ধি সঙ্কুচিত হওয়া দূরে থাক্, বরং তাঁকে প্রায় সমকক্ষ শ্রেণীভুক্ত ধরিয়া লইয়াই অকুণ্ঠ আলাপ সুরু করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রধান বিশেষত্বই এই যে,তাঁর সৃষ্ট প্রায় সকল চরিত্রেরই একটা ব্যক্তিত্ব, একটা আপন নিয়মে গড়িয়া তোলা নিজস্ব জগৎ আছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা বহির্ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির সম্মুখীন হয়।

"শত্রু হয় হোক্ না—যদি সেথায় পাস মহৎ প্রাণ,
তাহাতে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান ;
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে, তাহারে দূর করিয়া দে
সবার বাড়া শত্রু সে, আবার তোরা মানুষ হ।"
"জগত জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোখ্
পুণ্য-সেনা আপন কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক্
ধর্ম্ম-যেথা সেদিকে থাক্—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ
স্বজন, দেশ ডুবিয়া যাক্, আবার তোরা মানুষ হ।"

—মবার-পতনের শেষ দৃশ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনুষ্যত্ব গঠন বুদ্ধির এই যে কয়েকটী মাত্র পংক্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই পংক্তিগুলিকেই তাঁর চরিত্র-চিত্রের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলে আমরা [illegible] খিতে পাইব যে, তাঁহার দেশাত্মবোধ একটা 'বিশ্ব-মানব-মাহাত্ম্যে'—বিচ্ছি [illegible] ভৌগোলিক সীমা চিহ্নিত স্থান-মাত্রেরই প্রতি অন্ধ মমতা নয়, কিন্তু প্রত্যেক দুর্ব্বল ও দলিতকে মর্য্যাদাবুদ্ধি ও উদার-উন্নত-ভাবসিদ্ধ জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান [illegible]—তাঁহার নাট [illegible] চিত্রগুলিও দৃষ্টান্ত হিসাবে নানাদিক্ সঞ্চালিত বর্ণতুলিকার একটা রেখামূর্ত্তি মাত্র। এক একটী চরিত্র লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে নজরে পড়িবার মত ত্রুটিবিচ্যুতির হয়তো অভাব ঘটিবে না—হয়তো আমরা দেখিব যে, কোনো কোনো চিত্র-মূর্ত্তি তাহাদের অবলম্বিত আদর্শে বেশ সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, তাহাদের স্রষ্টারই অন্তরের নীতিবাদকে একটু 'নাটুকে' রঙেই আবৃত্তি করিয়াছে, শিষ্টাচার ও সঙ্গতির দিকে তাকাইবার অবসর ঘটিতে দেয় নাই—কিন্তু ভাবগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া তাহাদের মূল্য ও গৌরব-

জীবনে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝিবার দিমত ঘটিবার অবকাশই থাকিবে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, হিন্দু-পরিবারের চিত্রমূলক নাটকে শ্বশ্রূমাতার সম্মুখে সরযূর মুখে স্বামীর উদ্দেশ্যে মাতৃভক্তি সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা—মাতার দিক হইতে সন্তানকে পদধূলি লইতে অনুরোধ,—হিরণ্ময়ীর মুখে এমন ভাষা যা' ভাষা-ব্যবসায়ীরও চেষ্টাসাধ্য—কল্যাণীর মুখে পিতার সমক্ষে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ পতিভক্তির উচ্ছ্বাস,—মানসীর হৃদয়-যন্ত্রে বাহির হইতে প্রাপ্ত-প্রয়োগ বিশ্ব প্রেমনীতি-বুদ্ধ, প্রভৃতি। কিন্তু এ সকল ত্রুটী প্রকাশ-কৌশলের —বিশেষত নাটকের মত দুরূহ শিল্পে, যাহাতে পাত্রপাত্রীর হৃদয়ের ভাব বুঝাইবার প্রধান উপায় তাহাদের মুখনিঃসৃত বাক্যমাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরের আলোকে আমরা দেখিতে পাই—প্রচ্ছন্ন স্বার্থ-সিদ্ধি-লক্ষ্য, মধুর বাক্য-ব্যবসায়ী ও কপট মক্কাভিমুখ ওরঙ্গজীবকে—এবং তাহানারার সমালোচনায় তাহাকে 'মনোহর পাষণ্ড' নামে চিহ্নিত দেখিয়া মানব-চরিত্রের একটা আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে সতর্ক হই। এইরূপ, মনোরাজ্য-ঘটিত বিবিধ পাপ ও পুণ্য-পথযাত্রী পথিকের সহিত এখান আমাদের চেনা-শোনা হয় অথচ কবির তুলিকা সর্ব্বত্রই কল্যাণ-বরণে ও অকল্যাণ-বর্জ্জনে আমাদের সহায় হইয়া চলে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের কতই না বৃত্তি সুনির্দ্দিষ্ট ছাপ বুকে করিয়া তাঁর নাট্য-পটে আন্দোলিত; কতই না বিচার, তর্ক, সুষমা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, উপমায় ও অলঙ্কারে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া এ সাহিত্যে হিল্লোলিত। টীকাকারের ব্যাখ্যা-মুখাপেক্ষী হইয়া এখানে কিছুই পড়িয়া নাই—সমস্তই, বিচারনিষ্ঠ কবির অর্থরোপে এবং আপনাপন কথাবার্ত্তায় পরস্পরের মধ্যে সাহায্য বিস্তার করিয়া, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সৌরকিরণ-চ্ছটার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনো বন্ধুকে লিখিত কয়েক ছত্র কবিতায় আমরা শুনি :—

"মানুষের ভালমন্দ, মানুষের পুণ্যপাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ;
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।

* * * * *

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক ভাই.

তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি'
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি।"...

তাঁর এ প্রার্থনা ও অন্তরের কামনা যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করি।

(৪)

দ্বিজেন্দ্রলাল নিরাশাবাদী ছিলেন, কি সন্দেহবাদী ছিলেন, Personal God-এ অবিশ্বাসী ছিলেন, কি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপে বিশ্বাস করিতেন, এ সকল দুর্ভাবনার বিশেষ কোনো মূল্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না—কেন না সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য হইতেছে এই কথা যে, তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। বিশেষতঃ 'মনুষ্যত্ব' নামক একটী আদর্শে আমরা তাঁহাকে এত বেশী শ্রদ্ধাবান দেখি যে, স্বামী বিবেকানন্দের সুরে সুর মিলাইয়া তিনিও সমস্ত প্রাণের উল্লাস-বর্ষণে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যদি মানুষ সে হয়"। যা' কিছু সুন্দর ও মহৎ, বিশুদ্ধ ও কল্যাণময়, তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হওয়াই তো যথার্থ ভগবদ্-বিশ্বাস, প্রকৃত আস্তিকতা। আমি কি মানি না মানি, তাহাতে জগতের কিছুই যায় আসে না;—যায় আসে, যদি আমার চিত্তচালনা, উদার ও আলোকিত ভাবের স্বর্গে সাধারণের হৃদয়কে উন্নীত করিতে না পারে—বিশ্লেষণবৃত্তি ও বিচারতৃষ্ণা জাগাইয়া ভাবজটিল মানব-চিত্তের দীপ্তি মুখ হইতে কুজ্ঝটিকার আবরণ অপসারিত করিবার সহায় না হয়। কিন্তু দেবকুমার বাবু তাঁর বন্ধুর যে বৃহৎ জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে দেখা গেল যে, বিশেষভাবে 'পরপারে' নাটকের ভবানীপ্রসাদই তাঁহার চক্ষে সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর হইতে "ভক্ত-চরিত্র"রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। নিরীহ ভবানীপ্রসাদ যে ভাল লোক, এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নাই—কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিশ্বেশ্বরের ঐ গৃহ-পালিত কাশীভক্ত-চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল যদি না আঁকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার শিল্পশালা, এমন কি ভক্ত-চরিত্রের দিক হইতেও বিন্দুমাত্র দীন বিবেচিত হইত না, কেন না তাঁর যে 'চাণক্য' দেবকুমার বাবুর চক্ষে "হৃদয়হীন, ভক্তিহীন ও নিজের আত্মার নিকট ধিকৃত-পরাক্রম পুরুষকার-সর্ব্বস্ব" বলিয়াই বোধ হইয়াছে, তাহাকেই আমরা ভক্তি-লোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম।

এই চাণক্য-চরিত্রের জীবন্ত পরিকল্পনা ও অনবদ্য প্রকাশ যে কোনো নিপুণ শিল্পী মাত্রেরই পক্ষে সম্ভব হইত না, যদি না তাহার পশ্চাতে ভাবুক-বাঁর

ব্রহ্মণ্য-প্রতিভার জন্মান্তরীণ শক্তি-সাধন-রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিত। আধ্যাত্মিকতা বলিতে যাঁহারা আকুল সুরের মত আভাসের ভাষায় ব্যক্ত কি-যেন একটা কিছুই মনে করেন, তাঁরা শুধু আবেশ-মধুর মোহিনী শক্তিচাতুর্য্যেই আত্মার লীলা অনুভব করিতে অভ্যস্ত,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঐ চাণক্য-চরিত্রে কবির হৃদয়-আরোপ যে আত্মপ্রকাশকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিকতা মাপিয়া দেখিবার কোনো সহজ যন্ত্র কাহারও হাতে নাই।

এই চাণক্য এত হৃদয়-হীন যে, তাঁহার হৃদয়ের ভাষায় দেখি—"মন্ত্রিবর! আমি রাত্রিকালে কার্য্যান্তর থেকে ফিরে এসে যখন দেখলুম যে, আমার কন্যার শয্যা শূন্য আর আমার দুহিতা ভূমিতলে অজ্ঞান, তখন আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইল, চক্ষে অন্ধকার দেখলুম, মাটী থেকে একটা তপ্ত বাষ্প আকাশে উঠতে লাগলো—তারপর উন্মত্তবৎ রাস্তা দিয়ে মা মা বলে ছুটতে লাগলুম, পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে পাখীরা কলরব করে উঠ্‌লো—নদীর ধারে গিয়ে চীৎকার করলুম—সেই রাত্রের অন্ধকারে কৃষ্ণা নদী শুধু গর্জ্জন করে চলে গেল, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।"

এত হৃদয়হীন যে তার ভক্ত-হৃদয়ের অভিমানী বাণী বলতে চায়—"ঈশ্বর তোমার স্বপক্ষে আমায় নিলে না; তামার বিপক্ষে সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে যে—কি করবে, কর" এবং যে প্রভাত সৌন্দর্য্য চিরকালই মনোহর, বিদ্বেষ সঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া স্বকার্য্য-সাধনের অন্তরায়-বোধে তাহার দিক হইতেও বিমুখ হয়,—মন কি সঙ্কল্পে জোর পাইবার জন্য নিজের মনের কাছেও তাহাকে কুৎসিত বলিয়া প্রচার করিতে থাকে।

এত হৃদয়হীন, যে এই দীনহীন ব্রাহ্মণ সন্তানটীর দেহে দেহে প্রাণ-সঞ্চার-শক্তি-সম্পন্ন বলিষ্ঠ হৃদয় আত্মমর্য্যাদায় আহত হইলে, হৃদয়ে হৃদয়ে মর্য্যাদাবুদ্ধি বিকীর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া ওঠে—"ব্রাহ্মণ! জড়ের মত খাড়া হয়ে আর দাঁড়িয়ে দেখছো কি! জগতের বিদ্রূপ হ'য়ে ঐশ্বর্য্যের দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়াতে তোমাদের লজ্জা হচ্ছে না পারো তো ওঠো, কপিলের তেজে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে' নীচের দর্প দগ্ধ করে দাও। আর তা' দ না পারো, তবে ওরে ঘৃণিত, যাও।"

আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মত যার অপমানিত আত্মা হইতে উদ্‌গিরিত

তুমি দেখবে। এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি তো আমি চণক্যের সন্তান নই। তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এই শিখা বাঁধবো, এই প্রতিজ্ঞা করে যাবো, মনে থাকে যেন মহারাজ। আর ভবিষ্যদ্বাণী করে' যাই যে একদিন এই ব্রাহ্মণের পদতলে বসে' তোমাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে—সে ভিক্ষা আমি দেবো না—সেই দিন বুঝবে আবার, এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, প্রতিভার প্রভাব, প্রতিজ্ঞার বল, অভিশাপের তেজ, ক্রুদ্ধ বিক্রম, আর ব্রাহ্মণের ক্রোধের প্রতাপ।"

অপরপক্ষে, এই ভক্তিহীন হৃদয়েরই ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে—"এই প্রধূমিত প্রজ্বলিতা, প্রবহিত রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা সঙ্গীত-মুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হইতে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক মহাসাম্রাজ্য, যার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আর যার পুরোহিত ঐ দীনদরিদ্র 'হৃদয়হীন' চাণক্য!

এই চাণক্য আহার করেন দুটি আতপ-তণ্ডুল, শয়ন করেন অজিন শয্যায়, আর দ্বিপ্রহর রাত্রে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ও রাজ্যে শান্তিস্থাপনের চিন্তায় ইনি মস্তিষ্কে কুটীর প্রাঙ্গণে পাদচারণা করেন—চিত্তশক্তির আঘাতে চিন্ময় যার সমুদ্রে ঘটনাতরঙ্গ তুলিয়া এবং তাহার হাল ধরিয়া নির্জ্জন নিস্তব্ধে আহ্নী-কূলপ্লাবী জ্যোৎস্না-দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলেন—"এ কি এ এতক্ষণ কোথায় ছিল? এই রাশি রাশি সৌন্দর্য্য উপরে, নীচে, নিকটে, দূরে, দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে,—এ তো বহুদিন দেখিনি! কি সুন্দর জ্যোৎস্না! আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে যাচ্ছে, আর তার নিম্নে জ্যোৎস্না-স্নাতা ভাগীরথী কলস্বরে গান গেয়ে চলেছে! পতিতপাবনী মা সুরধুনী! ভাগীরথী কি পুণ্যবলে তোমাকে, স্বর্গের এই মন্দাকিনীকে মর্ত্ত্যভূমে টেনে এনেছিল মা,—একবার এই মরুহৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিয়ে দে না মা—আমি একবার মা মা বলে ভরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করি"—

ক্রমশঃ।

বৈঠকী।

নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তোমার কাগজে লিখিব কি? প্রাণটা যে নীল হয়ে রয়েছে!" আমাদেরও তাই বলিতে ইচ্ছা করে। বৈঠকী আলাপ করিব কি, দেশের ও দশের ভাবের বাতাস যেন কেমন কেমন, তেমন যেন নয়।

* * * *

এমন অবস্থায় বৈঠকী আলাপ করা চলে না। একদল প্রমত্তবৎ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, আর একদল পাকা মাঝির মতন যেদিকে বাতাস চলিতেছে, সেইদিকে বাদাম তুলিয়া স্বার্থের পানসীকে দখরাত উজাইয়া আগাইয়া লইতেছে, দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। যাহারা প্রমত্তবৎ ছুটাছুটি করিতেছে, তাহাদের অনেকে ভাবোন্মত্ত, স্বার্থ এবং পরার্থ-জ্ঞান-শূন্য। কাহারও দুইদণ্ড বসিয়া বৈঠকী আলাপ চালাইবার অবসর নাই। কাজেই বলি কাহাকে?

* * * *

এই উন্মাদ অস্থৈর্য্যের জন্য আমরা বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় এবং গবরমেণ্টকে দোষী করিয়া থাকি। বহুকাল আস্তাবলে যাহারা বাঁধা ছিল, তাহাদের দড়ি ছিঁড়িয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহারা ছুটাছুটি পা-ছোড়া ছুড়ি করিবে না ত আর কি করিতে পারে? যুদ্ধের ঘোড়াকে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে ইটিতে ছুটিতে শিখাইতে হয়, তবে সে দলবদ্ধ হইয়া মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে! মানুষকে কুচকাওয়াজ শিখাইয়া দোরস্ত করিতে হয়, তবে সে পাকা সিপাহী হইয়া মহারণপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে পারে। বিধি এবং নিষেধ ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা চলে না। 'সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা'—সংহতি শক্তি বহুকাল তপস্যার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। ব্রিটিশজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া শাসনরশ্মি ধারণ করিয়া কেবল ভাঙিয়াছে,—গড়ে নাই ত কিছু।

* * * *

এখন সেই সনাতন ভারতবর্ষের বিচূর্ণ প্রস্তরখণ্ড সকল অভাবের ও অব্যবস্থিতচিত্ততার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এক অপরকে আঘাত করিতেছে। গবরমেণ্ট ও শাসক-সম্প্রদায় চোট খাইতেছেন, ধীর গৃহস্থ সম্প্র-

দায়ও আহত হইতেছেন। এইটুকু যেন বুঝিয়াই শাস্ত্র বার বার বলিয়াছেন—"যৎ যৎ শাস্ত্রমধীতং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ"—কেবল তোতা পাখীর মতন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হইবে না, শাস্ত্রানুকূল ব্রতাচরণ করিতে হইবে। ব্রতাচারী না হইলে কোন মানুষের দ্বারা কোন কার্য্যসাধন হইতে পারে না। কেবল খেয়ালে এবং সখে কোন স্থায়ী কাজ হইতে পারে না।

* * * * *

রাম বনগমন করিলে কৌশল্যা যখন শোক করিতেছিলেন, তখন সুমন্ত্র তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন—"মা তুমি ভীত হইও না, রাম সংযমী এবং ব্রতাচারী পুরুষ; সম্রাটের পুত্র হইলেও মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ভাবপ্রণয়ের সেব্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। মনে নাই কি, বিবাহের পূর্ব্বে রামলক্ষ্মণ দুই ভাই বিশ্বামিত্রের সহিত অতি দুর্গম বনপথে জনকপুরে গিয়াছিলেন। অতএব রাম বনবাসের দুঃখ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে।" দুঃখই জীবন, সুখ জীবন নহে। 'বাধনালক্ষণং দুঃখ'মিতি, যাহা বাধাপূর্ণ, তাহাই দুঃখ। মনুষ্যজীবন বাধাপূর্ণ; কেবল বাধা উত্তরণের জন্যই মনুষ্যের উদ্ভব। যে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার দ্বারা জীবনের কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না। শ্রীভগবান্ দুঃখময় জীবনের ব্রত ফুটাইবার উদ্দেশ্যেই বারে বারে নরাকারে নরমর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

* * * * *

আমাদের আধুনিক বংশধরগণ শিক্ষার সময়ে দুঃখের পরিচয় গ্রহণ করেন না। সুখের ও বিলাসের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া, গোটাকয়েক তোতা পাখীর বোল্ কপ্‌চাইতে শিখিয়া তাহারা সহসা সংসারের অভাবময় দুঃখাগারে রূপ প্রদান করে। অভাবের দুঃখ অতিক্রম করিবার কোন সামর্থ্য তাহাদের সঞ্চয় করে না, ইংরেজের নির্ম্মিত আইন-আদালতের ও চাকরীর বাঁধা পথ ছাড়া তাহারা অন্যত্র বিচরণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারে না। অথচ ভাগ্যদোষে মস্তিষ্কের মধ্যে "লিবার্টি" "ইকোয়ালিটি" "ফ্রাটারনিটি" প্রভৃতি অনেক রকমের গাঁজার ধোঁয়া জমা থাকে। সে ধোঁয়ার প্রেরণায়, খেয়ালের বশে ছেলেরা অনেক সময়ে এমন সকল কাজ করিয়া বসে; যাহার সমাধানের সামর্থ্য ও সহিষ্ণুতা তাহাদের নাই। তাহাদের অনেকে অভিনয় করে, সাধনা করিতে পারে না। তাই চাপ পড়িলেই অনেকেরে বাঁকিতে হয়। সুতরাং হয়

বখন চাপে, তখন হিতবচন বলা চলে না—বলিলেই গালাগালি সহিতে হয়, মার খাইতে হয়।

* * * * ৭

বেদের বাক্য—তপস্তপস্তপ :—তপস্যা কর, তপস্যা কর—তপস্যা কর, তবে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটিবে। আমাদের শাস্ত্রে—সাধন শাস্ত্রে—Miracle বা অলৌকিক ঘটনার, অতি প্রাকৃত ব্যাপারের স্থান নাই। মানুষ মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তবে সে অসীমশক্তির প্রভাবে অঘটন ঘটাইতে পারে। বাহিরের দেবতা আসিয়া অঘটন ঘটাইতে পারেন না। শ্রীরামচন্দ্র কখনও Miracleএর সাহায্যে কোন কাজ করেন নাই। তাই তাঁহাকে পুরাণে আত্মবিস্মৃত অবতার বলা হইয়াছে। মানুষ গড়িয়া উঠিলে অঘটন ঘটনা আপনিই ঘটে। চাই মানুষ, তেমন মানুষ হইতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণসখা মহাবীর হইলেও তাঁহাকেও হিমালয়ে যাইয়া সর্ব্বশক্তিধর মহাদেবের আরাধনা করিতে হইয়াছিল। পাছে দৈবীশক্তি লাভ করিয়া ধনঞ্জয় শক্তিদর্পে আত্মহারা হন, তাই অর্জ্জুনকে একবৎসরকালক্লীবত্ব সহ্য করিতে হইয়াছিল। বলা দেখ, অর্জ্জুন কেবল নিবাতকবচবধে পাশুপত অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু বধের পরও তিনি পাশুপত স্পর্শ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সখা যিনি জগজ্জয়ী মহাবীর, তাঁহাকেও দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে হইয়াছিল এবং শেষে গীতামৃত পান করিয়া তবে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। তিনিও Miracleএর সাহায্য কখনই গ্রহণ করেন নাই।

* * * * *

আমরকালকার যুবজন এ সকল কথা কাণপাতিয়া শুনিতে চাহে না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, হরিনাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ, পাপভার তুলার বস্তার মত বিরাট ও বিশাল। এই অগ্নিকণা সহযোগে পাপ কার্পাস ক্রমে ধীরে ধীরে দগ্ধ হইতে থাকিবে। যখন সবটা পুড়িয়া খাক্ হইবে, তখন নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় জীব নিরাবিল দেহধারণ করিয়া ভাবরাজ্যে বিরাজ করিবে। অর্থাৎ সহসা এক কথায় কোন কাজ হয় না—হইতে পারে না। তাই রঙ্গ করিয়া প্রভু মানগোপাল গোস্বামী—বলিয়াছেন যে, একলম্ফে সাগর পার এযো হনুমানই করিয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন সাগর পারে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহাকে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। মানুষ লাফাইয়া সাগরপার উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহার জন্য সেতু চাই—ভেলা চাই—যে

জোয়া ডুবিবে না, এমন ভেলা চাই। সেতু ও ভেলা নির্ম্মাণ সময়সাপেক্ষ, অর্থাৎ তপস্যাসাধ্য। মানুষ যে কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ, সে সূত্রের বল্লিশ বন্ধন উন্মোচন করিতে বিলম্ব ঘটে। কথাটা বেশ ভলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবে কি?

* * * *

বানর জন্মিবার পরেই ডাল ধরে, দুই একদিনের মধ্যে মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া শাখামৃগের স্বভাব অবলম্বন করে। মানুষ পাঁচ বছরের ছেলেটি না হইলে ঠিকমত হাঁটিতে পারে না; পনর বৎসরের কিশোর না হইলে জীব-সামান্য ধর্ম্ম আহার নিদ্রাদির জন্য চেষ্টা করিতে পারে না। মনুষ্য এবং পশুতে এটা বৈষম্য। এই স্বাভাবিক বৈষম্যের কথাটা ভুলিলে ত চলিবে না। ইহা ছাড়া আধুনিক শিক্ষিত যুবজন ইংরেজের গড়া রাজপথ ছাড়া অন্যত্র জীবিকার্জ্জনের জন্য বিচরণ করিতে পারে না। অথচ তারানাথ তর্কবাচস্পতি অসামান্য পণ্ডিত হইলেও ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন এবং ব্যবসায় সাহায্যে অর্থশালী হইয়াছিলেন। পুরাতন যুগের কোন পণ্ডিতই কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, জীবিকার্জ্জনের জন্য কেবল শাস্ত্র ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেন না। তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণু, অতি পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী ছিলেন। জর্জ্জ অটোট্রিডিশিয়ান সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তুল্য অপূর্ব্ব মনুষ্য আমি আর কোন দেশে দেখি নাই। উহারা অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে পারে, কোদাল ধরিয়া একটা পুষ্করিণী খনন করিতে পারে, কুঠার হস্তে একটা তেঁতুল গাছ চেলাইয়া দিতে পারে, যেমন ভূমি তেজনে পটু, তেমনই অকাতরে নিরন্ন উপবাস করিতে প্রস্তুত। এই দৈহিক বল ও শ্রমসহিষ্ণুতার সহিত অসামান্য মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির উন্মেষ! এমনটি আমি আর দেখি নাই।

* * * *

ইহাই ছিল আমাদের পুরাকালের শিক্ষিত সমাজের আদর্শ। তাঁহারা যখন যেমন সঙ্কল্প করিতেন, সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে সরস্বতীপূজার ভাসানের দিন ভাটপাড়ার জনকয়েক ছাত্র বেলেল্লামী করায় তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া বারাসতের মেজেষ্টর গারদে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। ছাত্রগণ তিন দিন তিন রাত্রি কেলখানায় জলস্পর্শ না করিয়া, মলমূত্র ত্যাগ না করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া ৺গোবিন্দ রায় মহাশয় স্বয়ং গেলে যাইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া

আনেন। দুঃখ দেখি, দেহের উপর তাহাদের কতটা প্রভাব বিস্তীর্ণ ছিল; তাহারা যাহা বলিত, তাহার অনেকটা করিতে পারিত; আর তোমরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রাসাদতুল্য হোষ্টেলে লালিত-পালিত ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি ড-কারাদিরোগের আকরস্বরূপ, তোমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিতে না পারিলে মূর্চ্ছা যাও; তোমরা সাগরলঙ্ঘনে উদ্যত হও কেন? ক্ষোভ এই, এই সোজা কথাটা বুঝাইয়া বলিবার যতন মুরুব্বী এখন বাঙ্গালায় নাই।

* * * * *

কথাটা কি জান? জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে আত্মদর্শন করিতে আমরা ভুলিয়াছি। আমরা আর আর্শিতে মুখ দেখিতে জানি না—পারি না। অথচ এখন ঘরে ঘরে আর্শি বা মুকুর ছড়াছড়ি যাইতেছে। অনেকের কক্ষপ্রাচীর মুকুরে মণ্ডিত। মুকুরে মুখ দেখিতে হইলে "মোহমুদ্গর" ঠিকমত বুঝিতে হয়,—মুকুরে মুখ দেখিতে হইলে বংশ এবং জাতি পরিচয় জানিতে হয়—মুকুরে মুখ দেখিতে হইলে পূর্ব্বজগণের আলেখ্য প্রাচীরগাত্রে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়,—নিজের মুখ এবং পিতা পিতামহগণের মুখের তুলনায় বৈষম্য বিচার করিতে হয়। যৌবনের চাকচিক্য টানিয়া রাখিবার চেষ্টায় এখন প্রায় সকলেই মুকুরে মুখ দেখিয়া থাকে। গোল ত এইখানেই—এ তত্ত্ব বুঝাইব কাহাকে? পূর্ব্বজগণের সহিত আকারগত পারম্পর্য্য কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, সে তত্ত্ব ত আমরা বুঝিয়াছি। বাৎসায়ন সে কথাটা একটুও বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বুঝে কে—পড়ে যে?

সাহিত্য, ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ।

(প্রতিবাদের উত্তর)

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম, সে গুলির প্রতিবাদ হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত চিঠিতে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যে সব কথা ছিল, তৎপ্রতিবাদের উত্তর পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে; এ ঐ প্রবন্ধে চূড়ামণি মহাশয়ের পক্ষ হইতে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রবন্ধে পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার কথার যে প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বপ্রবন্ধেই বলিয়াছি, প্রতিবাদগুলির অধিকাংশই গালিপূর্ণ। কটু কথা কখনও 'যুক্তি' বলিয়া গ্রাহ্য হয় না—ইহাতে প্রতিবাদীরই পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ কটূক্তি অপ্রত্যাশিত নহে; 'লঙ্কাপ্রিয়' স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলি যে 'ঝাল' হইত—তদীয় অনুবর্ত্তিগণের ভাষায়ও যেটুকু থাকিবে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যেখানে তর্ক চলে না—প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা যায় না—সেখানে গালি ভিন্ন আর উপায়ই বা কি? †

পরন্তু রাঁচির শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথোচিত ভদ্রতার সহিত তাঁহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয়ের বিরুদ্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন—তদুত্তর চূড়ামণি মহাশয়ই দিয়াছেন—আমি এ বিষয়ে কিছুই বলিব না। আমার সম্বন্ধে তিনি যেটুকু লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ৺পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমার মন্তব্য পড়িয়া তিনি বলেন যে, "রামকৃষ্ণ পরমহংস আমার ছিলেন না", এটা আমি "প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি"।

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি।—বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† গালির আর একটা সমাদর দেখা যাচ্ছে; যুক্তির উত্তরে যে যুগে যে কটূক্তিরই হউক না কেন "গলা ধাক্কা" বা "পুরস্কার" সমাপ্তিতে সেই কোনও দিন দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করা "লঙ্কা" অন্যায় নহে। বিবেকানন্দ।

একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া দেখিলে বোধ হয় তিনি এভাবে কথাটা বলিতেন না। আমি আমার 'ধারণা' মাত্র বলিয়াছি;—তাঁহাকে আমি 'অবতার' মনে করি না, একথা অবশ্যই বলিয়াছি—এবং ভক্তেরা তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন, একথাও বলিয়াছি; অপিচ ঐরূপ অবতার বলাতে কিরূপ 'অনিষ্ট' হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সামান্য কিছু বলিয়াছি। ইহাতে, তিনি অবতার নহেন—ইহা 'প্রতিপন্ন করার চেষ্টা' বুঝায় না, কেন না কোনও একটা বিষয় 'প্রতিপন্ন' অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে যুক্তি দিতে হয়। অবতারের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া একরূপ অসাধ্য? শাস্ত্র যাঁহাদিকে অবতার বলিয়াছেন—আমরা তাঁহাদিগকে অবতার মানিব—ইহাই একমাত্র 'প্রমাণ' মনে করি। অবশ্য গীতার—

'যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥'

অথবা ভাগবতের "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে অবতারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে; তথাপি স্পষ্টতঃ যে সকল নাম অবতারের তালিকাভুক্ত, তাহা ছাড়া অপর অবতার স্বীকার করা নিরাপদ নহে। একবার 'অবতার' খ্যাপিত হইয়া পড়িলেই আর কোনও বালাই নাই; তিনি যদি লম্পট হন—নজির হয় "শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ, রাসলীলা ইত্যাদি করিয়া ছিলেন;" তিনি যদি শঠ বঞ্চক হন, ভক্তেরা বলিবেন "বামন দেব বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। এ অবস্থায় যুক্তি তর্ক চলে কি? এমন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহারও 'অবতার'ত্ব এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।* অবতারের প্রয়োজনেই বা কি? আমাদের তো অনেক অবতারই আছেন—এ ছাড়া—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' যথাবিধিই হইয়াছে। ৺রামকৃষ্ণকে যাঁরা গুরুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁহার পূজা করিতে পারেন।†

---

* হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে—"গৌরচন্দ্রিকা" এখন অপরিহার্য্য পড়িয়াছে; কিন্তু তখন মনে করা যায় যে, তিনি এইরূপ কীর্ত্তনের "গুরু", তখন ইহার বন্দনা (যেমন করিয়া বাল্মীকি রামের বন্দনা করেন) সঙ্গতই মনে করা যাইতে পারে।

† আমাদের দেশে যেমন ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিয়া অমূল্যের প্যাটেণ্ট ঔষধ খাইয়া আরোগ্যলাভ করিতে চায়—এ সকল উটে অবতারবাদীরাও 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ তেন যায়েন্ স্বয়ং তাতঃ' সেই শাস্ত্রমার্গ ছাড়িয়া অনায়াসে অবতারাদির প্রতীকোপাসনা দ্বারা সহজ মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে প্যাটেণ্ট 'ঔষধের পরিচয়ের'—অর্থাৎ, সেই সাধু ব্যক্তি, এদেশে কলাচিৎ কিন্তু ভক্তেরই মাত্র লোভনীয়

আমি লিখিয়া ছিলাম, "৺রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে—এবং ৺রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভট শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" ইহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, "বঙ্গদেশে আধুনিক বহু অবতারের কথা আমরা তো শুনি নাই।" তিনি যদি না শুনিয়া থাকেন, তবে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করি। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু-প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, স্বামীজি বলিতেছেন, "এক ঢাকাতেই শুনলুম্ তিন চারিটি অবতার বেরিয়েছেন।" এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আরো যাহা বলিয়াছিলেন, [পুনরুক্তি হইলেও—কেন না দ্বিতীয় 'আষাঢ়' সংখ্যায় ইহা উল্লেখিত হইয়াছিল—] তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম। (ঢাকায় একজন বালক একটা 'ফটো' দেখাইয়া স্বামীজিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করে—ইনি অবতার কিনা? তদুত্তরে স্বামীজি বলেন) "বাবা এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো; তাহলে মাথাটা খুলবে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।" আবার বলিলেন, "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বলতে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্ত্তে পারে। কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে, এ কি রকম? ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না।" *
(স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠা)

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসকল কথার প্রতিও একটু প্রণিধান করিবেন কি? কেবল ঢাকায় কেন, পূর্ব্ববঙ্গের আরো দু এক জেলার খবর জানি—যাতে এইরূপ উদ্ভট অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। এক খানি পুস্তকের নামও উল্লেখ করিয়া দিলাম "ঠাকুর দয়ানন্দ" ৺মহেন্দ্র নাথ দে এম, এ, বি, এস্ সি প্রণীত; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেন তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করেন এবং এই 'ঠাকুর'টির একটু তথ্যানুসন্ধানও করেন।

আমি আক্ষেপ প্রকাশার্থই লিখিয়াছিলাম যে, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসও এখন উদ্ভট অবতার-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরমহংস দেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে—একথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি; † কিন্তু

---

* এ সকল উপদেশ বাক্য ৺ রামকৃষ্ণদেবকে যাঁরা অবতার মনে করেন, তাঁদেরও একটু ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

† কেবল যে এক বলিতেছি তাহা নহে! ১৩১৯ সালের কার্ত্তিকসংখ্যা "প্রবাসী সমাজ" পত্রে "আত্মকথা" শিরোনামে একটি গল্প প্রকাশিত করিয়াছি। সে—তাহাতে পরমহংস

[illegible]" মণিয়া তাঁহাকে মানিতে পারিব না ; বরং অবতার সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার মহত্ত্বই খর্ব্ব করা হইয়াছে—একথা ভূয়োভূয়ঃ বলিব। অবতার প্রতিপাদনার্থ "কথামৃত" "লীলা প্রসঙ্গ" প্রভৃতিতে কত যে অত্যুক্তি ইত্যাদি রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। —বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এ সকল অতিরঞ্জন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

অন্যান্য প্রতিবাদকারীদিগের কটূক্তিভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের উত্তরে আমার বক্তব্য কিছুই নাই ; তবে ইঁহাদের বিচারশক্তি ও তথ্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। বাবু সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, (সাহিত্য জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮—১৫৫ পৃঃ) "পত্র খানির [অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত পরমহংস দেব সম্বন্ধীয় প্রথম পত্রের] তারিখ দৃষ্টে বুঝা গেল, ইহা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের লেখা।" সত্যেন্দ্র বাবু ঐ পত্রখানির তারিখ দেখিয়াছেন "২৭।১।২৫"—তাহাতে "২৭শে পৌষ ১৩২৫" ; কিন্তু ঐ তারিখের পাশে একটি "?" চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লেখা হইয়াছে, "অর্থাৎ ২৫শে পৌষ ১৩২৭—দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা—তারিখটাই সনাতন রীতি", ইত্যাদি [১৩২৭—পৌষ মাঘ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 'সাহিত্য' ৫৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয়ের তলাইয়া দেখার' অভ্যাসটী থাকিলে ঐরূপ ভ্রম ঘটিত না। এই "দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা" বলিয়া তিনি যে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

বিগত শ্রাবণের 'সাহিত্যে' "মিথ্যা অভিযোগ" শীর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কিন্তু আমরা জানি রামকৃষ্ণ দেব আপনাকে অবতার বলিয়া মনেই করিতেন না ; কারণ তিনি বলিয়াছিলেন "ভগবানের কি cancer হয় ?" কথাটি ঠিক ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও বাকি এরূপ কথাই পরমহংস-দেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠে আছে— * * * "পরমহংস দেবের শেষ মুহূর্ত্তে * * * তিনি [অর্থাৎ বিবেকানন্দ] তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিতেছেন। এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন, 'আমি ভগবান্' তবেই

একে নিয়ে সভাতে কথা হইয়াছে। ইহাতেও পরমহংসের কথাটি ও আছে, কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়ের সম্পর্কে নহে।

[illegible] বিবেকানন্দ প্রবন্ধে [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible]

বিশ্বাস করি।" কিন্তু তাহার সেই মুহূর্তে নিদারুণ রোষ দেখিয়া পরমহংসদেব তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর হুঁস হলো না? আমি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।"

যে বিবেকানন্দ এরূপ কথা (প্রতিবাদকারিণীর মতে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা) প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও উচ্চ ধারণা হইতে পারে কি? আমরা যদি পাকেপ্রকারে 'প্রবর্ধক' ঠাওরাইয়া থাকি, তবে কি আমাদের খুব গুরুতর অপরাধ হইবে? এইরূপ লোকের বাণী কি 'বীজবাণী' হইবার উপযুক্ত? এদেশ লোকই বা সন্ন্যাসের অধিকারী?

এখনে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, 'কথামৃত', 'লীলা প্রসঙ্গ' ইত্যাদিতে পরমহংসদেব নিজেকে অবতার মনে করিতেন, এরূপ কথা পাওয়া যায়। তবে কি এ সকলের লেখকগণও (এই প্রতিবাদ-লেখিকার মতে) অসত্যের প্রচারক?

অপরের লেখাকে 'মিথ্যা অভিযোগ' বলিয়া অভিহিত করিবার পূর্বে তথ্য অনুসন্ধান ও বিবেকানন্দ স্বয়ং তৎসম্প্রদায়ের লিখিত কাহিনী ভাল করিয়া পড়াটা কি উচিত ছিল না?

এই শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" অপর একজনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উপসংহারে এই প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন "তবে ঠাট্টা না করিতে হইলে হয়তো কি বাঘ ঠেঙ্গান দরকার, নহিলে নাম করিবে না।" পরে নিজের নামটী এ ভাবে লিখিয়াছেন,—

"শ্রী-মধুসূদন সেন কবিশেখর কবিরাজ
আয়ুর্বেদ নিভার সমিতি, ৭৭।৭৮ হরিতকীবাগান ষ্ট্রীট"

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। ইংলণ্ডের মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন — The mote thou seest in the eyes of others. But not the beam in thine own.'

---

* ইনি নিজেকে 'বেথুন কলেজের ছাত্রী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধ প্রবন্ধের ভাষা ইত্যাদিতে স্ত্রীসুলভ শালীনতা অথবা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিদুষীর গাম্ভীর্য দৃষ্ট হয় নাই। [প্রবন্ধ ছদ্মনামেও লেখা হইতে পারে।]

† পত্র পরিচালনার ধারা দেখিয়া মনে হয় কবিরাজ মহাশয় নিজেই ছদ্মনামে পরবর্তী পত্রগুলি লিখিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ইনি বলিয়াছেন 'লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কাপ্তিয়ার ছিলেন।" আমার লেখা (সাহিত্য জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮।১২৮ পৃঃ) তিনিই আদ্যোপান্ত সহকারে পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, যে 'বিবেকানন্দ কাপ্তিয়ার ছিলেন' একথা আমার স্বীকার—উক্তি নহে ; একথা তাঁহার জীবন-চরিতে (স্বামী বিবেকানন্দ—৭৫০ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরমহংস বলিতেন, "ও (বিবেকানন্দ) যখন জানতে পারবে ওকে, তখনই দেহত্যাগ করবে।" অথচ মৃত্যুর ৫ বৎসর পূর্ব্বেই দেখা যায় বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা, অর্থাৎ তিনি কে ইহা জানিতেন—অথচ তখনই দেহত্যাগ করেন নাই। দুই কথায় অসঙ্গতি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল,—এই স্পষ্ট কথাটাও প্রতিবাদলেখকের বোধগম্য হয় নাই।

অন্য একজন প্রতিবাদকারী এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকিতে কেন এ সকল কথা প্রকাশ করি নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কেন তাঁহার কথার ও কাজের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি। এই অভিযোগ অতি অকিঞ্চিৎকর ; তথাপি ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাত্র বৎসরেকের পরেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন—অতএব ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার জীবিত সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশই ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দু'চারিটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ভিন্ন (আমেরিকার প্রথম বক্তৃতা ছাড়া) আমি তাঁহার বিশেষ কোনও কিছু তখন পড়ি নাই—তাঁহার জীবনচরিতও তখন দেখি নাই। এই সে দিন মাত্র তাঁহার পত্রাবলী (১ম খণ্ড) 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি দু' একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি—এবং যে জীবনচরিত-খানি হইতে আমার প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশ মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা প্রবন্ধলেখার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে মাত্র হস্তগত হইয়াছে। তবে যখনই সুবিধা পাইয়াছি, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছি ; ১৩১৬ সালে (স্বামীজির মৃত্যুর মাত্র ৭বৎসর পরে) যখন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করি, তখনই রায় মহাশয়ের বিবেকানন্দ হইতে উদ্ধৃত কথার উত্তরে স্বামীজির সম্বন্ধে দু' চারিটী স্পষ্ট কথা লিখিয়াছিলাম। * ঐ সকল কথা পড়িয়া

* "বিবেকানন্দের ভ্রান্তি নিরাশ" (গৌহাটি সম্মিলন কার্য্যবিবরণী হইতে প্রকাশিত) ১২ পৃঃ হইতে ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্বামীজির জনৈক ভক্ত (১৩২৩ সালে) আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চিঠি লিখিয়াছিলেন; তদুত্তরে তাঁহার প্রবোধার্থে গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সহিত আমার যে সব কথা হয় এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা জন্মে, এ সকল সংক্ষিপ্তভাবে যথাশ্রুত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম—ইহা হইতেই ৬ "আসামে বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। অতএব 'বুড়ি বছর পরে' যে এই প্রথম এইরূপ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলাম, ইহা ঠিক্ নহে। তারপর, বিবেকানন্দ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—তাঁহার কীর্ত্তি, তদীয় গ্রন্থাবলী, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি, এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাই বলিয়াছি, এরূপ অভিযোগ অকিঞ্চিৎকর।

এক্ষণে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ৺রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কীয় যে সকল গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যাবলী সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে, এগুলির ভিতরে পরস্পরবিরোধী অসমঞ্জস বহু কথা রহিয়াছে—আমি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ অসামঞ্জস্য থাকা সম্প্রদায়ের গৌরবজনক নহে। তাঁহারা ঠিক কি চাহেন, এরূপ অসঙ্গত উক্তিগুলি পাঠ করিয়া বুঝা যায় না। অথচ অভিযোগ দ্বারা এবং অপরকে ক্ষুব্ধকুণ্ণ করিয়া † উহাঁদিগকে বাড়াইবার যে একটা প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে অশোভন। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী কথা থাকিলে প্রকৃতধর্ম্মবিশ্বাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবেই এবং তাহা হইলে এ সকলের তীব্র প্রতিবাদও অবশ্যই হইবে। আবার পরমহংস দেবের বা বিবেকানন্দের নিষ্ঠ্যূতোদীর্ণ বাক্যাদি ‡ সবই যে প্রকাশ করিতে হইবে,

---

৬ ঐ ভদ্রলোকটি আমার একজন আবাল্যবন্ধু—শিলং থাকিতেন। সেই সময়ের মধ্যে অনেকে আমার সেই স্মৃতিমূলক লেখা পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ইহার উপর আর তর্ক তুলে যাং লেখাটি কেহই পাইয়াছিলাম।

† এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কতক বলিয়াছি—এ স্থলে এতৎসমর্থনে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইল। ৺রামকৃষ্ণের গুরু পরমহংস তোতাপুরী এবং উভয়সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী কি ভাবে ৺রামকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রদর্শনচ্ছলে) বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গ' বক্তব্য পূর্ব্বাপর অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

‡ উদাহরণ :—ঐ বুক্ত পথরের বাটীতে খুব কীর্ত্তন হইয়াছে, অনেকেই তাতে মাতিয়াছেন, কীর্ত্তনান্তে রামকৃষ্ণ পরমহংস লিখেন 'হাতেরা' বেড়েছিল। নরেন্দ্র (মহাশয়) আসর [illegible]

'চায়ের "আসর" সংখ্যার 'বৈঠকী'তে নিখিলেশ, 'বিদ্যাবিনোদ মহাশয় [illegible] নিশ্চিন্ত ভাবে লেখনী চালাইতে পারিতেছেন না—তাঁহার লেখায় একটু যেন বিষের বিষ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।" অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'সাহিত্যে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেও সমগ্র প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বৈশাখের 'বৈঠকী'তে প্রশংসাবাদের পূর্ব্বেই পাঠান হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই অযাচিত বৈঠকীর তৈল নিক্ষেপেও প্রতিবাদের ভয়ঙ্কর ধোঁয়া নাই; ও 'বেঙ্গলী' 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সূত্রে একজন পত্রপ্রেরক প্রবন্ধলেখক সহ সম্পাদক মহাশয়কেও গালি দিয়া 'সাহিত্যে' বয়কটের ভয় প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর শ্রাবণের 'বৈঠকী'তে সম্পাদক মহাশয় হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে [illegible] কথার অবতারণাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবটা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি একথা বলিতে পারি না; তবে বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি নিম্নে প্রকারে শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে; (১) বাঙ্গালী গুরুপুরোহিতের অভাবে দলে দলে গুরুপুরোহিতভুক্তির মোসলমান সমাজে ঢুকিতে আরম্ভ করিল, [illegible] হইতে লাগিল, তাই ক্রমতর বাঙ্গালায় ২॥ কোটি মোসলমান ও ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টান; (২) আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় হিন্দু ধর্ম্মের এবং সমাজের কোনও চিহ্নই থাকিবে না (৩) রামকৃষ্ণপ্রচারক [illegible] ভাজনের মুখে বালির বস্তা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন (৪) ইহাঁদের [illegible] পরিমাণ রঘুনন্দনী গজে হইবে না (৫) স্বামী বিবেকানন্দও নাকি বলিয়া গিয়াছেন, বেদান্তের প্রচার দ্বারা 'আমি'কে জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রকট করা।

এ সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। সংক্ষেপে [illegible] কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে [illegible] করিয়া দিয়াছেন—তাহাতেই সাধারণ লোক—নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে [illegible] পাইয়াছে—মোসলমান হইবার প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি [illegible] ব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টায়ও খৃষ্টান পাদরীরা এদেশে কিছুই করিতে পারিতেছে না—খাসিয়া পারো সাঁওতাল ইত্যাদিতে যা কিছু সামান্য প্রচার করিতে [illegible] সমর্থ হইয়াছেন। মোসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রধানতঃ বহুবিবাহ ও বিধবা-

---

নিক্ষেপ করা সামান্যই ছিল, এবং তাহা 'পরমহংসদেবসম্বন্ধীয় বলিয়া মণোচিত্ত সংযত [illegible] কিন্তু 'চিত্তদর্পণে'র ঢুকিয়া বোধ হয় বিবেকানন্দবিষয়ক পরবর্ত্তী—প্রবন্ধে—যাহা [illegible] ক্ষেত্রে ও বৈদান্তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও প্রতিবাদীর প্রকৃতির পরিচয় আরও একটু পাওয়া যাইতেছে।

বিবাহেরই ফল—এরূপ বুদ্ধি দারিদ্র্য ও তজ্জনিত চৌর্য্যাদি অপরাধের উৎপাদক—জেলখানার দিকে তাকাইলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। খৃষ্টানও নূতন কিছু বড় কেহ হইতেছে না। ২য় দফার উত্তর ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা না হইলে কিরূপে দেওয়া যায়? তবে যে সনাতন সমাজ বহু বিপ্লবের ভিতর দিয়া আসিয়া আজও টিকিয়া রহিয়াছে এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাহার স্রষ্টা (চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্) এবং রক্ষক (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে) বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বলা বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে অতিশয় সাহসের কাজ হইয়াছে। ঈষৎ পরিবর্ত্তন সমাজে কালক্রমে হইবেই—সেই পরিবর্ত্তনটা যাহাতে ক্ষীণীভূত হয়, সমাজহিতৈষী মাত্রেরই সেই চেষ্টা হওয়া উচিত—এবং এই চেষ্টা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণাদি দ্বারাই হওয়া 'আবশ্যক' তৃতীয় দফার উত্তরে বক্তব্য যে, আজ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই—অতএব এযাবৎ "সমাজির বক্তা"র পরিচিহ্ন কোনও কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। চতুর্থ দফার উত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই—কেন না বিবেকানন্দের চেষ্টা যে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাশাসিত সমাজ বিধির প্রতিকূল, তাহা আমি ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছি। বলা আবশ্যক রঘুনন্দন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রেরই প্রচারক—হরিভক্তি বিলাসেও শাস্ত্রাদি অবলম্বনপূর্ব্বক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাতে সনাতন ধর্ম্মের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবারই প্রয়াস আছে। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে হরিভক্তিবিলাসকারের ন্যায় বিধানের অত্যন্তাভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পণ্ডিত ও অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন—তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শিক্ষাদীক্ষা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার দ্বারাই 'হরিভক্তিবিলাস' সঙ্কলিত হইয়াছে; রামকৃষ্ণ বেদ শাস্ত্র জানিতেন না—যদিও গুরূপদেশ ও সাধুসঙ্গে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত কেহ 'হরিভক্তি বিলাসের' ন্যায় গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হন নাই। তাঁহার যে সকল উক্তি সোজা কথায় আছে, তাহাই 'টেনে বুনে' রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে শাস্ত্র বিচার নাই। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ প্রভৃতি সংস্কারকগণও যথাসম্ভব শাস্ত্রের উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় তেমনটা করেন নাই, করিবার শক্তিসামর্থ্যও ইহাদের নাই *

* অতএব কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের জীবন চরিত বা ধর্ম্মমত অভ্রান্ত ভাবে গ্রহণ

ম মহাশয় সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে, "বেদান্তের প্রচার, যে জন্য করিবার অধিকার স্বামী বিবেকানন্দের ছিল, তাহার অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাহিরে কিছুটা বলা হইয়াছিল—এদেশে তাঁহার নাম হইতে বেদান্তের নাম কেহ শুনিবে না শুনে নাই—এ দেশের লোক তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর (বেদান্তে) ব্যুৎপন্ন। ৺রামমোহন রায়ের কথাই ধরুন। এমন কি রামমোহনের অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মেরাই 'Vedantism discarded' করিয়া, যাদৃচ্ছিক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ যাহা হউক আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁর আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা অনেক অনুন্নতরূপে ও অভিনব সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার জানা আছে।" ইত্যাদি (আমার বিবেকানন্দ ৩১০ পৃষ্ঠা)। তিনি মাদ্রাজে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজার বিধানব্যবস্থা যে তিনিই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। (সঞ্চিতা আষাঢ় ১৩২৮ দ্রষ্টব্য)

এখন সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন এই যে, বিবেকানন্দ তো কুড়ি বৎসর প্রায় হইল চলিয়া গিয়াছেন—এবং রামকৃষ্ণ মহাসঙ্ঘও আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ ('মিশন' প্রতিষ্ঠা হইতে) কাজ করিতেছেন। বেলুড় মঠে পণ্ডিত জাতির উন্নতি সাধন তাঁহারা করিয়াছেন এবং বোলপুরে ও ঢাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি বিবৃত করিয়া দেখাইবেন? ৺রামকৃষ্ণের বয়স যে দুএকটা বাড়াইয়াছেন, সে কথা নাই—এবং দুর্ভিক্ষাদিতে যিনি যেরূপ ব্যবস্থা করেন ইহাও প্রচারের বিষয়। থাক্ এই যে বৈষ্ণব গোস্বামীরা কার্য্যে ও পাণ্ডিত্যে শাক্তদিগকে বর্ম্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছেন কি? মনে রাখিবেন যে, মিশনারীরা ঐ সকল স্থলে দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করিয়া লোকদিগকে খৃষ্টান বানাইয়া খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। আর একটা মোট কথা এই যে, যদি কর্ম্মের ব্যবহার বিপক্ষে বলিয়া শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করাইয়া মোসলমান বা খৃষ্টান হওয়ার তরফ ঝোঁক করিতেই হয়—তাহা কি আমাদের বাঞ্ছনীয়? আর্য্য ও খৃষ্টানে বা মোসলমানে আমাদের

করিতে পারেন নাই, এমন কি ঐ ছবির 'চিত্রকর' যে এই মহাত্মার অনুরূপ তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, উহারা উভয়ে কি কোনো দিন কাহারও মূর্ত্তি গড়িতে বসিয়া স্থির করাইতে পারিবেন, উহা কিরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে,

নিকট পরমার্থতঃ প্রার্থনা কি? কথাতঃ [illegible] কোন্ বিষয়ে কাহার বিরোধ বিরূপে সম্ভাবিত? *

* ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ পক্ষে সমর্থন করিলেন না।" তাঁহারা বৃথা এবিষয়ে যোগ দিতে কেন আসিবেন? তাঁহারা তো (সম্পাদক মহাশয়েরই ন্যায়) দেখিতেছেন "কোন প্রতিবাদী আগাগোড়া সবটা পড়িয়া ঠিকমত উত্তর দিল না।" তবে তাঁহারা কেন আসরে নামিবেন? পরন্তু এ দীন লেখককে দু'একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আলোচনা এবং চিঠি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, একথা সম্পাদক মহাশয়ের অবগত্যর্থে নিবেদন করিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত 'ব্রাহ্মণ সমাজের' গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। যে একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এস্থলে উল্লেখ করা উচিত মনে করিতেছি:— "আমরা তো এত কথা জানিতাম না; তাই বিবেকানন্দ সোসাইটিতে যোগ দিতাম; তবে এইবার ঐ সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়া অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে কিছু বলাতে মনে করিয়াছিলাম যেন উহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমার কথা সমর্থন করেন না; সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটির সম্পর্ক এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি।, ইত্যাদি" এ ছাড়া বঙ্গের জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক (যিনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু খুব "গোঁড়া হিন্দু" নহেন) লিখিয়াছেন "* * যে যুগ আসিয়াছে, সে নবীন যুগ—পুরাতনের সহিত অনুবন্ধহীন অভূতপূর্ব্ব অভিনব যুগ। ইহার শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা সমস্তই অভিনব—বহুবিষয়ে উচ্চ অঙ্গের। তাহার মধ্যে শূদ্রলোর অধিকার কামনা এবং সেই কামনা পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা নিরর্থক। * * * তথাপি ব্রাহ্মণের পক্ষে ভ্রান্ত মান হইয়া "নেদং যদিদমুপাসতে" বলা ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বাভাবিক

* হিন্দু সমাজ তরঙ্গে ভারত রোধিতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় বালির বস্তা ফেলিতে কৃতকার্য্য হইল—এ না-ই হউক সম্পাদক মহাশয়ের ঐ সঙ্কল্পায় তথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এরূপ লেখা যে বিবেকের গায় তরঙ্গে বালির বস্তার কাজ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না ঐ সালের মার্চ্চ বিবেকানন্দ প্রবন্ধের লেখাগুলি প্রকাশিত হইলেও অতঃপর আর কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। এটাও একটা সত্য কথা বলিতে হইবে।

† কিন্তু মহাশয় আমার প্রবন্ধাবলীর কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাহা তাঁহার চক্ষে পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। এগুলি পড়িতে পাইলে তাঁহার [illegible]

বহে (সে কালেও সেরূপ উক্তির প্রয়োজন ছিল, এ কালেও সে প্রয়োজন একেবারে উড়িয়া যায় নাই)। সেই হিসাবে আমি আপনার আলোচনা নিবিষ্টমনে পাঠ করিয়া থাকি—তাহাতে ভাব পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। * * * " (পত্রের শেষার্দ্ধ হইতে উদ্ধৃত)।

উপসংহারে বক্তব্য যে দুর্ভাগ্যবশতঃ সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও সমাজের পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতি পক্ষের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার লোক দিন দিনই বিরল হইয়া পড়িতেছেন—অযোগ্য হইলেও এ সময় স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম ও সমাজের অনুকূলে বিশেষতঃ বিপক্ষের প্রতিকূলে, দুচারি কথা না বলিয়া উদাসীন থাকা কাপুরুষতা মনে করি। ইহাতে যদি প্রতিপক্ষের কটূক্তির আঘাত সহ্য করিতে হয় করিতে প্রস্তুত আছি; কেবল বলিব, ভাই, Strike but heare মারো কিন্তু শুন।

শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্ম্মা।

প্রেমের স্বরূপ।

প্রেম আজিকার দিন,
নাহি তাহে চিন্তা কালিকার;
প্রেম স্বরগের সুধা,
নাহি তাহে লালসা-বিকার।

প্রেম বিমল হরষ,
নাহি তাহে বিমর্ষ-আঁধার;
প্রেম সুরভি জোছনা,
নাহি তাহে কলঙ্ক চাঁদার।

প্রেম 'সরবস্ব' দান,
নাহি তাহে প্রতিদান-আশ,
প্রেম সরল তরল,
নাহি তাহে-বিন্দু অবিশ্বাস।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ।

বঙ্কিম চন্দ্র ও ইংরাজ।

'সাহিত্যের' আশ্বিন সংখ্যায়, "দেবী চৌধুরাণী" প্রবন্ধ সমাপ্তিকালে, আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম যে, সামান্য কোন ইংরাজও মৃত্যুতে ভয় পায় না। একদিন না একদিন মরিতেই হইবে, একথা ইংরাজ বেশ বোঝেন।

একথা যে বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িক প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ইংরাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অগাধ ভক্তি ছিল, ইংরাজ-চরিত্রে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বঙ্কিমের ইংরাজভক্তি বিশ্লেষণের চেষ্টা পাইব।

(১)

"দেবী চৌধুরাণী"তে লেফ্‌টেনাণ্টের মুখে তিনি যে কথা প্রয়োগ করাইয়াছেন, 'চন্দ্রশেখরে'ও তিনি ঐ কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। মুরশিদাবাদে ইংরাজের নৌকাগুলি পৌঁছিয়াছে। নবাব মীর কাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁ নৌকাস্থ ইংরাজদিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। এ নিমন্ত্রণের অর্থ ইংরাজএয় বেশ বুঝিলেন। এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে বন্দী হইতে হইবে! হয় ত, হয় ত কেন—নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে হইবে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা স্থির করিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে মুসলমান মনে করিবে যে, ইংরাজেরা ভয়ে নিমন্ত্রণে যাইবেন না। কিন্তু গলষ্টন্ ও জন্‌সন্ বলিলেন, "ভয় কাহাকে বলে' তাহা ইংরাজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে।' (চন্দ্রশেখর, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

তৎপরে, যখন নৌকাস্থ ইংরাজরা বুঝিলেন যে, নবাবী সিপাহী তাঁহাদিগকে শীঘ্রই আক্রমণ করিবে, যখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, "যুঝিয়া মরিব, সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পালাইব না।" আলিয়া গুলিয়াই তাঁহারা এরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা ও তাঁহাদের সৈন্য মরিবেন, অগণিত মুসলমান সৈন্যের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু নিশ্চিত। কারণ, তাঁহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কাপুরুষোচিত। তাঁহারা অগণিত যবনগণের মুখে পালিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এই কথাই বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' বলিয়াছেন। মহেন্দ্র ও ভবানন্দে কথোপকথন চলিতেছে। ভবানন্দ বলিলেন, "এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পালায় না; ইংরেজের জিদ আছে, যা ধরে, তা করে। একটা গোলা দেখিলে দশজন মানের গোষ্ঠী শুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠী শুদ্ধ গোলা দেখিলেও একটা ইংরেজ পলায় না।" (আনন্দ মঠ, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ)।

তাই চন্দ্রশেখরে, ফষ্টরের ন্যায় ব্যক্তিও বলিতেছে, "আমি মরণকে ডরাই না।"

(২)

বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্নস্থলে ইংরাজের কয়েকটী অন্যান্য গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

'আনন্দ মঠ, প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ দেখুন। ভিন চারিজন সিপাহী মহেন্দ্রকে জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন, বলিলেন, "শালা গাদ্দারকে সাদি করো। কিন্তু পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দেখুন—এই অষ্টম পরিচ্ছেদ ও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম পরিচ্ছেদে একই ঘটনা বিবৃত হইতেছে। কিন্তু, সাহেবের কি পরিবর্ত্তন! যেমন ডাকাত পড়িল, অমনি সাহেব আর মেমসাহেব নাই। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না।"

'চন্দ্রশেখরে'র সেই যুগান্তকারী দৃশ্যের কথা স্মরণ করুন (ষষ্ঠ খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদ)। বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, মুক্তা-প্রবাল-রত্নত-কাঞ্চন-খোচিত উচ্চাসনে নবাব কাসেম আলি খাঁ মুক্তাহীরকমণ্ডিত হইয়া, শিরোদেশে উষ্ণীষোপরি উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ড সজ্জিত করিয়া দরবারে বসিয়াছেন। ফষ্টরকে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাঁদী কুৎসনের কথা সত্য কি না; কথা ইংরেজ কুলকলঙ্ক! কিন্তু তবু নবাব জানেন যে, "ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা কয় না।"

(৩)

প্রসঙ্গক্রমে, বঙ্কিমচন্দ্র ওয়ারেন হেষ্টিংস সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন ("চন্দ্রশেখর, ৪র্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)" ইতিহাসে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কর্ম্মলোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি অতি দয়ালু হইলে কার্য্যকর হইতে পারেন না। রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। সেখানে দুই জনে [illegible]

করিলে মানুষ রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে তাঁহাদের কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে।... ওয়ারেন্ হেষ্টিংস দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।

ইহারই পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে তিনি কুলসম্মকে দিয়া বলাইয়াছেন যে, হেষ্টিংস শয়তান। কলিকাতায় গিয়া সে যাহাকে দেখিয়াছে, তাহাকেই সাধিয়াছে যে, তাহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, কিন্তু কেহই কিছু বলে নাই। হেষ্টিংসের কৃপায়ই সে মুঙ্গেরে ফিরিতে পাইয়াছিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা আনন্দমঠেও উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক উহার তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন। "এই সময়ে প্রণিতনামা ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল।" ঐ কথাই তিনি পুনরুল্লেখ করিয়া চতুর্থ খণ্ডের, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন। "এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন। তাঁর যে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ কোথায় থাকিত?"

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র বহুস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজদের সঙ্গে যে বিবাদ করিবে, সে মরিবে। (চন্দ্রশেখর প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। শুধু দলনীকে দিয়া বলান নাই, রামানন্দস্বামীও বলিতেছেন, (চন্দ্রশেখর ষষ্ঠখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ), "এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্ এবং বলবান্ এবং কৌশলময় দেখিতেছি, চন্দ্রশেখরও যখন প্রতাপকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন বলিতেছিলেন, "ইংরাজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।" যে "আনন্দমঠকে" আমরা বঙ্কিম জীবনের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া গণ্য করি' সেই আনন্দমঠেও দেখিতে পাই,—বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "ইংরেজ ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধনজন্য আসিয়াছেন" (তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। তাই মহাপুরুষের মুখে আমরা শুনিতে পাই, "ইংরেজের রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। ইংরেজ রাজা হইলে প্রজা সুখী হইবে। নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে"।

সত্যানন্দ দ্বিধা করিতে ছিলেন, তাই মহাপুরুষ পুনর্ব্বার বলিলেন, "ইংরেজের সাধ্য নাই যে, ভারতের সুখ বৃদ্ধি হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

কবি হেমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

দার্শনিক ও সাহিত্যিক কারলাইলের কথায়, "The history of a nation's poetry is the essence of its History, Political, Economic, Scientific and Religious." অর্থাৎ একটা জাতির কবিতার ইতিহাসে সেই জাতির রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের সারাংশ; সুতরাং কবিতায় যে জাতির সমগ্র ইতিহাসের ছায়াপাত হয়, ইহাতে কাহারই দ্বিমত হইতেছে। হেমচন্দ্রের যুগই মাইকেলের যুগ, হেমচন্দ্র কিন্তু মাইকেল অপেক্ষা ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং এই যুগের রাষ্ট্র, সামাজিক ও ধর্ম্মের ইতিহাস তাঁহাদের উভয়ের রচনাতেই পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা যুগের কবি বা সাহিত্যিক জন্মিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বীয় যুগের দ্বারা পরিচালিত হন না—তাঁহারাই যুগকে পরিচালিত করিতে চাহেন, তাঁহারা যুগ-প্রবর্ত্তক। সমুদ্রের প্রকাণ্ড ঢেউগুলি যেমন তীরের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়, কিন্তু প্রায়ই নিজে হটিয়া যায়; সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুব্ধ স্রোত বারম্বার আসিয়া কেবল নিজের আঘাতে নিজেই জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, তেমনি যুগের ধর্ম্মগুলি এই শান্ত সমাহিত সাহিত্যিকগুলিকে বিচলিত করে না, বরঞ্চ আপনারাই বিচলিত হয়। এই রচনায় আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় যে হেমচন্দ্রের উপর তাঁহার যুগের প্রভাব কতদূর, তিনি কোন্ কোন্ প্রভাবে পরিপুষ্ট। ইহা বুঝিতে হইলে তাঁহার যুগের ধর্ম্মগুলির একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ, এই যুগের ধর্ম্মগুলির বিশ্লেষণ করিলেই সেই যুগের বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জীবনের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের পরিমাণ অনুমিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাইকেলের যুগই হেমচন্দ্রের যুগ; উভয়েই ১৯ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ১৯ শতাব্দীকে আমরা ১৮শ (অষ্টাদশ) শতাব্দীর অবনত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম বলা করি। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যপাদ হইতে শেষ পাদ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সমাজের বড়ই দুর্দ্দিন গিয়াছে। সাহিত্যে ইহাই ভারতচন্দ্রের যুগ; সুতরাং

কাব্যলক্ষ্মী সাহিত্য একেবারে অচল ও অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিদুষী ও রসজ্ঞা বিদুষকে রহোবা সাহিত্যের বাজারে লজ্জাহীনতা ও কলুষতার আবরণে উলঙ্গ করিয়াছিলেন। কবিতার প্রাণ ছিল না,কেবল ছিল একটা শব্দের ঐশ্বর্য্য মাত্র—কেবল আড়ম্বরপ্রিয়তা। সাহিত্যে নারীর মহিমা কীর্ত্তিত না হইয়া তাহাকে মানুষের বিলাসবাসনার তৃপ্তিদায়িনী দাসীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল। এক দিকে সংস্কৃতের চর্চ্চা ও অন্যদিকে আরবী, ফারসীর ছড়াছড়ি; এই দুই ভাষা-শৃঙ্খলে মানুষের প্রতিভাকে জড় করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যে কোন বৈচিত্র্য নাই, কল্পনার লীলাময়ী তরঙ্গভঙ্গী নাই; কেবল আছে একটা একঘেয়ে ভাবের স্রোত এবং তাহাতে গা-ভাসান দেওয়াই কবিজীবনের একমাত্র সাধনা। রাজনৈতিক ব্যাপারেও চারিধারে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নীচতার অভাব। পাঠানের যুদ্ধের পর ইংরাজরা প্রাচীনকে রক্ষা করিবেন, না—এদেশে ইংলণ্ডের সাময়িক উদ্যম নব জীবনের আদর্শ আনিয়া দিবেন, ইহা লইয়াই ব্যস্ত। অবশ্য তাহারা কতক পরিমাণে রাজনীতিবোধে তাঁহারা সমাজের ও সাহিত্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে উদ্বেলিত সমুদ্রের বহুদূরে প্রকৃতির স্নেহদানে পালিতা পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাহারা সাহিত্যের ধার ধারিত না।

১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই (অর্থাৎ ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে) আমরা ইংরাজবিপ্লবের একটা বিস্ফোরণের লক্ষ্য করি। এই সময়ে স্কটনামা ডেভিড হেয়ার ও মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রয়োচনায় বাঙ্গালীকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া স্থিরীকৃত হইল। ইং ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে দেশের প্রতিভাবান্ যুবকবৃন্দ ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। এইখানেই তাঁহারা প্রতিভাশালী শিক্ষকবৃন্দ রিচার্ডসন্ ও ডিরোজিয়োর প্রভাবে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা আরম্ভ করেন। পূর্ব্বযুগে ছিল খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ও সামাজিকতা বিষয়ে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের নিয়মে চলা, একটা সংযমের বিপুল শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিষ্পেষিত করা হইত। এ যুগে হইল একটা শৃঙ্খলাহীন অসংযমের উদ্দাম স্রোত খুলে দেওয়া—ফলে দেশের যা কিছু মন্দ, তাহার সহিত দেশের যা কিছু ভাল ভাসিয়া গেল। এই নবীন ও পুরাতনের মিলন মুহূর্ত্তে মাইকেলের জন্ম—১৩ বৎসর পরে হেমচন্দ্রের জন্ম। এই প্রভাব মাইকেলকে যতদূর অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, হেমচন্দ্রকে ততদূর করে নাই, আমরা যথাস্থানে তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইব। মাইকেল ও বে, এম, কলাসিক

ছাড়িতে পারে নাই। তাহারা হিন্দুসমাজের অনেক ছাড়িয়াই ইংরাজীনীতি অনুসারে চলিতেন; মদ ও গোমাংস খাওয়া এরূপ গৌরবের কথা ছিল। কিন্তু হেমচন্দ্র নিজেকে এই দলভুক্ত করেন নাই। তিনি নিজের যুগের প্রভাব হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন ও তাহার মধ্যে যেটুকু ভাল, তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় আমরা অন্ধ অনুকরণ কম দেখি। কিন্তু উপযোগী অনুকরণ (Adaptation) বেশী দেখি। পাশ্চাত্য প্রভাবে তিনিও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আত্মহারা হন নাই। নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া—নিজের যা কিছু উত্তম তাহার সহিত বিদেশের যা কিছু অনুকরণীয়, তা'যাচাই করিয়া পরের জিনিষ নিজের করিয়া লইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি বৃত্রকে বড় করিয়া, ইন্দ্রকে ছোট করেন নাই। ঐন্দ্রিলাকে মহিমময়ী করিয়া শচীকে হীনা করেন নাই, চরিত্রসৌন্দর্যে শচীকে মহত্তর করিয়াছেন। বৃত্র যখন শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখিয়া ভীত-ত্রস্ত-চিত্তে শচীকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, এবং রতি যখন সেই মুক্তিবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল, তখন শচী জলদপ্রতিমস্বরে বলিয়া উঠিলেন:—

"হে অনঙ্গরমে!
* * *
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী?
* * * *
না রতি, কহগে দৈত্যে চাহিনা উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাস অশেষ যন্ত্রণা—
পতিহস্তে যতদিন মুক্তি নাই মম।

এখানে পৌরাণিক শচীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেই ইং ১৮৬১ সালে মেঘনাদবধ রচিত হয় ও ইং ১৮৭৭ সালে বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। আমরা এইরূপ তেজোগর্ভ উক্তি শুনিয়াছিলাম, যিনি তাহা হিন্দুর কোন আদর্শ চরিত্রের মুখনিঃসৃত নহে।

দানবরমণী প্রমীলার মুখে—

"দানবনন্দিনী আমি; রক্ষকুলবধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?"

কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদে শচীর মুখে বা হিন্দুর কোন আদর্শচরিত্রের মুখে আমরা এরূপ তেজের কথা শুনি না; সেখা আছে কেবল ভীতা নারীর ত্রস্ত

অনুপম বিনয়—বাঙ্গালীবধূর যাহা, "নিজস্ব"। হেমবাবুও দানবরমণী ঐন্দ্রিলাকে লেডিমেকবেথরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, ঐন্দ্রিলাও লেডি ম্যাক্‌বেথের ন্যায়, শিবের রোষচিহ্ন দর্শনে চিন্তিত ও ভীত স্বামীকে উৎসাহিত করিবার মানসে বীর রমণীর ন্যায়ই বলিয়াছেন :—

"আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে,
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে।"

আর একস্থানে যখন—

"বামা তুমি" যবে দৈত্য তুলিল লোচন, তখন ঐন্দ্রিলা গর্ব্বিত ও গম্ভীর মুখে অগ্নিময় নয়নে, "দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত করিয়া" বলিয়া উঠিল—

"বামা আমি"
বামা আমি, দনুজেন্দ্র রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।
শুন ওহে দৈত্যনাথ, বামা সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোক খ্যাত গন্ধর্ব্বদুহিতা,
সামান্য অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা,
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা শুনহে দানব।"

এখানে দু'টী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে,—প্রথমতঃ হেমচন্দ্র শচীচরিত্রে পুরাণোল্লিখিত শচীচরিত্রের ন্যায় কমনীয়তা ও বীর্য্যবত্তাই রাখিয়াছেন—কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে একটু পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালিয়াছেন, পড়িতে পড়িতে পাঠকের স্বতঃই লেডি ম্যাকবেথের কথা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু কাহারোও গৌরব ক্ষুণ্ণ করেন নাই। উভয়েই উভয় সম্প্রদায়েরই আদর্শ রমণী। ঐন্দ্রিলা দানব-রমণীকুলাগ্রগণ্যা, পুলোমনন্দিনীও "যমুনাশিনী" ও দেবরমণীকুলের আদর্শ-স্থানীয়া। তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে যাহাকিছু উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রহণ করিয়া নিজের আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন ও আর একটা লক্ষ্যের বিষয় যে, লেডি ম্যাক-বেথের ছাঁচে ঐন্দ্রিলাকে ঢালিলেও কথায় কথায় অনুবাদ নাই—বেটা আমরা

রঙ্গলালে প্রচুর লক্ষ্য করি। উদাহরণস্বরূপ লেডি ম্যাকবেথ যে ভাবে বলিতেছেন,—

I have given suck and know
How tender it is to love the babe that milks and
I would while it was smiling in my face,
Have plucked my nipples from his boneless gum
And dashed the brains out had I sworn
As you have done to this.

স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম মুখে
দন্তহীন মুখ হতে স্তনাগ্র ছিনায়ে
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার
প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে করি তোমার সমান

(মেগবেথের অনুবাদে—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।)

সেখানে ক্রীত্রিলা বলিতেছেন,

"আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে etc."

(উপরোক্ত)

এখানে লক্ষ্যের বিষয় যে, সমান অবস্থায় পড়িয়া বিভিন্ন দেশীয় কবিগণ একই ভাবেই নিজের কথা প্রকাশ করিতেছেন, কেহ কাহারও বিশেষরূপ চুরি করিয়া সাহিত্যের আদালতে ধরা পড়েন নাই। ইহাকে ভাব-সঙ্কলন বলিলেও অত্যুক্তি হয়।

এখন আমরা ছায়াময়ী সমালোচনা করিয়া দেখিব, ইহা দান্তের ডিভিনা কমডির ইন্‌ফারনোর (Dante's Divine Comedy, Inferno) উপযোগী অনুকরণ। (Adaptation) কিনা? তিনি, (হেমবাবু) সেক্সপিয়রের কথার অনুবাদ করিয়া কবিগুরু দান্তের (Dante) উদ্দেশে লিখিয়াছেন,—

"তোমারেই চিত্ত স্মরণ করিয়া চলেছি তোমারই পথে,
তোমারই ভাবিতে নিবিড় তোমায় ধরি এই মনোরথে।"

অপর স্থানে কহিয়াছিলেন, "বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার (Dante) কল্পনা ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। অনুপদে "Dante, Purgatorio

[illegible] স্বর্গ সম্বন্ধে তাঁহাতে ডিভাইন মেজেডি (Divine Comedy) যে সকল মত [illegible] উপদেশ একত্রিত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টধর্ম্ম-অনুমোদিত— এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল [illegible] হইতে অনেক বিভিন্ন। ডিভাইন কমেডিতে (Divine Comedy) ভ্রমণকারী আত্মা প্রথম চন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হয়। এই চন্দ্রলোকই পৃথিবীতে সন্ন্যাসব্রতাবলম্বিত খৃষ্টানদিগের আত্মার বাসস্থান। কিন্তু ছান্দোগ্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে, শোকবাক্যের মধ্যে গীতা প্রথম পাঠ হয়—

"পৃথিবীর অনুরূপ দৃঢ় কলেবর তব
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত যাহা ধরা মাঝে,
এই লোক সে নক্ষত্র ভূলোক না জান।"

হেমচন্দ্র বর্ণিত নরকে স্থান পাইয়াছে সিজারেরা, ক্রিওপেট্রা, বিবি, তাহার [illegible] মুসলমান রাজীন ও হিন্দু পার্থীদের আত্মা সকলেই। খ্রিষ্ট যে নরকের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত আত্মা [illegible] নয়—তাহা ঠিক পুরাণেতিহাসের নরক। সুতরাং এখানে আমরা দেখাইতেছি যে, কবি অনুকরণ করেন নাই—তখনও যে উদ্ভূত হইত, তাহার সাহিত্য ওমার [illegible] সাহিত্যের নব স্ফূর্তি পূরণ করিয়াছেন।

১৮৫১ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে "মাহেন্দ্রক্ষণ" এই কালের মধ্যে "বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গাম হরিশের আবির্ভাব, সোম প্রকাশের [illegible] প্রচার, দেশীয় নাট্য শালার প্রতিষ্ঠা", এই [illegible] ঘটনা ঘটিয়া ছিল। এই ঘটনা [illegible] বাঙ্গালী সমাজের উপর [illegible] [illegible] করিয়াছিল। কতকগুলি [illegible] প্রভাবেই [illegible] করিয়াছিল ও কতকগুলি সেই প্রভাবে পরিপুষ্ট। হেমচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতায় এই ঘটনাগুলির [illegible] ছায়াপাত দেখা যায়। তাহার "ভারত বর্ষ" "ভূবনে মাইকা বিদ্যা" (অবিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষার সহায়তার নিমিত্তে যে আন্দোলন উপস্থিত করিবার উদ্যোগ, তাহা লক্ষ্য করিয়া রচিত) "বিধবা-অশ্রু" এগুলি কবি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আকারে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা আমরা হেমচন্দ্রকে গ্রহণ করি। তাঁহার "চিন্তাতরঙ্গিণী" ও "আশাকানন" তাহার দুই [illegible] রচনাকালে কবির মিল্টনের লিসিডাস (Milton's Lycidas) [illegible] (Moschus) ও Mathew Arnoldর Thyrsis এর কথা মনে ছিল। [illegible] দুঃখসমস্যার মীমাংসাচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

হেমচন্দ্রের উপর বায়রণের (Byron) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, [illegible] বায়রণ—বার্থিনেফ্রিক,—ফল তাঁর স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। [illegible] হইতে তিনি সমাজ, সংসার, বিবাহিত জীবন—পৃথিবীর [illegible] তাহার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন। বিপুল কীর্ত্তি [illegible] তিনি [illegible] হেমচন্দ্রের সম্বন্ধের যা কিছু Connection বা [illegible] তাহাই উপলক্ষ করিয়া বায়রণের [illegible] ইংলণ্ড (England) ত্যাগ উপলক্ষে [illegible] বায়রণের [illegible] ও উপাদেয় বর্ণনা পাঠ করিয়া [illegible] (Child Harold) পড়িতে পড়িতে [illegible] পড়িয়াছেন। "কোন একটী পার্থির প্রেমে," [illegible] বায়রণের [illegible] আবেগের মধ্যে বায়রণের (Byron) [illegible] উপর [illegible] আভাস পাওয়া যায়। "চিন্তাতরঙ্গিণীতে" [illegible] (Hours from) হইতে ভাবসংগ্রহ দেখা যায়, Byronএর [illegible] [illegible] ও [illegible] (স্বপ্নাভঙ্গের পর কবি) ছিল। [illegible] [illegible] বায়রণের এই দুঃখবাদ [illegible] করি। "[illegible] Childe Harold," হেমচন্দ্রও বলিয়াছেন—

"এ ঘোর কাহার নয় আমি একেলা।"

[illegible] "বিষাদিনী" ও "বিষাদিনী" কাব্যদ্বয়ে [illegible] [illegible] অনুরূপ। বায়রণ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"হায় কি হলো" "নেভার, নেভার" প্রভৃতি রচনাগুলি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে লিখিত—এই "মেকির উপর কষাঘাত" পাশ্চাত্য সাহিত্য বঙ্গভাষায় প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই—তিনি যখন দেখিয়াছিলেন "উচ্চ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ" গ্রাস করিয়া পৌরুষকে শতধা করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি হিন্দুকে "হিন্দু দুরাচার" বলিয়াই আহ্বান করিয়াছিলেন। আবার যখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, বৃটনবাসীর অপরকে স্বাধীনতা দান করিবার একটা ঝোঁক আছে, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা নাই বা চেষ্টা নাই, তখনি কহিয়াছিলেন,—

"নেটিভের কাছে বাড়া নেভার নেভার"

* * * * * *

"বৃটন্ স্বাধীন সদা ক্রীডম্ এভার"

এই বিলাতী অনুকরণে বিলাতকেই গালি দেওয়া—বিলাত হইতে আমদানি সাহিত্যেই তাহার পৃষ্ঠ আঘাতে জর্জ্জরিত করা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে—To pay one in his own coin এবং গ্রাম্য ভাষায় আমরা যাহাকে বলি "যার নিধি তারই নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া," "আবার তিনি যখন কল্পনা করিয়াছিলেন যে, অন্তঃসারশূন্য সাহেবের কুশিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাতে একটা অসামঞ্জস্যের স্তূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই বলিয়াছিলেন—

"রেলওয়ের হাওয়া খাওয়া গাড়ী হয়ে যাওয়া
দেশটেক লোকের মাঝে গঙ্গাযাত্রা যাওয়া"

বাইরণের অনুকরণে আমরা এইরূপ অসামঞ্জস্যের উপর বিদ্রূপের কষাঘাত প্রায়ই লক্ষ্য করি। কিন্তু হেমচন্দ্রের এই সকল খণ্ড-কবিতার বিশেষ ইহাই যে, তিনি যে অনুকরণ করিতেন, তাহাতে দেশের আদর্শ বজায় রাখিতেন—তিনি যাহা নিন্দা করিতেন, তাহা দেশের ও দেশের সমাজের। এই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নতাই তাঁহাকে 'জাতিবৈরী' করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক এই "জাতিবৈর" তাঁহার মধ্যে একটা গৌরবের জিনিস আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাননীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথায়, "এই যে জাতিবৈর ঘটিয়াছে, ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক হেমবাবু।" হেমবাবুর কবিতা—

"দেখ চেয়ে দেশ প্রতিভা সরসে
তোমার পদতলে পড়ি একি বেশে

কাঁদিছে সে ভূমি পূরিত যে শেষে
কত জনপদ গাহি মহিমা"—

ইহার মধ্যে দলিত ও ক্ষুব্ধ প্রাণের একটা মর্ম্মন্তুদ সুর আছে—যাহা পাঠকের অন্তরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়। সুতরাং এই জাতিবৈর যদি দোষেরই হয়, সে দোষ দেশের সৌভাগ্যই সূচনা করে। আমরা দেখি একটা দেশাত্মবোধসম্পন্ন কবি হেমচন্দ্রকে তাঁহার যুগের মনোভাব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি দেশের হিন্দুর অতীত আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন ও সেই অতীতকে বর্ত্তমানের মধ্য দিয়াই গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। মাননীয় মোহিনীমোহন সেনের কথায় "এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় প্রাচীন গ্রীক্ কবির উপাদানে গঠিত—তাহার বিশেষ এই কাব্যে বাল্মিকীর প্রাচীন হেলিকন্ পর্ব্বতের আয়তনাদি। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিলেও, প্রাচীন হোমার, হেসো, সাফো ও পিণ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন। হোমার ও মিল্টনের ন্যায় তিনিও অন্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণের ন্যায় তাঁহারও প্রতিভা অতি-দানব ঘটনা অবলম্বন করিয়াছিল। নানা বিদেশ হইতে রত্নরাজি আনিয়া তিনি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়া ছিলেন।"

শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য।

সখীর প্রতি শ্রীরাধিকা।

আমার লজ্জা কি লো তায়
তোরে স্পষ্ট কথা কই!
কলঙ্ক না' রটে গেছে—ঘুচে না ত সই!
তবে কৃষ্ণ কথা কই,
তবে কৃষ্ণ কথা কই—
ঘরের পরের চিট্ পাটি মন মাঝার পেতে লই!
আমি দাঁড়িয়ে পথে রই,
আমি দাঁড়িয়ে পথে রই,
কখন এসে শ্যামটি ডাকবে—"প্রেমময়ী"—
ডাকবে—'রাধা প্রেমময়ী'—
বাঁশী ডাকবে "প্রাণময়ী"—
আমার লজ্জা কি লো তায়!
দেখ ব যখন শ্যামের কাছে লুটিয়ে পড়ব পায়।
আর অবাক্ হ'য়ে রইবে চেয়ে ব্রজের যত বয়স্যই।
কলঙ্কভাকে—তা শুনতে যে খুসীপাখীর কি

"ডাক্তার বাবু, আমায় না ব'ভয়ানক জ্বর। কিন্তু ইনি আমার অনেক ছিলেন। আজ কিছু জ্ঞান হওয়ায় আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাদের বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়; আপনি যদি ক'রে একবার তাঁকে দেখবেন চলুন।"

"আমি এখনি যাচ্ছি। তুমি অত উতলা হ'য়ো না, মা। ভগবান তোমার মাকে শীঘ্রই নীরোগ ক'রে দেবেন।"

ডাক্তার বাবু একটী হ্যাণ্ডব্যাগ লইয়া গদব্রজেই সেই বালিকাটীর সঙ্গে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। বালিকা ডাক্তার বাবুর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে অনেক আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহা না শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন "সকাল থেকে গাড়ীতে ব'সে ব'সে ক্লান্ত হ'য়েছি; সে জন্য খানিক বেড়াতেই ইচ্ছা ক'রছে।"

অনেক ছোট বড় গলি পার হইয়া অবশেষে ডাক্তার বাবু একখানি ছোট বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বাহির হইতে বাটীর অবস্থা দেখিবার ডাক্তার বাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যে জন্য এই বাটীর দরিদ্রতার চিহ্ন বিদ্যমান। বাটীর ভিতর যাইয়া তিনি দেখিলেন, একটী জীর্ণ কক্ষে অনেক জায়গায় অতি পুরাতন লেপের দ্বারা আবৃত করিয়া বালিকাটীর মাতা রোগযন্ত্রণা ক্ষুদ্র গৃহ-প্রাঙ্গণের একধারে একটী নিম্ন বৃক্ষ; উহার শুষ্কপত্রে সমস্ত পরিপূর্ণ; দেখিলে বোধ হয় যেন বহুদিন যাবৎ গৃহটীর সম্মার্জনীর সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। বালিকা প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়াই, তাহার মাতার নিকট ক্ষুদ্র চৌকি রাখিয়া দিল। ডাক্তার বাবু উহার উপর উপবেশন করিলেন। বালিকা ডাক্তার বাবুর আগমন-সংবাদ তাহার মাতার কর্ণগোচর করিলে জননী আনন হইতে লেপ অপসারিত করিলেন। ডাক্তার বাবু রোগিণীর মুখমণ্ডলে রোগের কঠোর যন্ত্রণা ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে উহা ইহা পরিবর্ত্তনতা এবং মানসিক চঞ্চলতার চিহ্ন জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে ডাক্তার বুঝিতে পারিলেন যে, যদিও রোগিণী অসহ্য রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাচ একদিন নিশ্চয়ই তিনি বোধ করিতেন সুযোগ্য পতির হৃদয়ের স্নেহ অধিকারিণী ছিলেন। রোগিণীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের অধিক। রোগ এবং দারিদ্র্য উভয়ে মিলিয়া তাঁহার অবয়বের কোন চিহ্ন রাখে নাই। কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে কিসের আদর্শের, বিদ্যার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, তাহা ডাক্তার

বিপদরাশি তাঁহাকে এক পদও নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে টলাইতে পারে নাই। রোগিণীর শান্তিপূর্ণ মুখ দেখিয়াই ডাক্তার বাবুর শ্রদ্ধা উহার প্রতি আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা, আপনার এখন যন্ত্রণা কি? আপনার শরীরের উপস্থিত অবস্থা সমস্ত বলুন।"

রোগিণী অতিকষ্টে উত্তর দিল—

"ডাক্তার বাবু আপনি দীনবন্ধু; সে জন্যে ঈশ্বরের মত পূজনীয়। লজ্জা ত্যাগ ক'রে আমি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আশা করি সে জন্যে আপনি আমাকে নিজগুণে ক্ষমা ক'রবেন। সংসারে আমি কখনো কা'র কাছে অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইনি; কিন্তু আজ মরবার সময় আপনার কাছে মাথা নীচু ক'রতে হ'ল। আমার প্রার্থনা যদি—আর বলিতে পারিলেন না; মনের আবেগে বাক্‌রোধ হইল, রোগিণীর নয়ন কেবল অজস্র ধারায় বহিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু অতি নম্রতা সহকারে বলিলেন,—

"মা, আপনি অত কাতর হইবেন না। আপনার সেবার জন্য আমি আছি। আপনি নিঃসঙ্কোচে যা আজ্ঞা করবেন, আমি তা'ই প্রতিপালন করতে পরাঙ্মুখ হ'ব না। প্রথমে আপনার রোগের অবস্থা বলুন।"

রোগিণী সামান্য ম্লান হাসি হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ডাক্তার বাবু, রোগের অবস্থা আর কি ব'লব? আমার সময় পূর্ণ হয়েছে। আপনাকে যা' ব'লবার জন্যে ডাকিয়েছি এখন তা' আপনি মনোযোগ ক'রে শুনুন। অমলা আমার একমাত্র মেয়ে। এত দিনে সে অনাথিনী হ'তে চল্‌ল। আমার অবর্ত্তমানে আপনিই ওর একমাত্র অভিভাবক। আমি ওর বিবাহ দিতে পারি নি। সে জন্যে আপনার কাছে এই ভিক্ষে চাইছি। অমলা লেখা, পড়া কাজ-কর্ম্ম জানে। যা' আমি জানি এবং আমার যতদূর শিখান উচিত, তা' আমি অমলাকে শিখিয়েছি। অমলা অবশ্য লেখা পড়া বেশী জানে না। আমিও শিখাইনি। আমার ধারণা স্ত্রীশিক্ষার অর্থ কতকগুলি বই পড়ান নয়। গার্গী, অরুন্ধতী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি স্মরণীয়া রমণীগণ কোন বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন ক'রে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ ক'রবার পর গৃহকর্ত্রী মনোনিবেশ করেন নি। অমলা আপনার পরিচর্য্যা ক'রবে। আমার সম্পূর্ণ জানা আছে যে, অমলা আপনাকে সুপ্রসন্ন রাখবে। সেইজন্যে আপনি কোন শিক্ষক, সচিবের ও সদংশজাত [illegible] সহিত ওর

বিবাহ দিয়ে দিবেন। এই আমার প্রার্থনা। আর হ্যাঁ, একটা কাগজের তাড়া আমার কাছে আছে; তা'র মধ্যে দু'খানি খাম আছে। আমার মৃত্যুর এক বৎসর পরে এগুলি প'ড়তে পারেন। এগুলিতে আমার পরিচয় আছে, যা এখন বলবার বা জানাবার কোন প্রয়োজন দেখি না। পরোপকারী ব্যক্তির সর্ব্বদাই একটা না একটা বিপদ লেগে থাকে। আপনিও পরোপকারী; সে জন্যে আপনাকেও বিপদে প'ড়তে হ'ল।"

এই পর্য্যন্ত বলিবার পর তাঁহার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না।

ডাক্তার বাবু মধুর কণ্ঠে কহিলেন—

"মা, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনার কন্যাকে আমি নিজের সন্তানের মত প্রতিপালন ক'রব। আমার বাড়ীতে কোন ছেলে মেয়ে নেই। আমার বৃদ্ধা মা অমলাকে পেয়ে যথার্থই আপ্যায়িত হ'বেন। সময়ে অমলার বিবাহও দিয়ে দিব। কিন্তু আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? আশা করি আপনি সত্বর আরোগ্য লাভ ক'রবেন।"

ইহার পর ডাক্তার বাবু রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণরূপে প্রতীতি হইল যে, রোগিণীর রোগ-বিষয়ক বিবরণ মিথ্যা নহে; এ যাত্রা তাঁহার আরোগ্য লাভের কোনই আশা আর নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রোগিণী ইহ সংসার হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

কৃতঘ্নতা।

—*—

যামিনীকালিমা দেখ হরে শশধর,
হৃদয়লালিমা তারে দেয় নিরন্তর;
কিন্তু লোকনিন্দা হ'তে হইয়ে নিশঙ্ক
নিন্দা দেয় তারে শুধু আপন কলঙ্ক।

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরাম।

—:০:—

(১)

আদিকবি বাল্মীকির চিত্ত,
ত্রিতন্ত্রীর সুমধুর তান ;
শিক্ষা দিলা দুইটি ভ্রাতায়,
গাহিবে কি মনোত্ত মহান্!
তপসার বিস্তৃত বেলায়
সৌম্য শান্ত, পুণ্য তপোবনে ;
নাচিয়া নাচিয়া দু'টি শিশু
গাহিত তা' তরুণ স্বনে।
শুনিত সে সঙ্গীতলহরী,
পশু পক্ষী তরু লতা সবে ;
শিহরিয়া উঠিত প্রকৃতি,
সে মধুর নৃপুরের রবে।
পুলক-কম্পিত কলেবরে
জাগিত সে হেন তপোবন ;
ফুটিত কুসুম ধরে ধরে
পরিমলে পূর্ণ সমীরণ।
সেই গানে উঠিত ফুটিয়া,
ভ্রাতৃত্বের মধুর মিলন ;
সেই গানে উঠিত ফুটিয়া,
সতীত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
সেই গানে উঠিত ফুটিয়া,
বন্ধুত্বের মূরতি সুন্দর ;
সেই গানে উঠিত ফুটিয়া,
সত্যের মহিমা মনোহর।

রাজ্যের [illegible]
ধ্বনিত হইল সেই তানে ;
এ বিশাল কুরুক্ষেত্র মাঝে
কত সুখ স্বার্থে বলিদানে !
সে মধুর সঙ্গীতের তান,
ধ্বনিত হইত অবিরাম ;
নমি তাঁরে, জয় সীতাপতি,
রঘুকুল-কমল ঐ রাম !

(২)

সীতার কারুণ দুঃখ-গাথা,
অদৃষ্টের কঠোর পেষণ ;
ভরি' সব আকুল অন্তরে,
ফুকারিয়া করিত ক্রন্দন।
ঊর্দ্ধমুখে সহিত হরিণী,
শুনি সব শুষ্কমুখ বনে ;
লুকাইত কুশ অস্ত্রগুলি
মধুর মধুরী সুস্বনে।
ফেলিয়া পড়িত ফুলরাশি,
পাখিগুলি ডাকিত না আর ;
শুধু সেই বনমাঝে শুধু
উঠিত সে শোকের ঝঙ্কার !
কোথা সে সরযূর দিন,
অতীতের অঙ্কে লুপ্ত আজ ;
আছে কিন্তু ভারতের মাঝে
'রামায়ণ' কীর্ত্তি পুণ্যময় !
মুছিও সে স্মৃতি-পুরাতন,
দারিদ্রের পর্ণশালা হ'তে ;
ধনীর প্রাসাদে আছে জাগি'
সাদরে ভক্তি অর্ঘ্য হাতে।

এসো ভক্ত, এসো মম সাথি
স্নান করি, প্রেম-গঙ্গা-নীরে ;
হে পূজার্থি ! এসো সবে ত্বরা
এ মন্দিরে ভক্তি-নত শিরে।
হৃদয়ের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি,
অর্পিব সে দেবতা-চরণে ;
লভিব অনন্ত মুক্তি আজি ;
এসো এই বাঞ্ছা লয়ে মনে,
ডাক ভাই আকুল হইয়া
মুমূর্ষুর সম্বল সে নাম ;
নমি পদে, জয় সীতাপতি,
রঘুকুল-কমল শ্রীরাম !

(৩)

ভুঞ্জিবারে চিন্তি সদামনে,
হে দেবতা, তোমারি চরণ ;
অমরত্ব ক'রেছেন লাভ,
লভেছেন অপার্থিব ধন।
তব নামে দূরে যায়, দেখ,
সংসারের সকল জঞ্জাল ;
তোমাকে পাইয়া ধন্য হ'ল,
বিশ্বমাঝে অস্পৃশ্য চণ্ডাল !
তোমারি পরশ লাভ করি'
কঠিন পাষাণ প্রাণ পায় ;
অতিনীচ শরীর সে, প্রভু,
সেও মুক্ত তোমারি কৃপায়
তব নাম উচ্চারিয়া মুখে,
ধন্য হ'ল দস্যুরত্নাকর ;
কবিত্ব সম্পদ লভি' প্রাণে,
গাহিলেন সঙ্গীত সুন্দর।

সাধুদের পরিত্রাণ হেতু,
পাপীদের করিতে সংহার,
ধর্ম্মস্থাপন করিবার তরে,
হে দেবতা, তব অবতার।
ইথে ধর্ম্মের মূর্ত্তি ক্ষীণ,
অধর্ম্মের হইলে উদয়,
ভয়ত্রাতা! আসি' বিশ্বমাঝে,
দাও দেব জগতে অভয়।
এসেছিলে অতীত ত্রেতায়,
কি জানি সে কোন্ পুণ্যদিনে;
আবার কি আসিবে না দেব,
দিবে না ও শ্রীচরণ দানে?
কর্ম্ম-ক্লিষ্ট—এই জীবনের,
কবে দেব দিবে হে বিশ্রাম;
নমি পদে, জয় সীতাপতি,
রঘুকুল-কমল শ্রীরাম!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কন্যার প্রতি।

ন'স তুই কন্যা মোর—স্বর্গের কুসুম—
বিধাতা পাঠায়ে দেছে মর্ত্ত্যের কাননে—
দুরন্ত তারে করি' সৌরভ আকুল
বুঝিবা চলিয়া যাবি তাঁহারি চরণে।
আমাদের বৃথা চেষ্টা কাঁদিবার আশা,
দেব শিশু-মানে কভু ধরণীর ফাঁস!
সে শুধু দুদিন আসে—দেয় ভালবাসা—
মরতে রাখিয়া যায় স্বর্গের নির্য্যাস।
আমাদের শুধু সার আকুলি ব্যাকুলি,
আমাদের শুধু সার নিষ্ফল রোদন,
বৃথা ছুটে যাই নিয়ে "মানতের" ঝুলি—
দু'দণ্ড দেবতার দ্বারে জানাই বেদন।
সন্ন্যাসী দেখিলে কিংবা লইয়া মাদুলী—
লয়ে আয়ো এটা সেটা করাই ধারণ!

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

ভাব-সাধক দ্বিজেন্দ্রলাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২

চাণক্য কঠোরমূর্ত্তি, কিন্তু সে 'মন্ত্রান্ধ ও অবিচারে'র বিরুদ্ধে। চাণক্য রাষ্ট্রনৈতিক গুরু—কিন্তু তাঁর মনীষা ও মনের বল বিচারভিত্তিশূন্য বা 'অন্ধশক্তি-মাত্র নয়; তাঁর হৃদয়ে বিরাজিত খড়্গ-বিদ্যুৎ-করা ইচ্ছাশক্তি-রূপের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে আমরা বিশ্বমূর্ত্তিও দেখিতে পাই। বস্তুতঃ, যে শক্তির উৎসমূলে প্রেম-বৈরাগ্যময় হৃদয় নাই, তাহা অন্ধশক্তি—তাহা ভাঙিতে পারে, কিন্তু গড়িতে পারে না। অপরপক্ষে, যে ভক্তির উৎস মূলে শক্তি নাই, তাহাও অন্ধভক্তি—তাহা অবনতই হইতে পারে, উন্নত হইতে পারে না। শক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ যে বিবাদে কিম্বা প্রতিবাদ নয়, একথা আমরা পূর্ব্বেও দু'একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি—ইহাদের একের অভাবে অন্যটি পঙ্গুই হইয়া পড়ে।

চাণক্য বিক্ষুব্ধ প্রেম পারাবার। রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সিংহাসনে বসাইয়া আশীর্ব্বচনান্তে "আয় মা, এখন তুই আমাকে শাসন কর্" বলিয়া রাজসঙ্ক হইতে চাণক্যের বিদায় গ্রহণ তাঁহার পুরুষকারের পরাধয় নয়,—কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পিত ব্রতের উদ্‌যাপন শেষে শান্তির ও স্নেহের অধিকারে আত্মসমর্পণ। ইহার পর যদি আমরা দেখি যে, ঐ চাণক্যই কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"শুধু বীণাখানি হাতে দাও তুলি'
বাঘাই বসিয়া প্রাণমন খুলি'
শুনের মত সঙ্গীতগুলি,
ফুটাই আকাশতলে,
অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোকে করি বিরচন
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে," ইত্যাদি হইতেও—

যেমন আমরা বিস্মিত হই না,—অপরদিকে তেমনি 'ভারতধর্ম' প্রতিষ্ঠার বিদেশী শিল্প-আঙ্গিকে নব ভারতবর্ষ গড়ার চেষ্টার রূপান্তরিত কর্মপ্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে প্রবিষ্ট মনে করাও অসঙ্গত বোধ করি না।

৫।

এইবার দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' নাটকখানির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচ্য প্রবন্ধ আমরা শেষ করিতে চাই। তাঁহার সমস্ত নাটকই সাধারণে অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু কেন বলিতে পারি না, এখানি হয় নাই, সুতরাং এখানির সহিত সকলে বিশেষ পরিচিতও নন। অথচ আমাদের মনে হয়, এখানির অভিনয় সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়। লোকমত আমারা যতদূর জানি, তাহাতে শুনিতে পাই—বেদব্যাসজননী সত্যবতীর ধর্মভ্রষ্ট কৌমার্য্যকে উজ্জ্বলবর্ণে গ্লানিকর করিয়া চিত্রিত করা অনেকেরই নিকট রুচিকর হয় নাই—অপরিণত বয়সের ঐ ত্রুটিটুকুকে একালের অনেকের চারিত্র-নৈতিক নিক্তিতে ওজন না করাই ভাল ছিল। এরূপ আপত্তি অবশ্যই অসঙ্গত নয়, কেননা মহাভারতের ইতিহাস হিসাবে পাঠ বা তদন্তর্গত চরিত্রগুলিকে আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ মনে করা একালের সাধারণ্যে তত সহজ নয়—যত সহজ তাহাদিগকে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী মনে করা। কুসংস্কারই হোক্, আর সুসংস্কারই হোক্—এটা আজও ভারতবাসী জনসাধারণের মজ্জাগত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর চারিত্র-নৈতিক সংস্কার যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয় যে কোনো বড় নামের আড়ালে কোনো ছোটো কাজ উপেক্ষা করা অপেক্ষা দণ্ডিত করা মানব জগতের কল্যাণকল্পে অত্যাবশ্যক—বিশেষতঃ যাহা ত্রুটি, তাহা সকলের পক্ষে সমান ত্রুটি; দেবতা বা মানব রাণী বা বাঁদী প্রভৃতির প্রভেদ ওখানে নাই। অবশ্য মনের ক্রমবিকাশ এরূপ ক্ষেত্রেও দেখানো যায়, কিন্তু তাহা অনুতাপের আগুনে ঐ মনের অনাবিলতা দগ্ধ করিয়া। যাঁহারা সংস্কারমুক্তচিত্তে দ্বিজেন্দ্রলালের এই স্পষ্ট রীতিটীর উপযোগিতা স্বীকার করিতে সক্ষম,—তাঁহারা কবিচিত্তের অর্থারোপে কোনো একটী বিশেষ দিক দিয়া গড়িয়া উঠা এই সত্যবতীতেও নিগূঢ় মানব-হৃদয় বৃত্তির অনেক সুন্দর সুন্দর সত্যের সাক্ষাৎ পাইবেন, তা' ছাড়া অনেকের এমনও মনে হইতে পারিবে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ অবলম্বিত প্রথাটীর জন্যই আমরা একটা নূতনতর চিত্র পাইলাম, যাহার সহিত মহাভারতের মিল না থাক, মানব-স্বভাবের অসঙ্গতি গরমিল নাই। তা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্মে সত্যবতীর চরিত্রের ঐ বিশেষ

পরিকল্পনা সমগ্র কাব্যখানির মূল সৌন্দর্য্য, বিভিন্ন দিকের সত্য, এবং বিশেষ বিশেষ তথ্যরাজির উদ্ভাবনে যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সত্যবতীর কৌমার্য্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া বুঝিবা ভালই হইয়াছিল,—অন্ততঃ এই 'ভীষ্ম' কাব্যের রস পিপাসুদের কাছে।

মানবহৃদয়ের এমন কতকগুলি স্বরগ্রাম এই কাব্যে নূতন করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে, যাহা কি গভীরতায়, কি গাম্ভীর্য্যে, কি তত্ত্ববুদ্ধির সরস সহজ ও সুস্পষ্ট ধারণায়, সর্ব্বত্র প্রাণস্পর্শী। বস্তুতঃ চরিত্রকে নিয়মিত করিবার, সুন্দর ও মহৎ করিবার অজস্র উপাদান এই কাব্য-গ্রন্থখানির পত্রে পত্রে বিক্ষিপ্ত।

গুহানিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব যে উপনিষদে বা কোরাণে, হিমাচলগহ্বরে বা গীতায় না খুঁজিয়া আপনাপন অন্তরের গুহাতেই খুঁজিতে হইবে, এই নির্দ্দেশকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যখানি আরব্ধ, এবং অন্তরের অন্তরতম বিবিধ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ভাব সম্পদের তরঙ্গ তুলিতে দুলিতে সুললিত গতিলীলায় অগ্রসর। এবটী কেন্দ্র হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, দু'টী গতিপথে প্রধাবিত ভীষ্মচিত্ত ও অম্বা-চরিত্রের আপনাপন লক্ষ্য-সাধনা দেখিতে দেখিতে কবির শিল্প দৃষ্টি ও ঘটনাটীর ভাব-সঙ্গীত ও অর্থ গৌরব প্রভৃতির সম্বন্ধে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

তার পর, এ নাটকে গুরুশিষ্যের যথার্থ সম্বন্ধ দু'একটী মাত্র সংক্ষিপ্ত দৃশ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'টী একটী কথায় এতই অত্যুজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের তুলিকা-মুখেই সম্ভব।

'সবুজপত্র' সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কোনো প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি থাকাও চাই আবার তাহার বিদ্যাটুকু গুরুমারা বিদ্যা হওয়া চাই। একালের দ্রোণাচার্য্যেরা যদি একালের একলব্যদিগের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাহাদের 'বুড়ো আঙুল' চান, তবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাই একলব্যদের পক্ষ থেকে উচিত কাজ হবে।

তাঁহার ঐ উক্তির কদর্য্য সম্ভাবনা হীন, পরম রমণীয় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধমূলক দৃষ্টান্ত এই 'ভীষ্ম' নাটকের পরশুরাম ও ভীষ্ম চরিত্রের ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাই। দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনায় গুরু ও শিষ্য সমান মর্য্যাদা গৌরবে আপনাপন সীমায় দণ্ডায়মান,—ছোট বড় বুঝিবার সামান্যতম ছিদ্রটীও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যিক মণ্ডপের একটা বিশিষ্ট দিক্ দ্বিজেন্দ্র প্রতিভাকে হাসির গানেই সীমাবদ্ধ মনে করেন, কিন্তু যদি কেহ নিবিষ্টচিত্তে

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য-সাগরের সমস্ত তরঙ্গ পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হাসির গানের কবিকে তাঁহারা প্রায় ভুলিয়াই যাইবেন। কবি তাঁহার কোনো কবিতায় বলিয়াছেন—

"হাস্ত শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্ত করে' অর্দ্ধজীবন করেছি তো অপচয়।"

কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘতর না করিয়া আমরা এইখানেই আজ শেষ করিতে চাই। ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধে কোনো কবির জীবনব্যাপী ভাব সাধনার পরিচয় প্রদান সম্ভব নয়। তাঁহার কাব্য ও নাটকগুলি শ্রদ্ধার সহিত অধীত ও আলোচিত হইতে থাকুক, ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি—আর তাহা এই জন্ম যে, মানবহৃদয় ও মানববুদ্ধিকে জড়তামুক্ত করিবার শক্তিপ্রাচুর্য্য দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে। আজ জনসাধারণের জড়তা ঘুচাইয়া ও মর্য্যাদা বুদ্ধি জাগাইয়া তাহাদিগকে মাথা তুলিয়া দাঁড় করাইবার জন্য সমস্ত ভারতে যে আন্দোলনস্রোত বহিতেছে, কবির 'আলেখ্য' নামক ছোট কবিতা গ্রন্থটীতে 'রাজা' শীর্ষক একটী বেগতীক্ষ্ণ অথচ সাধারণ হৃদয়োচ্ছ্বাসেও তাহার সুর আমরা শুনিতে পাইব—কিন্তু প্রবন্ধ যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতার স্বাতন্ত্র্য ও ভঙ্গী সম্বন্ধে আর কথা বাড়াইলাম না। শুধু বিদেশ ও বিজাতীয় মনীষাগুলির সহিত শুদ্ধ পরিচয়, এই নব্যভারতীয় ব্রাহ্মণ কবির বাণীর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াই এ আলোচনা শেষ করিলাম।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

আমার ভারতবর্ষ।

আমার ভারতবর্ষ।
যুগে যুগে তুমি দেবতা নিলয়,
দেশে দেশে তব খ্যাতি অক্ষয়,
কোটী নির্ঝরে গাহে তব জয়,
হিমাচল দুর্দ্ধর্ষ;
আমার ভারতবর্ষ।

ধুইয়া সিন্ধু তব পদ তল
বিগ দিগন্তে বহে মঙ্গল,
পাবন করিয়া মহীমণ্ডল
দিয়া যে পুণ্যস্পর্শ;
আমার ভারতবর্ষ।

কোথায় তপন এত উজ্জ্বল?
কোথায় চন্দ্র এমন শীতল?
পুষ্পে কোথায় এত পরিমল?
গুঞ্জনে এত হর্ষ?
আমার ভারতবর্ষ।

কোথায় এমন ধ্যান ভাণ্ডার
অনন্ত জ্ঞান-নিধির-আধার?
ত্যাগে যোগে যাগে সন্তান কার
নিখিল ভুবনাদর্শ?
আমার ভারতবর্ষ।

লুপ্ত যদিও তোমার মহিমা,
আবার জানিবে লুপ্ত গরিমা;
দীপ্ত হইবে পুন ও প্রতিমা;
কেন মা এত বিমর্ষ?
আমার ভারতবর্ষ।

"সাথির সিন্দুর"

১

সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন আমি জব্বলপুরে মুনোফি করিতাম। রাস্তার পাশেই একখানা আটচালা ঘর ছিল; আর তার সঙ্গেই একটী বৈঠকখানা। এই বাসাটীতে থাকিতেন—উৎপলবাবু সবডেপুটী। রাস্তা আর কাছারির মাঝামাঝি রাস্তায়, একটা টিলার উপরে রোজই আমার ছেলে নন্নী আর ডেপুটী বাবুর মেয়ে মণিমালা খেলা করে। তখন নন্নীর বয়স ছিল চার, আর মণিমালা সবে পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। উৎপল বাবুর স্ত্রী প্রায়ই উপহাস করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিতেন—"দিদি! ছেলে মেয়ে যে প্রায় গায় হলুদের যোগাড় করে তুল্লে।" এইভাবে আমাদের দিনগুলা বেশ এক রকম কাটিতেছিল। রক্ত সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য জোনাকির আলো ফুটিয়া উঠিত। দূরে ঝোপের মাঝে চাঁদের আলোতে দুই একপাল বন্য শূকর খেলিয়া বেড়াইত, আর আমাদের বাসার পাশেই একটা ক্ষুদ্র পাহাড়িয়া পাখী থাকিয়া থাকিয়া কি এক করুণ গীত গাহিয়া যাইত। আমি যুদ্ধের মাল্য কবিত্বের বড় একটা ধার ধারিতাম না। কিন্তু উৎপল বাবু লোকটী বেশ একটু সৌখীন ছিলেন। এমন কি তিনি সেখানে একটী সখের থিয়েটার পর্য্যন্ত বসাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তার উপর নিজেই "পূর্ণচন্দ্রের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। উৎপল বাবুর সদা উৎফুল্ল ব্যবহারে সেই অজানা দেশে আমাদের মনটা বেশ একটু জমকাল গোছেরই ছিল। ক্রমে 'নন্নী' স্কুলের শিক্ষার আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার জন্য এখন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইয়াছে। এদিকে মণিমালাও আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায় না। বেশ ঘরে বসিয়া কার্পেট বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর মধ্যে মধ্যে তাহার ধাত্রীর নিকট হইতে কথামালার অর্থ বুঝিয়া লইতেছে। কলির বন্ধে নন্নীর [illegible] হয়, তবে [illegible]কের।

অশ্রুসিক্তনয়নে সবডেপুটী বাবুর স্ত্রী আসিয়া আমার স্ত্রীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন আর উৎপল বাবু মণিমালাকে লইয়া একেবারে শেষনে আসিয়া হাজির হইলেন। এইরূপে শরতের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে আমাদের বিদায় গ্রহণ করা হইল। তারপর কয়েক দিন চিঠি লেখায় খুবই ধুমধাম চলিতে লাগিল, তার ক্রমে গাঙ্গামাটী, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, তেজপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আলিপুরে আসিয়া সবজজ হইলাম। আর এদিকে উৎপল বাবুর নাম ঘোষণায় তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বগুড়ায় আসিয়া হাজির হইয়াছেন সেদিন লিখিয়াছিলাম একটা খবর উৎপলকে বলি নাই। অধ্যাহ্ন আহার শেষ করিয়া ঘরে শুইয়া একটু বসিয়াছি, এমন সময় তার সাহেবের চাপরাশি আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্র খুলিয়াই আমার হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইবার কারণ ছিল যথেষ্ট, কারণ আমি প্রভিন্সাল সার্ভিসের দরখাস্ত পাইয়া মহা চিন্তিত হইয়াছিলাম। আর কলিকাতা ছাড়িতেই বিমল আসিয়া যেখানে সেখানে হইক এপায়েণ্টমেণ্টের তখনও একমাস বাকি আছে। দুইদিন পর উৎপলের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলাম যে, তিনি কুমিল্লায় এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া চলিলেন। ভগবান যেন আমাদের অদৃষ্টকে সমান করিয়াই গড়িয়াছিলেন। ননী তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে। ময়মনসিংহে তখন "বেথুন স্কুল" কলেজ ছিল, কাজেই ননীকে কলিকাতায় একটা মেসে রাখিয়া আসা হইল।

২

নরেন্দ্র কমলপুরের বাবুদের বাটীর ছেলে, সে কলিকাতায় ননীদের বাড়িতে মেট্রোপলিটান কলেজে পড়ে। পূজায় এবং গরমের ছুটীতে বাড়ী যায়। কিন্তু তিন দিন যাবৎ নরেন্দ্রের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। মেস শুদ্ধ লোকেই ব্যস্ত, কারণ নরেন্দ্র স্বভাবগুণে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। শরতের প্রভাতে ভিখারী মায়ের আগমনী গাহিয়া আনন্দময় আগমন ঘোষণা করিতেছিল। আর ননীদের মেসের বাসার নিকটে এক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হইতে প্রচুর সেফালি ঝরিয়া পড়িয়াছিল। পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল, সকলেই লোলুপ দৃষ্টিতে পত্রগুলির উপর চাহিয়া দেখিল, তার যেমার কাছে চলিয়া গেল। কোন ছেলে বা কলের পাড়ে দাঁড়াইয়া মুখ ধুইতে ধুইতে চিঠি পড়িতে লাগিল, কেহ বা অভিমানে ক্ষুণ্ণ হইয়া চিঠিগুলি ফেলিয়া

"আমার কুঠীর রাণী" গাহিয়া লইল। কলেজের সময় সকলেই চলিয়া গেল, বাসায় ঝি "অমলা" গেল না, তাহার তখনও ভাত দেওয়া হয় নাই। কারণ ঠাকুর খাইলে সে ভাত লইয়া যাইবে। এদিকে উড়িয়া ঠাকুর আর ঝিটির ভৃত্যে বিশেষ বসা আরম্ভ হইয়াছিল। "অমলা" এই কুরুক্ষেত্রে "উইলসনের ন্যায় তরকারী কুটিতে আরম্ভ করিল। অমলা পূর্ণ যুবতী। ভাদ্রমাসের ভরা যৌবন ফুল প্লাবিয়া পড়িতেছিল। শরতের আকাশের স্নিগ্ধ, সৌম্য চন্দ্রকলার ন্যায় তাহার বর্ণ। সাহা হউক মেসের ঝি সে, তাহার রূপবর্ণনায় অনেক পাঠক হয়ত রুচিবিকার দোষ ধরিবেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য লুকাইয়া থাকে না। ঝি "পিসকনফারেন্স" বসাইয়া ঠাকুর ও ভৃত্যকে ঠাণ্ডা করিল। বেলা ১২টা বাজে, সূর্য্যদেব তখন মধ্যাহ্ন গগনে প্রচণ্ড তেজ বিকীর্ণ করিতেছিল।

পূজার বাজার রাস্তায় ভিড় খুবই বেশী। বিশেষতঃ পটলডাঙ্গার ত কথাই নাই—মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, কাবলীওয়ালা, বাঙ্গালী তাহাদের কত রকম কথার বাহার কত রকমই সাজসজ্জার বাহার! এমন সময় হঠাৎ "ননী" কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। "অমলা" বলিল "কি ননী বাবু এত শিগ্‌গির যে?" "ননী" বলিল "বলছি, সে অনেক কথা।" ঝি ভাতের থালা রাখিয়া বসিল, তাহার শুনিবার আগ্রহ হইল। ননী বইগুলো উপরে রাখিয়া নীচে কলেজ পাড়ে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল।

"দেখ ঝি নরেন যে এমন ছোটলোকের মত ব্যবহার করবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সে আমাদের কিছু না জানাইয়া উৎপল বাবুর মেয়েকে বিয়ে করতে চলে গেল" ঝি জিজ্ঞাসা করিল "উৎপলবাবু কে?" ঠাকুর বলিল "মু-জানুছি", কাটিহারী রাগিয়া বলিল "তোম কাহে বক্ বক্ করতা হ্যায়!" এই প্রকারে ঠাকুর চাকরের মন্তব্য সমাপ্ত হইলে ননী বলিল "বাবা যখন ফরিদপুরে পার্ড মুন্সেফ ছিলেন, উৎপল বাবু তখন সেখানকার সবডেপুটী। উৎপল বাবুর বাটী উত্তর পাড়ায়, রাজাদের সঙ্গে তাঁহাদের খুব নৈকট্য সম্বন্ধ। এখন তিনি কুমিল্লার এ্যাডিসনাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্। সে অনেক দিনের কথা, আমি তখন দশ বৎসরের বালক। উৎপল বাবুর মেয়ের নাম ছিল "মণিমালা", সে দেখতেছিল একটী গোলাপের মত। ঝি হাঁ করিয়া কথা শুনিতেছিল, তাহার হাতে না একটা বিড়ালে লইয়া গেল। তখন ঝি, চাকর, উড়িয়া ঠাকুর একসঙ্গে চীৎকার আরম্ভ করিল, বিড়াল ত পলায় পায়। ননী বলিল "আমার ও

আমার কাহিনীটা শেষই। আমি আর মণিমালা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে খড়ের দিয়ে সোনার ঘর তৈরী করতুম, প্রাতঃস্নান পূজিয়া ইত্যাদি [illegible] পালংশাক, সেঁচোশাক' আমরাও তাহাদের অনুচরগণ করিতাম। বাবা একবার বদলি হইয়া সাঁতরাবাদে গিয়াছিলেন, তখন মণিমালা আমার কে [illegible] কি বলিল 'বল কি বাবু আটঘরের মেয়ে কাঁদিয়াছিল?" বলা বাহুল্য 'সে সে শেষই ছাই: তোমারত এই মাছ খাবার বিরহে প্রায় রোজ [illegible] আসিতাম।" ঘড়ীর দিকে চাহিয়াই নয়ন তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটিল, আর [illegible] হইল না।

৩

মনোর কথা—বিকেল বেলা কলেজ হইতে ফিরিয়াই দেখি যে আমার টেবিলের উপরে একখানা টেলিগ্রাম রহিয়াছে। [illegible] দেখি বিবাহ করিবার জন্য বাবা ময়মনসিংহ যাইতে লিখিয়াছেন। [illegible] একখানি পত্র দিয়া গেল—পত্রের মর্ম্ম এই রকমের বিবাহের [illegible]—তিনি কুমিল্লার এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে। [illegible] সেই রাত্রেই ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখি আমার বিবাহের সব ঠিক। তখনকার দিনে বাপের কথার উপর "না" বলিবার যো ছিল না। আমার বিয়ার চাকাতে হইবে, তাহার মেয়ের সঙ্গে কিছু আসিবে না। [illegible] আশিন গোধূলি লগ্নে বিবাহ স্থির হইল। একটা চাপা হাসি [illegible] মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত মাতন লুকাইয়া চাপা [illegible]। বিবাহের সময় অনেকেই আসিয়াছিলেন। উৎপল বাবু [illegible] আসিয়া আমাদের [illegible] করিয়া এক বুড়ে। মুখটিকোর [illegible] চাহিলাম না। পরের ঘটনা আলোকোজ্জ্বল মনে [illegible] একজাতিয়া আমার হাত ধরিয়া [illegible] আছি, তখন সে স্ত্রীকে আমার কাছে [illegible] "[illegible] মণিমালা এদিকে গলায় পরিও।" তখন সবের [illegible] হইল, শালিকাটও [illegible] কাল [illegible] মণিমালার" [illegible]। পরে নয়ন বলিল "ভাই মনো! [illegible]" [illegible] তখন [illegible]। [illegible] [illegible] মধুরিমায়" [illegible] পলাইয়া [illegible]

খাসদখল।

(গল্প)

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি ও গুলো আর খেয়ো না।

কেন সরলা! যাতে আমি শান্তি পাই, যাতে করে সব ভুলে যাই—

ওগো, ও যে সর্ব্বনাশ করবে—তা কি জানো না! ও খেয়ে কারো কিছু নাই, তাও তুমি জানো।

আমারই বা কি আছে?

যা আছে তাই থাক। আর সর্ব্বনাশ করো না। ফেলে দাও—ফেলে দাও—

বল কি সরলা, মদ ফেলে দিলে বাঁচব কি নিয়ে। যার ভরসায় এখন আছি দুনিয়ায় থাকা, তাকে ফেলে দেব!

তোমার পায়ে পড়ি, ও বিষ আর খেয়ো না। একবার আরসিতে মুখটা চেহারা খানা—কি ছিলে, কি হয়েছ!

সত্যি বলেছ সরলা, কি ছিলাম কি হয়েছি! রূপায় অধিক সম্পদ, কার্ত্তিকের মত রূপ, অসুরের মত শক্তি, ফুলের মত নির্ম্মল, চরিত্র আর মহাদেবের মত উদার ভাই—সব ছিল। কি না ছিল সরলা?—আমার যা ছিল, কাহারো তা থাকে? ছিল সব—গেছেও সব।

যাক্—হয়ত আবার হবে।

আবার হবে সরলা? এ কি আমাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের জোরে হবে?

না—হয় না—হবে।

না-ই ত হবে সরলা।

না হউক। ভবুও দিন কাটবে। তুমি আছ, মা আছে—এই ঢের।

ঢের বই কি? রাজপ্রাসাদে ছিলে,—কাল হয় পাঁচায় না থাকে ত কিরা কেলো কুঁড়ে ঘরে জায়গা করে নেবে। ঢের বই কি সরলা?—

যে দিন দিয়ে না? সেদিনেই আমি জোমার চোখের আড়াল

হাঁ বলা, এরকম কল্পনা তুমি কলে করতে পার—কিন্তু ভগবান্ রাজের ছেলের কল্পনায় অতখানি নেমে যাওয়া চলে না।

যেখ ঈশ্বর যেমন রাখেন তেমনি থাকতে হবে।

আমি আপীল কর্চ্ছিনা। তবে ভাবছি—তোমাদের দুজনকে এই অকূল বিদেশ প্রান্তরের মত সংসারে রেখে মরতেও পারছ না।

ছি, ওকথা বলছ আবার!

সরলা, মরতে যদি পারতাম।

তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে—

এই কথাগুলি কি আমার কাণে বড় ভাল লাগে বলে বলছ। এখন একটু ঘুমাও দেখি।

ঘুমাব এইকি? তবে বরাবরের জন্য ঘুমাতে পারলে বেশ হতো। আমার ঘুম দাদার সঙ্গেই গেছে।

দাদা সবারই থাকে না। যার মণিকে দেখে তাঁকে ভুলে থাক।

ঐ মাবাপ-মরা ছেলেটা একটা কাঁটা দাদা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। চিরজীবনের স্নেহের একটা মস্তরকম প্রতিশোধ। ছেলেটা যদি মরে যেতো—

চুপ থাকতে পারো না! আমি তবে সরে যাই।

যাও না—সবইত আমার কাছ থেকে সরে গেছে। সম্পত্তি গেছে, চরিত্র গেছে, গাঁ গেছে—যে দাদা শৈশব থেকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন—তিনি গেছেন—দু'দিনের বন্ধু তুমিই থাকবে কোন্ ভরসায়। যাও—তা হলে আমি নিশ্চিন্ত।

তোমায় বিনয় কর্চ্ছি—একটু শোও এসে, একটু ঠাণ্ডা হও।

না যাই—দেখি গে একটা খোলার ঘর যদি ভাড়া পাই।

এ রাত্রিকালে কোথা যাবে? কাল ভোরে যেও না হয়।

কাল এবাড়ী খাসদখল করে নেবে। তবে আগেইতে সরে যাওয়া ভাল।

তুমি কি গো বল্লে! যদি বলতে দাদার ঋণের জন্য দাদার অর্দ্ধেক থাক্—আমার ছেলে—

তবে। যদি পাই আর না কাঁদি, দাদার উপর কথা কইবে ভাল হবে না!

তানা দাদার—নয়তানা আমার। কেউ জানে না সরলা—দাদা (বোঝেন)

তবে——

কথা কয়ো না। শোনো। দাদা আজীবন খেটে এই ইন্দ্রপুরীর মত প্রাসাদ খানিকে সাজায়ে ছিলেন। মনে পড়ে সরলা তোমার বিয়ের কথা লাখ টাকার উপর খরচ করে দাদা—তোমায় ঘরে আনলেন;—আর—সেই দাদা—

হায় স্বামি! তিনি এ অপকর্ম্ম—

সাবধান সরলা, দাদার উপর বিদ্রূপ করো না। তোমায় বিয়ে যদি আমি এই চার বছর বোম্বেয়ে না থাকতাম, তা হলে এই কলকেতার ছুঁচোরেও দাদাকে কাবু কর্ত্তে পার্ত্ত না।

তাঁর মত মানুষ প্রমদার আড্ডায়—

হাঁ সরলা—দৌলত দিয়ে নিয়ে গেছে। যদি বড়বৌ থাকতেন—তবু হয়ত ছিল। তিনি দাদাকে বাঁচাতেন। এখন সব গেছে—ঋণ—ঋণ—ঋণ রয়েছে। কাল তা শোধ হবে। দাদার ঋণ শোধ হবে—আমার আনন্দ, আমার কি সরলা, কাল দাদা ঋণী হবেন।

"চুপ কর। মাথাটাকে বিশ্রাম দাও।"

"হাঁ, দেব বই কি? কাল থেকে চির বিশ্রাম। একটু ফূর্ত্তি করি। আর একটা বোতল নে আও—দাদা হার্ট ফেল করে মরেছেন—আমার হার্ট ত ভঙ্গপ্রবণ নয়—ভয় নেই। মদ নে আও—

(২)

কেদার কোথা গেল বৌ মা!

জানি না মা! কাল সন্ধ্যার পর থেকেই কেবল মদ টানলে। ভোর বেলায় দেখি বিছানা খালি পড়ে আছে।

বউ মা, উপায় কি হবে মা। আজ নাকি লাহা বাবুদের বাড়ী হতে দখল নিতে আসবে। কোথা যাব মা, কি করব মা!

মা, আমি ত তার কিছু জানি না। আজ ছ'মাস এখানে আসি। জিনিষের বালা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ে গেছে। কিন্তু কি করে কি করতে হবে—তা ত জানি না মা।

বৌ মা, কার কুঁড়ের ছায়ায় আশ্রয় নেব,—কার দয়ায় হাত পাতব মা এবে শিখা করিনি!

মা তুমি বুঝতে পারছ না ওরা ইচ্ছে করে আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

মা একটু চুপ করে থেকে—তার হাতে ও কি ? দেখি তো।

না, তুমি আপত্তি কর, কিন্তু আমার যাওয়া হবে।

কী মা, কিনব বাবা ইউনিক।

কেন—

কি কি মা।

একবারে মাথায় করবে কি কিনে ? পথের ভিখারীর ছেলে—

না মা পথের ভিখারীর ছেলে নয় সে। রাজপুত্র সে। তাকে এখন কাজের ভেতর দিয়ে চিনবে।

কি কিনে মা ! কিনা পুঁজিতে ত ব্যবসা চলে না। কিনা টাকায় কেনা হলে কখন কেনা চলে না।

কোথায় পাবেন। এত বড় দুনিয়াটা যার কেবলমাত্র চলে, কিন্তু কিনে চলে এমন কেউ নেই ! মা, তুমি আপত্তি যদি কর, কিন্তু যাওয়া হবে। ঐ যে কিনু আসছে—চোখ মুছে ফেল মা ! আমি যাই তাকে কিছু কিনে বাড়ি নিয়ে যাই গে।

কাল তাহলে কখন যাবো কিনু। কি আছে তোমার কিনে দেবে।

(৩)

বাড়িতে কেউ নেই এখন।

সবে বুঝি সব বাড়ী ছেড়ে আগেই চলে গেছে।

কই।

এই, বড় জোকের ছেলে কিনা ! লজ্জায় মরে গেছে হয়ত।

কনফিডেন্স বলে বাবুর হাতে অসংখ্য টাকা ছিল।

লজ্জায় আত্মহত্যায় সব নিকাশ হয়ে গেল। বড়লোক বাড়ীর আর কেউ বেঁচে থাকে গেল।

তবে এখন তবে আমরা এবাড়ী দখল করে বসি।

এ কাকে দেখি ! ইস্ কি প্রকাণ্ড বাড়ীই করেছিল—ভেতরে গিয়ে ঢুকে যদি আমরা টাকাগুলি নিয়ে এসো—প্রমদার ভিতে কেউ সন্দেহ উদ্রেক করে, কে—হেমন্তের গলা আর যে—কেমন যোগেশ বাবু !

কতটাকা আপনি দিয়েছিলেন ?

এই লাখ খানেক।—উঁ—বগলা বাবুর না কি না—বুড়া মানুষ খুব কোথায় খোকার ঘরেটরে।

ওর এক ভাইও ত আছে শুনছি।

হাঁ শুনেছি। আপন ভাই নয় বুঝি। বাড়ীতে থাকত—জ্ঞাতি হবে বা। না আর কেউ। বগলা বাবুর একটী শিশু—এই ছ'সাত বছরের যেন শুনেছি। আর থাবার নাজানি কত—

না হুজুর—বাড়ীত খালি নয়। ঐ দেখুন উপর থেকে টর্চ্চ ফেলে একটী ছেলে নেমে আসছে।

বেশ ছেলেটী। বুঝি এটীই বগলা বাবুর হবে। ... এসোত বাবা—তোমারা কে গা! কাকা বাড়ী নাই—বৈঠকখানায় তোমরা কি করছ গা!

তোমার কি নাম বাবা!

আমার নাম বিনয়। তবে সকলে আমাকে মণি বলে ডাকে।

কি চাও বাবা মণি!

এই ঠাকুর মা আজ সকাল থেকে কাঁদছে, কাকীমা কাঁদছে। কাকা বাবা মন খেয়ে কাঁদছে—সকালে কোথায় চলে গেছে।—হাগা তোমরা জান—

না জানি না।

বলতে পার—তারা কাঁদছে কেন?

আমরা তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। তোমরা আর এবাড়ীতে থাকতে পারবে না।

কোথা যাব! ও মা—আমরা তবে কোথা যাব। হাগা আমরা যাব কোথা। তবে তোমাদের বাড়ীই যাব। তোমার গাড়ী খানিত বেশ। আর কি সুন্দর ঘোড়া! হাঁ গা তোমাদের—বাড়ী আমাদের নে যে। ঘোড়া চারটা আমাদেরও ছিল।

আমাদের বাড়ী তোমাদের খাবার দেবে কে?

কেন—তোমার ছেলেদের খাবার দেয় কে? কি নেই—ঠাকুর নেই?

আজ কি খেয়েছ মণি!

কিছু না। কাল আমি মুড়ি খেয়েছিলাম। কাকী মা, ঠাকুর মা, আরা একাদশী করছিল। কাকা বাবু মন খেয়েছিল।

খাও নি কেন মণি!

খাবার [illegible] কাল বড় কেঁদেছিলাম [illegible] কাকীমার কাছে পয়সা চেয়ে।

আজ কি নেই মণি।

বড় ক্ষুধা। তাই এসেছি বেমে—যদি দুখণ্ডরাটী পাই—তাই উপরে নিয়ে যাব।

পয়সা নেই বল্লে যে।

হা কাকীমা একটা কিছু।

আচ্ছা তোমায় একটা পয়সা দিতে পারি। এই নাও—

ও বাঃ—এ যে লাল পয়সা—তা কাকীমাকে বোঝে আসি।

তোমরা ত এখনি এ বাড়ী থেকে চলে যাবে।

নাঃ—আমরা যাব না। তুমি এত লোক নিয়ে এসেছ কি তাড়াতে নাকি?

হুঁ।

আমি তা হলে উপরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। তোমার পয়সাও নেব না—আমরা এ বাড়ী থেকে যাবও না।

যাবে না!

নাঃ।

যাবে বৈ কি জোর করে বের করে দেব।

না না—কেন গা। কাকা বাবু বাড়ী নেই—তারা দু'জনে কাঁদছে। আমরা ত যাব না। মেরে ফেল্লেও যাব না। তোমার বাড়ী যদি নেও তা হলে নাই। আচ্ছা তুমি ত বাড়ী ছেড়ে এসেছ, যদি বেউ তোমার ছেলেদের তাড়িয়ে দেয়—আমার ত মা নাই, বাপ নাই—কাকী মা, ঠাকুর মা আমায় নিয়ে কোথায় যাবে? না, আমি যাবো না। তোমরা যাও, চলে যাও, বাড়ী আমার।

হাঁ মণি, এ বাড়ী তোমার। সুখন সিং যাও—এটর্ণিকে বাড়ীতে নিয়ে এসো। আমি এ বাড়ী এ ছেলেকে লিখে দেব।

হুজুর দখল—

হয়ে গেছে।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারত ইতিহাসে পাশ্চাত্য অভিমত।

—*—

কয়েকদিন হইল বঙ্গদেশে নূতনভাবে ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে বিমুখ ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রাজ্যে বিচরণ করিতে কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত উদ্‌গিরণ করিতে পারিলেই ইতিহাস-শিক্ষার সার্থকতা প্রমাণিত হইত। মূল পুস্তকের পাঠ ত দূরের কথা, তাহার অনুসন্ধান করাও হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতনভাবে ইতিহাস-চর্চ্চা ও গবেষণা চলিতেছে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ বহু শাখা-সংযুক্ত বেদ, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সত্যাসত্য বিচার করিয়া ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস গঠন করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। বর্ত্তমানে যেরূপ কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে আশা করিতে পারা যায় যে, অচিরে ভারতবর্ষের একখানি সর্ব্বাঙ্গীণ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। আমরা বাস্তবিক পক্ষে একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। কাব্যে দর্শনে ও নাটকাদিতে ইতিহাস-কুশলেরা যে মালমসলা সঞ্চিত আছে, তাহা ধীরভাবে বিচার ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া আমরা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসরূপ এক অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভারতের ইতিহাস-ক্ষেত্রে অনেকগুলি আগাছা জন্মিয়াছে। এই আগাছা-গুলি তুলিয়া ফেলিতে না পারিলে জগতের চক্ষে আমরা এক হীন জাতি বলিয়া পরিচিত হইব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষতঃ জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ গ্রীসকে বিশ্ব-সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। হেলিনিক সভ্যতার স্রোত য়ুরোপে প্রবাহিত হইয়া ইয়ুরোপকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে সত্য, গ্রীক্ সাহিত্য, কারুকলা ও দর্শন য়ুরোপের উপজীব্য হইলেও তাহা ভারতীয় সভ্যতা-বিকাশের বহু শতাব্দী পরে। ভারতীয় সভ্যতাকে খৃষ্টের জন্মের দিকে ঠেলিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক একদেশদর্শিতাদোষে

হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে গ্রীক্ সভ্যতার উৎস মেসোপটেমিয়ার ভারতীয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল; তাই তাঁহারা গ্রীসকে ভারতীয় সভ্যতার মাতৃস্থানীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসিগণ গ্রীক্ সভ্যতাকে নেশী ছাঁচে ঢালিয়া বেনোয়ী নামাঙ্কিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সমিচীন বলিয়া মনে হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা করিতে উদাসীন থাকিব এবং কোন বিষয় স্বচক্ষে না দেখিয়া পরের চোখের ঝাল খাইয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করিব, ততদিন পর্য্যন্ত কোনও যথার্থ ইতিহাস রচিত হইবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যত্ন ও অধ্যবসায় আছে। তাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়া সংস্কৃত ভাষার অতীব জটিল জ্ঞান ভেদ করিয়া যে পরিশ্রম ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্তা ও ভাবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুস্তকে তাঁহাদের মনের ছাপ প্রতিফলিত হইয়া অনেক স্থলে সত্যকে রঞ্জিত করিয়াছে। জড়বাদ-দীক্ষিত ইয়োরোপ ভারতের শক্তিকেন্দ্র নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। ভারতের বিশেষত্ব, তাহার প্রাণ—তাহার কাব্যে নয়, কারণ জগতের অন্য অনেক জাতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছে; নাট্যে সাহিত্যে নয়, কারণ গ্রীসীয় ও ইংরেজ-ফরাসীর নাট্য উন্নতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত; শিল্প বিজ্ঞানে নয়, কারণ গ্রীক্ ও রোমক এবং বর্ত্তমান পাঠান ও ফরাসী জাতিসমূহ শিল্পবিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে—ভারতের শক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার দর্শনে—তাহার মানবতার পূর্ণ বিকাশে—তাহার সভ্যতা ও সমাজগঠন প্রণালীর শ্রেষ্ঠতায়।

প্রথমতঃ ম্যাকস্‌মুলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকে কৃষকের গান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংগ্রহকল্পে ম্যাকস্‌মুলারের পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়; কিন্তু ভিন্ন জাতির ধর্ম্মতন্ত্র ও দর্শন—তাহার ক্রিয়া-কলাপ-জ্ঞান-ভক্তির প্রধান অবলম্বন বহু ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত মহাগ্রন্থের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাদের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। ওয়াশিংটন শিক্ষিত রমেশচন্দ্রও এক অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের যথার্থ অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহেন, কারণ, তাঁহারা গোঁড়ামী ও ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বৈদিক সূক্তের

লেখা করিয়া ফেলিলেন। বেদের যথাযথ অর্থ স্থির করা সম্বন্ধে যাঁহারা দূরদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এক চেঁয়া কার্য্য। এমন কি সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাও ঋষি ভ্রমপ্রমাদাত্মক, যিনি বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রচারে অমানুষিক পরিশ্রম, বিচারশক্তি ও সূক্ষ্ম দর্শনের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন—যাঁহার অলৌকিক ভাষা জ্ঞান ও সাহিত্যানুরাগ তাঁহার পুণ্যময় জীবনের জ্বলন্ত চিহ্ন—যিনি ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন—সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য সায়নাচার্য্য বেদের ভ্রমাত্মক সম্পোলকল্পিত ব্যাখ্যা প্রচার করিলেন, আর অমনি অদূরদর্শী আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই বেদের যথার্থ অর্থ নিরূপণে অন্ধ হইলেন—এই কথা শুনিলে, আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। এইরূপ হওয়া অসম্ভবনীয়।

ডাঃ বিটারনিৎস প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্ লেপ্টজি সাহেবের নাম উল্লেখপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, হিন্দুজ্যোতিষ গ্রীকজ্যোতিষের অনুকরণ মাত্র। সাহিত্যে গ্রীসিয়ান ভাবভঙ্গী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুগণের কীর্ত্তি এবং গৌরব যে ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দুজ্যোতিষকে ইহাতে বিযুক্ত করিয়াছেন। প্রেৎমটী বৈদিক সূর্য্য জ্যোতিষ ও হিব্রীয়দিগের কালের জ্যোতিষ। ওপ্পার্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৈদিক যুগের জ্যোতিষ বিজ্ঞানসঙ্গত প্রণালী দেখিতে পান না; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিক ঋষিগণের ফলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গণনার যথেষ্ট হয়, সুদূর বৈদিক যুগে ভারতীয় ঋষিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সহৃদয় বেন্টলি সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুগণের গতি ও সৌর এবং চান্দ্র বর্ষের কাল তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না, বৈদিক সূক্তের অর্থোদ্ধার করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুগণ বিষুব বিন্দুদ্বয় ও অয়ন বিন্দুদ্বয় (Equinoctial and Solstitial Points) সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, গ্রীকদিগের জ্যোতিষ জ্যোতিষের ছায়াবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হয়। দুই এই দুটী নামের গ্রন্থ দেখিয়াই একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহাদের বেন একটা ব্যাধি। তাঁহাদের মতে রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্ত নামক দুখানি গ্রন্থ গ্রীক জ্যোতিষের অনুবাদ। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে—"পৌলিশ সিদ্ধান্ত খানি জ্যোতিষের গ্রন্থ, অপর দিকে Paulus Alexandrinus এর গ্রন্থ, কোন

সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা করিয়াছে; সুতরাং পৌলিশ গ্রন্থ যে ভারতের নিজস্ব এবং কোন বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ইহার আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই", দ্বিতীয় যুগের আর্য্যভট্ট বরাহমিহির ভাস্কর প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রীকগণের নিকট ঋণী নহেন। রাশিচক্রের দ্বাদশ ভাগে বিভাগ এবং তিথি বিভাগ ব্যাপারটীও হিন্দুগণের গবেষণার ফল। দেশী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দুজ্যোতিষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে জন্মলাভ করিয়া ক্রমিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। চীন, আরব এবং ব্যাবিলোনিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট হিন্দুজ্যোতিষ ঋণগ্রহণ করিয়া উন্নতিলাভ করে নাই। গ্রীক জ্যোতিষের শৈশবাবস্থায় হিন্দুজ্যোতিষ গণনায় বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতবাসিগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুজ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহারা নিজ জাতীয় কৃতিত্ব দেখাইতে অসমর্থ। খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ইউরোপের কোন জাতি সভ্যতা ও আচার ব্যবহারে বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। কেবল গ্রীসদেশে সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রোম অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু কলাবিদ্যায়, সাহিত্যে ও দর্শনে রোম গ্রীসের পশ্চাৎপদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নিজ জাতীয় মহিমা ও কীর্ত্তি স্থাপনে অপারক হইলে গ্রীসের দোহাই দিয়া য়ুরোপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হন। প্রক্ষিপ্তবাদ ও হেলিনিক সভ্যতার উৎকর্ষবাদরূপ দুই ব্রহ্মাস্ত্র যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিয়া হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দুগৌরবের খর্ব্বতা সাধন করিতে তাঁহারা বিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের পুস্তক পাঠ করিলে তিনটী বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—প্রথম প্রক্ষিপ্তবাদ, দ্বিতীয় হেলিনিক সভ্যতায় উৎকর্ষবাদ, এবং তৃতীয় হিন্দুর কৃতিত্বের প্রাচীনতা গোপনে প্রচেষ্টা। আরও দেখিতে পাই, ক্রম বিকাশবাদরূপ ভূত তাঁহাদের ঘাড়ে বসিয়াছে। এক যুগে এবং এক দেশে বিভিন্ন মত প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে। ভারতের ন্যায় বৃহৎ ভূমিখণ্ডের এক অংশে স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত উচ্চভাবপূর্ণ গ্রন্থও বিরচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপর অংশে কিংবা সেই স্থানেই আপাত প্রতীয়মান প্রাচীনভাবসম্বলিত গ্রন্থ লিখিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুনরায় এক পুস্তকের এক অংশ গ্রহণ করিব এবং অপর অংশকে আধুনিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিব, ইহাই যা বিরূপ ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের পথা বুঝিতে [illegible]। ইহা সুবিধাবাদ, জাতীয় আর কিছুই

নহে। স্বকীয় মত স্থাপন করিবার জন্য কিংবা বিদ্বেষভাব বশতঃ কোনও পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া অপর সমস্ত স্থানে প্রক্ষিপ্ত বাদের আইন জারি করিয়া এক তরফা বিচার করা ইতিহাসক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড তামাসা মাত্র।

রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারতকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত রামায়ণের গল্পাংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু কালপরম্পরাগত ভারতীয় মত, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের সাক্ষ্য এবং দুই-খানি কাব্যগ্রন্থের রচনার প্রভেদ তাঁহাদের এই উক্তির অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, উত্তর ভারতের আর্য্যগণ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যে হিন্দু সভ্যতা প্রচারের কাহিনী রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে। তখন আর্য্য-সভ্যতা-সূর্য্য কেবল মাত্র দাক্ষিণাত্যগগনে তাহার ক্ষীণ রশ্মিজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রামায়ণের কবি চরিত্র অঙ্কণে নিপুণতা দেখাইয়াছেন বলিয়া উহা পরবর্ত্তী যুগে অধিক লাভ করিয়াছিল বলিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না; কিন্তু মহা-ভারতের কবিও চরিত্র অঙ্কণে অল্প নিপুণতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতে এক কৃষ্ণচরিত্রই কবির অশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রথমে উত্তর ভারতে আর্য্যক্ষমতা দৃঢ় না হইলে দাক্ষিণাত্যে আর্য্য অভিযান কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

কিন্তু রামায়ণে দাক্ষিণাত্যের ভৌগলিক বৃত্তান্তের অস্পষ্টতা ও অভাব দর্শন এবং মহাভারতে দাক্ষিণাত্যের যথাযথ বর্ণনা দেখিলে রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ থাকে না, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামায়ণে আর্য্য শৌর্য্য বীর্য্যের অভাব উপলব্ধি করেন। তিনি মহাভারতের চরিত্রাবলীতে সমধিক বীর্য্যবত্তা রণোন্মাদনা প্রভৃতি সদ্গুণ এবং সামাজিক আচার ব্যবহারে সরলতা ও প্রাচীনতা দেখিয়া রামায়ণের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ ধারণা তাঁহার ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। মহাভারতে রামায়ণের গল্প প্রক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রক্ষিপ্ত বাদ কেবল মহাভারত সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু রামায়ণ সম্বন্ধে নহে, ইহা যেন একটা 'গাঁজুরি' কথা। [illegible] ঈশ্বরের স্বর্গ, অন্যায় সাধনের বৃদ্ধাভিযানের সহিত ইউরিপিদিসের হেলেনকে উদ্ধার

করিবার জন্য টুয় নগরী ও যুদ্ধযাত্রার সদৃশ্য দেখিয়া ওদেসর সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব দর্শন করিয়াছেন। ওদেসর সাহিত্যে হেলেনিক চিন্তা ও রামায়ণে ভারতের সমস্ত ব্যাপারে হেলেনিক প্রভাব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে নাটক, তাপত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, কাব্যে ও দর্শনে গ্রীসের নিকট ভারতের কিছুই নাই। সমস্তই তাহার ধার করা ছিল। ম্যাকডোনেল সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মহাভারতের তৃতীয় পর্বে একটী ছাপা রামায়ণের সপ্তম কাণ্ডের দুইটী লাইনের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়, এবং এই দুই লাইনকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, অতএব মহাভারতও পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বে রামায়ণ একখানি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত ছিল। এই সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় মতবাদের ঐক্য আছে। অধ্যাপক হিলেব্রান্ট বলেন যে, অযোধ্যা ২০০০ পূঃ খৃঃ হইতে ১৫০০ পূঃ খৃঃ মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, ইক্ষ্বাকু হইতে রাম পর্যন্ত সপ্তত্রিংশ পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার মত গ্রহণ করিলে আমরা বলিতে পারি যে, খৃঃ পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৭০০) শ্রীরামচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। রামের জীবন কাহিনী রামায়ণ রচিত হইবার বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ ভাষা, কারণ বাল্মীকি রচিত সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধ কাণ্ডের কিছুংশ ব্যতীত সমস্ত রামায়ণ বাল্মীকির শিষ্য ও পুত্র লবকুশ সংযোগে গান করিয়াছিলেন। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, রামায়ণ রামের জীবদ্দশায় ১৭০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছিল।

কোসম্বীর মতে ব্যাসদেব খৃঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে কেহ ব্যাসদেবই মহাভারতের কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মহাভারত বেদসঙ্কলনের সমকালীন, অতএব রামায়ণের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দশরথ জাতক রামায়ণের গল্প বিকৃত ভাবে ধারণ করিয়াছে। যদি রামায়ণের ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পূর্ণ কিম্বা পঞ্চম খৃঃ পূঃ উহার বর্তমান আকার ধারণ করিত তাহা হইলে উক্ত জাতকের লেখক তাহার অঙ্গ ভঙ্গ দান করিতে সাহস পাইতেন না। এই জন্য তাঁহারা বলেন যে, দশরথ-জাতক রূপ বীজ কোন সহকারে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উক্ত বিশিষ্ট মহাকাব্যের ভাবকারি সিদ্ধান্ত, নবম তাকারে মহিমান্বিত পল্লবিত হইয়া রামায়ণের পরিণত অবস্থাতে এবং তাহার নিজ স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগণ যুক্তি তর্কে পরাজিত হইয়া নিজ মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। [illegible]

প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ কি বলিতে পারা যায় না। ঐ জাতকের লোক সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিম্বা রামায়ণের গল্প সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমাত্মক ধারণাও থাকিতে পারে, জাতকগল্পগুলি বিশ্বাস্য বলিয়া কোনো দিনও মনে হয় না। গল্পাংশে জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐ গল্পগুলি বিবৃত হইত অবশ্য উহারা তৎকালিক সামাজিক আকারের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। দশরথ জাতকের যে রামায়ণের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়া বিকৃতি ঘটান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের শিবি রাজার উপাখ্যান যে বৌদ্ধভাবাপন্ন, হিন্দুভাবাপন্ন নহে, ইহাই বা কিরূপে বলিতে পারা যায়? অত্যাচারিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা কিম্বা পরোপকারার্থে দেহের স্বার্থ ত্যাগ করা বৌদ্ধগণের যে একচেটিয়া সম্পত্তি, আর হিন্দুগণের নহে, এই কথা বলিতে একটা দুর্বল যুক্তির অবতারণা করিতে হয়। চিত্তবিনোদন দ্বারা নিরক্ষর বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার প্রথা অপরিচিত ছিল না। এইজন্য বোধ হয় মহাভারতের অতি গল্পাংশের অবতারণা করিয়া লোকশিক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধগণ সেই চিত্তাকর্ষিত ও সুশিক্ষিত পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। গল্পাংশে যে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। দেবদত্তজাতকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ গল্পটি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কণ্ঠহারি-জাতকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পরিণয়ের সামান্য আভাষ আছে। জাতকের লেখকগণ নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছা মতন সময়ের পরিবর্ত্তন বা আধিক্য ভাবগুলি করিয়াছিলেন, বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। বৌদ্ধজাতক সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব্বে রামায়ণ মহাভারত জনসমাজে বিদিত ছিল এবং ঐ ভাবের বহু পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। দশরথ জাতকের লেখকের ত্রুটি কিম্বা অজ্ঞতার জন্য রামায়ণের ভ্রান্তিমূলক বলিতে পারা যায় না।

ঐ গল্পের দুই একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহারা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া জাতকের ইতিহাসক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা ঐতিহাসিক কথা বলিতে চাহেন, এবং তাহাদের প্রকৃত করিয়া তাহারা গবেষণার যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা, যত্ন ও শ্রম নিষ্ফল হয় নাই, কিন্তু

ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত হইয়া সমাজে বদ্ধমূল করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অচিরে অবতীর্ণ হইয়া যথার্থ জ্ঞান-প্রচারের পন্থা মুক্ত করিয়া দিবেন। ইহাতে যে শুধু নিজ দেশের উপকার করা হইবে, তাহা নহে, পরন্তু সমস্ত জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ছুটী

—০—

সকল কাজ আজ চুকিয়ে দেছি,
এখন আমার ছুটীর পালা,
ঘরের কোণে বসে' বসে'
গাঁথব শুধু পূজার মালা!
এতদিন ত হাটের মাঝে
ফিরিয়াছি সকাল সাঁঝে
কি ফল আজি ফলুল তাহে?
বাড়ায়েচে কেবল জ্বালা!
আমার যাহা প্রাপ্য কড়ি,
তাহাই আদায় হয় না হরি,
পরের কাছে "ভিক্ষে" মেগে
কে তুলেচে সৌধশালা?
ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে,
মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জিয়ে,
চাইনা আমি সাজাইতে
তোষামোদের অর্ঘ্য ডালা।
আমার ভাগ্য-নেমি প্রভু,
হয়ি নাহি ফিরাও কভু,—
তবু তোমার ধ্যানে মজে'
আঁধার মাঝে হেরব আলা!

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ

ভারতীয় নাটকে গ্রীক্ প্রভাব।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে গ্রীক্ নাট্যকলার ছায়া পতিত হইয়াছিল। গ্রীক্ নাটকের আদর্শে ভারতীয় নাটক রচিত হইয়াছিল। একটু বিচার করিয়া দেখিলে এই সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। গ্রীক্ নাটক কেন, অপর কোন প্রাচীন জাতির নাট্যসাহিত্য হইতে ভারতীয় সংস্কৃত নাটক কোনরূপ সাহায্য পায় নাই। পারস্য, আরব ও মিশর দেশের সাহিত্যে নাটকের অভাব সুস্পষ্ট। চীন সাহিত্য-নাটকের কোন প্রভাব ভারতীয় নাটকের উপর পতিত হয় নাই, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানগণও বিজিত জাতীয় সাহিত্যকে কিছু দান করেন নাই, কারণ এইরূপ আদান-প্রদান ও রসরস ইসলাম ধর্ম্মের শিক্ষাবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। ইংরাজী ও অন্যান্য নাট্য সাহিত্য জন্মিবার পূর্ব্বেই ভারতীয় নাট্যকলা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া অবনতি লাভ করিয়াছিল। তবে বর্ত্তমানকালে বঙ্গের ও ভারতে। অন্যান্য প্রদেশের নাটক যে ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক, গ্রীক্ নাট্য কলা সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মণিবার সেকেন্দর সাহের ভারত অভিযানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় নাটক ছিল, তাহা সন্দিগ্ধ সত্যরূপে গৃহীত হইলেও উহার অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। রামায়ণ মহাভারত রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বেদগানে মুখরিত হইত। বেদের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই, কিন্তু বেদকে মানবজাতির আদি ভাষা, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বেদমন্ত্র গান রচিত, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন না উপলক্ষে বেদগান কোরাসে গীত হইত বলিয়া অনুমিত হয়। তৎপর কালক্রমে দেবদেবীগণের ক্রিয়া ও মহিমা সঙ্গীতে এবং ক্রমশঃ এক বিশেষ অনৈসর্গিক ব্যাপার কথোপকথনচ্ছলে বিবৃত হইত। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আট শতাব্দীর পূর্ব্বের ভারতীয় ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। কোন কোন ঐতিহাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিভাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সাধুনিক নাটকের গ্রন্থের প্রণালী

নাটকের ধরণ ও ভাব বহু অনুকরণ করিতেন বলিয়া বোধ হয়না। পণ্ডিতগণের মতে দুইটী কারণবশতঃ হিন্দু নাটক গ্রীক্‌নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ গ্রীক্ নাটকের একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ইস্‌কিলাসের (প্রায় ৫০৫ পূঃ খৃঃ) পূর্ব্ব হইতেই আলেকজান্দারের সময় পর্য্যন্ত গ্রীক্ নাটকের উন্নতির কাল। ৪৯৯ হইতে ৪০৫ পূ. খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইস্‌কিলাস সফোক্লিস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই অসাধারণ বাগ্‌শক্তিসম্পন্ন মনীষিগণের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নাটক দর্শকবৃন্দের বুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ। কিন্তু আলেকজান্দার কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীক্ রাজগণ ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, যদিও আলেকজান্দারের পূর্ব্বে গ্রীসে নাট্যকলার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং যদিও তাঁহার ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকভাষা কতকটা পরিমাণে অন্ততঃ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি তদ্দ্বারা ভারতীয় নাটক যে কোনরূপে উপকৃত হইয়াছিল কিম্বা গ্রীক্ নাটকের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দুই একটা বিষয়ের এক্‌টু আধ্‌টু মিল থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা ইচ্ছাকৃত নহে কিম্বা অনুকরণ বৃত্তির ফল বলিয়া বোধ হয় না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে ভারতীয় ও গ্রীক্ নাটকের যে ব্যবধান আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। প্রথমতঃ গ্রীক্ নাটকের গঠন ও আকার। গ্রীক্ নাটকের সহিত জাতীয় ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। গ্রীক্ নাটকরূপ মহামহীরুহের দুই প্রধান শাখা জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলে নিরন্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে ফিনিসিয়গণ কর্ত্তৃক গ্রীসে ডাইওনাসিয়াসের পূজা আনীত হইলে গ্রীক্ প্রমোদাত্মক নাটক ক্রমশঃ বিয়োগান্ত নাটককে অপসারিত করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত নাটক গ্রীক্ নাটকের ন্যায় দুই বিশেষভাগে বিভক্ত নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটকের আত্যন্তিক অভাব পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীক্ মিলনান্ত নাটক ও সংস্কৃত মিলনান্ত নাটকের মধ্যে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইংরাজী নাটকের বিশেষতঃ সেক্সপিয়রের মিলনান্ত নাটকের সহিত সংস্কৃত মিলনান্ত নাটকের আরও বেশী সাদৃশ্য বিদ্যমান। সংস্কৃত মিলনান্ত নাটক দেশ ও কালের নিয়মদ্বারা প্রতিবদ্ধ নহে। গ্রীক্ গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত। সংস্কৃত নাটকে

[illegible] সেক্সপীয়রের নাটকে Fool উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য দেখিয়া সেক্সপীয়র সংস্কৃত নাটকের দ্বারা অবলম্বন ও অনুকরণে তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিলে বিদগ্ধসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

ওয়েবার সাহেব বলেন যে, ভারতীয় কামদেবের পতাকায় গ্রীক দেবতা ঈরসের ন্যায় মকরের ছবি অঙ্কিত হয় এবং ইহা রাজদরবারে গ্রীকগণিকাগণের প্রবেশের সূচনা। আলেক্‌জান্দারের পর দুই শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক্‌রাজগণ ব্যাক্‌ট্রিয়া, পঞ্জাব ও গুর্জ্জরদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। এবং নিশ্চয়ই তাঁহারা গ্রীকনাটক অভিনীত করিয়াছিলেন। এই অভিনয় দর্শনে ভারতবাসিগণকে প্রথমে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আরও দেখা যায় যে, সাগরের কন্যা যবনিকা নামে এখনও অভিহিত হয়। কিন্তু মকরের ছবি দেখিয়া এবং যবনিকা কথার ব্যবহার দেখিয়া ওয়েবার সাহেব একেবারে একটা মতকথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু আবার ওয়েবার সাহেবও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারতীয় নাটকের সহিত গ্রীকনাটকের কোন আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নাই। গ্রীকনাটক যে ভারতবর্ষে অভিনীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, ইহা ওয়েবার সাহেবের অনুমান। দুই একটা কথার ব্যবহার দেখিয়া ভারতীয় নাট্যকলাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রীক্‌নাট্যের অনুকরণ বলা, আর পাশ্চাত্য সাদৃশ্য দেখিয়া ইংরাজী নাটককে [illegible] অনুকরণে গঠিত বলা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

ভারতীয় নাট্য-সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহা জাতীয় নিজস্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সর্ব্ববিষয়ে গ্রীসের নিকট ভারতের ঋণের কথা বলিতে চাহেন। বিদেশী লেখকগণ একটা অন্ধ ধারণা বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ভারতবাসী কোন বিষয়ে বিদেশীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহায্য ব্যতিরেকে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না। তবে যেখানে ভারতীয় প্রতিভার শক্তি অব্যাহত এবং তাহা স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই, কেবল মাত্র সেইস্থলে তাঁহারা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহা স্বীকার করেন। ইতিহাস ও জাতীয় ভাষা প্রমাণ করিতেছে যে, বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় নাটক প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল এবং নানা রসে ভরপুর হইয়া এদেশবাসীকে বিদ্যা ও অপার আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

স্মৃতিস্তম্ভ।

—:*:—

(একটী ছোট গল্প)

সে অনেক দিনের কথা—আমি তখন রুশিয়ার ফরেষ্ট বিভাগে কাজ করি। সে দেশে ছোট ছোট ঘোড়ার টানা কিট্‌কার—চড়ে স্থান হ'তে স্থানান্তরে যাতায়াত করতুম। আমি ছিলাম প্রবাসী। কাজেই রুশিয়াদের কাছে আমার আদর যত্নের অভাব ছিল না। আমি চিরকাল শুনে আস্‌ছিলাম রুশিয়রা বড়ই বর্ব্বর স্বভাবের। প্রবাসীদের ওপর অত্যাচারের জন্য তাদের চিরকালের কলঙ্ক শুনতেও আমার বাকী ছিল না। কিন্তু সেখানে গিয়ে যেটী তাদের স্বভাব বলে শুনেছিলাম, সেটীর অভাব দেখে আমার আশ্চর্য্যের প্রভাবটা একটু বেড়ে উঠেছিল। ফরেষ্টারের কাজে আমাকে প্রায়ই আজ এখানে, কাল সেখানে ক'রতে হ'ত। সেই জন্য আমি রুশিয়দিগকে আপনার জন ব'লে মনে করতুম। তাদের সততা, আতিথেয়তা ও অনুগ্রহের ওপর আমার জীবন, সুখ ও চাকরী নির্ভর ক'রত।

কাজের জন্য যেতে যেতে পথে সন্ধ্যা হ'লে আমি কত দিন রুশিয়দের কুটীরে অতিথি হ'য়েছিলুম—তার মধ্যে এক জনের কথা আমার আজও মনে আছে। তার ঘরখানা ছিল মস্কো থেকে ব'তোরিনের পথে একখানি ছোট গাঁয়ের ভিতর। সেই রাস্তায় প্রথম প্রথম আমায় প্রায়ই চল্‌তে হ'ত। সেই বনখানার মালিক ছিল একজন কাঠুরিয়া। বনে বনে ঘুরে গাছ কেটে সহরে বেচে আসা ছিল তার কাজ। ফরেষ্টারের কাজে বনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হ'ত। আমরা দু'জনে অনেক কথাবার্ত্তাও কইতুম। আমি চাকরীর জন্য অনেক দূর থেকে প্রবাসে এসেছি ব'লে সে আমায় খুব তারিফও ক'রত। এক দিন আমরা দুজনেই এক বনের মধ্যে গিয়েছিলাম—সে তার কাঠ কাটার কাজে আর আমি আমার মাপ-যোগের কাজে। হঠাৎ কোন দেশের একখানা কাল মেঘ এসে সন্ধ্যার অনেক আগেই সমস্ত আকাশখানাকে ঢেকে ফেল্লে। তারপর নিমিষের মধ্যে ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমি তখন আর কোন উপায় না দেখে ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে দিয়ে

সঙ্গেরে পথে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলাম। সেই কাঠুরিয়াও তার ছোট টাট্টুর পিঠে কাঠগুলি চাপিয়ে দিয়ে তারই এক পাশে কোন রকমে ব'সে আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে যেতে লাগল। খানিক পরে চারিদিক আঁধার হ'য়ে এল। তখন সে আমাকে বল্লে "বাবু আপনার আজ কোয়ার্টারে পৌঁছুতে অনেক দেরী হবে, আর খুব কষ্টও হবে। আপনি আমার কুটীরে আজ রাতটা কাটিয়ে যান। আমিও বেগতিক দেখে তার কুটীরে থাকতে রাজী হলুম।

আমরা দুজনে ভিজতে ভিজতে কুটীরের ভিতর ঢুকলাম। সে ডাকলে—মেরিয়া আলো নিয়ে এস; বাবু এসেছেন। আমি সেখানে দাঁড়ায়ে মাথা থেকে জল ঝেড়ে মুছ ছিলাম, এমন সময় দমকা বাতাসের মত একটী বালিকা এসে একটী আলো রেখে গেল। নিমেষের মধ্যে সেই ঝাপসা আলোতে বালিকার সৌন্দর্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম "এটী কি তোমার মেয়ে? সে আমাকে বল্লে "আমার আর কেউ নেই বাবু, এই আমার সব।" তারপর একটী কম্বলের ওপর রাতটী কোন রকমে কাটিয়া দিয়ে সকালে কাজে যাবার আয়োজন করছিলাম, এমন সময় কাঠুরিয়া এসে চা-কফি-কোকো-পানের জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রলে, আমি ধন্যবাদ দিয়ে বাধা দিতে গেলুম, তখন সে তার সেই ছোট মেয়েটির দোহাই দিয়ে বল্লে "বাবু মেরিয়া আপনার জন্য বিশেষ ক'রে তৈরী ক'রেছে।" তখন আমার আর না বলিবার সামর্থ্য রহিল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম, খানিক পরে বালিকা চায়ের বাটীটি রাখিয়া বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল। তার রূপ তার চাহনি সবই যেন বড় বেশী রকমের। আমার চোখ দুটো যেন কেমন এক রকম হয়ে গেল। বিদ্যুতের ক্ষণিক উজ্জ্বল আভা চোখে পড়বার পর যেমন চারিদিক অন্ধকার দেখায়, বালিকাটীর অন্তর্দ্ধানে আমিও সেইরূপ চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলুম। কাঠুরিয়ার ঘরে ভগবান্ এমন জিনিষও দিয়াছেন—তা ত জানতাম না ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লুম।

তারপর একদিন আমি সেখান থেকে বদলি হ'য়ে গেলুম। তিন বছরের মধ্যে আর সে পথে যাওয়া আসা করিনি বা সেই কুটীর ও কাঠুরিয়াকেও আর দেখিনি। কিন্তু সেই মেরিয়ার চা-দেওয়াটা স্বপ্নের মত ঝাপ্সা ঝাপ্সা আমার অনেকবার মনে পড়েছিল। তিন বছর পরে হঠাৎ আমার একবার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি চাকরী ছেড়ে দেবার মতলব করি। কিছুদিন পরে সেরে উঠেই কাজে ইস্তফা দিতে মস্কোর হেড আফিসে গেলাম। চাকরী ছেড়ে

আসবার সময় কাঠুরিয়ার বাড়ী শেষ দেখা দিতে গিয়াছিলাম। সে তখন কাজে বাহির হয় নি। সে আমাকে দেখেই চিনতে পারলে, কিন্তু আমার তাকে চিনতে একটু দেরী প'ড়েছিল। তার জোয়ান শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়াছিল, গলার স্বর চাপা হ'য়েছিল আর মুখে যেন কি একটা বিষাদ মাখান ছিল। সেইজন্য তাকে আমি সহসা চিনতে পারিনি। খানিক আলাপের পর আমি তাকে মেরিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলুম। সে যেন চমকে উঠল, সে যেন হতভম্বের মত নির্ব্বাক হ'য়ে গেল। অনেক প্রশ্নের পর তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা চাপা গলায় সে বল্‌তে লাগল।

"আর বছরও বাৎসরিক উৎসবের দিনে সনাতন প্রথামত অনেক রুশিয়া যুবক এই গ্রামে জুটেছিল। তাদের মধ্যে একজন জোয়ান দোহারা গোছের কশাক যুবক উৎসবের ক'দিন আমার বাড়ীতে ছিল। হঠাৎ একদিন তার অসুখ হ'ল। আমার মেরিয়া তার খুব সেবা শুশ্রূষা ক'রিলে। জোয়ান যুবক দুদিন পরেই চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। তারপর সে যেমনি চ'লে যাবে, আমি সে দিন কাজে বেরিয়েছিলাম; বাড়ীতে ছিল শুধু মেরিয়া। যাবার সময় যুবক আমার সঙ্গে তাকে দেখা করিয়ে দিতে বল্‌লে। মেরিয়া সরলস্বভাবা অত না বুঝে তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরুল—উদ্দেশ্য পথে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। কিন্তু সেই কশাক যুবক তাকে ভুলিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। আমি সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যার সময় কুটীরে এসে দেখি, আমার আলো করা কুটীর আঁধার হ'য়ে আছে। আমি আমার সেই অমূল্য নিধিটীকে দেখতে না পেয়ে মণিহারা ফণীর মত পথে পথে ছুটে বেড়াতে লাগলুম। অনেক খোঁজ করে দেখলুম যে এক বড়লোকের ছেলে আরও শুনলুম সে আমার একমাত্র হৃদয়ের ধন মেরিয়াকে বিয়ে ক'রেছে।

আমি মেরিয়াকে কেড়ে আনবার খুব চেষ্টা ক'রেছিলাম, কিন্তু শেষে সকল চেষ্টা বিফল ক'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কুটীরে ফিরে এলুম।

অনেক দিন পরে সেই যুবক একদিন মেরিয়াকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল—আমিও কপালক্রমে সেদিন সেই দিকেই গিয়েছিলাম। মেরিয়াকে দেখেই আমি কেঁদে উঠলুম। সেও আমাকে দেখে আমার পায়ে লুটে প'ড়ল। কশাক-যুবক এই ব্যাপার দেখে ছুটে এসে মেরিয়াকে হাত ধরে তুলে আমার কাঁধে ছোরা বসিয়ে দিলে।" এই ব'লে সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রলে। তারপর সে তার চোখদুটী ক্ষীণ আলোর দিকে তুলে আবার ব'লতে আরম্ভ ক'রলে

আমার রক্ত পড়াতে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়াছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পর দেখলুম আমি আমার কুটীরে শুয়ে আছি। কে রেখে গেল তা ব'লতে পারিনা। ...ন পাই নি। তার কাছে সব শুনে আমার মনটা কেমন উ ' হ'য়ে গে ..। তারপর বুড়োকে অনেক আশ্বাস দিয়ে দেশে ফিরে এলাম।

অনেকদিন পরে আবার একবার মস্কোতে গিয়াছিলাম। এবারও বুড়োর বাড়ী যেতে ভুলিনি। গিয়ে দেখলুম সেখানে মেরিয়াও নাই, কাঠুরিয়াও নেই, সে স্থানে বুড়োর কুটীরখানি ছিল। গ্রামের লোকেদের কাছে জানলুম, কাঠুরিয়া মারা গেলে মেরিয়া তার বাপের একটী স্মৃতিস্তম্ভ ক'রে দিয়েছে আর মাঝে মাঝে এসে তার বড় কালো কালো চোখদুটীর জলে তার বাপের স্মৃতিস্তম্ভটী ভরিয়ে দিয়ে যায়।

আমিও কাঠুরিয়ার স্মৃতিস্তম্ভের উপর আমার চোখের জল ফেলুম; কারণ তাতে সে মেরিয়ার অন্তরের শোক নিবৃত্তি আছে। তারপর বিষণ্ণমুখে চির-দিনের মত মস্কোথেকে বিদায় নিলুম! আর কখনও মস্কোও যাইনি।

শ্রীআশুতোষ পালুলি।

বৃন্দাবন

কোথা সেই বৃন্দাবন—বৈজয়ন্ত ধাম?
কোথা সেই নীপ-তলে মুরলীর তান?
কোথা সেই কল-কল যমুনার জল?
কোথা সেই জল-কেলি? রাধিকার মান?
কোথা সেই গোপাঙ্গনা সরম-চকিতা?
কোথা-সেই বংশীরবে যমুনা উজান?
কোথা সেই কুঞ্জবন, কোথা সে' গোধন?
কোথা সেই হোরি খেলা, গোপিকার গান?
কোথা সে' রাখাল-রাজ যশোদা-দুলাল?
ননীচুরি, বংশী-ধ্বনি আছে কি এখন?—
শ্যামের সে' কুঞ্জ-বনে আসিয়াছে গান,
সাধের গোকুল আজ বিষাদে মগন।
আজি তব দশা হেরি বিস্ময়ে ভাবিছে মন।
প্রতিজ্ঞা * ভুলিয়া কালা ছাড়ি'গেছে বৃন্দাবন!!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন—"বিকাশ সম্পাদক

* "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

"ঐ খানে দাঁড়ায়ে থাক।"

ঐখানে—ঐ দূরে কুঞ্জদ্বারের বাহিরে,—আমাদের জাতিগত বিশিষ্টতার গণ্ডীর বাহিরে,—আমাদের আয়তনের সীমান্তের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাক; সাবধান আর ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিও না। এতদিন বুঝি নাই, চিনি নাই, তোমার প্রকৃত পরিচয় পাই নাই; তাই তোমার প্রেমের আহ্বানে,—তোমার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝঙ্কারে মৃগের ন্যায় আত্মহারা হইয়া তোমাকে আমাদের বিশিষ্টতার গণ্ডীর ভিতরে আসিতে দিয়াছিলাম, আমাদের বুকের ও প্রাণের কুঞ্জকুটিরে তোমাকে বসিতে দিয়াছিলাম। তাহার ফলে আমাদের ইহকাল নষ্ট হইয়াছে,—ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কারিগরী-হুনরী, ধন দৌলত, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, বিলাস, ব্যসন-ভূষণ—ঐহিকের শ্লাঘার ও সুখের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে—চূর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যে পরকাল আমাদেরই কেবল অনুভূতিগম্য বিষয় ছিল, যাহার দিকে তাকাইয়া আমরা হেলায় ইহকালকে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, আমাদের সেই আশা-সুখের, তৃপ্তি-তুষ্টির, স্থিতি-শান্তির পরলোক,—অনন্ত-অজ্ঞেয়-অসীম পরকালও এখন আমাদের দৃষ্টিগত নহে; তাহাকে যেন আর আমরা ঠিকমত তাকাইয়া দেখিতে পারি না। ইহকাল নষ্ট হইলে আমাদের থাকে কি? তোমার সান্নিধ্যে, তোমার সহচর্য্যে, তোমার অনুচিকীর্ষায় আমরা অধিকতর পরাধীন হইয়াছি। যে হিন্দু

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"

বলিয়া সগর্ব্বে বাহ্বাস্ফোট করিত, বসন-ভূষণ, সাজ-পরিচ্ছদের কোন ধার ধারিত না, পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বরাট্ হইয়া জগতে বিচরণ করিত,—সেই হিন্দু এখন বসন-ভূষণের দাস হইয়াছে, পোষাক পরিচ্ছদের পরাধীন হইয়াছে,—সেই হিন্দু অনুচিকীর্ষার বশে এখন লম্বশাটপটাবৃত কাপুড়ে বাবু হইয়াছে! যে হিন্দু দম্ভ করিয়া বলিতেন যে,—

'কন্তী ধী ঘনা,
কন্তী মুষ্টি ভয় চনা,
কন্তী চনা ভি মনা।'

অর্থাৎ যখন যাহা পাই, তখন তাহা খাই, ঘী পাইলে সানন্দে ঘৃত ভোজন করি, আবার তাহার পরিবর্ত্তে এক মুষ্টি ছোলা পাইলে, তাহা চিবাইয়া সানন্দে দিন যাপন করি, বিধাতার বিধানে যদি সে মুষ্টিমেয় চনাও না পাই, তাহা হইলে তেমনই আনন্দে উপবাসে দিন যাপন করি,—সেই হিন্দু ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজ সাজিয়া প্রথম প্রভাতে শয্যায় শায়িত থাকিয়া কাককুলের কা-কা রবের সঙ্গে চা-চা রব করিতে থাকে, দিনমানের মধ্যে পাঁচবার ভোজন করিয়াও যাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না,—সেই হিন্দুর ইহকালই বা কোথায়, পরকালই বা কেমন? যে হিন্দু একদিন জগন্ময় করিয়া দিয়াছিল,

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ
কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥"

যে ত্রিগুণাতীত সত্ত্বরজঃতমের কোন ধারই ধারে না, তাহার পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কেমন? সেই তোমার সাহচর্য্যের দোষে, ভোগার অনুচিকীর্ষার প্রভাবে অশনে-বসনে, পান-ভোজনে, চলনে বলনে জীবনসামান্য সকল ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তোমাদের দাসানুদাস হইয়াছে। আজ হিন্দু ক্যাসানের দাস, বিচারালয়ে Precedent বা পূর্ব্ব ব্যবহারের দাস, সমাজে Etiquettesএর দাস, ভোজনে পঙ্‌ক্তির দাস,—উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, শয়নে, স্বপনে, বসনে, ব্যসনে, গৃহে, বাহিরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাজদ্বারে, মহাশ্মশানে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বব্যাপারে তোমার ভাবভঙ্গীর ও রীতি-পদ্ধতির গোলাম! এত দাসত্ব—এমন পরমুখপ্রেক্ষিতা, পরানুবর্ত্তিতা, পরম্পরাবশ্যতা—আমরা ভারতের হিন্দু কোন কালে কোন যুগে, কোন বিদেশীর বিজেতার অধীনে থাকিয়া ভোগ করি নাই। আমাদের সাধু সন্ন্যাসী, সিদ্ধ মহাত্মা, সকলেই পূর্ব্বে নিজ নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, আসন ছাড়িয়া কাহারও হুকুমে এক পদও অগ্রসর হইতেন না; আমাদের গৃহস্থ হিন্দু পূর্ব্বে পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া বারো মাসে তেরটা পার্ব্বণের উল্লাস আনন্দে মগ্ন থাকিতেন, কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর থাকিতেন, কখনও নিজের গণ্ডী কাটিয়া রাজার আয়তনে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিতেন না। আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তুষ্ট ছিলাম, হাজার বৎসর কাল খড়ম ছাড়িয়া বিনামা ব্যবহার করি নাই, উত্তরীয় এবং শাল-কম্বল ছাড়িয়া দর্জ্জির সেলাই করা কোট-পাৎলুন পরিধান করি নাই, গাড়ু গামোছাই আমাদের সম্বল ছিল, নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়া ভারতবর্ষের সকল দূর-দূরান্তরের

তাই ভ্রমণ করিতাম; আমরা স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু জাতি ছিলাম। মোগলের প্রজা হইলেও মোগলের দাসানুদাস নফরনবীশ ভাড় ছিলাম না। কেবল তোমার প্রেমে আত্মহারা হইয়া পূর্ব্বাপর বিবেচনাবর্জ্জিত হইয়া আজ আমরা ভিতরে-বাহিরে, ঐহিকে-পারত্রিকে তোমার দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছি। তাই কাতর কণ্ঠে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিয়া তোমাকে বলিতেছি,—

"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক,
রাইয়ের কুঞ্জে আর এস না!"

ইহাই আমাদের অসহযোগ, ইহাই আমাদের Non-co-operation, ইহাই আমাদের Boycott—ইহাই আমাদের তাহাই যাহার সাহায্যে আমাদের জাতিগত, ধর্ম্মগত ব্যাপার ও ব্যবহারগত আত্মরক্ষা করা চলে। যদি দেহবলে, বুদ্ধিবলে, প্রাণের বলে তোমার সমকক্ষ হইতাম, তাহা হইলে না হয় তোমার সাহচর্য্য করিয়া লাভালাভের খতিয়ান করিতাম; কিন্তু আমরা যে অতি দুর্ব্বল; তোমার সহিত সমকক্ষতা করিবার সামর্থ্য আমাদের যে একটুকুও নাই। কাজেই শিশু যেমন ভীত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় মায়ের কুক্ষিগত স্থালীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, আমরাও তেমনি আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের, পল্লীজীবনের কমঠ আবরণে আত্মগোপন করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে চাহি। সে অবসরটুকু হইতে তুমি আমাদের বঞ্চনা করিতে কেন চাও? আমরা বাঁচিতে চাই, হিন্দুর ছেলে হইয়া হিন্দুয়ানীসমেত হইয়া আমাদের জাতিগত ও দেশগত বিশিষ্টতার আবরণে আবৃত থাকিয়া আমরা বাঁচিতে চাহি। তুমি বাঁচিতে দিবে না কেন? আমরা রাজনীতি বুঝি না,—জানি না,—কেবল চাহি আমার বিনষ্ট সনাতন পল্লীবাস, চাহি আমার অপহৃত শিল্পকলা, চাহি আমাদের অবহেলায় উপেক্ষিত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। দেড়শত বৎসরকাল তোমার সহিত প্রেম করিয়া—

"রাজার নন্দিনী মোরা,
হয়েছি ব্রজের পথের
কাঙ্গালিনী।"

আর কাঙ্গাল থাকিতে চাহি না, আর ব্রজের পথে পথে নিঃসম্বল হইয়া ঘুরিয়া-ফিরিতে পারি না। তাই প্রথম প্রভাতে আমি গোষ্ঠে বলদেবের শ্যামা

শুনিয়া জাগরিত হইয়াছি, নয়নোন্মীলন করিয়া তোমাকে সুপ্তদ্বারে দেখিতে পাইয়া সভয়ে সকাতরে তোমাকে বলিতেছি—ঐখানেই দাঁড়ায়ে থাক, আর আগাইও না। দেবতা তুমি, তোমাকে দূর হইতেই নমস্কার করিতেছি। তোমার সহিত সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য—এই চারি মুক্তির কোন মুক্তিই প্রার্থনা করি না। বৈষ্ণব আমরা চিনি হইতে চাহি না, চিনি পাইতে চাহি—মুক্তি চাহি না—ভক্তিই চাহি। দেশভক্তি মাতৃভক্তি—বংশভক্তি—কুলভক্তি—কর্ম্মভক্তি, এই পাঁচভক্তি-সাধনা করিতে চাই। কাজেই বাধ্য হইয়া, অভাবে পড়িয়া, স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে অধীর হইয়া অতীতের পেবণে চূর্ণবৎ হইয়া বলিতে হইতেছে,

"যা' রে বিদেশী বঁধু,
আমি তোরে চাই না।"

যখন শতচেষ্টা করিয়াও তোমার অনুরূপ হইতে পারিলাম না, হিন্দুয়ানী ছাড়িয়া ইয়োরোপের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে পরিলাম না, সাহেবের খোলস পরিয়াও যখন শ্বেতাঙ্গের জাতিভুক্ত হইলাম না, সেনাপতি স্মাটস্‌ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া ভারতবাসীকে আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে বলে, যখন এই বন্ধুসরিৎরা ভারতভূমি ছাড়া আমাদের অন্যত্র আর জুড়াইবার স্থান নাই,—তখন ভারতবর্ষের প্রতি রেণুতে যে ভাব জড়ান—মাখান রহিয়াছে তাহাকে জীবনের সার সম্বল করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহি। বাপের বেটা হইয়া মায়ের ক্রোড় আলো করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি বলিয়াই বারে বারে ডাক দিয়া স্পষ্ট বলিতে হইতেছে—

"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক,
রায়ের কুঞ্জে আর
এস না।"

কর্ম্ম।

বাঃ—বেশ তোফা গঙ্গাজলী শাল!—অতি পুরাতন, সামগ্রী। অমন দৌড়দার হরিণা আর দেখি না, অমন কল্‌কা আঁচলা ও বিনাগুটের কাজও আর পাই না। এমনটী ইদানীং হইবার নহে,—হইতে পারে না। তবে উহা বহুকালের জীর্ণ, বড়ই অনাদরের সহিত উহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি উহাকে মেরামৎ করিয়া রাখিতে চাও। উহার যে বহুস্থান ফাসিয়া গিয়াছে—পচিয়া গলিয়া পড়িতেছে। তথাপি ঋযুকর্ম্ম রে ডাকিতেছ। পুরাতন সনাতন সামগ্রীর প্রতি এতটাই মায়া হইয়া থাকে।

মধ্যযুগের আচার্য্যপাদদিগের সময় হইতে,—রামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়ের কাল হইতে ভারতের হিন্দু অনবরত ঋজু কর্ম্মে মন দিয়াছে; ধর্ম্ম এবং সমাজকে ব্যাখ্যা ভাষ্য সাহায্যে ঋজু করিয়া নূতন ঢঙ্গে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে,—দেশ কাল পাত্রের অনুকূল করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছে। ঋজু করিতে করিতে, তাপ্পি দিতে দিতে হিন্দুয়ানী যেন বাঙ্গালার বৈষ্ণবের আলখেল্লার মত হইতেছে। কোথাও বা একটু বনাতের টুক্‌রা জুলতানী লোহিতাভা ফুটাইতেছে, কোথাও বা একটু অখণ্ডল কোমলতার বিস্তার করিয়া আছে, কোথাও বা একটু কিংখাব এক্‌টু বেনারসী শাটির টুক্‌রা ঝলমল করিতেছে, আর মাঝে মাঝে তেলাক্ত মেটেরঙের ছাকড়া ও কানী ঝুলিতেছে। অনবরত ও অবিশ্রান্ত ঋজু কর্ম্ম করিয়া হিন্দুয়ানীর গঙ্গাজলীশালের আসল তাকতা এবং হাজিয়া ও আঁটও এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন অবস্থাতেও আবার "ঋযুকর্ম্ম" রে ডাকিতেছ? হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্মেলন ঘটাইয়া, খণেকের জন্য খানা পিনার বন্দোবস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যের উৎকট "ছুৎমার্গের" অপসরণ চেষ্টা করিয়া আবার নূতন তাপ্পি চড়াইবার চেষ্টায় আছ। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ নিরীশ্বর-বাদকে কাটিয়া তবে যোড়া দিয়াছিলেন, রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যগণ তাহাতে ভক্তির ও ভাবের রিঠা চড়াইয়া উহাকে নিরাবিল করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আর তুমি মহাত্মা গান্ধি মহারাজ অতি মিহি সূচিকার্য্যের প্রভাবে তাহার উপর—হিন্দু-মুসলমান ভাবনিপর্য্যয়ের ঝাঁসা-ঝেড়া দিয়া

স্থানের উপর যেন লুভাতন্তুর তন্তু বিস্তার করিয়া নূতন তাপ্পি বসাইতে চাও? তাও কি হয়? ঐ শুন মৌলানা আবদুল বারি মোপলা উৎপীড়ন সম্বন্ধে কেমন অভিমত প্রকাশ করিতেছেন? তাহার প্রতিবাদ নায়ার মেনন মহাশয়গণ কেমন ভঙ্গীতে করিতেছেন? এমন ভাববিরোধের মধ্যে কি ঐক্যের চিক্কণ তন্তু চালান যায়? উহা হইবার নহে। মহাত্মন্—যদি চালিয়া সাজিতে পার ত সেই চেষ্টা কর—যদি নূতন তাঁতে নূতন আলোয়ান বয়ন করিতে পার ত তেমন বয়ন কর। আর ঋফুকর্ম্ম চলিবে না।

পলিটিক্সে ঋফু!

যেমন সমাজ ও ধর্ম্ম লইয়া ঋফুর চেষ্টা চলিতেছে তেমনই পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তাপ্পি দেওয়ার প্রযত্ন হইতেছে। মদরভ দল দোতর্ফা ঋফু করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। এক পক্ষে সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে গবরমেণ্টকে হাতে রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, মণ্টেগু-ম্যাঙ্গোর রসটুকু সবটাই নিজেরা চুষিয়া রাখিবেন বলিয়া উদ্যমশীল হইয়াছেন; অন্যদিকে গবরমেণ্টের ধর্ষণনীতির Repressive Policyর নিন্দা করিয়া, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বিবি বেসাণ্টকে ভোটে হারাইয়া লোকমতকে অনুকূল রাখিবার চাতুরী বিস্তার করা হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীত এক্ষেত্রে জোড়া দিবার পথা রাখেন নাই। রাজনীতিক জামেওয়ারের একখণ্ড লালে লাল হইয়া উঠিতেছে, অন্যখণ্ড শাদা ধব্‌ধবে আছে। জোড়া দিবে কেমন করিয়া? হয় এস্‌পার, নহেত ওস্‌পার অবলম্বন করিতেই হইবে। এই কয় দিন পূর্ব্বে তোমাদের মুখেই শুনিতেছিলাম যে, মহাত্মা গান্ধির দলের উপদ্রব অতি মাত্রায় বাড়িয়াছে; আর সহ্য হয় না, আর সহ্য করা চলে না। তোমার মিঃ এন, সরকার সাহেব, তোমার যমুনাদাস দ্বারকাদাস মহাশয় রোষকষায়িতলোচনে কংগ্রেস গান্ধির দলের বিভীষিকার বিরুদ্ধে কত চিঠিরাজীই না করিয়াছেন। গবরমেণ্ট সেই বিভীষিকা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ষণনীতি বা Repression আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আবার তোমরাই বলিতেছ ধর-পাকড়ের কল্যাণে অনেক উপদ্রব কমিয়াছে। যে রোগের যেমন ঔষধ, তাহা গবরমেণ্ট এবং পুলিশ ঠিকমত দিতেছেন। তবে আবার বলাহাবাদের কনফারেন্সে উহার প্রতিবাদ করিলে কেন? এমন মোটা ঋফুকর্ম্মের চেষ্টা কি এখন করিতে আছে? মোটা সেলাই যে এক নজরে ধরা পড়িবে! তাহার উপর গবরমেণ্টকে অনুকূল রাখিবার প্রয়াসে Civil dis-

obe dience বা আইন অমান্যের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কেবল কলমবাজীতে যাহার কুটাইতেছ! একবার দেশের জনসাধারণের সম্মুখীন হইয়া মেঠো বক্তৃতার খাড়া হইয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতে পার? এই তিন বৎসর ত কোন কাজ কর নাই, লোক বুদ্ধিকে পরহস্তগত করিয়া দিয়াছ। এখন Propaganda বা প্রচার কার্য্যের দোহাই দিলে ভবী ত ভুলবে না। এ ঋত্বিকর্ম্মও ধরা পড়িবে।

রাম বা রহিম।

আর রাম ও রহিমকে একাধারে ভজিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না। এখন হয় সোজা সুজি রাম ভজিতে হইবে, নহেত রহিমকে পাঁচ কুর্ণীষ করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। কেবল কথায় কেবল চিঠিবাজী করিয়া রহিম ভজা চলিবে না। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিয়া এলাহাবাদে যাতায়াত করিলে হইবে না, জেলে না নামিয়া সত্যাগ্রহের অনুকরণে কেবল আকাশে হাত পা ছুড়িলে কাজ হইবে না। পুরা দস্তুর গবরমেণ্টের পক্ষপাত করিতে হইবে, গবরমেণ্ট যাহা করিতেছেন এবং করিবেন, তাহা অবিচারিতচিত্তে সমর্থন করিতে হইবে, দেশের জনসাধারণকে গবরমেণ্টের অনুকূল করিয়া আনিতে হইবে। পারিবে কি? ইহা যদি না পার, তবে রহমতের পোষক হও, মহাত্মা গান্ধির দলভুক্ত হও, নন-কো-অপারেটার হও এবং অন্ধের ন্যায় অবিচারিতচিত্তে মহাত্মা গান্ধির উপদেশ অনুসারে কাজ কর। এখন দুই পক্ষই কর্ত্তাভজা, গণতন্ত্রের প্রভাব কোন দিকেই নাই। গবরমেণ্ট পক্ষে যেমন স্বৈরাচার—autocracy লাট বড়লাটের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট, তেমনই অপর পক্ষে কর্ত্তা—সর্ব্বেসর্ব্বা মহাত্মা গান্ধি। তিনি জেলে যাইতে বলিলে জেলে যাইতে হইবে, মরিতে বলিলে মরিতে হইবে। পারিবে কি? দুঃখ-কষ্ট পীড়ন-পেষণকে জীবনের অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে কি?

এই দুই কর্ম্মের এককর্ম্মও ঠিকমত করিতে পারিতেছ না বলিয়াই ঋত্বিক্-ওয়ালাকে রাচীর দরোজায় ডাক দিয়া আনা হইতেছে। আবার বলি—ইহা জগতের সন্ধিক্ষণ, এখন ঋত্বিকর্ম্মে কুলাইবে না। এখন মনে হয় পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। অথবা প্রাণ-পণ করিয়া গোটা পুরাতনকে রক্ষা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীও ঋত্বিকর্ম্ম করিবার জন্য বাস্ত, তাই তিনি মালবিজীয়ের বোম্বাইয়ের খিচুড়ী মজলিসে হাজির থাকিবার জন্য

অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে গবরমেণ্টও—বঙ্গলাট লর্ড রেডিঙ্গের গবরমেণ্টও যেন ঋক্‌কর্ম্মের অনুরাগী ; যদি উভয় পক্ষ স্ব স্ব মতে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিতেন, তাহা হইলে এমন ঋক্‌কর্ম্মে কেহই অনুরাগী হইতেন না ; এখন ঋক্‌কর্ম্মের সময় নহে,—ধর্ম্মে এবং সমাজে নহে, রাজনীতি ও পলিটিক্সে নহে। অথচ সবাই ঋক্‌কর্ম্মের জন্য ব্যস্ত। এই আজবকাণ্ড তোমরা কেহ লক্ষ্য করিতেছ কি ?

নববধূ

—:০:—

গগনের কোলে যেন শুক্ তারাটী,—
কাননের আধ' ফোটা যুঁইকলিটী।
দয়িতের সনে যবে প্রথম মিলন,—
সুধাময় হয় মনে তোমার বচন।
তুমি যেন প্রণয়ের পিক্-পাপিয়া,
মাতাইয়া তোল প্রাণ প্রেম্ ঢালিয়া।
জনকের গৃহে তুমি হরিণী পারা,
শ্বশুরের গৃহে তুমি সরমে সারা।
জননীর আঁচলের আদরিণী নিধি,
শাশুড়ীরে দেখে নাই ভয়ের অবধি।
ননদিনী বাঘিনীর ভয়ে তুমি ভীতা ;
লজ্জায় মরে যাও, লজ্জাবতী লতা।
দেবরের কাছে কও মন-খুলে-কথা,
ভাসুরের কাছে যেন স্নেহময়ী মাতা।
স্বামী পাশে বিরাজিছ সোহাগের লতিকা।
কবি-কাছে তুমি যে গো প্রেমে-ঢালা গীতিকা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব।

(প্রতি-উত্তর)

অবিনাশ বাবু সত্যই বলিয়াছেন যে, miocene বা মধ্যযুগে মানবের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ইনি কি অনুসন্ধান করিয়াছেন—সে মানব কিরূপ ছিল? সত্য বটে miocene যুগে পূর্ব্বপুরুষ (ancestral man Wallace) anthropoid apes বা 'বন-মানুষ' হইতে পৃথক্ হইয়াছিল—অর্থাৎ আকার প্রকারে বন মানুষের মত, কিন্তু বক্ষ-পঞ্জর সংখ্যায় ও দন্তবিন্যাসে 'মানবীয়' ছিল বলিয়া বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহারা 'মানব-জাতীয়' নামে অভিহিত হয়। বর্ণিত Dr. Dubois ও Piltdownএ প্রাপ্ত 'নর'-করোটী—যাহাদের বিষয় অবিনাশ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন—দেখিলে তাহারা আধুনিক মানব হইতে কতটা বিভিন্ন ও বন মানুষের সহিত কতটা সদৃশ বুঝিতে পারিবেন। ক্রমে Pliocene যুগে কিছু উন্নত হইয়াছিল ও বোধ হয় অগ্নি ব্যবহার শিখিয়াছিল; কিন্তু কোন ভাষা ছিল কি না এখনও স্থির হয় নাই। তাহাদের ব্যবহৃত 'প্রস্তরায়ুধ' দেখিয়া তাহাদের সভ্যতার চরম সীমা বুঝা যায়। অবিনাশ বাবু কি এই তথাকথিত 'মানবকে' বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি বৈদিক ঋষির কল্পনা করেন? 'আধুনিক মানব'ও ঋগ্বেদের 'দস্যু' নামে যাহারা অভিহিত হইত, তাহাদেরও বহু পূর্ব্বপুরুষ Quaternany age বা চতুর্থ যুগে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহাদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি দেখিয়া অনুমান করা যায়।

অবিনাশ বাবু কি ঋগ্বেদে Pliocene যুগের চিহ্ন, তখনকার অশ্ব-গবাদি গাইয়াছেন? কারণ আমি যতটা জ্ঞাত আছি, বৈদিক সাহিত্যে আধুনিক জীব-জন্তুরই উল্লেখ দেখা যায়, পর্ব্বসংস্থানও আধুনিক। কিন্তু Pliocene যুগে অশ্ব-গবাদি বিভিন্ন রূপের ও পর্ব্বসংস্থানও অন্যরূপ ছিল। হিমালয়ও বোধ হয় এই যুগে সাগর হইতে উত্থিত হয়। আমি ভূ-তত্ত্ববিদ্ নাই, আশা করি, কোন ভূ-বেত্তা এ বিষয় মীমাংসা করিবেন।

মানবের জন্ম আমি প্রায় দশলক্ষ বৎসর ধরিয়াছি, তাহা মোটামুটি অর্থাৎ

Ancient remains of man—Hrdlick

উহার কম বেশীও হইতে পারে। Miocene or Pliocene যুগের 'মানবে'র করোটী দেখিলে অনেক কষ্টে বুঝা যায় তাহারা বনমানুষ নহে। অবিনাশ বাবুর উল্লিখিত Dr. Dubois সম্বন্ধে Dr. A. Hrdlicka * বলেন 'While Dubois and other scientific men regard the Pithecanthropus (অর্থাৎ অবিনাশ বাবুর উল্লিখিত করোটী) remains as all belonging to the same skeleton, as dating chronologically from the latest tertiary or the earliest phase of Quaternary period and as representing a true intermediary form between the 'anthropoid apes' and man, others have expressed double as to whether the four bones belong to the same form or they consider the age of the remains, though no doubt early Quaternary, to be less than that estimated by Dubois; and finally some incline to regard the remains as those of early man rather than an intermediary being, while still others consider that they represent merely a supirior extinct form of ape. † আমি সকল মত তুলিয়া দিলাম না, অবিনাশ বাবু এই প্রবন্ধটি পড়িলে উপকৃত হইবেন।

অবিনাশ বাবুর অপর উল্লিখিত করোটী সম্বন্ধে Prof. W. Boyd Dawkins সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহা Pleistocene and later Strata ‡ পূর্ব্বে হইতে পারে না, বরং পরে সম্ভব।§

এই Piltdown চোয়ালের সহিত গরিলা ও মানবের চোয়ালের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এ মানব আধুনিক মানব ও গরিলা কাহার সহিত তাহার সাদৃশ্য ছিল ও বৈদিক ঋষিদের আকার এরূপ সম্ভব কি না (চিত্র)

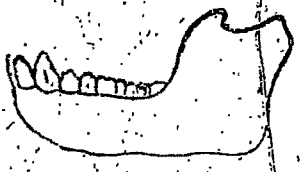

(ক) গরিলার চোয়াল।

* Ancient remains of man.—Smithsman report, 1913.
† Ancient remains of man.—পৃঃ ৪৯৭-৮।
‡ Ancient remains of man.—পৃঃ ৫০৯।
§ As to the age of the remains it can not be earlier than Pleistocene and later strata.

(খ) Piltdown চোয়াল।

(গ) মানবের চোয়াল।

(After A. Smith-wood ward.)

অবিনাশ বাবু যে Pleistocene যুগের 'Bismark-brain'যুক্ত মানবের কথা বলিয়াছেন ও তাহাদের 'মানব-সভ্যতার বিলক্ষণ উন্নতির' সন্দেহ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারা Dr. Boule এর কথিত Homo-Neanderthalensis নামক মানব, কারণ তাহাদের করোটীর ভিতরের মাপ ১৬০০ c. c. হইতে ১৭০০ c. c. হইত। সচরাচর মানবের করোটীর মাপ ১৫০০ c. c. হয়, সুতরাং তাহারাই Bismark-brainযুক্ত মানব মনে করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের তথাকথিত সভ্যতার বৈজ্ঞানিক মূল্য কত জানি না, কারণ Dr. Hrdlicka ইহাদের সম্বন্ধে বলেন "This অর্থাৎ বড় করোটী' indicates not necessarily a 'superior brain', but rather one sub-serving so largely developed organs and powerful musculature. *

বৈজ্ঞানিকেরা মানবের জন্ম তৃতীয় যুগে ধরিলেও যথার্থ আধুনিক মানবের সন্ধান অনেক পরে ধরেন। বেদের আচার ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, তখনকার ঋষিরা ও দস্যুরা আধুনিক (man as holi to-day) মানব ছিলেন। ইহাদের সম্ভাবনা ৮০০০।১০০০০ বৎসর পূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। আমি অবিনাশ বাবুকে Smithsman report. 1913এ উদ্ধৃত 'ancient remains of man' পড়িতে অনুরোধ করি, তিনি দেখিবেন যে, "* * * after the last glacial re-cession some eight thousand or more

* Ancient remains of man. p. 641.

years ago, man was already physically much like he is to-day." *

বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিম্নে যখন সমুদ্র বিরাজ করিত, সে কোন্ যুগের কথা Col. Burrad, Lord Kelvinএর মতে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা প্রায় ৩০০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভব। † পৃথিবীর যে সর্ব্ব নিম্ন স্তরে জীবের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা ৩৪ মাইল এখনকার ভূমি হইতে নীচে গণিতেরা ‡ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা প্রায় ৫০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বের স্তর, সুতরাং তখন প্রথম জীবের জন্ম হয়। মানব পৃথিবীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং বিন্ধ্যগিরির সাগর অনমন মানব সম্মুখে হওয়া সম্ভব নহে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব যেত বেশী প্রমাণিত হয়, ততই আমাদের গর্ব্বের বিষয়। অবিনাশ বাবু যদি তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু তাঁহার প্রমাণগুলি ভূ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব ও জ্যোতিষ দ্বারা প্রথমে পরীক্ষা করিয়া তবে প্রচার করিবেন, কেবল কল্পনা ও দুই একটি বৈজ্ঞানিক অপ-প্রয়োগের দ্বারা তাহা দুরাশা মাত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

---

* Ancient remains of man. p. 494.

† The Address of Col. Burrad in the Astronomical Society of India. 1912 Earth as a Planet

‡ The Annual Reports of the Smithsonian Institute 1912

বৈঠকী।

সবই শিক্ষা করিতে হয়। এমন কি উঠাবসা, চলা-ফিরা, রচন-বাচন, শয়ন-অসন জীবসামান্য ধর্ম্মের সকলগুলিই মানুষকে শিখিতে হয়। আমাদের তাই সেকালে,—সমাজ-শাসনের কালে—ব্যত্যাগ হইতে আবার শয়ন পর্য্যন্ত সারাদিনের সকল কর্ম্মের নির্দ্দেশ শাস্ত্র করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সে সকল নিত্যকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল,—না করিলে মহাপাপ হইত, করিলে বিশেষ পুণ্য সঞ্চয় ঘটিত না।

ইয়োরোপের সজীব শ্বেতাঙ্গ-সমাজের সকল স্কুল-কলেজে ছাত্রগণকে সবই শিক্ষা করিতে হয়। Drillএর সাহায্যে তাহারা চলিতে-বলিতে শিক্ষা করে, ডিনার টেবিলে মাষ্টার হাজির থাকিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দেন, কোন্ ভঙ্গী অনুসারে কাঁটা চামচ চালাইয়া সজ্জন-সমাজে ভোজন করিতে হয়। Catechist আসিয়া বাইবেলের স্থূল-স্থূল সিদ্ধান্ত সকল বালকগণকে কণ্ঠস্থ করাইয়া দেন। প্রত্যহ তিনবার প্রত্যেক ছাত্রকে উপাসনা বা ভগবানের প্রশংসাসূচক প্রার্থনা (Lords Prayer) আবৃত্তি করিতে হয়; প্রত্যেকবার আহারের পূর্ব্বে Grace বা ভগবানকে ধন্যবাদসূচক বচনের আবৃত্তি করিতে হয়। ইহা ছাড়া এটিকেট বা সামাজিক শিষ্টাচার শিখান হয়। পত্রলিখন পদ্ধতি, বাচন পদ্ধতি, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইয়োরোপের সকল Public schoolএর ছাত্রগণ বিধিনিষেধের বন্ধনে সংবদ্ধ। আমাদের যেমন পূর্ব্বকালে ধর্ম্মশাস্ত্রের কড়া নিয়ম ছিল, ইয়োরোপের খৃষ্টান সমাজের বিধিনিষেধ তেমনই কঠোর।

মনুর বচন—"সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"—সনাতন, নিত্য সত্য। সকল সভ্য মনুষ্যসমাজই এই মহাবাক্যের যথার্থতা স্বীকার করে এবং এতদনুসারে সমাজ-বন্ধন করিয়া থাকে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বারুদকণা সকলে অগ্নিসংযোগ করিলে তাহা যেমন পড়্-পড়্ করিয়া পুড়িয়া যায়, কাহারও কোন বিশেষ ক্ষতি ঘটাইতে পারে না। পরন্তু সেই বারুদকে লৌহের নলে বাঁধিয়া তাহার মুখে

গোলা বসাইয়া অগ্নিসংযোগ করিলে সেই গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীরও ধূলিসাৎ হয়। মানব-বৃষ্টি সকলকে তেমনই সমাজের বিধিনিষেধের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে, তাহার মুখে একটা ঈপ্সিতের গোলা বসাইয়া ভাবের বা প্রতিবিধিৎসার অগ্নিসংযোগ করিতে পারিলে সে সংহতি কার্য্যসাধিকা হয়ই। ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য নিত্য সত্য কথা। এই সমাজ-সংহতি নষ্ট করিতে না পারিলে যুদ্ধে পরাজিত কোন প্রবলজাতিকে দীর্ঘকাল বিজেতার অধীন রাখা চলে না। শাসন-তত্ত্বের এই গূঢ় সিদ্ধান্ত রোমকমনীষী সিসিরো (Cicero) পশ্চিম এশিয়া শাসন করিতে আসিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

* * * *

"কোম্পানীর মুল্লুক" এদেশে যতদিন ছিল, ততদিন এই তত্ত্ব অনুসারে কাজ রীতিমত হইত না। কোম্পানী বাহাদুর গোড়ায় বাঙ্গালা দেশে কাঁচা মালের (Raw material) রপ্তানী কার্য্যেই ব্যস্ত ছিলেন। পরে যখন ইংলণ্ডের শ্বেতাঙ্গজাতি কারিকরি শিক্ষা করিল, বিলাতে নূতন নূতন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, ষ্টিম এঞ্জিনের প্রয়োগ আরম্ভ হইল, তখনই বিলাতের শিল্পজাত সামগ্রী সকল বস্তায় বস্তায় এদেশে আমদানী হইতে আরম্ভ হইল। মাল আসিতে লাগিল বটে; পরন্তু তাহার কাটতি তেমন হইত না। বিলাতী মাল অপবিত্র বলিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই তাহা স্পর্শ করিত না। এই সময় সার টমাস মনরো বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মের বেষ্টনী ভাঙ্গিতে না পারিলে কোম্পানীর মাল বাজারে বিকাইবে না। তিনি দুইটা উপদেশ দিয়াছিলেন—(১) হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মগত গোঁড়ামী নষ্ট করিতে হইবে,—(২) সস্তা প্রতিযোগিতায় এদেশের পুরাতন শিল্পকলাকে নষ্ট করিতে হইবে, কলের মালের ফিরি প্রত্যেক হাটে-হাটে, ঘরে-ঘরে করিতে হইবে;—সখের খাতিরে যেন ধনী সমাজপতিগণ বিলাতী মাল কিছু কিছু ব্যবহার করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্যর টমাস মনরোর কথা অনুসারে কাজ হইয়াছিল। তাহার ফলে আজ আমাদের এমন হীন অবস্থা ঘটিয়াছে।

* * * *

কোম্পানীর এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সহায়ক উত্তর ভারতের বা আর্য্যাবর্ত্তের দুই জাতি হইয়াছিল। এই দুই জাতির পূর্ণ পোষকতা লাভ করিতে না পারিলে এদেশে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী এতটা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না। এই দুই

জাতি—বাঙ্গালী এবং মারবাড়ী। বাঙ্গালী ব্রাহ্ম এবং ইংরেজিনবীশ ইংরেজী লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া, অশনে-বসনে, বচনে-বাচনে ইংরেজের নকলনবীশ হইয়া হিন্দু সমাজের সনাতন গোঁড়ামীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্য্যসমাজ Iconoclrsm বা ধ্বংসবাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইয়াছিলেন। অন্য দিকে মারবাড়ির দল বিলাতী শিল্পজাতসামগ্রী সকলের বিশেষতঃ যন্ত্রাদির অতিমাত্রায় ফিরি আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাটে হাটে গঞ্জে-গঞ্জে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"রুপেয়ামে তিন কাপড়, একঠো ফাউ" বলিয়া হাঁকিয়া সস্তার প্রতিযোগিতায় দেশীয় তাঁতীকুলকে প্রায় নির্ম্মূল করিল। ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল, গোঁড়ামী গেল, শিল্পকলা, ঋদ্ধি বৃদ্ধি গেল,—হিন্দু ক্রমে পথের কাঙ্গাল হইলেন।

* * * * *

এইরূপে ভারতবাসীকে কাঙ্গালী বানাইয়াছে বাঙ্গালীই। কাঙ্গাল বানাইবার মহাযজ্ঞে মারবাড়ী প্রধান হোতা, সে হোমকুণ্ডে মারবাড়ীই দেশের সর্ব্বস্ব দগ্ধ করিয়াছে। গোড়ায় কিন্তু মুসলমানসমাজ এই আত্মহত্যার ব্যাপারে হিন্দুর সহচর ছিলেন না। গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোসলেম সমাজ ইংরেজি সভ্যতা ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ উদাসীন ছিলেন। আমরা আমাদের কিশোরকালে পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের কোন প্রদেশের ভাল মুসলমানকে বিদেশীয় বিলাতী বস্ত্রের পাগড়ী বানাইয়া মাথায় পরিতে দেখিতাম না। কোন ভাল মালদানী মুসলমান হ্যাট কোট পরিতেন না। বোধ হয় বাঙ্গালায় সৈয়দ আমীর আলি সাহেবই প্রথম হ্যাট কোট-ধারী মুসলমান। আলিগড়ের সৈয়দ আহম্মদ খাঁ সাহেবই আলিগড় কলেজ বানাইয়া নূতন কেতায় মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রচলন করেন। তিনিই মুসলমানদের মধ্যে টর্কিশ ফেজ বা লালটুপির প্রচলন করেন। তিনি তুর্ক সম্রাট খলিফার সমাদরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই Pan-Islamism এর প্রথম প্রবল প্রচারক। তথাপি, এই বিয়াল্লিস বর্ষব্যাপী তাঁর প্রচেষ্টার পরও ভারতবর্ষের মোসলেম সমাজের মজ্জাগত গোঁড়ামী এখনও অপসারিত হয় নাই। কেবল সে গোঁড়ামীর প্রণালী বদলাইয়াছে, উহা Pan-Islamism এবং খলিফার অনুরাগকুল্যা-সংবদ্ধ হইয়া সতেজে প্রবাহিত হইতেছে। তাই খেলাফতী আন্দোলনের এত তেজ, এমন অপূর্ব্ব মহিমা! তাই খেলাফৎ রক্ষার জন্য ভারতের মুসলমান মুক্তহস্ত হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিতেছে। তাই এখনও ইংরেজ এবং সেই সঙ্গে ইয়োরোপের অন্য শ্বেতাঙ্গ জাতি সকল মোসলেমের আব্দার হেঁটমুণ্ডে গ্রাহ্য করিতেছে।

* * * * *

বুঝিলে Non-co-operation এবং Co-operation পার্থক্য কি? কো-অপারেশন বা প্রজার সাহচর্য্য এবং আনুকূল্যের উপর ব্রিটিশ ব্যাপার-বাণিজ্য

এবং শাসনপদ্ধতি সবই প্রতিষ্ঠিত। প্রজা সাহচর্য্য করিয়াছিল, ইংরেজি শিখিয়াছিল, গোড়ামী ছাড়িয়াছিল, ব্রাণ্ড-রীয়ার বীফ উদরস্থ করিয়াছিল, দেওয়ানী উকীল, ব্যারিষ্টার হাকিম হইয়াছিল, তাই ইংরেজের শাসন চলিয়াছিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার হইয়াছিল, মালের কাটতি অভূতপূর্ব্ব ভাবে হইয়াছিল। ইউনিভার্সিটির ইংরেজী শিক্ষার বিশিষ্টতার প্রতি একটু লক্ষ্য করিতে হইবে। সংহতিশক্তির উপচয় যে সকল রিধিনিষেধের দ্বারা ঘটিতে পারে, উহাতে তেমন কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না;—তেমন বিধিনিষেধ চালান হয় না। উহা কেবল মেধার উন্মেষকারক কণ্ঠাগত বিদ্যা; ইংরেজী লিখিতে, পড়িতে, বলিতে শিখিলেই ইংরেজী বোলওয়ারীর নেশায় আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতে পারিলেই ঐ শিক্ষার পর্য্যবসান ঘটে। ইংরেজের ছাত্রদিগকে যাহা শিখান হয়, ভারতীয়ছাত্রদিগকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভারতবাসী এম, এ, বি, এল, উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে জানে না। ফলে "বাঙ্গালীর বয়স বৃদ্ধি ভরসা চল্লিশ পেরুলেই ফর্সা"—ডায়াবিটিজ ডিস্‌পেপসিয়া ইতি-ড-কারাদি রোগে বাঙ্গালীর ইংরেজিনবীশের দল মানবজীবনের শফরী লীলা শেষ করিয়া দেন। এই হেতু বাঙ্গালী বা ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে "রণ্ডা দোষ" দেখা গিয়াছে। যেমনটি যাইতেছে, তেমনটি আর হইতেছে না। ব্যবহার দোষেই এমনটি ঘটিতেছে, কো-অপারেশনের প্রভাবেই এতটা দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইংরেজিনবীশ যদি পুরাদস্তর ইংরেজ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে এতটা কষ্ট হইত না। কিন্তু ভারতবাসী ত ইংরেজ সাজিতে পারে না; ভারতবর্ষের ভূমি ও আবহপ্রভাব ভারতবাসীকে পুরাদস্তর ইংরেজ সাজিতে দিবে না। তিনি যতই জবর-দস্ত কো-অপারেটার হউন না, ষোল আনা কো-অপারেটার ইংরেজ সঞ্চর কেহ হইতে পারিবেন না। বিধি ইহার বাদী, দেশপ্রকৃতি, জাতিপ্রকৃতি এ চেষ্টার বিরোধ করিবেই।

* * * * *

আমরা নন-কো-অপারেশন শব্দের অর্থে কি বুঝি, তাহা "ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক" শীর্ষক প্রবন্ধে ভাবের ভাষায়, কাকুর সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছি। রাজনীতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে "ঋজুকর্ম্ম" শীর্ষক হেঁয়ালীর সন্দর্ভে ইঙ্গিত করিয়াছি। পাঠকগণ তাহা অভিনিবেশসহ পাঠ করিলে সুখী হইব। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শিক্ষিত সজ্জনসমাজে কাকু, হেঁয়ালী এবং ভাবের ভাষার অতি প্রচলন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "মৃণালিনী" এবং "আনন্দমঠে" উহার পরিচয় অতি মিষ্টভাবে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "কমলাকান্তের দপ্তর" তারুণ্যতার এবং কাকুর অক্ষয় মঞ্জুষা। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার এপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য শিষ্য ছিলেন। আমরা এই দুই রস-গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই দুই সন্দর্ভ লিখিয়াছি। তাই পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে অনেক কথা পরে আরও বলিব।

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীযুত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি।

বিগত ১৩২৭ সালের পৌষ-মাস যুগ্মসংখ্যক "সাহিত্য" পত্রে "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি- শীর্ষক" একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে ৺রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহোদয়ের একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে ৺রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অবস্থা কতদূর কি ছিল, এই বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয় কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। ৺রামকৃষ্ণদেবের অনেক ভক্ত ঐ সব কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ মৌখিক আলাপে, কেহ চিঠি দিয়া এবং অপরে (স্বনামে এবং বে-নামেও) প্রবন্ধ লিখিয়া স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইহাদের উক্তির অধিকাংশই গালাগালি ও বাজে কথায় পরিপূর্ণ, তথাপি যে সকল কথাতে কিঞ্চিৎ যুক্তির আভাস আছে—বিশেষতঃ রাঁচির শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সাহিত্য আষাঢ় ১৩২৮) যে সকল শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি আমি শ্রীযুত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। অপিচ, চূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "বেদব্যাসে" ৺পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—সেগুলি পশ্চাৎ সংগ্রহ করিয়া * পাঠ করাতে দেখিলাম, তন্মধ্যে উল্লিখিত কতকগুলি কথা চূড়ামণি মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত অভিমতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। অধুনা ঐ সকল কথার প্রতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করি, কেননা তথ্য প্রকাশই আমার অভিপ্রায়। উত্তরে চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে যে চিঠিখানি পাইয়াছি, তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা যে যে গুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম—তাহা প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বেদব্যাস পাঠের ফলশ্রুতি মাত্র।

৺সদাশিবঃ
শরণং

পরম স্নেহাস্পদ!

আপনার ৩০শে শ্রাবণের পত্রখানা যথাসময়ে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন আমার দৌহিত্রটী টাইফয়েড জ্বরে পীড়িত থাকায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলাম, আবার সে একটু সুস্থ হইলে নিজেও অসুস্থ হইয়াছিলাম। এজন্য আপনার পত্রখানির উত্তর দিতে অসমর্থ ছিলাম। সম্প্রতি ৺কৃপায় সে সব ঝঞ্ঝাট্ সারিয়াছে, তাই অদ্য উত্তর দিতেছি,—

লোকের তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা আর কি লিখিব। সে যাহার যেমন ইচ্ছা হয় করুক, তাহা তাঁহার মুখ আর হৃদয়েই থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার বা আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহাত্মা ৺রামকৃষ্ণ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার মহিমার লাঘব করিবার মানসে কিছুই লিখি নাই; সুতরাং আমার ধারণার মূলে কোন অংশে ভ্রম থাকিলেও আমি পাপী নহি।

৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় আমার দীক্ষিত শিষ্য, ছাত্র নহে। ভূধর আমার বা অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। যথাসম্ভব ঋজুবাদাদি পাঠেই সাধারণ ভাবে ভূধরের কিছু জ্ঞান ছিল। অতএব নির্ব্বিকল্পসমাধি, সবিকল্পসমাধি ভূধরেরও বিদিত ছিল না। যেটুকু বিদিত ছিল, তদনুসারেও রামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্পসমাধির উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং দিবসত্রয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, একথা লিখিত হয় নাই। ৺রামকৃষ্ণের প্রথম অবস্থায় ভূধরের শৈশবকাল ছিল। সুতরাং সে স্বয়ং তাঁহার সে অবস্থার কিছু দেখে নাই। তাঁহার নিজের মুখেও সে একথা শুনে নাই। অন্য লোকের মুখেই শুনিয়া লিখিয়াছে। সাধারণ লোকেরা কতজনেই কত কিছু কথা বলে, সে সকল কথার যথেষ্ট মূল্য দিলে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তবে তিনি তোতাপুরীর নিকট দীক্ষিত বা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এ কথাটি মিথ্যার গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করা অসঙ্গত। তখন অনেক লোকেই একথা বিদিত ছিলেন। তাঁহাকে তান্ত্রিকভাবের ন্যাস দেওয়াও সম্ভব হওয়ার সম্ভব, এবং সেইজন্যই তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার চিতারোহণাদি অনুষ্ঠান এবং আমার পূর্ব্বলিখিত তাঁহার অন্যান্য আচরণ সেই বিষয়েরই প্রমাণ করে।

হৃদয়ানুসারে তাঁহার গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি হইতে পারে অথবা হইয়াছিল। 'পরমহংস' সেরূপ কোন উপাধি নহে, উহা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা। শ্রীরামকৃষ্ণের সেরূপ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে পরমহংস বলা ঠিক্ নহে। তবে দশজনে যখন পরমহংস বলে, আমিও তখন মুখফলকে পরমহংস বলিতাম, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। অবধূত আর পরমহংস কথার অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রায় এক। ইহাও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী আরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, এই দশদলের তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণের অবধূত সংজ্ঞার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পুরীর শিষ্য, সুতরাং তিনি শঙ্করাচার্য্যের [illegible] অবধূত, ইহা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু অবধূত গীতার প্রকৃত অর্থ [illegible]। তৎকালের "বেদব্যাস" পত্র বা "সাধুদর্শন" আমার নিকট [illegible] পাইবার উপায় নাই; সুতরাং তাহা আমার দেখা অসম্ভব। রামকৃষ্ণের [illegible] অপূর্ব্বভাব দেখিয়া আমি আনন্দিত হইতাম, ইহা [illegible] এবং উহা যে অসাধারণ, তাহাও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার [illegible] হইত, ইহা আমি কখনও বলি নাই, ইহা নিশ্চয়।

"বেদব্যাসে" আমার যে সকল কথা প্রকাশিত হইত, তাহাই [illegible] দেখিতাম। ভূদেব বা অন্যের লেখা দেখি নাই বা অনুসন্ধানও করি নাই। আমি বেদব্যাসের সম্পাদক ছিলাম না।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরুর নিকট দুই চারিটী কথা [illegible] শ্রবণবিদ্যা ভ্রমবিদ্যা-লাভ হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধি [illegible] ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, অথবা জ্ঞান হইতে পৃথগ্‌ভূত ভক্তিনামক [illegible] দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে অধ্যাত্মতত্ত্ব-[illegible] গ্রন্থ প্রণয়ন করা নিরর্থক বা উন্মত্তের অনুষ্ঠান মধ্যে [illegible] করিতে হয়। আর উপনিষদ্ অধ্যয়ন এবং মননশীল শিষ্যের পর [illegible] অভিজ্ঞ হইয়া যে গুরুর নিকট মোক্ষ শিক্ষা করার উপদেশ [illegible] স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও একেবারে পরিগণিত হয়। [illegible] শাস্ত্রোক্ত ভক্তিও কেবল সত্ত্বশুদ্ধিরই কারণ এবং সত্ত্বশুদ্ধি [illegible] জ্ঞানের কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত মুক্তির কারণ, ইহা [illegible]

[illegible] আমার সম্পাদকীয় [illegible] পুরাণ [illegible] বলিয়াছেন।

(৩য় প্রবন্ধ ১৫) লিখিত আছে। এজন্য ভাগবতও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে অপরিপূর্ণ। ভাগবতের মতেও জ্ঞান ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। অদ্বৈতশাস্ত্র কোন লোক যে, অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টান্তও নাই। সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরেই যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, শাস্ত্রের দ্বারা তাহাদের পরিচয় না থাকিলে, সে কোন্‌টা ধরিবে, কোন্‌টা না ধরিবে, সে ঈশ্বরতত্ত্বের দিকে গেল, কি অন্য তত্ত্বের দিকে সরিয়া পড়িল, এবং তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হইতেছে, উহা কোন্ লক্ষণের অন্তর্গত, কিংবা উহা সত্য বা ভ্রমদর্শন, ইহা কি প্রকারে বুঝিবে? তবে যদি গুরু তৎসমস্তই সাধককে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে সাধক যথানিয়মে উঠিতে পারে, ইহা সত্য, কিন্তু সেরূপ শিক্ষাতো অধ্যয়নের নামান্তর। তাহা হইতে সকলের অবশ্য লাভ হওয়া অসম্ভব, আর নিরক্ষর লোকের অত কথা মনে রাখাও সম্ভবের নহে; কাজেই শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক। আপনি বোধ হয় তাহা বলিবেন যে, আজকাল এমন গুরুর অসদ্ভাব নাই, যিনি ৫৲ টী টাকা দক্ষিণা পাইলেই অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তব ঊর্দ্ধতালে অমুষ্ঠপরিমিত ব্রহ্মদর্শন করাইয়া দিতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনে কোনরূপ অধ্যয়নেরও প্রয়োজন নাই। উহা, আপনারই চক্ষে এবং তাহাদেরই সন্তোষজনক। ঐ শ্রেণীর গুরু এবং ঐ শ্রেণীর শিষ্য শাস্ত্রাধ্যয়ন বা জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী এবং তাহারাই আত্মপ্রসাদ বা আত্মতুষ্টি রক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাদির অকিঞ্চিৎকরত্ব সর্ব্বত্র সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, রীতিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত জীবের ব্রহ্মরাজ্য বা অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করা গগনকুসুমের ন্যায় অসম্ভবপর।

আমি একথা কখও ভাবি নাই যে, যথারীতি যোগানুষ্ঠানাদি না করিয়া কেবল বৈরাগ্যাদিশূন্য লোকের কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই কৃতার্থতা হইবে, কিন্তু শুভাদৃষ্ট থাকিলে শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বীজ সমাধি কৃতার্থতা হইতে পারে, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভবপর, ইহাই আমার বিশ্বাস।

কি মধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ, কি শাস্ত্রীয়বিদ্যা, ইহার কোন বিষয়েই আমি আজকাল ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা উচ্চলোক বলিয়া এখনও মনে করি না। ঐ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতাদিরই কারণ

করিতেছি। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদেবতার কৃপার নিমিত্ত নানাদিক পরিভ্রমণ করিতেছি, একথা সত্য এবং তাহারা তাহা করেন নাই, তাঁহাদের তুলনায় এ অংশে আমি একটু অগ্রসর। আর তাঁহারা সেই অরণ্য হইতে দূরে অবস্থিত, এরূপ ধারণা যদি দাম্ভিকতা আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কারের নামান্তর হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি এ অংশে অপরাধী। কিন্তু শাস্ত্র এ ধারণাকে তাহা বলে না। শাস্ত্রমতে ইহা স্বরূপ জ্ঞানমাত্র। যে ভাবটি অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া নিজেকে স্ফীত করিয়া তোলে, তাহাই অহঙ্কার বা দম্ভাদির অন্তর্গত। অতএব, "আমি ২৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছি, আর ৺রামকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, ইহা তাঁহার বিদিত ছিল" এইরূপ বলা শাস্ত্রের মতে দাম্ভিকতাদিমূলক নহে। অধিক আর কি লিখিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীশশধর শর্ম্মা। *

এই চিঠি পাইয়া শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে আমরা দুএকটি জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মের প্রভূত সুকৃতি থাকিলে পরজন্মে সাধক স্বল্পকাল মধ্যেই অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন—যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদ শুকদেব প্রভৃতি হইয়াছিলেন; ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসও হয়তো সেইরূপ কারণেই অত্যল্প সময়ের সাধনায়ই নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? অপিচ তদীয় পত্রের শেষাংশে চূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন, "বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতা অনুভব করিতেছি;" ইহা তাঁহার বিনয়াতিশয় মনে করিয়া, পত্রখানি প্রকাশ করিবার সময়, ঐ বাক্যটি ছাড়িয়া দিতে অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এ সকলের উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় আর একখানি চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাও এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

* চিঠিখানিতে তারিখ নাই; ইহা ২রা আশ্বিন (১৩২৮) আমার হস্তগত হইয়াছিল।

* চূড়ামণি মহাশয় এ চিঠি লিখিবার ভিনি বহু বর্ণশুদ্ধি ইত্যাদি করাতে, সংশোধনপূর্ব্বক ইহা প্রকাশিত হইল।

৺সদাশিবঃ
শরণং

বহরমপুর
২৪।৭।২৮

পরম স্নেহাস্পদ।

আপনার পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। নানা ঝঞ্ঝাটবশতঃ এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি এই পত্রে যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যাহা বিবেচনা তাহা জানাইতেছি :—

অবধূত রামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত কি না, তাহা সমর্থন ও অসমর্থন এই উভয় পক্ষেরই প্রমাণ সুদৃঢ় নহে; তবে যতটা দেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই বলিয়াছি এবং এখনও তাহাই বলিতেছি। তবে যদি আমার বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে, আর সত্য সত্যই তিনি নির্ব্বিকল্পসমাধি ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পরমানন্দের বিষয়। তিনি শুক নারদাদির মত মুক্তপুরুষ হইলে বা অনন্ত যশঃকীর্ত্তি ও মহিমা প্রকাশ হইলে আমার পৈত্রিক বা নিজ সম্পত্তির কোন হানি হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে আমার দুঃখিত হওয়া বা তাঁহার অপলাপের জন্য আমার চেষ্টার কোন কারণ নাই। সমাজে যত বড় লোক হয়, ততই সমাজ ও দেশের উন্নতি, ইহা আমি সম্যক্ বিদিত আছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের জ্ঞানবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহি। রামকৃষ্ণকে আমি কিরূপে জানিতাম, তাঁহার সহিত আমার কিরূপ যথাবার্ত্তা হইত—ইহাই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়। সুতরাং আমি যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি। ইহাতে যদি তাঁহার অনুগত লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎর্সনা করেন, তবে করুন, আমি সেই ভয়ে সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। এজন্য এবারও আমার বিশ্বাস অনুরূপ লেখাই লিখিতেছি।

নির্ব্বিকল্পসমাধিতে অধ্যাত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু এই উভয় বিষয়েরই কোন কথা তাঁহার নিকট শুনিতে পাই নাই। তাঁহার কথা বলিয়া যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত বিষয়ের কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি লেখা পড়া জানিতেন না বলিয়া সে বিষয়ে উপনিষদাদি কোন গ্রন্থ তিনি পড়িতে পারেন নাই, তবে যদি কাহারও উপদেশে ২।৩ দিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগানুশাসন আয়ত্ত করিয়া সমাধির অসংখ্য স্তর কাটাইয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিক্ষেত্রে

আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া কেহ সন্তুষ্ট হন, তবে সে বিষয়ে আমি কি বলিব? তাঁহাদিগকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্রহ্মবিদ্যাদি ও সমাধিব্যাপারের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতে বোধ হয় তাঁহারা সুযোগ পান নাই, সেজন্য ঐরূপ বলিতে সাহস করিতে পারেন। ধ্রুব যতদিন পর্য্যন্ত অনশন ব্রতাদি করিয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত আরাধনা দ্বারায় ভগবৎকৃপাভাজন হইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দ্বারায় মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গবিশেষে (ধ্রুবলোকে) গমন করিয়াছিলেন; ইহা ভাগবতেই লিখিত আছে। কিন্তু মুক্তির তুলনায় সে স্বর্গ নরকবিশেষ। প্রহ্লাদও যাবজ্জীবন আরাধনা দ্বারায় স্বর্গবিশেষে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিত আছে। শুকদেবও জন্মাবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত পিতার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা ও যোগাভ্যাসাদি করিয়াছিলেন, এবিষয় শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে। তাহাতে তাঁহার বনীকার বৈরাগ্য হইবার কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির কথা লিখিত নাই। অতএব পূর্ব্বজন্মের শুভানুষ্ঠান থাকিলেও ২।৩ দিন মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা, যোগবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা লাভ করিয়া মানুষ নির্ব্বিকল্পসমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ধ্রুব বা প্রহ্লাদ নহেন, শুকদেবও নহেন। ধ্রুব প্রহ্লাদের যদি সমাধি হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

যিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ, তিনি ব্যুত্থানের অবস্থায়ও শারীরিক ও মানসিক পীড়ার দ্বারা পরিবাধিত হন না এবং রোগাক্রান্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ সমাধির আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। অতএব তাঁহার নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত, ইহা আমি বলিতে পারি না।

আমি যে জন্মেই আমার অজ্ঞতা ও নীচতা অনুভব করিতেছি, ইহা লিখিয়াছি, তাহা বিনয় বা ভদ্রতা প্রকাশের জন্য নহে। উহা আমার বিশ্বাসমতেই লিখিয়াছি। কিন্তু মহাবিদ্যা জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি জগদম্বারই নামান্তর। পিতা, অনন্ত ও তাঁহারই নাম। সুতরাং বিদ্যা বা জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। একটা দিক দিয়া বিদ্যাদেবীর অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে মানুষ প্রোফেসর বা কোন্সিলর কিম্বা পর্য্যন্ত হইতে পারে, সেজন্য গর্ব্বিতও হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর যখন অকূল সমুদ্র দেখিতে পায়, তখন সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, আসিয়া পড়ে। তখন বিদ্যাদেবীই যে অনন্ত ব্রহ্মের কথাকার, এ

সিদ্ধান্তে সপ্রমাণ হয়, সেই সময়ে নিজের অজ্ঞতা না বুঝিতে পারে এমন মানুষ বোধ হয় নাই ; কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই পারকূলশূন্য সমুদ্র হইলেও তাহার দিকে অগ্রসর হইতে নিশ্চেষ্ট হয় না। ইহা মানবের স্বাভাবিক বিধান। আমি এখন সেই দশা ভোগ করিতেছি। জগন্মাতা মহাবিদ্যার অন্বেষণের জন্য একএক দিক্ দিয়া কতকটা কতকটা অগ্রসর হইয়া যতদিন তাঁহার প্রকৃত সংবাদ কিছুই জানিতাম না, ততদিন তাঁহার চরণসংস্পৃষ্ট এক একটু বায়ুমাত্র দূর হইতে স্পর্শ করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া বৃথা আনন্দানুভব করিতাম। এখন কতক পরিমাণে ঝিঁঝিবিঁজি, কাঁটা জঙ্গল ছাড়াইয়া একটু আলোকের ভাব পাইয়া বিদ্যামূর্ত্তির অসীমতার একটু মাত্র আভাস বুঝিতে পারিয়া, সেই মিথ্যা মন্দ হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর নিজের অজ্ঞতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রাণের ব্যাকুলতা বশতঃ সেই অকূল সমুদ্র লক্ষ্য করিয়াই প্রাণের সর্ব্বশক্তি সমর্পণ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বিদ্যামূর্ত্তির কোন অংশই পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং আমি অজ্ঞ, ইহা সত্য।

আমি নীচও বটে। যতদিন দৈহিক অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাইতাম, ইহার বাহিরে নিজের জীবাত্মার মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না, ততদিন আমি নিদ্রিতবৎ তমসাচ্ছন্ন ছিলাম। সুতরাং আমি ভাল কি মন্দ, সুখ কি অসুখ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন বহুকষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় আবর্ত্ত বা কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করিয়া, অনেক সময় নিজের জীবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। দৈবিক প্রবৃত্তি বা আসুরিক প্রবৃত্তি কি তাহার কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং এখন দেখিতে পাই, আমার নিজের জীবশরীর অসংখ্য আসুর বা অপবিত্র প্রবৃত্তির এগুলি পিচিয়া অতি দুর্গন্ধান্বিত ও অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছে। সুতরাং আমাকে আমি অতি নীচ ও অতি দুঃখী ব্যতীত কি বুঝিব ?

সত্য কথাই আপনার নিকট লিখিয়াছি। ৺ নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমি এই জন্মেই এই ব্যাধিগুলির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পারি। আমি স্বয়ং লিখিতে বা পড়িতে পারি না, ইহা বিদিত আছেন। অন্যদ্বারায় লিখিতে ও পড়িতে হয়, সুতরাং অধিক আর লিখিতে পারিলাম না। এখানে দৈহিক কুশল। আপনার কুশলাদি লিখিয়া সন্তোষিবেন, ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী,

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই পত্রখানি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে গ্রীক দার্শনিকপ্রবর সক্রেটিসকে যখন ডেল্‌ফির দৈববাণী "জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন "দৈববাক্য অসত্য, সন্দেহ নাই; তবে আমি একটা কথা জানি যে আমি কিছুই জানি না, অন্যেরা হয়তো ইহাও জানেন না।" ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন মৃত্যুর প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন "জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে দু একটা উপলখণ্ড মাত্র সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি—অসীম অনন্ত রত্নাকর পুরোভাগে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।" শ্রুতি বলিতেছেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

তাই বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যিনি শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন—যাঁহার সাধনপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হইয়াছে, সেই ষড়্‌দর্শনবেত্তা বিদ্বচ্চূড়ামণি শাস্ত্রাচারপূত বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ স্বকীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই শ্রদ্ধার বিষয়—তাহাতেই তাঁহার নিষ্কপট সত্যসন্ধতা প্রমাণিত হইতেছে—প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক তদুপরি কটূক্তি ব্যর্থ হইতেছে।

চূড়ামণি মহাশয়ের চাপরাশ সম্বন্ধীয় কথায় অস্বীকার মিথ্যা বলিতে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, "তবে আশঙ্কা হয় ঐ প্রশ্ন (চাপরাশ আছে কি না) স্বকর্ণে শুনিয়াছেন পরমহংসের শিষ্যগণ ব্যতীত এমন ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও জীবিত আছেন, এ সংবাদ শুনিয়া চূড়ামণি মহাশয় লজ্জিত হইবেন *।" সত্যেন্দ্র বাবু যদি যথার্থ সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক হইতেন, তবে সেই জীবিত ব্যক্তিটির নাম ধাম প্রকাশপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধানের উপায় করিয়া দিতেন—তা না করিয়া কটূক্তি বর্ষণপূর্ব্বক নিজেরই পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ের ছেলে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বে-আদব ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমাছিলেন, সেই বাড়ীর বাসিন্দা ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় ঐ দিনকার ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সুধীবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, যোগীরা যে ঐরূপ

* সাহিত্য—১৩২৮। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ২১৭ পৃষ্ঠা।

হয় নাই, এমন নহে—তাদৃশ প্রশ্নের কোনও অবকাশই ছিল না। "বেঙ্গল" ম্যাগাজিন (১২৯৪) ১০ম সংখ্যা হইতে ৺ভূধর বাবুর প্রবন্ধের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"একদিবস আচার্য্যদেব [অর্থাৎ তর্কচূড়ামণি মহাশয়] তাঁহার কলিকাতার আবাসভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই; অদ্য কোনওরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবা মাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন, অমনি দেখেন পরমহংসদেব অচৈতন্য—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষলোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জ্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এ অবস্থায় অতীত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনের অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, মা, শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে কেন মা। আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা আমায় ভাল করে দে মা।" এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাই শশধর! দেখ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমার বলিলেন যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাহার কাছে যা, গিয়ে দেখা ক'রে আয় গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিলাম না। আমি চলে এলাম। অনেক দিন আসিব আসিব করিতেছিলাম, আজ তা হইয়া গেল।" এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর দুইজনে নানা ভাব ভক্তিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে

পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্য দেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।" * বেদব্যাস, ২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড, ২৪০-৪১ পৃঃ।

১২৯৩ সালে ৺ পরমহংসের তিরোভাব—এই সকল প্রবন্ধ তৎপরবর্ত্তী বৎসরই লেখা হয়। † ৺ভূধর বাবুর প্রবন্ধে পরমহংস দেব সম্বন্ধে তৎসময়ে প্রচলিত অনেক গ্লানিকর কথার প্রতিবাদ আছে—(প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগ—বেদব্যাস ২য় খণ্ড, ১১ সংখ্যা ২৭৪ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য)। এ অবস্থায় ৺ ভূধর বাবুর ন্যায় রামকৃষ্ণ দেবের ভক্তের স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বকর্ণে শ্রুত ঘটনা ও কথায় সন্দিহান হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। ‡ এখন দেখুন, যিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে "তোমার চাপরাস আছে কি?" এরূপ প্রশ্ন সম্ভাব্য কি না? কেশব সেন বা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। পরে উহাদের নখের উপর দু'একটা স্পষ্টকথা সরলভাবে বলা এক কথা—আর কোনও দিন জানা শুনা আলাপ পরিচয় নাই—এরূপ দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া "চাপরাস আছে কি না" প্রশ্ন করা এক কথা, ইহা অভদ্রতা—পরমহংসদেব অভদ্র ছিলেন না নিশ্চয়ই। তবে তিনি যে সব লোকের খপ্পরে পড়িয়াছিলেন, তাদের অসাধ্য কোনও কিছুই ছিল না। ইহাঁরা কয়েকটী কারণেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়। (১) প্রথমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ—ইহাঁরা ব্রাহ্মণবিরোধী। (২) ইনি সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচারক—ইহাঁরা বর্ণাশ্রমের তেমন পক্ষপাতী নহেন। (৩) ইনি 'পণ্ডিত'—ইহাঁরা পাণ্ডিত্য-বিরোধী—শাস্ত্রের ধার বড় ধারেন না। (৪) ইনি খাদ্যাখাদ্য বিচার, পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার ইত্যাদি সদাচারের পক্ষপাতী ও প্রচারক—ইহাঁরা হাড়িধর্ম্ম, ছুৎমার্গ ইত্যাদি বলিয়া এসকলের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ

---

* ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু দর্শন" নামক পুস্তকেও এ সকল কথা অবিকল আছে, কেন না "সাধুদর্শন" বেদব্যাস প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ মাত্র। মাষ্টিন দ্রষ্টব্য।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "কথামৃত" "লীলা প্রসঙ্গ" প্রভৃতি ইহার পরে প্রকাশিত হইলেও ৺ ভূধর বাবুর এ সকল কথার কোন উল্লেখ বা প্রতিবাদ এগুলিতে নাই। রামকৃষ্ণ দেবের তাঁহার সম্বন্ধে কোথায় কে কি লিখিল, এ সকলের অনুসন্ধান রাখিলে, ইহাও প্রকাশিত হইত।

† বরং উল্লিখিত পরমহংসদেবের বিবরণীতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত-বিরুদ্ধ (যথা 'সমাধি' ইত্যাদি) অনেক কথাও যে আছে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

করেন। * অতএব চূড়ামণি মহাশয়কে "স্নাব" করিবার এরূপ প্রয়াস আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে। †

আমাদের এই ধারণার সমর্থনার্থ, এস্থলে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থে এই "চাপড়াণি" সম্বন্ধীয় ব্যাপার কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে:—

"এবৎসর (১৮৮৫খৃ) ‡ রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্য্যের§ সহিত ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথারার্ত্তা হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পণ্ডিতজির [অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের] কথা শুনিয়া এবং তাঁহার বাসা অতি নিকটে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শশধরকে ঐদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতজির কলিকাতাগমন সংবাদ স্বামীজি প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, যাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণে তিনি ধর্ম্মবক্তৃতাদানে আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত স্বামীজির পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল এবং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাসভবনে স্বামীজির গতায়াতও ছিল। আবার পণ্ডিতজি আধ্যাত্মিক ধর্ম্মব্যাখ্যাগুলি ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়া ধারণা হওয়ায় তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া দিবার প্রয়াসেও স্বামীজির ঐ গমনাগমন এই সময়ে কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, এইরূপে স্বামীজি পণ্ডিতজির সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুরকে উহা বলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত দর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজিকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে "চাপরাস" বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজিকে এই প্রথম দর্শনকালেই

---

* এই দলে শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণভক্ত দুই একজন যে না আছেন, একথা আমি বলিতেছি না—অবশ্যই আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা এমনই "মোহগর্ত্তে নিপতিত" হইয়া আছেন যে, এই সম্প্রদায়ের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কী রূপ অপকার হইতেছে, তলাইয়া দেখিতেছেন না।

† ৺ রামকৃষ্ণকে (এবং সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে) বাড়াইবার জন্য অপর লোকদের খাটো করিবার প্রয়াস "কথামৃত" "লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতিতে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

‡ মতেও গোল আছে; "কথামৃত"কারের মতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে।

§ "অনেকগুলি" ভট্টাচার্য্য।

বসিয়াছিলেন। এই সকল জলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই পণ্ডিতজি কিছুকাল পরে প্রচার কার্য্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যা পীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।" লীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ২২৩-৪ পৃষ্ঠা।

লীলাপ্রসঙ্গকার কিরূপে অবগত হইলেন যে, পণ্ডিতজি বক্তৃতা ছাড়িয়া ৺কামাখ্যায় তপস্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন? চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মবক্তৃতা প্রসঙ্গেই কামরূপেও আসেন এবং ৺কামাখ্যা দর্শনাদি করিয়া যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অব্দে শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফলতঃ এ সকল লেখক যে কত অসত্য এভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

প্রকৃত পক্ষে ৺রামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের সম্মান যথেষ্ট করিতেন। চূড়ামণি মহাশয়কে অপ্রতিভ করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই লীলাপ্রসঙ্গ কারের লেখাই উদ্ধৃত করিতেছি—ঠাকুর। "ওগো পণ্ডিত তোমায় দেখলুম। [অর্থাৎ সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তোমার অন্তরে কিরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সকল আছে, তাহা দেখিলাম—(প্রসঙ্গকারের ফুটনোট)]। তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে দয়াইয়ে, গামছা খানা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটে গা ধুতে কাপড় কাচতে যায়, আর হেঁসেল্ ঘরে ফিরে না—তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বোলে কোয়ে যে যাবে আর ফিরবে না।" ঐ গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ২৩৯ পৃঃ।

'কথামৃত'কারও লিখিয়াছেন, যখন বলরাম বাবুর বাড়ী চূড়ামণি মহাশয় (প্রথম সাক্ষাৎকারের সপ্তাহ মাত্র পরে) ৺রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যান, তখন তাঁহাকে—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) বলিতেছেন—আমরা সকলে বাসর শয্যায় জেগে আছি—কখন বর আসবে।" (কথামৃত ৪র্থভাগ ১২৬ পৃঃ)

আবার আছে—

"পণ্ডিত বিদায় লইলেন। ঠাকুর বলিলেন, একে গাড়ী আনিতে দাও।

পণ্ডিত। আজ্ঞে না, আমরা অমনি চলে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তা কি হয়—ব্রহ্ম যারে না পায় ধ্যানে—" (কথামৃত ঐ ১৩০পৃঃ)।

প্রতিবাদী কেহ কেহ, চূড়ামণি মহাশয়ের উপর একটী অভিযোগ এই বসিয়া করেন যে, এই দীর্ঘ ৪০ বৎসর পরে কেন তিনি 'চাপরাস' র কথা প্রতিবাদ

করিতেছেন।—অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে তিনি কেন প্রতিবাদ করেন নাই। এবিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় বক্তব্য জানাইতে লিখি নাই—লেখা বাহুল্য মনে করিয়াছি। স্বদীয় পূর্ব্ব প্রবন্ধের সূচনারই লেখা আছে যে, তিনি (তিন বৎসর পূর্ব্বে) গৌহাটি আসিলে, আমি তাঁহাকে ৺পরমহংস দেবের বিষয়ে জিজ্ঞাসা বাদ করি—'চাপরাস' সম্বন্ধেও তখনই কথা হয়, পরে আমিই নির্ব্বন্ধসহকারে চিঠি দিয়া তাঁহার লিখিত মন্তব্য (আমার পত্রের উত্তরচ্ছলে) আনাইয়াছিলাম। চূড়ামণি মহাশয়ের উপরে বহুবিধ অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কিছুর—প্রতিবাদ করিয়াছেন, বলিয়া আমি অবগত নাই। এমন কি, আজ ৩।৪ বৎসর হইল ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা" পত্রে ৩ দুইবার "৺শশধর তর্কচূড়ামণি" বলিয়া তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রতিবাদে, উত্তরেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (তৎসহ প্রকাশিত) পত্রগুলি লেখেন নাই—আমিই বারংবার চিঠি ও তাগিদ দিয়া এগুলি লেখাইয়াছি।

উপসংহারে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের কথায় কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন—(সাহিত্য আষাঢ় ১৩২৮ বৈঠকী দ্রষ্টব্য) "তর্কচূড়ামণি মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সদ্ব্যাখ্যাতা, পরন্তু তিনি গৃহী। তিনি বনে দুর্গম বনে ঘুরিয়া কখনই সাধু দর্শন করিবার সময় পান নাই" ইত্যাদি। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নাই। গৌহাটিতে যখন তিনি শেষবার আইসেন, তখনই—এবং তাহাও কয়েক মুহূর্ত্তের মাত্র। তৎকালে আলাপ প্রসঙ্গে, শ্রীহট্ট জেলায় জন্মভূমি স্থিত ৺রামজঙ্ঘ মহাপীঠে গিয়া, জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ঐস্থানি তখন (১২৯৫ সালে) দুর্গম ও শ্বাপদাকীর্ণ ছিল এবং তিনি যে জীবনে তাদৃশ অনেক বড় লোকের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, একথাও বলিয়াছিলেন। * ফলতঃ গৃহী হইলেও যাঁহারা তীর্থসেবী, তাঁহাদের সাধুদর্শনের সুবিধা বহুশই ঘটিয়া থাকে।

এ সকল প্রতিবাদের উত্তরচ্ছলে আমার নিজের বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইবে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

(১ ১৩১৬ সাল—৪১ পৃঃ ও ২০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

* শ্রীময়ন্তী মহাপীঠ এবং উক্ত সাধু (ব্রহ্ম চারি দাস প্রসাদ) সম্বন্ধে সত্বরই একটি প্রবন্ধ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইবে—তাহাতে শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত ঐ সাধু দর্শন বিষয়ক একখানি চিঠিও প্রকাশিত হইবে।

পূজা।

যজ্ঞোপবীত দুলায়ে গলায়, মৃৎ-প্রতিমার চরণতলে,
পুষ্প বাঁধিয়া শিখার গুচ্ছে, অঙ্গ আবরি চেলাঞ্চলে,
চন্দন ফোঁটা রঞ্জিত ভাল, দক্ষিণে শোভে অর্ঘের থাল,
দু'পাশে বিবিধ পূজাসম্ভার, সম্মুখে ভরা কুসুমরাজি—
মাঝখানটীতে কে তুমি বিপ্র মহাগৌরবে বসেছ আজি?

মন্ত্র পড়িছ যন্ত্রচালিত, পুষ্প ঢালিছ প্রতিমা'পায়,
ধূপের ধূম্রে ফুলের গন্ধে পূজা প্রাঙ্গণ ভরিয়া যায়—
ব্রাহ্মণ, তুমি কি চাও কি চাও? কার লাগি এত পুষ্প বিছাও;
পরের ইষ্টদেবতারে কেন তুমিই বা দাও অর্ঘ-ভার?
বুঝেছি বিপ্র, বর্ণের সেরা! পূজা যে তোমারি একাধিকার!

পূজার ব্যাপারি! বাড়ী বাড়ী ঘুরি' কার পদে কর অর্ঘ্যদান?
ব্যবসাপঙ্কে হৃদয়পুষ্পে নিত্যই এ যে করিছ ম্লান!
পূজারি, পূজারি, করিতেছ একি! আজনম-ভোর চালাইয়া মেকি
প্রাণের ঠাকুরে কোথায় ঠেলিছ, হিসাব নিলে না একটীবার—
দক্ষিণাদান সংগ্রহ করি' জমাদে শুধুই অন্ধকার!

পূজাপদ্ধতি অর্চ্চনা-নীতি প্রাণপণে সবই রেখছ ঠিক
হাড় পেকে গেল মূর্ত্তিপূজায়, পাকিল না শুধু প্রাণের দিক!
মন্ত্র, সে আজ কণ্ঠে তোমার, নিষ্প্রাণ, জড়, শব্দের হার,
মাটীর দেবতা মাটী থেকে যায়, অন্তরদেব জাগেনা তায়—
বাক্যবাহন উড়ে চলে হু হু, পথহারা প্রাণ বিপথে ধায়!

ক্রোধে আস্ফালি যখন বিপ্র তর্ক বাধাও পরস্পর
শূন্য ভাষায় তুচ্ছতা নিয়ে আরাধ্যের ঐ বেদীর পর—
করুণাবাষ্পে ভরে আসে আঁখি, শুদ্ধ নীরব দূরে বসে থাকি
আক্ষেপ জাগে বক্ষে কেবলি, আসল শূন্য রহিয়া যায়;
দেহে মনে প্রাণে, বাকো পূজারী দেবতারে কৈ খোঁজে ত চাব

হে পূজারি! তুমি যার পাশে বসি করিতেছ আজ পূজার ভাণ,
হয়ে গেছে সে পূজা। আলোকে উজলি একটী প্রাণ;
প্রতিমার ঐ মুখপানে চাও, বন্দনাভাণ দাও রেখে দাও—
কি তুলির টানে, চেয়ে দেখ, সরি, হাসে ও কমল-নয়ন দুটী,
কি গভীর প্রীতি আননে উছলি করুণা-ধারায় পড়িছে লুটি!

চরণ হইতে নয়ন অবধি শত জনমের সাধনা দিয়া
গড়েছে দেবীরে কে সে তন্ময় মাটীতে মাথায়ে সারাটী হিয়া?
অন্তরে যাহা নিত্য অরূপ, বাহিরে সে আজ একি অপরূপ—
প্রতিমার পানে ফিরালে নয়ন শিল্পীর প্রাণে যায় যে যাওয়া।
একান্তে ঐ যে প্রাণের অরূপে বাহিরে আনিয়া দেখিতে চাওয়া।

উপবীতধারি! উঠিয়া দাঁড়াও, পুণ্যের মাঝে থেকো না আর,
ভাস্কর থাক্ অপলক আঁখি রচনার পানে চাহিয়া তার;
মুগ্ধ মৌন, চাহিয়া, চাহিয়া তাহার দুখানি গণ্ড বাহিয়া
ঝরিয়া পড়ুক্ পূজার মন্ত্র ভকতি-সিক্ত নয়ন জল,
দর্শক-বুকে ফুটায়ে শতেক অম্লান পূত পদ্মদল।

মূর্ত্তি পূজার প্রবল তৃষায় ঘরে ঘরে আজ বাজিছে শাঁখ
নূতন মন্ত্রে, নব নব রসে, দেশের কবিতা! সাধক ডাক্;
ঐ শোন সারা আকাশে বাতাসে, মহাসাগরের গান ভেসে আসে,
উন্মাদ করি সন্ধ্যা উষার খণ্ডমূরতি পূজিতে চায়—
ছন্দে তাদের কিরণ ঝলকি' মর্ম্ম-কোরক দু'লায়ে যায়।

ব্রাহ্মণ যদি পূজারি আজিকে, পূজারি যদি বা সাধক নও;
আচণ্ডালের অন্তর তবে ব্রহ্মণ্যের সাধক হও;
বিশ্বামিত্র ঋষির মতন; আপনার তেজে জল প্রাণপণ
লুপ্ত-ভকতি বঙ্গ জুড়িয়া গঙ্গার ধারা ছুটায়ে দাও—
সকল দৈন্য, সকল সন্ধ্যা, ভক্তির স্রোতে লুটায়ে যাও।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

মুক্তি।

সমস্ত দিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর মাঝে মাঝে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। হাট, মাঠ, ঘাট, সবই জলে ভাসিতেছে; বৃষ্টির উৎপাতে রতনপুরের কেহই আজ দুই দিন ঘরের বাহির হয় নাই; কোন রকমে সঞ্চিত ধান-চালে দু'বেলার আহার জোগাড় করিয়া লইয়া নিজ নিজ দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্ট-মনে ধূমপান করিতেছে; আর ভাবিতেছে,—আকাশের কি আক্কেল! সূর্য্যদেব আজ দু দিন হইল উঠিয়া ডুবিয়া গিয়াছেন, আর উঠিবার নাম নাই; একঘেয়ে ভাবে থাকা কষ্টকর দেখিয়া দেবতার উপর সকলেই মাঝে মাঝে একটু ঝাঁঝও ঝাড়িতেছে। দেবতার কিন্তু সে দিকে কাণ নাই,—সে কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ রব বৃষ্টি দিয়া মানুষের সকল উদ্যম, আশা-ভরসা নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছে। এমন একটানা বৃষ্টি কেহ কখনও দেখে নাই; তাই রতনপুরে দেবতার একগুঁয়েমির জন্য বেশ একটু কটূক্তিও চলিতেছে। সবই জলে জলময়; কেবল দেখা যাইতেছে, কতকগুলা বড় গাছ, আর সেই সঙ্গে রতনপুরে বাবুদের বাড়ী; তাও বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঝোড়ো কাকের মতন মনে হইতেছে। এমন প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টি আর হইয়াছে বলিয়া গ্রামের অতিবৃদ্ধেরও মনে পড়ে না; সকলেই ভাবিতেছে, ধরণী রসাতলে যাইবে।

প্রকৃতির মনের সহিত মানুষের মনও কেমন একটা অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ। যখন বাহিরে এইরূপ দুর্য্যোগ চলিতেছে, তখন রতনপুরের বাবুদের বাড়ীর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহাদের যুবতী মেয়ে কমলা নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। বাহিরে প্রকৃতির কালি-মাখা রূপের সহিত তাহার অন্তরের কালি বেশ মিশিয়াছে দেখে, মুখে হাসির শুভ্ররেখা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল; সে বোধ হয় ক্ষণিক সমবেদনার উৎস; কিন্তু, আজ কয়মাসের ভাবনায় তার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; জগতে সব সুখ থাকিয়াও যেন তার কিছুই নাই! একবার মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া খিড়কীর ঘাটের দিকে দেখিতেছে, আবার আকাশের পানে চাহিয়া নিজের মন মিলাইয়া লইতেছে; দৃষ্টি তার স্থির; ভ্রূ কখনও কুঞ্চিত হইতেছে, আবার ছায় সংসারের

কথা ভাবিয়া কোন্ অজানা দেশ হইতে ফিরিয়া চক্ষের উপর পূর্ব্বের ন্যায় পড়িতেছে; বাতাসে এলো চুলগুলা মুখের উপর আসিতেছে; কিন্তু তাহা সরাইয়া দিবার অবসর তার নাই; সে যে সকলকার অলক্ষ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতেছে। কত চিন্তা, কত ব্যথা তার মনে জাগিতেছে, কে তার ইয়ত্তা করে? কয়মাসেই তার সোণার রংয়ে কালি প'ড়ে গিয়াছে; চুল-চুলে মুখখানি ক্রমশঃই জীর্ণ হইয়া আসিতেছে; কেবলই ভাবিতেছে, কেন সে বাঁচিয়া রহিল। সে জানিত না যে, ভাবনার অন্ত নাই; ক্ষুদ্র প্রাণে কত ভাবিবে? হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গিল; হাতের কাছে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া ছবি আঁকিতে বসিল; এ ছবি তার হৃদয়কন্দর হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে; প্রথম রেখাপাতে তাহা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল; সে জন্য সে উহা মুছিয়া ফেলিতেছে, আবার নূতন করিয়া আঁকিতেছে, কত যত্ন, কত আগ্রহে উহা রচিত হইতেছিল, তাহা এক অন্তর্যামী ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় নাই; সে চিত্র যে তার অন্তরের দেবতার ছবি! কত আকাঙ্ক্ষা, কত বাসনার ফলে সে যে তার দেবতাকে পাইয়াছিল। তাই আজ সে হারাণ রত্নকে অন্তরের ভিতর হইতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতেছে; যে সৌন্দর্য্য ছবিতে সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা চিত্রকরের শিল্পে আসা অসম্ভব; কারণ, সেত আর কার, মন, প্রাণ দিয়া ছবি আঁকে না। কমলা নিস্তব্ধভাবে ছবির দিকে দেখিতেছে; আর কতকটা প্রকৃতিস্থও হইতেছে; চেষ্টা তার, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলে। তার জীবনের শান্তি বা সুখ সবই ঐ ছবির উপর বাঁধা পড়িয়াছে। প্রাণে যখন ধাক্কা লাগে, মানুষ তখন অধীর হইয়া শান্তির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়; তাই সে অভাবটাকে মোচন করিয়া সুখ আনিতে ছুটে। কমলার তাহাই হইয়াছে; সে যে তার নিরুদ্দেশ স্বামীর জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। মনে তার পাপ ছিল না; তাই সে তার স্বামীর উদ্দেশে হৃদয়ের সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। যুবতীর নেত্র ছবিতে আবদ্ধ, বাহিরের জগৎ তাহার কাছে থেকে বহু দূরে সরিয়াছে। সে কেবলই তার অন্তরের অর্ঘ্যে ছবিকে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, এ সুখস্বপ্ন তার টিকিল না; হঠাৎ রুক্ষ কবাটে ঘা পড়িল; তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেখিল যে, কথা কি তার জন্যে আসিয়া ডাকাডাকি করিতেছে; দরজা খুলিতেই সে বলিল, "সারাদিন কি ঘরে বসে থাকবে দিদিমণি, সংসারে কি আর কোন কাজ নেই। যা ডাক্‌ছেন তোমার, এস।" কথাগুলি সে করিয়াই সে চলে গেল

করিয়া চলিয়া গেল; কমলাও তার আকস্মিক স্বপ্নভঙ্গে ক্ষ্যাপ্তমনে যার কাছে চলিল।

২।

রতনপুরের রায় বাবুরা বহুদিনের বনিয়াদি ঘর; কুলে, শীলে, ধনে ও মানে তাহাদের তুল্য লোক সে কালে ছিল না। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই ছিল; কিন্তু, চিরদিন সমান যায় না, ভাগ্যচক্রে তাঁদের অবস্থায় ক্রমশঃ রূপান্তর ঘটিল, সংসারে বহু পরিবার হওয়ায় আর তেমন বোল-বোলা রহিল না; কিন্তু, তাহা হইলেও এখন তাদের যা ছিল, তা অন্যের পর্ব্বত। কমলা ছোট বাবুর একমাত্র কন্যা; কাজেই শৈশবে সে যে আদর যত্ন পাইয়াছে, তাহা এখনও সমান ভাবে চলিতেছে; কেহ তাহাতে দুর্বী দাওয়া বসাইতে আসে নাই। বাপ মার একমাত্র সন্তান বলিয়া সে চিরকালই ঘরে থাকে; সচ্চরিত্র গরীবের ছেলে দেখিয়া তার বিবাহও হইয়াছিল; স্বামীর সহিত মনের সুখে আজ চার বৎসর হইল সে সেই ঘরেই ঘর করিতেছিল। কিন্তু, চিরকাল বাপের বাড়ীর আদর পাইয়া স্বভাবটা তার কিছু উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। বাপ মার যত্ন থাকিলেও সেদিকটা বড় বেশী মাত্রা ঘসা হয় নাই; কাজেই রূপ থাকিলেও গুণের কিছু খর্ব্বতা ঘটিয়াছিল। বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া কেহ তাহা লক্ষ্য করিত না; কারণ, পয়সায় সবই ঢাকিয়া যায় যে! মানুষ বুঝে না, রমণী রূপে শুধু সুন্দর হইলে হয় না, গুণে তার পূর্ণ বিকাশ, রূপ তার অভিব্যক্তি মাত্র, গুণেই তার সমাপ্তি; স্রষ্টার শিল্পেও নিত্যই ইহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কমলা একেবারে নিগুণ না হইলেও অনেক জায়গায় তার অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছিল।

৩।

বিবাহের পর কমলার স্বামী ভাবিয়াছিল যে, তার নূতন ঘরে জীবনটাকে বেশ সুখেই কাটাইয়া দিবে; সেজন্য সে নিজের বংশগত দৈন্যের কথা মনে করিয়া স্ত্রীর মন যোগাইয়া চলিত; ইহাতে মনের সুখ তার ঠিক ছিল কি না জানি না, কিন্তু, সকলেই বলিত যে উভয়ের মধ্যে মনের মিল বেশ হইয়াছে। অমরের চেষ্টা ছিল, কমলাকে ভাল বাসিতে; কমলা তার বিনিময়ে নিজ হৃদয়খানি দিয়াছিল বটে; কিন্তু, সময়ে সময়ে সে দানে কিছু সঙ্কোচ আসিত বলিয়া মনে হইত যেন সে এখনও হৃদয়খানি নিজের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। প্রেম পূর্ণ বিনিময়ে বাড়িয়া যায়; সে যে মোয়ামের ধন, ওটা তাতে লাগে না। স

জোয়ার এখনও কমলার হৃদয় ভাসাইতে পারে নাই; সে আত্মশক্তিতে বলীয়সী।

শ্বশুর বাড়ীতে অমরের দিনগুলা বেশ কাটিতেছিল; এতদিন কমলা তার বাপ-মার একমাত্র সন্তান ছিল, আজ অমর আসিয়া তাঁদের সে স্নেহ বন্টের উপর ভাগ বসাইল। অমর অনাথ হইলেও নূতন বাপ-মার যত্নে পুরাতনের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে লাগিল। ছোট বাবুও নূতন জামাই পাইয়া দ্বিগুণ ফূর্ত্তিতে তাঁর বাগান ঘর আরও সাজাইতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল; কেবল তাদের কীর্ত্তিকলাপের রেখা সময়ের বুকে অঙ্কিত রহিয়া গেল; সে বোধ হয় মানুষের ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য। কিন্তু, সে ত তার ভবিষ্যতের উপায় অতীতের দিকে চাহিয়া করে না; তাই তার পদে পদে বিপদ আসে। যে রাত্রে কমলার স্বামী "বাহিরে শুতে যাই" বলিয়া উঠিয়া গেল, সে রাত্রে সামান্য বচসায় পরস্পরের মধ্যে একটু মনান্তর ঘটিয়াছিল মাত্র; এমন কিছু হয় নাই যাহাতে অমর যুবতী স্ত্রীর শয্যাত্যাগ করে। কতদিন এর চেয়ে বড় রকমের কথা কাটা-কাটি হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও ত কিছু বিপর্য্যয় ঘটে নাই। আর, স্বামীস্ত্রীতে কোথায় বচসা না হয়; সংসারে ত ইহা নূতন নয়; তবে নিয়তি মানিলে সব কথায় প্রলয় ঘটিতে দেখা যায়। অমর বাহিরে গিয়া রুদ্ধ সদরের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া অন্ধকার রাত্রে পথ বহিয়া চলিতে লাগিল। সে জানে না কোথায় যাইতেছে; সংসারে ত আর তার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই; একবার ভাবিল, ফিরি কমলার কাছে; রাগ ত তার ক্ষণিকের জন্য হইয়াছিল, এখন ত তাহা নাই। আর কমলা ছেলে মানুষ; সে মা বুঝিয়া তাঁর হীনবস্থার কথা তুলেছিল। তাহাতে কি রাগ করা ভাল। হৃদয়ের আবেগে একবার বাড়ীর দিকে ফিরিল; তার পর ভাবিল, কই মামিত বাহিরে যাই বলিয়া এসেছি, কেহ ত আমার খোঁজ করিল না; তবে কেন আর ফিরিব। অভিমানে তার হৃদয় ভরিয়া গেল; সে আবার পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যুষেই তার অনেক খোঁজ খবর পাওয়া গেল, কিন্তু, কোথাও পলাতকের সন্ধান পাওয়া গেল না। "তার পর কত মাস গতীতের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, অমরের কোনও খবরই আসিল না।" আশাপথ চাহিয়া আর কতদিন কাটে? কমলাও মনের ভিতর গুমরাইতে লাগিল; বুঝিল, তার দোষেই অনর্থ ঘটিয়াছে। [illegible] জোয়ার আসিবার উপায় নাই।

মা'র ডাকে কমলা বরাবর তাঁর শয়নকক্ষে গিয়া হাজির হইল। তখন সাঁঝের আলো গ্রামের অনেক ঘরেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং রাত্রিও অনেক রুমিয়া গিয়াছে; তবে লজ্জাবিলয় নারীর মত সে তার আবরণ এখনো বাহে তুলিয়া লইতে কিছু সঙ্কুচিত হচ্ছিল। কমলা মার কাছে গিয়া বসিলে মা তাঁর শীর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া "কেন মা কমলু শরীরটা মাটি করেছিস্; বাবুত অমলের জন্যে কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; আমিই বড়ই দুর্ভাগ্য, তাই এমন হইল" বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কমলা মাথা হেঁট করে নিরুত্তর রহিল। মা আবার বলিতে লাগিলেন, "যা হয়ে গেছে তার ত আর উপায় নাই; সকলেই বলছে যে যখন কোন খবর নাই, তখন সে নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিয়াছে" বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কেন আর ভাবিস, বাবু পাঁচজনের মত বলিয়াছেন; তাঁরা সকলেই বলছেন নূতন করে ঘরসংসার পাতিয়া দিতে। তাতে কিছু দোষ আসে না।" কমলা এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিল। হঠাৎ এ কথায় তা'র হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া গেল। সে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, তা' কেমন করে হতে পারে; হিন্দুরমণী কখনও কি দ্বিচারিণী হতে পারে? সে পাতান সংসার আমি চাহি না।" কথাগুলি বলিয়াই সে আবার তার বুদ্ধ চিন্তার মধ্যে আশ্রয় লইল। জননী ছাড়িবার পাত্রী নহেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবু ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের মত আনাইয়াছেন; তাহাতে তোর আবার সংসার করিতে কোন আপত্তি নাই; বাবুরও ইচ্ছা এতটা সম্পত্তি রক্ষা করিতে একজন উপযুক্ত অভিভাবক না হইলে সবই ছারখার যাইবে; ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে একবার বুঝে দেখ।" কথাগুলা কমলার ভাল লাগিল না; কিন্তু, তবুও সেগুলা তার প্রাণের মধ্যে খুব জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল; কখনও ত সে এমনটা শুনে নাই, কাজেই উহাতে ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম আছে, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে নিরুত্তর রহিল। ঠিক এই সময়ে তার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই মেয়ের ভাবনা তাঁকে জর্জ্জরিত করিয়াছিল। কতকটা স্নেহের প্রেরণায়, কতকটা সমাজের মত তিনি তার কমলুর দ্বিতীয়বার বিবাহে পক্ষপাতী ছিলেন; স্ত্রীর কাছে সম্মত হইয়াছিলেন। আর পাড়ার লোক,—সে ত সব তাঁর বন্ধুবান্ধব

এতকাল তাঁহার বুদ্ধিতেই তারা চলিতেছে; সকল ক্রিয়া কর্ম্মেই ছোট বাবু হাজির। যখন পাড়ার জন কতক মুরুব্বি লোককে ডাকিয়া কমলার আবার বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অনুশাসন নির্দ্দেশ করিলেন, তখন সকলেই ছোট বাবুর বুদ্ধিপ্রাবর্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিল না। আর তাহারা সকলেই যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে, তাহাও বলিয়া দিল। কমলাকে আজ একলা পাইয়া পিতার বেশ সুবিধা হইল। তিনি সকল কথা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং মেয়ের মঙ্গলের জন্যই যে ঐ সব ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। এদিকে বাপ-মার আদেশ, আবার ওদিকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার ভয়; কমলা কোন্ দিক্ সামলাইবে? জীবনে কখন ত সে বাপ-মা'র আদেশ লঙ্ঘন করে নাই; আজ সে তার বিপক্ষে যায় কি করে? আবার পিতা বলিতেছেন, বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত। কমলা বিষম সমস্যায় পড়িল; চিন্তায় ঘরস্রোতে পড়িয়া সে তুকূল হারাইতে বসিল। ভাবনার বুঝি বা অন্ত নাই; ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত ভাবনা সে আর পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতে পারিল না; রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যা ভালো বুঝেন, করুন।" পিতা কন্যার কথায় আশ্বস্ত হইয়া তা'র চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন; আর মা কমলায় নূতন ঘর সাজাইবার অবসর পাইবেন ভাবিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

৫।

যখন অমরের কোন খবরই পাওয়া গেল না, তখন ছোট বাবু অনন্যোপায় হইয়া আবার গৃহকর্ম্মে মন দিলেন; আর সেই সঙ্গে কমলার ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য একটা চিন্তা ক্রমশঃ আসিয়া তাঁর হৃদয় অধিকার করিল। গ্রামে অমরের কথা আর কেহ ভাবে না; কেবল তা'র যুবতী স্ত্রী সময়ে সময়ে তা'র স্মৃতিটাকে সাগ্রহে করিয়া তুলে। ধ্যানে সে তা'কে পাইতে চেষ্টা করে; সে ক্ষণিকের জন্য আসে, কিন্তু আবার দূরে সরিয়া যায়। কতকাল এইরূপে কাটিল। ছায়ার অনুসরণ করিয়া আর ত চলে না; কমলা হতাশ হইয়া পড়িল। তা'র মন বাস্তবের দিকে ফিরিল; কিন্তু, তাহাতে ত তা'র শান্তি নাই; সে যে রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া উদাস প্রাণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অমর রতনপুর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহু দূরে থাকিয়াও সে কমলাকে ভুলিতে পারিল না; ঘৃণায় লজ্জায় চলিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু, তা'র মন কমলাকে দেখিবার জন্য আন্‌চান্ করিত।

বিবাহ আসরে নানাদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া জুটিল। ব্যবস্থাও যজ্ঞ-সুদায় মধুর আওয়াজে; শাস্ত্রের জীর্ণপত্রের মধ্যে উহা ক্বচিৎ দেখা যায়। সে মধুর নিক্কণ দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়াছিল, তাই বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতেরা আজ রায় বাবুদের বাড়ীতে মধুচক্র রচনা করিয়া বসিয়াছেন। বিবাহ গোধূলিলগ্নে হইবে। সানাইয়ের বাজনা সমস্ত দিন ধরিয়া তা'র আনন্দ উৎস নিমন্ত্রিতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছে। অন্দরে ছোট বাবুর স্ত্রীর তিল মাত্র বিশ্রাম নাই; সে কেবলই এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া চরকীর মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রমে শুভমুহূর্ত্ত আসিল; বর ক'নে আবার হাজির; বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য্য সব আরম্ভ হইল। হঠাৎ আসরে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে বলিয়া সোরগোল পড়িয়া গেল। সে কে বা কোথা হইতে আসিয়াছে, কেহই তাহা বুঝিল না। কথা বলিলে কোন উত্তর দেয় না, কেবল ইঙ্গিতে ইসারায় তা'র মনোভাব জানায়; সে আসে নাই যাইতে, সে আসে নাই রসিতে, কেবল আসিয়াছে সে বিবাহ আসরে তা'র অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে। প্রথমে কেহই তাকে আমল দিচ্ছিল না, কিন্তু, ক্রমে তা'র হাব ভাব দেখিয়া সকলেই তা'কে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে লাগিল। অভিপ্রায়টা তা'র কি, এখন সকলেই জানিতে পারিল, তখন কেহই তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না, কারণ শুভকার্য্যে সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ ভবিষ্যতে মঙ্গলেরই সূচনা করে। অপরিচিত ক্রমশঃ বরক'নের কাছে গেল। কমলা ঘোমটার ভিতর দিয়া স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল; কি দেখিল সেই জানে, কিন্তু তার বুক দুলিল না। দুঃখে, ঘৃণায় ও লজ্জায় কে যেন তার বুক চাপিয়া ধরিল; এত আমোদ প্রমোদ সবই যেন তা'র চোখে বিষময় বোধ হইতে লাগিল। সে আসর ছাড়িয়া অন্তঃপুরে তার নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাহারও আদেশ, কাহারও সান্ত্বনা সে মানে না; কেবলই বলে "ঐ যে আমার হারাণ রতন আসিয়াছিল।" ব্যাপার দেখিয়া বিবাহসভায় সকলেই অবাক্; অনেকে ভাবিল মেয়ে পাগল হইয়া গিয়াছে। ছোট বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল; কমলাকে কত সাধ্য সাধনাও করিল, কিন্তু কিছুতেই আর আসরে আনিতে পারিল না; সে যে এতদিন লক্ষ্যহারা হইয়া বেড়াইতেছিল, আজ সে লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে, তা'কে ফেরায় কে? সন্ধ্যের সন্ধান পাইলে মিথ্যা কে ধরিতে যায়। সভায় গোল মাল দেখিয়া নিমন্ত্রিতের দল ক্রমশঃ পাতলা হইয়া গেল। আর এদিকে গতিক ভাল নয় দেখিয়া বরও পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

ব্রহ্মচারীর বেশে সে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত হইলেও গৃহীর সব লক্ষণই তাহাতে থাকিয়া গিয়াছিল; কারণ, ধ্যানে তার কমলা, মনে তার কমলা কেবলই জাগিত। এমন লোক কি কখনও কৌপীন পরিলে সন্ন্যাসী হইতে পারে? দূরে থাকিয়াই সে কমলার সন্ধান পাইতে লাগিল; রতনপুরে কবে, কোথায় কি হইতেছে, সবই সে জানিতে পারিত। কতবার দুর্দমনীয় ইচ্ছার বেগে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু, আবার নিজেকে সামলাইয়া যেখানকার মানুষ, সেইখানেই রহিয়া গেল।

৬।

বৈচিত্র্যময় জগতে ঘটনার সমাবেশ হইতে দেরী লাগে না; পুরাতন যায়, নূতন আসে; কত কথা, কত কার্য্য মানুষ অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিটুকুও ক্রমশঃ লুপ্ত হয়; আবার নূতন করিয়া আসিয়া পুরাতনের ভিতিতে স্বরাজ্য স্থাপন করিয়া বসে। জগতে এ নিয়ম কতদিন ধরে চলছে তা ঠিক বলা যায় না, তবে রতনপুরে অমরের গৃহত্যাগের পর সকলে সকল কথা মনে রাখিলেও উহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। সময়ে হৃদয়ের সব দাগগুলি আস্তে আস্তে মিলাইয়া যায়; ছোট বাবুরও তাহাই হইল। সংসার বজায় রাখিবার জন্য তিনি আবার নূতন ছেলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গ্রামের মুরুব্বিরা কত ছেলের খবর আনিল, কিন্তু, তাঁহার চক্ষে এক সুকুমার ছাড়া আর কেহই মনের মতন হইল না। সুকুমার দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেও কুলে ও শীলে সে গ্রামে সকলকার শীর্ষস্থানীয় ছিল; টানা টানা চোখে ও মাজা রঙে তা'কে বড় ভাল দেখাইত। আর সকলকার দৃষ্টির পথে সে চিরকাল রহিয়াছে, কেহই ত তা'র বদ্‌চাল কখনও দেখে নাই। প্রথমে তা'র বাপ মা ছোট বাবুর মেয়ের সহিত বিবাহে রাজী ছিল না; কিন্তু, পয়সার খাতিরে কিছুই আটকায় না। অতটা সম্পত্তির অধিকারী হওয়া বড় কম ভাগ্যের কথা নহে। তা'রা উভয়েই মত দিল।

বিবাহের দিন ক্রমশঃ কাছে আসিতে লাগিল। রায় বাবুদের বাড়ীতে আবার পাতা পড়িবে ভাবিয়া গ্রামের লোক উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতদিন বাবুদের মনের অবস্থা খারাপ থাকায় সকলেরই একঘেয়ে রকম খাবারে অরুচি হইয়া গিয়াছিল; কাজেই মুখ বদলাইবার অবসর পাইয়া সকলেরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কর্ম্মক্লান্ত ছোটবাবু মেয়ের আবার বিবাহে কোন আয়োজনেরই ত্রুটি করিলেন না। প্রথমটা অনেকেরই খট্‌কা লাগিয়াছিল বলিয়া

এ অচিন্তনীয় ঘটনার পরক্ষণেই সন্ন্যাসীর সন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু, জন-কোলাহলে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহই তাহার খোঁজ পাইল না।

৭।

ক্রোধ দাবানলের সৃষ্টি করে; দেবতা ক্রুদ্ধ হইলে স্তব স্তুতিতে তাঁহার ক্রোধ শান্ত হয়, মানুষ কিন্তু, অল্পেতেই তা'র মনের আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। যখন কন্যার বিবাহে ছোটবাবু ব্যর্থমনোরথ হইলেন; তখন হইতে তাঁহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। যে কমলা তাঁহার চক্ষে ননীর পুতলী ছিল, সে আজ তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে; তা'র কথায়, তা'র কাজে তিনি দোষ দেখেন; যে আহারের সময় কাছে না বসিলে খেয়ে পেট ভরিত না, সে এখন কোথায় থাকে; কি করে, তা'র খোঁজ রাখেন না। সংসারে কোন ত্রুটি ঘটিলে কমলার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না; দৈবাৎ স্ত্রী যদি মধ্যস্থ হইতে আসিত ত সে মেয়ের গর্ভধারিণী বলিয়া বেশ দু'কথা শুনিয়া যাইত। দিনের পর দিন তাঁর রাগ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে রাগ কেবল তাঁর জিদ্ বজায় রহিল না বলিয়া। কমলা যে ঘরে একাধিপত্য করিয়াছে, এখন সে সেই ঘরেই লাঞ্ছিত চোরের মত বাস করিতেছে। ভাবনায়, অনশনে ও অবিরাম অশ্রুপাতে তা'র শীর্ণতনু খানি ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে; এমন করিয়া সে ক'দিন বাঁচিবে? যে হৃদয়-দেবতার পাদপদ্মে তা'র জীবন অর্ঘ্য দিয়াছে; সে ত নির্ম্মমভাবে চলিয়া গেল; কপাটে তা'র এক্ষ আঘাত করিতেছে, কই সে ত সাড়া দিচ্ছে না। তবে আর ছার জীবন কি হইবে? কমলা দেহপাত করিয়া দিনরাত কেবল তাই ভাবে।

বছরের পর বছর কাটিয়া যাইতে লাগিল; কমলার মনের ভাব পূর্ব্ববৎই রহিল। প্রাণে তা'র বল নাই, হৃদয়ে তা'র উদ্যম নাই; তরুণী হইলেও দৈবের তাড়নায় সে আজ বার্দ্ধক্যে আসিয়াছে। জীবনটা যে টানিয়া বাহির করিবার নহে; তাহা হইলে সে বোধ হয় তাহাও করিত। পোড়া কপাল তা'র পুড়িয়া গিয়াছে, সহানুভূতি পর্য্যন্ত কেহ করিবার নাই। একা রমণী সে কত সহ্য করিবে? ইহার উপর আর এক নূতন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়ের মাই তা'র নিত্য খবর লইতেন; কথার অবাধ্য হইয়াছে বলিয়া মেয়ের প্রতি কখনও বিরূপ হইতেন না; হাজার হ'ক মা'র প্রাণত বটে; কিন্তু, সে সুখেও বিধি বাম সাধিল। সে বন্ধনে কমলার রতনপুরে থাকা, হঠাৎ তাহা খসিয়া পড়িল। মা তা'র হৃদরোগে প্রাণ হারাইল।

ভীষণ শূন্যতার মধ্যে কমলার হৃদয় আরও শূন্য হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে কেবল বাপের সেবার জন্য পড়িয়া রহিল। বাপ তাহাকে চাহে না; কিন্তু, সে জানে,—পিতা স্বর্গ, পিতাই তা'র মোক্ষ; দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহারই পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। মা থাকিতে বরং তা'র নিজস্ব ভাবনার পরিচয় পাইত, কিন্তু, এখন আর তা'র সে সময় নাই। সর্ব্বদাই বাপের কাজে ব্যস্ত। বাপ তাহা বুঝিত না, বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই; শুধু জানিত যে, সবই তা'র লোকজনে করে। স্ত্রীবিয়োগের পর মন তা'র অবসন্ন; শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কমলা ভগ্নহৃদয়ে বাপের চেহারার দিকে লক্ষ্য করিত, আর মনে মনে প্রমাদ গণিত। কিন্তু, বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে?

৮।

শুধু অর্থে মানুষের সুখ হয় না, মনের সহিত সুখের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সে সম্বন্ধ শরীরকে তাজা না রাখিতে পারিলে মনও দমিয়া যায়, সুখের বাণী শুনিতে পায় না। জমিদারী হইতে ছোটবাবুর যথেষ্ট আয় থাকিলেও ভাঙ্গা শরীরে আর তার কিছু ভাল লাগে না; সংসারে থাকিতে হয় তাই থাকে; গ্রামের লোক আর বড় দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে না; নির্জ্জনে নীরবে আসিয়া সর্ব্বদাই কি ভাবে। বাড়ীর ভিতর একা কমলাই বাপের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করে। বাপই তা'র এখন জীবনের ধ্রুবতারা, তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই তবে তা'র মঙ্গল। বাপের মাথা ধরিলে সে তা'র কত সেবা করে, বাপ তাতে কুণ্ঠিত হন কি না জানি না, কিন্তু, আজ কয়বৎসর ধরিয়া মেয়ের সহিত কেহ তাঁহাকে কথা কহিতে শুনে নাই। এমন করিয়া বেশীদিন আর চলিল না; ভাগ্যচক্রে তা'র নূতন বিপত্তি রচিত হইতে লাগিল।

পিতা গুমরাইয়া গুমরাইয়া এক নূতন রোগের সৃষ্টি করিলেন; গ্রামের কবিরাজ প্রথমে কি হইয়াছে বুঝিতে পারিল না। পরে যখন রোগ চাপিয়া বসিল, তখন বুকের অসুখ বলিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া রোগের প্রসার বাড়াইয়া দিল। কমলা দিনরাত বাপের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকে; চোখে তা'র ঘুম নাই, পেটে তা'র আহার নাই; সে কেবলই ভাবে, কি করিয়া বাপকে রক্ষা করিবে? কিন্তু মানুষের ভাবনায় কি আসে যায়! ত চেষ্টায় রোগের বাড় কমাইতে পারিল না; সবই জলে ভাসিয়া গেল! পিতা তার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া মৃত্যুর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। যে দিন তার কিছু ঘনাইয়া আসিল, সেদিনও সূর্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় নিজ রশ্মিজালে জগৎকে

রাখিয়া ফেলিয়াছে ; বাহিরের সকল কাজই সুখেনের চলিতেছে। কেবল সেই কর্ম্মশয্যার পার্শ্বে তার হৃদয়খানি তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অতি নাড়ী হঠাৎ থামিয়া গিয়া দেহপিঞ্জর হইতে তার পিতার প্রাণ বাহির করিয়া দিল। অনন্তের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ ; সে তাই পৃথিবীর সুখ, দুঃখ, বাসনা ও তৃষ্ণা সবই পিছনে ফেলিয়া অনন্তের উল্লাস লইতে গেল। কমলা পিতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িল। রায় বাবুদের বাড়ীতে সেদিন লোক ধরে না ; সকলেই তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া মৃতের সম্মান করিতে লাগিল।

অর্দ্ধোচাস্তে কমলা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন নিজের ঘর সংসার সামলাইতে আরম্ভ করিল, তখন হঠাৎ একদিন বাপের হাতবাক্সে একখানি উইল তার চোখে পড়িল। সে উহা পড়ে, আর পাষাণের মত আড়ষ্ট হইয়া যায় ; কান্না পড়িল, কিন্তু মর্ম্ম তার একই বুঝিল। পিতা এ কি করিল, ভাবে আর অবসাদে তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। উইলে সমস্ত সম্পত্তি ছোটবাবু সুকুমারকে দিয়া গিয়াছেন ; সামান্য মাত্র কেবল কমলার নামে আছে। রাঙা ভাতে এমন করিয়া ছাই পড়িতে সে আর কখনও শুনে নাই। একবার ভাবিল, পিতার দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলি। মনে কতকটা জোরও আনিল ; কিন্তু ভরসায় কুলাইল না। শেষে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ঠিক করিল যে, সংসারে থাকিলেই ত যত বিপত্তি,—দূরে থাকিয়া বাসনার নিবৃত্তি করিবে। আর প্রেমনিকৃষ্ট মানুষের প্রতি না দেখাইয়া ভগবানে উহা অর্পণ করিলে তার পরকালের ভাবনা আর ভাবিতে হইবে না। ত্রস্তগতিতে উঠিয়া উইলখানি সুকুমারের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া কমলা নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল।

৯।

অমর অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সকল আশা নির্ম্মূল হইল দেখিয়া, বিবাহসভা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। নিভৃতে থাকিয়া সে এতদিন যার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত, তা'র দ্বারা এ কার্য্য ঘটিয়া উঠিতে পারে, তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে যে নিজের দর্পণে কমলাকে দেখিতেছিল। কমলা তা'র বিশ্বাস হারাইল, এ কথা সে কেমন করিয়া মনে আনিবে ? কিন্তু সে যদি জানিতে পারিত যে, এ ব্যাপারে কমলার কোন দোষই ছিল না, তাহা হইলে সে এমন করিয়া বিমুখ হইত না। অমর রমণী জাতির উপর অবিশ্বাসী হইয়া উঠিল। বিবাহ হইতে কমলা যে বিবাদের কালিমা ছড়াইয়া দিয়াছিল, সে খবর সে জানিত না ; কাজেই বোধ হয়, কমলাকে সে নূতন করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইত। যে প্রেম

রমণীকে দিয়াছিল, তাহা এখন নিকৃষ্ট বলিয়া তা'র মনে হইতে লাগিল ; সে উর্দ্ধ-মুখে বিশ্বপ্রেমের দিকে ছুটিল। কমলার স্মৃতি তা'র হৃদয়পটে মুছিয়া গেল। বৃন্দাবনে আসিয়া অনুদিন তা'র যা রূপান্তর ঘটিয়া, তা মানুষের শতবর্ষের সাধনায় হয় কিনা সন্দেহ। সে তখন ঘোর ত্যাগী সন্ন্যাসী। সংসার তা'র বহুদূরে আসিয়া গিয়াছে। এমন ধাক্কা না খাইলে কি আর মানুষ চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধানে ফিরিতে পারে ? জগতে ঘাতপ্রতিঘাত নিয়তই ত চলিতেছে. ক'টা মানুষ তা'র সাড়ায় জাগ্রত হয় ?

কমলারও সংসারে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। সে বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে বৃন্দাবনে আসিল। প্রাণ তা'র ছুটিয়াছে অনন্তের পথে ; সে তা'ই ব্যাকুল হৃদয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরিতেছে। সাধনায় কি না পাওয়া যায়। যে কুঞ্জে অমর তা'র অভীপ্সিতের অর্চ্চনা করিতেছিল, খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই খানেই সে উপস্থিত হইল। রমণীকে অমর চিনিতে পারিল না, কারণ, সে যে তখন সাধনায় অনেক-খানি ধাপ অতিক্রম করিয়াছে। রমণী কিন্তু, তা'র দৃষ্টিতে পরিচয় পাইল। প্রাণের আবেগটা চাপিয়া ধরিয়া সে আর পার্থিব সুখের দিক দেখিল না ; দেখিল কেবল সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষাবিরহিত আঁখিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির ধ্যানে ও সেই মূর্ত্তিরই জ্ঞানে তা'র জীবনের যত কিছু বাসনা বা তৃষ্ণা নিমেষের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইল। কৃষ্ণপ্রেমে আবার তা'র মরা গাঙ্গে বান ডাকিল ; সে উদ্দাম তরঙ্গে ভাসিল—শুধু একা কমলা নয়,—জগৎসংসারও তা'র সঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

২। বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ।

Sadi was assuredly one of the most gifted men of genius that the world ever known; a man of large and comprehensive intellect, an original and profound thinker, an accurate observer of men and manners; and his works remain the imperishable monument of his genius, learning and industry. W. A. Clouston.

পারস্য-সাহিত্য যে সমস্ত মহামনীষাসম্পন্ন লেখকগণের রচনা-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধি লাভ করে, "হাজার গানের বুলবুলি" শেখসাদী তাঁহাদের অন্যতম। কবি শেখসাদী ভগবৎপ্রেরিত পুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে পারস্যে নিম্নলিখিত গজল প্রচারিত—

দারশি-ইর সিতান পাই আমবারান আন্দ
কোয়ালিমত কী জুমলাগবারি আন আন্দ;
কারদুসী ও আনওয়ারী ঔসাদী
হার্ন চাঁন্দ কী লা নাবিয়া বা আদি।

অর্থাৎ যদিও পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছেন "আমার পর আর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না; তথাপি কবিদের মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎপ্রেরণায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পয়গম্বররূপে ভক্তি ও পূজা পাইবে। ফারদুসী বীররস-কাব্যে, আনওয়ারী বিষাদসঙ্গীতে ও সাদী গজল বা গীত কাব্যরচনায় চির-অমরত্ব লাভ করিবে।

বিগত ভাদ্রমাসের সাহিত্যে কবির জীবনী আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার জগদ্‌বিখ্যাত কাব্য বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর নামোল্লেখ করিয়াছি। আজ আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই কাব্যদ্বয়ের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম।

শেখ সাদি সর্ব্বশুদ্ধ বাইশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং এই কাব্যদ্বয়ই বিশ্বসাহিত্যে সমধিক আদৃত ও প্রসিদ্ধ। কবির জীবনীলেখক হাজি লুতিফ আলি খাঁ তাঁহার "আতিশ কাদা" নামক গ্রন্থে সাদিকে পারস্যের কবি সম্রাটরূপে সম্মানিত করিয়াছেন; তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পারস্যের কাব্যকুঞ্জে ফার্দুসী, আনোয়ারী,

পারস্যের কাব্যকুঞ্জে শেখ সাদির স্থান।

নেজামি এবং শেখ সাদির অপেক্ষা কেহই অধিকতর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। (১) হাজি লতিফ আলিখাঁর সাহিত্যগুরু, তাৎকালিক বিখ্যাত লেখক মীর সৈয়দ আলি মশটক পরম শ্রদ্ধাভরে কবি শেখ সাদিকে "হাজার গানের বুলবুলি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। (২)

"হাজার গানের বুলবুলি"

কবির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভালোকের উজ্জ্বল রশ্মিপাতে কাব্যের প্রতি বিভাগই সমুজ্জ্বল।

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ কাব্যমধ্যে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠোপযোগী বিষয় আছে। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসকার Prof. E. G. Brown. সাদির রচনাবলীকে microcasin of the East" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩)

ফার্দ্দুসি ও আনওয়ারী এই দুই কবির রচনায় যেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাসের প্রাতিশয্য, দুর্ব্বোধ্যতার আধিক্য, সাদির রচনা সেরূপ না হইলেও উহাতে পবিত্র ভাব ও লৌকিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই তিনেরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিউদ্দিন আটার, জেলালুদ্দিন রুমি, ওমর খৈয়াম, হাফেজ প্রভৃতি সুফি কবিগণের দুর্ভেদ্য রহস্যজাল সাদির কাব্যকে আচ্ছন্ন করে নাই।

তুলনায় সমালোচনা।

বোস্তাঁ কাব্যে কবি নিজ জীবন ও পর্য্যটনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোস্তাঁকে কবির আত্মজীবনী বলিতে পারা যায়। সমগ্র জীবনে সঞ্চিত জগতের পাণ্ডিত্য অভিজ্ঞতার কথায় গুলিস্তাঁ পূর্ণ। কর্ম্মক্লান্ত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের সায়াহ্নে নন্দনকাননের সুষমাপূর্ণ সিরাজের এক নিভৃত পল্লীতে বসিয়া কবি খৃষ্টীয় ১২৫৪ বৎসরে বোস্তাঁ রচনা করেন। তৎপর বৎসরে গুলিস্তাঁ রচনা

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ রচনা

---

(১) Shaik Sadi is the most eloquent of writers and the wittiest author either modern or ancient times, and one of the four monarchs of eloquence and style. * * None has appeared since the first rise of Persian Poetry who can claim a superior place to Firdusi of Tus, Nizami of Kum, Anwari of Abward and Shaik Sadi of Shiraj.

English translation of Afishkada of Hazi Latif Ali Khan. by Prof Eastwick.

(২) * * My master, the august and felicitous, Mir Syed Ali Mostak used to call Shaik Sadi, the Nightingale of a thousand song, intending to express that in every branch of poetry he displayed the perfection of genius."

English translation of Afish Kada by Prof. Eastwick.

(৩) Prof. E. G. Brown এর History of Persian Literature দেখুন।

করেন। যে যুগে কবি তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ কাব্যদ্বয় রচনা করেন, সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়োরোপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তখনো প্রতীচ্য জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হয় নাই। প্রাচ্য দেশ তখন জগতের অন্ধকার দূরীকরণ মানসে মুক্তহস্তে জ্ঞান বিতরণ করিতে ব্যস্ত। (৪)

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ পাঠে জানা যায়, এই জগদ্বিখ্যাত কাব্যদ্বয় রচনা করিতে কবির জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান্ সময় ব্যয়িত হইয়াছে। (৫) কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে এই দুই কাব্যের জন্ম ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন। বোস্তাঁর জন্মকথা কবি এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—"জগতের অনেক দেশ পর্য্যটন ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সংসর্গে কাল কাটাইয়াছি। প্রত্যেক দেশ হইতে আমি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু সিরাজরাসীর মত সাধু-চরিত্র, ভক্ত মানব আর আমি কোথাও দেখিলাম না।—সিরাজের উপর ভগবানের অসীম করুণা বর্ষিত হউক।—এই কারণেই আমি যখন শিরিয়া ও তুরস্কে বাস করিতেছিলাম, তখন আমার সমস্ত প্রাণ সিরাজের উপর পড়িয়া থাকিত। প্রিয় বন্ধুগণের নিকট জগৎরূপ বাগান হইতে আমাকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে ভাবিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়া বলিতেছিলাম, প্রত্যেক পর্য্যটক তাঁহাদের প্রিয়-বন্ধুগণের প্রীতির জন্য মিশরের মধুর ইক্ষু উপহার আনিবে, আমার নিকট যদিও চিনির মোওা নাই, তাহা হইলেও, ইক্ষু অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট বাক্য আছে। আমি মিষ্ট বাক্যরূপ যে চিনি লইয়া আসিয়াছি, যদিও তাহা ভক্ষণ করা যায় না তথাপি সত্যান্বেষীরা পরম শ্রদ্ধাভরে ইহা গ্রহণ করিবে। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদরূপ আমার এই বোস্তাঁ রচনা শেষ হইলে, ইহাকে দশ দরজা রূপ দশম অধ্যায়ে বিভক্ত করিলাম। হিজরীর ৬৫৫ বৎসরে এই রিখ্যাত রত্নাগার মুক্তারূপ বাগ্মিতায় (pearls of eloquence.) পূর্ণ হয়।" গুলিস্তাঁ কাব্যের জন্ম ইতিহাস এইরূপ :—"একদিন রাত্রিকালে অতীত কালের কথা ভাবিয়া অতি-

বোস্তাঁর জন্ম কথা।

(৪) "When we consider indeed, the time at which it (Guli-tan) was written, the first half of the thirteenth Century a time when gross darkness brooded over Europe, at least—darkness which might have been felt—it was not felt the justness of many of its sentiments and the glorious views of the Devine attributes contained in it, are truly remarkable.

Prof. Eastwick অনূদিত গুলিস্তাঁনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(৫) মূলগ্রন্থের শেষ ভাগে সংখ্যার সহিতে প্রকাশিত লিখিত কবির জীবন-কথা পাঠ করিতে পারেন।

জীবনের জন্য অনুতাপ করিয়া পাষাণে রচিত হৃদয়মন্দিরকে অশ্রু বিন্দুরূপ হীরক খণ্ড দ্বারা বিদীর্ণ করিতেছিলাম ; এবং আমার মানসিক অবস্থানুযায়ী একটী কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, সমাজে বাস না করিয়া নির্জ্জনেই আশ্রয় লইব। বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া কাল-হরণ করিব না। একদিন আমার এক প্রিয়বন্ধু আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর সহাস্যবদনে মহা উৎসাহের সহিত

ঔলিপ্তার জন্ম কথা।

কৌতুক ও স্নেহরূপ কার্পেট বিস্তৃত করিলেও, আমি বন্ধুর কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ভূমি হইতে মস্তক না উঠাইয়া মৌনী হইয়া রহিলাম। বন্ধু ব্যথিত অন্তঃকরণে আমাকে বলিলেন, "হে বন্ধো, কথা কও, আজ তোমার কথা বলিবার শক্তি আছে, নানকে কথা কও, যেহেতু কাল যদি তোমার মৃত্যু হয়, তোমাকে কাল আর কথা বলিতে দিবে না।" আমার সহচরেরা আমার প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল, "আপনার বন্ধু আজ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন সেই কারণ মৌনী হইয়া রহিয়াছেন, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রস্থান করুন, অথবা যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।" তিনি বলিলেন, আমাদের পূর্ব্ব বন্ধুত্ব ও ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, যতদিন না আমার বন্ধু আমার সহিত পূর্ব্বের মত সহাস্য বদনে বাক্যালাপ করিতেছেন, ততদিন আমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব না এবং বন্ধুর সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।" বন্ধুকে স্নেহ দেওয়া অথবা ত্যাগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তও যখন দুঃসাধ্য নহে। (৩)

তখন বন্ধুর সম্মুখে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা নিতান্ত অভদ্রজনোচিত ভাবিয়া আমি বন্ধুর সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না ; বিশেষতঃ সে আমার জীবনের সুখ-দুঃখের দোসর, অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সুতরাং বাধ্য হইয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া আমরা উভয় বন্ধু মিলিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। বসন্তকালে হিমবর্ষণ-সমুচিতা প্রকৃতি পত্রপুষ্পশোভিত হইয়াছে ; চারিধারে নবত্বের ঢেউ বহিতেছে। বসন্তসুন্দরী আপনার কচি-রূপলাবণ্য ছড়াইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে লাবণ্যবিভাসিত করিয়াছে। প্রেম ও সঙ্গীতের ধারায় জগৎ

(৩) কোরাণের মতে মুসলমানেরা হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তিন দিবস উপবাস করিয়া অথবা দশজন ভোজন করাইয়া কিম্বা একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন।

প্রবিত। বুলবুলের ঝঙ্কারে দ্রাক্ষা ও হেনার সুরা দিগুণিত হইতেছে। সমস্ত পথে বিশিরবিন্দু পতিত হইয়া দেখাইতেছে, যেন সুন্দরীর গোলাপ-বিনিন্দিত গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু-মুক্তা ঝরিতেছে! আমরা দুই বন্ধু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ফলবাগানে বেড়াইতেছিলাম; এই বাগানটী অতীব মনোহর। বাগানস্থ বৃক্ষসমূহ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অঙ্গুরের স্তবক শোভা পাইতেছে। আমার বন্ধু নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে ও বিচিত্র পল্লবে অঞ্চল পূর্ণ করিয়াছেন। দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, এই বাগানস্থ বৃক্ষের পুষ্প-প্রসবিনী শক্তিকে বিনাশ করা যায় না, আর ইহা অবিনশ্বর নহে। পণ্ডিতেরা বলেন, যে জিনিষে কোন বিশেষ নাই, তাহাতে আমাদের আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমার কথা শুনিয়া যদি বলিলাম, তা হ'লে আমার মত লোকের উপায় কি? আমি বলিলাম, তোমার মন লোকের চিত্তবিনোদন ও দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য বোধ হয় গুলিস্তাঁ নামক এমন একখানি কাব্য রচনা করিতে পারিব যে, হিমঋতুর তুষারের প্রকৃতি কখনও আমার গোলাপ-বাগানের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারিবে না, আর পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি কখনও আমার গোলাপবাগানের কমনীয়তা নষ্ট করিতে পারিবে না। হে বন্ধো! তবে আর তোমার পুষ্পের প্রয়োজন কি? যদি পুষ্পের প্রয়োজন নয়, তা হ'লে আমার গুলিস্তাঁ হইতে পুষ্প চয়ন কর; প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত বাগানের পুষ্প দুই দিনের জন্য সুরভি বিতরণ করিয়া ঝরিয়া পড়িবে, আর আমার গোলাপবাগানের পুষ্প-সুরভি চিরদিনের জন্য থাকিবে। আমার কথা শুনিবামাত্র বন্ধুবর তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে গোলাপ ও রুচি পল্লবগুলি দূরে ফেলিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, যে, কবে এ মহতেরা প্রতিজ্ঞা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাটি পালন করিয়া থাকেন; সুতরাং সত্বর, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞাটি পালন করিলে সুখী হইব। কথোপকথনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার উপকারিতা-বিষয়ক এই গ্রন্থখানি সেই দিনই রচনা করিলাম। আমার বিশ্বাস আছে যে, ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বসাধারণের উপকারে লাগিবে। স্বভাবসুন্দরীর গোলাপ বাগানের শোভা শেষ হইতে না হইতেই আমার গুলিস্তাঁর (গোলাপ বাগানের) পুষ্প ফুটিতে আরম্ভ করিল ও গুলিস্তাঁ প্রকৃত পক্ষেই গোলাপ বাগানে পরিণত হইল।

মোড়ী আমাকে কবি "পথ প্রদর্শক" রূপে এখন কথায় বিতরণ করিল।

বোস্তার দশ অধ্যায়।

১। ন্যায়বিচার ও রাজনীতি উপদেশ, ২। পরোপকারিতা, ৩। প্রেম, ৪। দীনতা, ৫। আত্মসমর্পণ, ৬। সন্তোষ, ৭। শিক্ষা, ৮। কৃতজ্ঞতা। ৯। অনুতাপ। ১০। উপাসনা।

গুলিস্তাঁ কাব্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কবি অধ্যায়গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন ও পাঠকগণের ক্লান্তি নিবারণ মানসে ঘনতরুরাজী ও কুঞ্জবীথিপূর্ণ গোলাপ বাগানকে স্বর্গের নন্দন কাননের মত অষ্টমাংশে (৭) বিভক্ত করেন।

গুলিস্তাঁ অষ্টম অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা,—

নন্দন-কাননের মত গুলিস্তাঁর অষ্টমাংশ।

১। রাজকীয় ব্যবহার। ২। দরবেশের গুণাবলী। ৩। সন্তোষের উপকারিতা। ৪। মৌনাবলম্বনের উপকারিতা। ৫। যৌবন ও প্রণয়। ৬। জরা ও বার্দ্ধক্য। ৭। শিক্ষার উপকারিতা। ৮। সামাজিকের কর্ত্তব্য।

সে ঈশ্বরানুরাগ, সাধুতা আদি-চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ, বোস্তাঁর দশটী অধ্যায় সেই পবিত্রভাবে পূর্ণ। গুলিস্তাঁর আটটী অধ্যায় কয়েকটী মূল্যবান্ উপাখ্যান, জনশ্রুতি, গল্প, কবিতা ও পূর্ব্বতন রাজগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, কবিতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ও নীতিপূর্ণ উপদেশ দান করাই আমার কাব্যের উদ্দেশ্য।

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর বর্ণিত বিষয়।

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর মধ্যে কবি শেখ সাদি পরচ্ছিদ্রান্বেষিগণকে ছিদ্রান্বেষণ হইতে বিরত থাকিতে এবং গুণগ্রাহীর মত গুণ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—চীনের সূচিকার্য্য-খচিত রেশমী পরিচ্ছদ মধ্যে কার্পাস বস্ত্রের গদি আবশ্যক হয়। যদি তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসক হও, তাহা হইলে সেই পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া কার্পাস বাহির না করিয়া বরং সযত্নে এই কার্পাস বস্ত্রক ঢাকাইবে অর্থাৎ উদারচিত্ত ব্যক্তিগণের মত এই কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া গুণভাগের প্রশংসা করিবে। মানব অপূর্ণ দোষগুণ-সম্পন্ন। মানব-চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দোষ ও গুণ দুই বাহির হইবে। মানবচরিত্র ত কোন ছার, নীলআকাশ-সাগরের চাঁদমারা পূর্ণচন্দ্রও কলঙ্কশূন্য নহেন। আমি বলিয়াছি মানব-

ছিদ্রান্বেষিগণের প্রতি।

(৭) কোরাণের মতে স্বর্গীয় নন্দন কানন আটভাগে বিভক্ত এবং এই আট ভাগ পবিত্রতা বোধক।

জীবনের শেষের দিনে দয়াময় শ্রীভগবান্ মঙ্গলের জন্য মন্দকেও ক্ষমা করেন। যদি তুমি আমার কাব্য মধ্যে কোন প্রকার কুৎসিত অথবা রুচিবিগর্হিত কোন চিত্র দেখিতে পাও, তাহা হইলে গুণগ্রাহীর মত মন্দ অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাল অংশের প্রশংসা করিও।"

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ রচনা করিয়া সাদির ধারণা হইল, তাঁহার অনিত্য জীবনের শেষ হইবে; মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইবে, কিন্তু অমূল্য উপদেশপূর্ণ কাব্য কবির অক্ষয় স্মৃতি রক্ষার সহায় হইবে। যদিও সাদি জানিতেন যে, পার্থিব জগতের কোন বস্তুর স্মৃতি চিরস্থায়ী নহে; তথাপি কবি আশা করেন যে, এই পবিত্র কার্য্যের জন্য কেহ না কেহ তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিবে।

কবির আশা।

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর উপক্রমণিকায় কবি বলিয়াছেন, যাঁহারা দীন লেখকের দোষসমূহ গোপনে রাখেন এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণের ছিদ্র অন্বেষণ করেন না, সেই সকল উন্নতমনা ব্যক্তির উদার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এই কাব্য প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।

কাব্য প্রকাশসম্বন্ধে কবির সঙ্কল্প।

"ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ"রূপ বোস্তাঁকে কবি "দশ মরজা"রূপ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া "মুক্তারূপ বাগ্মিতায়" (Peorles of eloquence) পূর্ণ করিয়াছেন। বোস্তাঁর প্রতি অধ্যায়ের প্রান্তে কবিতা "মুক্তারূপ বাগ্মিতায়" পূর্ণ ও প্রেম উক্তি ও ঈশ্বরানুরাগের শাশ্বত ভাবধারা-স্নাত। গুলিস্তাঁয় কবি নীতিপূর্ণ উপদেশ, অতীন্দ্রিয় জগতের কথা, ও অফুরন্ত হাস্য রসের যে ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন, জগদ্বাসী অঞ্জলি পুরিয়া এই পবিত্র ভাবধারা পান করিয়া কোন কালে নিঃশেষ করিতে পারিবে না।

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর ভাব-ধারা।

বোস্তাঁ সম্বন্ধে Prof. A. H. Edward বলিয়াছেন,—"If the Bostan were the only monument that remained of his genius, his name would assuredly still be inscribed in the roll of Immortals." পারস্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক Prof. E. G. Brown গুলিস্তাঁকে পারস্য সাহিত্যের নীতিশাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "* * that is the Gulistan in particular is one of the most Machiavellian

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর রূপ।

works in the Persian language" অধ্যাপক এডওয়ার্ড রোজার নীতিপূর্ণ উপদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"under the several headings of the various chapters a wide range of ethical subjects is discussed, the whole forming a compendium of moral philosophy the broad principles of which must remain for all time as irrefutable as the precepts of scriptural teaching."

কবিতা। পদ্যে লিখিত, গুলিস্তাঁ গদ্য ও পদ্যে সম্মিশ্রিত রচনা। গুলিস্তাঁর গুলিস্তাঁর তুলনা। সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি; ইংরাজী সাহিত্যের কর্ণেল ফরেষ্টার (Col. Forester) লিখিত Polite Philosopher ও লাতিন সাহিত্যের মিনিপিয়েন (Menippian) এবং ভ্যারোনিন (Varronean) লিখিত ব্যাঙ্গ গ্রন্থ ও পেত্রোনিয়স (Petronius) সেনেকা (Seneca) এবং বোয়েত্রিশ (Boetius) লিখিত গদ্য ও পদ্যসম্মিশ্রিত গ্রন্থাবলীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। *

সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাতিন সাহিত্য।

কবির বর্ণিত চিত্রগুলি ভাষার ছটায়, অলঙ্কারঘটায়, বর্ণনার বিচিত্র ছন্দে প্রকাশে মধুর, স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল। সাদি স্বাভাবিকতার উপাসক ও পরিপোষ্টা ছিলেন। কবির ভাবসৌন্দর্য্যপূর্ণ চিত্রগুলিকে হাজিলতিক আলিখাঁ অস্ত্রাগারের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, রাজকীয় অস্ত্রাগার যেরূপ ভীষণ ভীষণ অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণ থাকে, কবি সাদির ভাবমাধুরীপূর্ণ রচনাবলী সেইরূপ জগতের জ্ঞান পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া কবির তুলিকায় যেন নবসাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া জগতের কাব্য চিত্রশালাকে মহান ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। (৮)

কবির বর্ণিত চিত্র।

(৮) "* * his works may be fairly compared to a vast arsenal of ideas drawn from every region of humble speculation, and they are either the solves the condensed quintessence of knowledge and wisdom of the dressing and adoring of the fairest and most magestic conceptions."

English Translation of Atiskada by Prof. Alalat Khan of Fort William College, Calcutta.

* "Like the Menippian and Varronean satire, of which Petronius, Seneca, and Boetius was the chief Latin composers, and Colonel Forester's Polite philosopher is an example in English, the Gulestan is written partly in prose and partly in poetry." Dr. James Ross.

প্রকৃতপক্ষে শেখসাদি যে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম ও তাঁহার সম্বন্ধে ধন্য ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নৈতিক, বাস্ত ও পরিহাসের চিত্রগুলি কবির অসামান্য ও বিচিত্র শক্তির এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব চরিত্র অধ্যয়ন ও তাঁহার ভাস্কর্য্য ভুয়োদর্শনের পরিচায়ক। তাঁহার রচনাবলী হইতে আমরা কতকগুলি নৈতিক অনুশাসন (Precepts) সংগ্রহ করিতে পারি, মানবজীবনের যাহা সর্ব্ব অবস্থায় কল্যাণপ্রদ। অবশ্য ইসলাম ভাগিনেয় কবি মৌলানা হতিফা তাঁহার একটী গজলে বলিয়াছেন, "যদিও পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছেন,—"লা নাবিয়া বা আদি" অর্থাৎ আমার পর আর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না তথাপি কবিদের মধ্যে তিন জন কবি ভগবৎপ্রেরণায় কাব্যশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া পয়গম্বররূপে ভক্তি ও পূজা পাইবে।" ফার্দ্দুসী বীররস কাব্য, আনওয়ারী বিষাদসঙ্গীত ও সাদি গজল বা গীতি কাব্য রচনায় চির অমরত্ব লাভ করিবে। (৯) সাদির রচনাবলী পাঠ করিলে মনে হয় যেন কবি পয়গম্বরের মত ভবিষ্যদর্শী ও জ্ঞানী হইয়া বোস্তা ও গুলিস্তা রচনা করিয়াছেন। সেক্সপিয়রের ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"——Amuse of fire that would ascend
The brightest heavans of invention."

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

---

(৯) "Not with standing what the prophet Mohamed has said, that after me no prophet can come, yet there are among the poets three men endowed with divine inspiration,—Namely, Firdusi in heroics, Anwari in elegy, and Sadi in the ghazal or ode."

দেশী খৃষ্টান।

কুয়াসাচ্ছন্ন ধবল-বরফ মরুর মধ্যে আমরা দুই বন্ধু দার্জ্জিলিংএর টংলুর ডাক-বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে ফটো ক্যামেরা ছিল, ফটো তুলিবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই বরফের দেশে গিয়াছিলাম। আমাদের এ যাত্রা নূতন নহে, কত দুর্গমস্থানে এই ফটোর নেশায় গিয়াছি, তাহার ঠিক নাই। দেশে বন্ধু বান্ধবেরা আমাদের 'ফটোপাগলা' উপাধি দিয়াছিল, কিন্তু বিচিত্র দৃশ্যের মোহময়ী তাড়নায় আমরা কিছুতেই স্থির হইতে পারিতাম না। উঁচু-নিচু-পাহাড়ের শৃঙ্গে যেন শাদা বরফের ঢেউ, দূর দূরান্তরে আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছিল, তখন সন্ধ্যা; প্রবল শীত; আমরা চিমনীর ধারে বসিয়া সিগারেট খাইতে খাইতে দুই বন্ধুতে পায়ের উপর মোটা কম্বল দিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম —রাত্রের খাবারের বেশী বিলম্ব ছিল না, একটু পরেই খান-সামা আসিয়া ডিনার তৈয়ারী জানাইয়া গেল। আমরা আহারের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি একজন বৃদ্ধ সাহেব ঠিক আমাদের সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ বিশুষ্ক, চুলের পারীপাট্য নাই। চক্ষুতে একটা বেদনাকাতর ভাব—ভাবিলাম ইনিও আমাদের মত একজন। নতুবা এখানে আসিবেন কেন! খানসমা মদের বোতল আনিয়া কি পরিমাণে মদ্য দিবে জিজ্ঞাসা করিতেই ভদ্রলোকটি তাহার হাত হইতে বিকারগ্রস্ত রোগীর মত বোতলটা কাড়িয়া লইয়া একটা বড় টাম্‌বলার গ্লাসে সবটা ঢালিয়া এক নিশ্বাসে সবটা পান করিয়া ফেলিলেন, আমরা, ভদ্রতাবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভদ্রলোকটী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাবু বলিতে পার পাদ্রীরা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য এদেশে এত পয়সা নষ্ট করেছে কেন? এদেশে এতে কি কোন উপকার হয়েছে? এরা বাবু সেজে রবিবারে রবিবারে চার্চ্চে যায়, আবার বাড়ী এসে ভূতপ্রেতের পূজা করে। তাদের সংখ্যা দেখতার মধ্যে খৃষ্ট একজন বেড়েছে মাত্র, এদের কাউকে এরা মাথা করতে পারে নি, কখনো পারবেওনা, তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে, আমি এখানে ২। ৩ দিনে যা দেখেছি, তেমন বীভৎস ব্যাপার তোমরা বোধ হয় কল্পনা কর্‌তে

পারবে না। আমি বোতল বোতল মদ খাচ্ছি, তবু সে বীভৎস কল্পনাশক্তি ভুলতে পারিছিনে। উঃ সে কথা মনে করতে আমার সমস্ত শুদ্ধি যেন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠে। শোন বাবু, কালসকালে আমি এখানে বসে চা খাচ্ছিলাম, সেই সময়ে এই দেশী একজন লোক আমাকে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি চাও? সে উত্তর কল্লে, তাদের পরব, তার ছেলেকে গির্জ্জায় নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করিতে হইবে, সে আমাকে তার ছেলের ধর্ম্মবাপ হইবার জন্য অনুরোধ কল্লে। আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার হলেম, তার ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা দেখে স্বভাবতই তার উপর একটা দয়া উপস্থিত হইল। সে তার দেশ জাতির এই কার্য্যের জন্য কিছু টাকা ঋণ চাইল। অপরিচিত হইলেও আমি দ্বিরা করিলাম না, দশটী টাকার একখানি নোট দিলাম। লোকটী চলে গেল। পাদ্রীরা এদেশে খুব ভাল কাজ কচ্ছে মনে করে আমার খুব আনন্দ হ'ল। আমি বিকালে তাদের পল্লীতে বেড়াতে গেলাম, ছোট কাঠের টিনের চালের ঘরের মধ্যে তার পীড়িতা পত্নী রয়েছে, তাহার শ্যালিকাটী একটী ছেলে কোলে বাহিরে বেরিয়ে এসে আমাকে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল—দিব্য সুস্থ, সবল, সুন্দর ছেলে, টুকটুকে গোলাপের মত গালের রং দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল। কাল সকালে চার্চ্চে যাবে স্থির হ'ল। আমি বাড়ী ফিরে এলাম। পরদিন সকালে উঠে চার্চ্চের দিকে রওনা হলেম। কি কন্‌কনে হাড়ে সূঁচ ফুটান শীত! বিন্দুমাত্র রৌদ্রের আভাস নাই, তার উপর ভীষণ শীতল হাওয়া; এত গরম কাপড়ের মধ্যেও আমার শীত যাচ্ছিল না। সে দিন সে দেশের পরব, দলে দলে লোক চলেছে। আমি গির্জ্জায় গিয়া উপস্থিত হলেম, দেখি কি বীভৎস ব্যাপার—সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে চার্চ্চের সিঁড়ির উপরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শুইয়া দিয়াছে। শীতে তাহার সমস্ত লোমকূপ খাড়া হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত দেহে রক্ত জমে একটা রক্তপিণ্ডের মত শিশুটা পড়ে ছিল। একটা অস্ফুট যন্ত্রণা শব্দ কচ্ছিল, শীতে শিশুর চীৎকারের শক্তি ছিল না, আমি তাড়া দিয়ে তার বাপকে বল্লম করেছ কি এখনই যে মারা যাবে! লোকটার শ্যালিকাটী অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে বল্লে, ভগবানের দুয়ারে এমনি করেই আসতে হয়—এই আমাদের প্রথা। পুরুষটীও ঘাড় নেড়ে সেই কথায় সায় দিলে। কি সর্ব্বনাশ প্রথা! আমি ধমকে উঠলেম, তারা আমার কথা আমলেই আনলে না। অন্য দিকে সরে গেল। আমি ছুটে চার্চ্চের পাদরীকে ডাকতে গেলাম। ছেলেটী সেইখানে সেই চার্চ্চের দরজার সিঁড়ির পাথরের উপর তেমনিভাবে ছিল, গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ তার গায়ে পড়ছিল। ছুটে

গিয়ে দেখি পাদরি সাহেব আসছেন—সেই বকেয়া আমলি চাল, পদক্ষেপ যেন ধরিত্রী না টের পায়, এমনিভাবে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতেছেন। আমি চীৎকার করে বল্লেম, শীঘ্র করে আসুন, ছেলেটী মারা যায়। তেমনি নির্ব্বিকার, তেমনি শান্ত। আমার দিকে ধীরে ধীরে চক্ষুটী তুলে বল্লে, "ওরা ওরকম করে, ওদের ওই প্রথা।" কি সর্ব্বনাশ! এখানেও প্রথা, এর মুখেও প্রথা। বুঝি ওই মন্থর গমনে, ঢিলে কাল পোষাক পরে চলাও ওঁর প্রথা। দুনিয়ার এদিক ওদিক হ'য়ে যাক্, তবু প্রথা ভঙ্গ করতে পারবেন না। চার্চের দরজায় দুগ্ধপোষ্য শিশু মরুক, তবু তার প্রথাবদ্ধ পা এক ইঞ্চি বেড়ে চলবে না। আমার ইচ্ছা হ'ল হিড় হিড় ক'রে হৃদয়হীন পাদরীটাকে টেনে নিয়ে যাই। কিন্তু ওই প্রথা! ভদ্রতার প্রথায় আমি তা পারলেম না। আমি উত্তেজিত কণ্ঠে কাতরভাবে বল্লেম, একটু পা বাড়িয়ে চলুন, ছেলেটা যে মোল। কে কার কথা শোনে? তিনি তেমনই স্বভাবসিদ্ধ মন্থরগতিতে চলিতে লাগিলেন। তার পর গুঁড়া বরফে ঢাকা বাক্যহীন আড়ষ্ট শিশুটীকে কতক গুলি ওলোট পালট করা অশুদ্ধ ল্যাটিন শ্লোক পড়ে শিশুটীকে খৃষ্টান করা হইল। খৃষ্টান করার পর পাদরী আমাকে খাতা দস্তখত করিতে বলিলেন। শিশুটীর তখনও ঠাণ্ডা লাগ্‌ছিল। আমি সেই বর্ব্বর লোকগুলাকে তাড়া তাড়ি বাড়ী ফিরিয়ে পাঠালাম; কারণ তখনও ফিরে বাড়ী যাইয়া গরম কাপড় দিলে শিশুটী রক্ষা পাইতে পারে। তারা কম্বল দিয়ে শিশুটীকে জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি খাতা দস্তখত করিতেই পাদরী আমার কাছে খরচা বাবদ পঞ্চমুদ্রা দাবী করিল। আমি প্রথম দিতে অস্বীকার করিলাম। অনেক তর্ক বিতর্কের পর আমাকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। পাঁচটি মুদ্রা পাদ্রীর পকেটে দিয়া গির্জ্জার বাহিরে আসিলাম। ইতি মধ্যে লোকগুলি চলিয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে গিয়া শিশুটী কেমন আছে দেখিতে ইচ্ছা হইল দেখিয়া সেই দিকে রওনা হইলাম।

তাদের বাড়ী যাইয়া দেখি তারা তখনও কেউ নাই। কেবল জরাজীর্ণ কুলক লাল্লীটী বিছানায় পড়িয়া একা, শীতের প্রকোপে কাঁপিতেছে এবং অতি করুণ সুরে কাঁদিতেছে। আজ দুই দিন তাহার খাবার জোটে নাই। আমি তাকে তার আমীপুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সেও নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করিল, তারা তাদের দোকানে গিয়াছে। ছেলেকে আজ খৃষ্টান করা হলো কিনা, এতবড়

আনন্দের দিনে, আজ কি মদ না খেলে চলে। আজ মদ খেতেই হয়, এই এখানকার প্রথা। এখন বুঝলাম খরচাবাবদ—কাল সকালবেলায় যে দশটী টাকা দিয়াছিলাম, তার কি দশা হচ্ছে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার সময় দেখি তারা টলিতে টলিতে ফিরিতেছে।—সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা। বুঝিলাম নেশার ঝোঁকে কতবার যে তারা পড়িয়াছে, কতবার যে উঠিয়াছে আর ছেলেটী সে কি অতটুকু প্রাণ লইয়া অত সহ্য করিতে পারে? শিশুটীর ক্ষুদ্র জীবন প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। মৃত ছেলেটীকে আনিয়া মায়ের কোলে দিতেই মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বর্ব্বর গুলো অমনি ছেলের মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পুত্রশোক ভুলাইবার জন্য মদ খাওয়াইতে সুরু করিল। আমি কত বারণ করিলাম, অনুনয়, বিনয়, ভয়, কত কি বলিলাম; কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। যতই তারা মদ খাওয়াতে লাগল, ততই সে ডুকরিয়া বুক চাপরাইয়া ছেলেটীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। মদে শোকের উপশম না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিতে লাগিল। সেই দুর্ব্বল শরীরে—একেই তো সে এক পা কবরে দিয়াই ছিল, তার উপর পুত্রশোকের আঘাত ও মদ খাওয়াইয়া শোক ভুলাইবার স্নেহের অত্যাচার এত সহ্য হয় কি করিয়া? খানিকক্ষণ পরে স্ত্রীটী মারা গেল। তার সমাধি দ্বারস্থ করিয়া দিয়া এই ফিরিতেছি। খৃষ্টান করিয়া তাদের কি উপকার হয়েছে বলুন দেখি? আর সেই সভ্য ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রীটীর কাণ্ডখানা দেখুন।

হঠাৎ তিনি চুপ করিয়া বাকী মদটুকু ঢক ঢক করিয়া খাইয়া ফেলিলেন দেখি খাবার ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হইল না। কতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম বলিতে পারি না।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

খুনী আসামী।

বিচার কক্ষ। বন্দী কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া, বিচার চলিতেছে। একজন নতুন উকিল বন্দীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন :—

জুরি মহোদয়গণ! ঘটনা যে সত্য তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। আমার মক্কেল একজন সৎলোক আদর্শ কর্ম্মচারী, নম্র, বিনয়ী ভদ্রলোক। তিনিই যে রাগের বশে তাহার প্রভুকে খুন করিয়া ফেলিবেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সত্য ঘটনার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া বিশ্লেষণ সাধন না করিয়া মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি। এই বিশ্লেষণ দেখিয়া আপনারা অপরাধ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবেন।

জীন নিকোলাস লাউ লেয়ার বড় লোকের সন্তান। তাঁরা পুত্রকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পুত্রের মধ্যেও শিক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার আত্মসম্মান-বোধ জন্মিয়াছিল।

এই আত্মসম্মানবোধই তাহার অপরাধের বিষয় হইয়াছে। এই সম্মান-বোধ মানুষের একটী অনুভূতির বিষয়। এখন আমাদের এ অনুভূতি অনেকটা নাই, কেবল নাম মাত্র পড়িয়া আছে। যদি আমাদের এই সম্মানবোধ (জ্ঞান) কি বুঝিতে হয়, তবে কোন প্রাচীন বনিয়াদী ঘরে যাইয়া দেখিতে হইবে। সেখানে কিরূপ যত্নের সহিত সম্ভ্রমের সহিত ঠিক ধর্ম্মকার্য্যের মত মানুষের সম্মান-বোধের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, তাহা দেখিতে হইবে। সেখানে এ সম্বন্ধে কেহ কোন দিন ইহাকে ঠাট্টার বিষয় মনে করে না, এতটুকু পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ পোষণ করে না, কেহ ইহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কণামাত্র সাহস হয় না।

যে মানুষের সম্মান (জ্ঞান) বোধ নাই, সে কখন সৎ হইতে পারে না। যারা অপরকে সম্মান করিতে জানে, তাদের দৃষ্টি-অন্ধ, কারণ তারা সেটা বিশ্বাসের জোরে করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা যারা এই বিচারালয়ে বসিয়া থাকি, তাহারা নিজেদের মনে করি—বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বই জানি। আমাদের এ বিচারালয় কি সমাজের বাড়ীখানা? আমরা যারা উকীলরা মানবজীবনের সকল

রকম গর্হিত কর্মই বিনা বিচারে সমর্থন করি, নির্বিবাদে লজ্জা মুখে তাহাদের প্রশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হই না, কোন কাদের উপর তাহাদের সহানুভূতি নির্ণীত হয় শুধুমাত্র তাহাদের প্রাপ্ত ফীএর পরিমাণ বুঝিয়া। এই রকম যে সকল লোক তাহাদের কখন সম্মান (জ্ঞান) বোধ থাকিতে পারে না। আমরা অনেক সময় জানিতে পারি, সন্ধান পাই, গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কর্ম্মচারীদের মধ্যেও কত পাপের স্রোত চলিতেছে, কি করিয়া কি হইতেছে, কি করিয়া দেওয়া নেওয়া চলিতেছে, কি করিয়া লোকে আপনাকে আপনি বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে! সম্মান, উচ্চপদ, আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান প্রভৃতি মানুষ সামান্য অর্থের বিনিময়ে কেমন করিয়া হেলায় বিকাইয়া দিতেছে একটা উপাধির জন্য কি না করিতেছে, স্ত্রীলোকের একটী সামান্য চুম্বন লাভের আশায় সব জলাঞ্জলি দিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাদের ব্যবসায় কিছুতে উহারা দিতে বারণ করে, প্রত্যেককে সন্দেহ করিতে শেখায়, আমাদিগের প্রকৃতি বিগড়াইয়া দেয়; সেইজন্যে যখন আমরা বর্ত্তমান খুনী আসামীর মত কোন গভীর সম্মান (জ্ঞান) বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সম্মানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে দেখি, তখন আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই, কিছুতেই এই আত্মবিসর্জ্জনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না।

আমাদের উকিলদের সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, সম্মান আছে কিসের জোরে? কারণ আমরা নীচতাকে ঘৃণা করি, আমাদের একটা আত্মসম্ভ্রম ও আত্মগর্ব্ব আছে। কিন্তু এই গোকটীর মনে একটী গভীর, আন্তরিক, অন্ধ, জন্মান্তরের আত্মজ্ঞানবোধ আছে আমাদের কি তা আছে? আমাদের সমস্তই উপরে উপরে ভাসা কিছুই আন্তরিক নহে।

এইবারে আমি ইহার জীবনের ইতিহাস বলিব।

ভদ্রলোকের শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল প্রাচীন প্রথায়। মানুষের জীবনকে দুই ভাগ করিয়া তাহাকে দেখান হইত—ভাল দিক, মন্দ দিক, ভালটা যেমন ভাবে তাঁর জানান হইত যে, সে অনায়াসে মন্দটাকে চিনিয়া লইতে পারিত ও মন্দের উপর একটা ঘৃণা জন্মিয়া যাইত। ইহারই ফলে যে ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান, উৎসাহী হইল; কিন্তু তাহার মনটা হইয়া গেল সঙ্কীর্ণ; তাহার কারণ তার পিতার মন ছিল না, (এত উচ্চ ছিল না) যাহার ফলে তিনি এই সহজ বিশ্বাসের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই যে এই সকল পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন।

বাইশ বৎসর বয়সে সে তার খুড়তোত বোনকে বিবাহ করে। এই ভগ্নীটীও তাহারই মত লালিত পালিত হইয়াছিল—সাদাসিধে নির্ম্মল চরিত্রের তিনি ছিলেন। ভদ্রলোকের ইহা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, তিনি যাকে জীবনসঙ্গিনী পাইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন সৎ; তাঁর অন্তর ছিল মহৎ কোমল। এই সকল গুণ পৃথিবীতে দুর্লভ। এই ভদ্রলোকের তার মাতার উপর গভীর দেবতুল্য ভক্তি ছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রীতেও এই ভক্তির আগুনের কণা প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কোনদিন দোমনা হইতে দেখা যায় নাই, তাহার একটা কঠিন সঙ্কল্প ছিল, মনের মধ্যে একটা শান্তি বিরাজ করিত। অন্য মানুষের সঙ্গে তাঁর এইখানেই প্রভেদ। তিনি নিজেও অপরকে ঠকাইতেন না, অপরে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, এ ধারণাও তাঁহার হইতে পারিত না।

তাঁহার বিবাহের কিছু পূর্ব্বেই মসিয়ে ল্যাদেলার নিকট চাকরি যান—(খাদ্যের চাকরি) যাহাকে তিনি অল্প দিন হইল খুন করিয়াছেন।

ম্যাডাম ল্যাদেলা ও তাঁহার ভ্রাতা এবং মসিয়ে পারথুই ও পরিবারের অন্যান্য পরিজন ও ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, লাওগেয়ার একজন সততার, নম্রতার, আজ্ঞানুবর্ত্তিতার ও ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য সাধন করিবার এবং উপরিতন কর্ম্মচারীদের প্রতি—উপযুক্ত সম্মান দেখাইবার আদর্শ ছিলেন।

লাগার ব্যাঙ্কার ব্যবসায়ের অংশীদার।

এই আদর্শ চরিত্রের জন্য তাঁকে সকলেই সুনজরে দেখিত। এই রকম সাধারণ সম্মানে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, ম্যাডাম লাওগেয়ারকেও যে সম্মান দেখান হইত তাহাতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। ম্যাডামের প্রশংসা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যাইত। অল্পদিন পরেই ম্যাডাম মারা যান। নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহার গভীর দুঃখ হয়, কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল, যার অন্যথা ছিল না। বাহিরের চেহারা দেখিলে ভাবভঙ্গীতে স্পষ্ট ধরা পড়িত—কি গভীর ক্ষত তাঁহার মনে।

ম্যাডামের সাধারণত যাহা ঘটে, তাহাই হইল। দশ বৎসর হইল ইহার বিবাহ হইয়াছিল। দশ বৎসরের সব সময়ই তাহার কাছে একজন স্ত্রীলোক ছিল। ক্লান্ত হইয়া তিনি যখন বাড়ী ফিরিতেন, স্ত্রীর সেবা, যত্ন, সকাল সন্ধ্যা নানা আদর আবদার, তাঁহার মনকে বিরিয়া রাখিত। যাতে স্ত্রী পুরুষের

আপনার অতি প্রিয় হইয়া উঠে, পুরুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, সে সবই উহাতে ছিল। হয়ত তাঁহার স্ত্রীর সাংসারিক অভাবও তাহার (গাঙ্গুলীর) মনকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। লাওগেয়ার আর একা থাকিতে পারিত না; সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন দীর্ঘ সন্ধ্যা সে কাছাকাছি এক ফাঁকেতে কাটাইয়া দিত। সে কিছু পরিমাণ মদ খাইয়া নিশ্চিন্তমনে একটা জায়গায় বসিয়া বসিয়া পাশের বিলিবার্ড টেবিলে সবুজ জমির উপর লাল সাদা বলের দৌড়াদৌড়ি ও ক্রীড়কদিগের ঝগড়া কিম্বা পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক আলোচনা ও উচ্চ হাসির দিকে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া থাকিত। কোন কোন সময় শ্রান্তিভরে সে ঘুমাইয়া পড়িত; কিন্তু সর্ব্বদাই তার মনে একজন স্ত্রীসঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করিত। প্রতিদিন বিকালে সে আপনা-আপনি কলের মত কাসিয়ারের নিকট চলিয়া আসিত। কারণ সে ছিল স্ত্রীলোক।

ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে কথা আরম্ভ হইল। তারপর এমন অভ্যাস হইয়া গেল যে, সারা সন্ধ্যাটা তার সহবাসেই তাঁহার কাটিত। তিনি ছিলেন সে দয়াবতী, ভাবুক, মদপূর্ণ গেলাস সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে থাকিত যেমন, নবসারীর শোভা পায়। দিন দিন লাওগেয়ার ধীরে ধীরে এই রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে না জানিল তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস, জানিতেও চাহিল না; কারণ জানিবার কোন প্রয়োজন নাই যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, তাহার অন্য পরিচয় দরকার কি!

কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী ছিল ভারি চতুর। সে দেখিল এই পুরুষটীকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লইতে পারে; প্রথম কাজ তাহাকে বিবাহ করান—অবশ্য চেষ্টাতেই তাহার এ কার্য্য সিদ্ধ হইল।

স্ত্রীলোকটীর স্বভাব ছিল অতি নির্লজ্জ। বিবাহের পর তাহার এ লজ্জাহীনতা তো কমিলই না, বরং আরও বাড়িয়া গেল। আফিসের সকল কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাহার কুভাব ও কুসম্পর্ক বাড়িয়াই চলিল; কিন্তু তাহার সাদাসিধে সরল স্বামী বেচারী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সে বেশ স্বামীকে ফাঁকি দিয়াই চলিতে লাগিল। আফিসের সমস্ত কর্ম্মচারী এবিষয়ে দোষী, তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, বহু চিঠি পত্র ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সকলের মধ্যেই ইহা জানাজানি হইয়া গেল। কেবল স্বামী বেচারী ইহা অজ্ঞাত রহিল।

। অবশেষে এই দুষ্টা তাহার সনিবের উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে পথভ্রান্ত করিল। মঁসিয়ে ল্যাগালা একদিন এই দুষ্টা রমণীর বাহুবন্ধনে তাহার পুত্রকে দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি এতদিন জানিতেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মঠ সৎ কর্ম্মচারীরগুণে সব সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এবার আর পারিলেন না। এইবার একটা মস্ত ভুল তিনি করিয়া ফেলিলেন। আর ভুলই বা বলি কি করিয়া? পুত্রের এরূপ ব্যবহারে কোন পিতার না ক্রোধ হয়; তিনি তৎক্ষণাৎ লাগেয়ারকে ডাকিয়া লইয়া নিজের ক্রোধের কারণ বলিলেন।

আমার আর কিছুই বলিবার নাই। মুমূর্ষুর মুখ হইতে যে কাহিনী জানা গিয়াছে, তাহাই সবিস্তারে বলিতেছি। এই মাত্র আমি শুনিয়াছি আমার পুত্র এই স্ত্রীলোকটীকে ১০০০হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়াছে। ক্রোধে আমার বিবেচনাবোধ লোপ পাইয়াছে। আমি লাগেয়ারের সততা সম্বন্ধে কোন দিনই সন্দিহান হই নাই; কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, অনেক পাপের চেয়েও অন্ধতা ভীষণ। আমি বাধ্য হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছি যে, তাহার কাজ আমি চাই না। সে আমার দিকে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া রহিল, যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে সে একটু রাগান্বিত হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিল। আমি কোন কারণই বলিলাম না; কেবল তাহাকে জানাইয়া দিলাম, ইহা আমার নিজের ইচ্ছা। ইহাতে তাহার মনে হইল যে আমি তাহাকে তহবিল তছরূপকারী মনে করিয়াছি। ইহা ভাবিয়া সে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে খুব জোর করিয়া কথা বলিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়াছিলাম। আমি যতই চুপ করিয়া থাকিতে লাগিলাম, ততই তাহার গলা চড়িতে লাগিল। শেষে আমার ভয় হইল যে, মার খাইব নাকি? হঠাৎ একটা খোঁচায় আমার টনক পড়িল তার মুখের সামনে আমি সবকথা বলিয়া দিলাম। সে সেইখানে থ হইয়া খানিক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ দু'টা কেমন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। হঠাৎ সে টেবিলের উপর হইতে কাগজ কাটা ছুরিখানা লইয়া আমার ঘাড়ের উপর পড়িল। গলার বুকে আমি যে অনুভব করিলাম; কিন্তু বেদনাবোধের অবসর পাইলাম না।

জুরি মহোদয়গণ! ইহাই হত্যার ইতিহাস। ইহার স্বপক্ষে কি আর অধিক কিছু বলিতে হইবে? সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে অন্ধের মত বিশ্বাস করিয়াছিল, কারণ তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে দেখিয়াছিল যে, স্ত্রী কিরূপ হয়।

তাহার বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান ও প্রথম পক্ষের স্ত্রীর স্বভাব ও ব্যবহার তাহাকে এরূপ করিতে শিখাইয়াছিল।"

উকীলের বক্তৃতা শেষ হইল। জুরীরা খানিকক্ষণ যুক্তি করিয়া মত দিলেন—

আসামী নির্দ্দোষ।

ভীষ্ম।

—:০:—

কৌরব গৌরব-রবি বৃদ্ধ পিতামহ
ব্রতধারী দেবব্রত ভীষ্ম মহারথ,
ভারতের বীর্য্য-স্তম্ভ কীর্ত্তিমান্ বীর।
কি মহান্ স্বার্থত্যাগ জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা,
—কি মহতী পিতৃভক্তি দেবতাদুর্ল্লভ,
কুরুক্ষেত্রে দশদিন কি মহামহিম
ক্ষাত্রতেজে পরিপূর্ণ দেবতার ছবি!
—কি অন্তিম শর-শয্যা লোক ভয়ঙ্কর!
পারে নাই যাহা কেহ—হয় নাই যাহা,
দেবব্রত, করিলা সে অসাধ্য—সাধন;
হ'ল তাই ভীষ্মনাম জগতে প্রচার।
যুগ-যুগান্তর গত আজিও জগতে
নর-নারী মৃত-হৃদে আনিছে টানিয়া
তব নামে কি যে এক স্বর্গীয় দৃঢ়তা
পালিতে প্রতিজ্ঞা-বাক্য, "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা"
ভারতের মৃত-দেহে ঔষধ মহান্।

শ্রীভুবনমোহন দাশগুপ্ত
কবিশেখর।

রাণীর কবর।

পেশোওয়ারের পার্ব্বত্য প্রদেশে আর অন্ন মিলে না দেখিয়া মাতৃপিতৃহীন দরিদ্র পাঠান আজাদ হিন্দুস্থান আসিবার সংকল্প করিল। সংসারে তার কোন বন্ধন নাই। তার বাড়ী নাই, ঘর নাই, জমী নাই, জমা নাই—জগতে আপন বলিবার মত তার কোন আত্মীয়ও নাই। ভিক্ষুকের মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া পরান্নে প্রতিপালিত হইয়া সে জীবনের কুড়ি বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। পরের অন্নে পেট ভরে নাই; কিন্তু পরের তিরস্কারের জ্বালায় তার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে! কি আশায় সে আর দেশে থাকিবে? কার মুখ চাহিয়া সে তার দরিদ্র জীবন যাপন করিবে? সংসারে সে একা—সম্পূর্ণ একা, তবে কেন শুধু সে তার নিজের জন্য পরের কাছে হাত পাতিবে? জন্মভূমির ক্রোড় হইতে বিদায় লইতে তার কোন কষ্ট হয় নাই। ভিক্ষুক সে, ভিক্ষুকের আবার মায়া!

পেশোওয়ার হইতে সে রেলগাড়ী চড়িল। টাকা কেমন সে বড় চোখে দেখে নাই। সে আজীবন কপর্দ্দকশূন্য; কাজেই তার নিকট টিকিট ছিল না। রেল-কোম্পানী তাকে ছাড়িবে কেন? একরাত্রির পথ অতিক্রম করিয়া বিনা টিকিটে রেলে চড়ার অপরাধে সে ফৌজদারী সুপরদ্দ হইল। বিচারকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বিনা টিকিটে রেলে চড়িয়াছিলে কেন?" সে উত্তর দিল—"আমিদ আমি টিকিটের টাকা কোথা পাইব? হিন্দুস্থানে আসিয়াছি নৌকরী করিতে—টাকা পাইলে টিকিটের দাম দিব।" আদালত শুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—হাকিম কবুল জবাবে সন্তুষ্ট হইয়া মাত্র সাতদিন তাহার শ্রীঘর বাসের হুকুম দিলেন।

(২)

জেলখানার দীর্ঘকায় পাঠান খানী টানে, আর খায়। বহুদিন তার অদৃষ্টে এরূপ আহার জোটে নাই। সে খাটিয়া খাইতে চায়, তার জন্য সে যথেষ্ট উমেদারী করিয়াছে; কিন্তু ঘৃণিত ভিক্ষুককে কেহ বিশ্বাস করিয়া নৌকরী দেয় নাই। কৃপা করিয়া তার সম্মুখে রুটীর টুকরা ফেলিয়া দিয়াছে, আর দিয়াছে—লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর তিরস্কার। ভিক্ষুককে কে কবে স্নেহ করিয়া থাকে? কে করে বিশ্বাস

করিয়া থাকে? পরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সে বাঁচিয়া আছে বটে; কিন্তু যে দয়াতে কুকুর বিড়ালের তৃপ্তি হয় সে হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ, তাই সেহশূন্য—বিশ্বাসশূন্য দয়ার উপর নির্ভর করা অপেক্ষা তার কারাগারই ভাল লাগিল। কারাগারে পরিশ্রম করিয়া সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাইতে পায়, নিজে আস্তানায় শুইতে পায়, ইহার জন্য তাহাকে কাহারও দয়াভিক্ষা করিতে হয় না। বড় সুখে সে জেল খাটিতে লাগিল।

সাত দিন অতীত হওয়ার পর জেলের কর্ত্তা তাহাকে জেল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। পাঠান চক্ষে অন্ধকার দেখিল, তারপর আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সরলভাবে কহিল—"হুজুর আমি যাইব কোথা? তোমরা মালীর লোক আমায় একটা নৌকরী দাও। আমি খুব খাটিতে পারি; কিন্তু পেটের জন্য আর ভিক্ষা করিতে পারি না।"

সরল পাঠানের সরল উত্তর "হুজুরে"র বড় ভাল লাগিল। তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম দয়াপরবশ হইয়া তাহার হাতে দুটী টাকা দিয়া কহিলেন—"এত বড় সহর চেষ্টা কল্লেই তোর নৌকরী জুটবে। নৌকরী না পাওয়া পর্য্যন্ত এই টাকা দিলাম, কিনে পেলে রুটী কিনে খাস্। দেখিস্ যেন চুরি করিস্ না।"

টাকা লইয়া আসাদ কৃতজ্ঞহৃদয়ে হুজুরকে সেলাম করিয়া জেলখানা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

হাতে টাকা পাইয়া সর্ব্বপ্রথম তাহার টিকিটের কথা মনে পড়িল। সে সোজা ষ্টেসনে যাইয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে টাকা দুইটী দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া কহিল—"হুজুর, এই নাও তোমার টিকিটের টাকা—আর আমায় একটী নৌকরী দাও। বাকি টাকা মাইনা হইতে কাটিয়া লইও।" ষ্টেসন মাষ্টার অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকাইয়া শেষে চিনিতে পারিলেন—এ সেই তাঁর টিকিটের আসামী। আদালতগৃহে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এবার তাঁর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি তাহাকে একটী কুলির চাকরিতে বাহাল করিলেন; কিন্তু টাকা লইতে অসম্মত হইলেন।

নৌকরী পাইয়া আসাদ আজ জীবনে বিমল আনন্দ লাভ করিল। পয়সার টাকায় আর তার প্রয়োজন? এখন আর কেন সে পেটের জন্য পরের দান গ্রহণ করিবে? সে জেলখানায় হুজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া সহাস্যে কহিল, "আমার নৌকরী মিলিয়াছে, আর ভাবনা

নাই। আমার চুরি করিবার দরকার হইবে না, আর টাকারও কোন প্রয়োজন নাই। এই নাও তোমার টাকা"। হুজুর বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন—সে চকিতে তাঁহার হস্তে টাকা দুইটী প্রত্যর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

(৪)

তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। কর্ম্মের ভিকারী কর্ম্মঠ পাঠান আজ কুলির সর্দ্দার। বহু কুলিপরিবারের সহিত রেল লাইনের পাশে সারবন্দী কুটীরগুলির একটীতে সে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছে। কর্ম্মের অবসরে দুই বেলা আহার ও রাত্রে নিদ্রা যাইবার জন্য সে বাসায় ফিরে। স্বহস্তে রুটীবানানো তাহার দৈনন্দিন কর্ম্ম। সে উৎসাহভরে তার কাজগুলি কলের মত করিয়া যায়—কেহ তার কোন কাজে গাফিলতী দেখে নাই।

নৌকরীর আশায় স্বদেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে ছুটিয়া আসিয়া খোদার আশীর্ব্বাদের মত নৌকরী পাইয়া সে আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার কার্য্যে শিথিলতা আসিয়া পড়িল। এখন নৌকরী করিতে তার সে উৎসাহ নাই, খাটিয়া খাইতে তার সে আমোদ নাই—কেমন একটা অবসাদ আসিয়া তাহাকে কেমন-কেমন করিয়া তুলিল। যখন দেখে, সে এক একটী বৃহৎ কুলিপরিবার দিবসের দু'টি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কা'র আশাপথ চাহিয়া থাকে—কা'র আগমনে তাহাদের মধ্যে আনন্দের লহরী খেলিয়া যায়—তখন তাহার বুভুক্ষু হৃদয় যেন কিসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মায়ের যত্ন সে কখন অনুভব করে নাই; পিতা কেমন, সে কখন বুঝে নাই; ভগ্নী যে কি, তা সে জানে না; যা জীবনে তাহার পক্ষে দুর্লভ তার জন্য সে এত কাতর কেন? কে জানে মানুষের কেন এমন হয়? সে মানুষ—কলের পুতুল নয়—তাই মাঝে মাঝে সান্ধ্য আহারে তার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। সমস্ত দিন খাটুনীর পর রুটী পাকাইতে কি ভাল লাগে? সে গৃহের বাহিরে খাটিয়া পাতিয়া শূন্যদৃষ্টে শূন্য আকাশে চাহিয়া কি ভাবে, তারপর তার ক্লান্ত দেহ নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে—আর ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে থাকে না।

আজ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সর্দ্দার আহারাদি না করিয়াই সেইরূপ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমের ঘোরে বোধ হইল তাহার কাণের কাছে যেন কোন্ অন্তরাত্মা হইতে একটী মমতাময় মধুর স্বর ধ্বনিত হইতেছে—"সর্দ্দার তোমার কি অসুখ করেছে"? সর্দ্দারের মনে হইল, যেমন ত্রিভুবন হইতে তিল তিল রূপ সংগ্রহ

যাহিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা কন্যাপুত্র আত্মীয় স্বজন ইহাদের স্নেহের উৎস হইতে এক একটী স্নেহবারি সংগৃহীত হইয়া তাহারই সমষ্টিতে এই অপূর্ব্ব মধুর স্বর সংগঠিত হইয়াছে। আবার ধ্বনিত হইল "সর্দ্দার তোমার কি অসুখ করেছে?" স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। সর্দ্দার চাহিয়া দেখিল—প্রশ্নকর্ত্তা একটী বালিকা—তাহারই অধীনস্থ কুলি-কর্ম্মচারীর কন্যা রাণী!

৫।

"সর্দ্দার, তোমার কি অসুখ করেছে?

"না"

"তবে যে রুটী না খেয়ে শুয়ে পড়েছ?"

"আজ আর রুটী তৈয়ারী করিতে ইচ্ছা কচ্ছিল না—তাই—"।

"ওমা! তৈরী কর্ত্তে ইচ্ছা কচ্ছিল না, তাই না খেয়ে ঘুমাতে হয়!"

সর্দ্দার হাসিয়া কহিল—রোজ রোজ কি এক ঘেয়ে কাজ কর্ত্তে ভাল লাগে?

বালিকা স্নেহবিজড়িত স্বরে কহিল—"তা হবে না। আমাদের ঘরে রুটী তৈরী আছে, তোমাকে খেতে হবে। আমি নিয়ে আসি গে"।

রাণী রুটী আনিতে ছুটিয়া গেল—সর্দ্দার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল ও-রাণী আন্তে হবে না রে—ওঃ—

নেপথ্যে উত্তর হইল—"না তা হবে না—আমি কিছু শুনব না।"

সর্দ্দার আর কথা কহিতে পারিল না। কি জানি কি ভাবিয়া তার দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। "তা হবে না" একথা কয়টী "তার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" তাহার বুভুক্ষুহৃদয়ের প্রত্যেক মর্ম্মতন্ত্রীতে আঘাত করিল। নারী-হৃদয়ে মাতৃত্বের আস্বাদন পাইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। আজ সর্দ্দার তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম রাণীর প্রসত্ত রুটী তুখানি আহার করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল। খাওয়া হইয়া গেলে রাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন পেট ভরিল কার?

সর্দ্দারও হাসিয়া উত্তর দিল—"কেন তোর?"

রাণী "যাঃ" বলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সর্দ্দার তাহার অসাড় হৃদয়ে নূতন সুরের সাড়া পাইয়া মোহিত হইল।

৬।

এখন আর সর্দ্দারের রাণী ছাড়া কোন কাজ চলে না। রাণীর হাতে তার ঘরের চাবী। সকালে বিকালে তাহার আসিবার পূর্ব্বেই রেলের কয়লা কুড়াইয়া রাণী তাহার রন্ধনের জন্য উনান ধরাইয়া রাখে, আহারের পর রাত্রে তার খাটিয়া বাহির করিয়া শয়নের জন্য বিছানা করিয়া দেয়। আর সর্দ্দার না খাইয়া ঘুমাইতে পায় না। সর্দ্দার এখন দ্বিগুণ পরিশ্রমে কাজ সারিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে বাসায় ফিরিয়া আসে। রাণী আনন্দে তাহার আহারের জোগাড় করিয়া দেয় রুটী পাকাইতে পাকাইতে—সে কেমন করিয়া তার জীবনের কুড়ীটী বৎসর কাটাইয়া দিয়াছিল—কেমন করিয়া রেলে চড়িয়া বেল খাটিয়া পরিশেষে নৌকরীর জোগাড় করিয়াছিল—এই সব গল্প করিত, আর রাণী উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহা শুনিত। এইরূপ পরস্পরের সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহাদের দু'টী হৃদয় এক হইয়া গেল। প্রভেদ রহিল কেবল বহিরাবরণ, ধর্ম্মে। আসাদ মুসলমান, রাণী হিন্দু!

৭।

পাঠক মনে রাখিবেন, আমি গল্পলেখক—সৃষ্টিকর্ত্তা নহি। হিন্দুমুসলমান-বিবাহের উদ্যোগ পর্ব্ব দেখিয়া হয়ত আপনারা আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। আমি এইরূপ অঘটন ঘটাইবার প্রয়াসী নহি, যাহা ঘটিয়াছিল আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি; সুতরাং কৈফিয়ৎ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। জগতের নিয়ম এই যে, আকর্ষণী শক্তি থাকিলে দুটী ভিন্নধর্ম্মী বস্তুও এক হইয়া যায়। চুম্বক লোহাকে টানিয়া লয়, সাগর নদীকে আপন বক্ষে মিশাইয়া লয়। সহানুভূতির আকর্ষণে আসাদ রাণীর হৃদয় জয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপ আপনার করিয়া অনুভব করে নাই। প্রস্ফুটিতযৌবনা রাণীর রূপে সে আকৃষ্ট হয় নাই। সে চায় স্নেহ-ভালবাসা। তাহা সে পাইয়াছে। স্নেহের আশায় সে মনে মনে প্রার্থনা করিত, রাণী যেন তার নিকট হয় মাতা—ন'য় ভগ্নী—হয় স্ত্রী—ন'য় কন্যা—এইরূপ আপন জনের মত সর্ব্বদা তার কাছে কাছে থাকে, যেন তার স্নেহ তাহাকে ডুবাইয়া রাখে, যেন তাহাদের উভয়ের কখন বিচ্ছেদ না হয়। এই অপূর্ব্ব রত্ন লাভ করিয়া সর্দ্দার তাহাকে হেলায় হারাইতে প্রস্তুত নহে; তাই একদিন সন্ধ্যাকালে রুটী পাকাইতে পাকাইতে আসাদ কহিল—রাণী, তোর দুদিন পরে বিবাহ হইয়া যাইবে; তুই পরের ঘরে যা'বি, তখন কে আমায় রুটি করিয়া দেখিবে?

উত্তর হইল—"যাঃ"

আসাদ পুনরায় কহিল—যা নয়, সত্য। তখন হয়ত আর আমার খাওয়া হইবে না—আমি আবার তেমনি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। তখন—

সে তাড়াতাড়ি আকম্পিতহৃদয়ে বলিয়া উঠিল "তা হবে না।"

"তা হবে না, তা বেশ কথা। তুই আমায় তাহলে বিয়ে করবি না কি?"

"যাও, ওসব বল্লে আমি আর এখানে আসব না—তা বলে দিচ্ছি।"

"তা না আসিস্ আমার বয়েই গেল; কিন্তু আমি আজ আর খাচ্ছি না।"

রাণী পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু সর্দারের কথা শুনিয়া সে বসিয়া পড়িল—তার খাওয়া হইবে না, ইহা ভাবিতেও রাণীর কষ্ট হয়। সর্দার সমস্ত লক্ষ্য করিল। রাণীকে রাগাইবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে কহিল,—"আচ্ছা বিয়ের কথায় তুই চটিস্ কেন?"

"কের্ সেই কথা?"

"কেন বিয়ে কল্লে ক্ষতি কি?"

"যাঃ হিন্দুর সঙ্গে কখন মুসলমানের বিয়ে হয়?"

"ইস্ হিন্দু কি পীর না কি—যে হবে না?"

"না তা হয় না।"

"আচ্ছা তোকে যদি মুসলমান করিয়া লই?"

"তুমি কেন হিন্দু হও না!"

"হিন্দুরা যে মুসলমানকে হিন্দু করে না। তা যদি হ'ত মোর হয় হিন্দু হইতাম।"

"আচ্ছা, হিন্দু মুসলমান হতে পারে?"

"তা হয়—যদি হিন্দু ইচ্ছা করে। তুই হবি?"

"যাঃ" বলিয়া রাণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সর্দার আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া দেখিল, আকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে—পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে।

৮।

গোটা গল্প লিখিতে বসিয়াছি; সুতরাং গুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। রাণী এখন আসাদের বিবাহিতা পত্নী। নদীর বেগ পাহাড়েও রোধ করিতে পারে না—সে সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্বিগুণ বেগে সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে ঝাঁপাইয়া

পড়ে। যদিও এখন রাণী মুসলমানী—তার নামও নূতন হইয়াছে, তথাপি সর্দ্দার তাহাকে রাণী বলিয়াই ডাকে—নামটী তার বড় আদরের। বিবাহের পর দু'জনের প্রতি দু'জনের টান আরও বাড়িয়া গিয়াছে—দু'জনের স্নেহ আরও গাঢ় হইয়াছে। সর্দ্দারকে আর রুটী গড়িতে হয় না—সর্দ্দারপত্নী স্বয়ং স্বেচ্ছায় সে ভার গ্রহণ করিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সর্দ্দার না আসিলে তার আর ভাবনার সীমা থাকে না—সে উৎকণ্ঠিতচিত্তে কেবল ঘর আর বাহির করিয়া বেড়ায়। সর্দ্দার কুটীরে ফিরিলে—তবে রাণী শান্ত হইয়া তাহাকে খাইতে দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর দেরী করিয়া বাসায় ফিরিবার জন্য সে তার সহিত তুমুল কলহ সুরু করিয়া দেয়। কখন তাহাকে গালি দেয়—কখন মান করিয়া বসিয়া থাকে, আবার কখন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলে সর্দ্দারও তার পত্নীকে শান্ত করিতে যেমন মজবুত, তাহাকে রাগাইতে ও তেমনি সিদ্ধহস্ত! যদি সে মান করিয়া বসিয়া থাকে, তখন সে পরদিন নিরাহারে থাকিবার মানস স্থাপন করিলে অমনি মানিনীর মান ভাঙ্গিয়া যায়। যদি সে তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে থাকে, তখন সর্দ্দার অম্লানবদনে পত্নীর প্রশ্নের অবান্তর উত্তর দিয়া তাহাকে রাগাইবার চেষ্টা করে। দু'জনের এই ঝগড়া এই ভাব, এই কান্না, এই হাসি—এই ভাবে দম্পতীর দিন কাটিতে লাগিল। দুটী পাখীর মত এ ওকে ঠোকরায়, ও ওকে ঠোকরায়, আধার একবৃন্তে দুটী ফুলের মত এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়ে ও এর গায়ে ঢলিয়া পড়ে।

আজ সর্দ্দারপত্নীর দুর্জ্জয় মান—তিনি গুম্ হইয়া বসিয়া আছেন। সর্দ্দার রকম দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল—"দেখ না, আর পারি না, রোজ রোজ কেই বা পারে? কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে একটু আধটু দেরী হয়ই —কার না হয়! কে দিনরাত ঘড়ি ধরে বসে থাকে? একটু দেরী হলেই আর রক্ষে নাই। অমনি ওঁর মান হবে এ কি!

শ্রীমতীর অসহ্য হইল। তিনি সুর সপ্তমে চড়াইয়া কহিলেন—"কেন হবে না! রোজ রোজ দেরী করে আসবে কেন? এতে দোষ হয় না, আর আমি রাগ করেই বড় দোষ।" "এত রাগ কল্লেই বা চলবে কেন? দেরী হল একটুখানি আর তোমার রাগ হল অতখানি"—পতিদেবতার অঙ্গভঙ্গী দর্শনে অতি কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া ভার্য্যা কহিল—"বেশ তুমিও দেরী কোরো না, আমিও রাগ কর্ব্ব না" সর্দ্দার স্নেহবিজড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা রাণী একটু খানি দেরী হলে—তুই অত ব্যস্ত হ'স কেন?" রাণী সুর নরম করিয়া উত্তর

দিল—"না হয়ে আর কি করি? সেই কোন্ সকালে খেয়ে চলে যাও আর তোমার চুলের টিকি দেখবার জো নাই। আমি বেঁচে থাকতে ওসব চলবে না তা বলে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা বেশ এবার থেকে জলদি জলদি আসব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—একটু দেরীতেই এই অনর্থ ঘটান্, এরপর আমি ম'লে তুই কি কর্ব্বি বল দেখি?"

"কর্ব্ব আবার কি। মরণটা বুঝি শুধু তোমার একার হাতে ধরা—আমরা বুঝি মর্ত্তে জানি না!"

"তুইও মর্ব্বি না কি?"

"আমি হিন্দুর মেয়ে,এটা ভুলে গেছ না কি! আমাদের মর্ত্তে ভয় হয় না।"

"তাহলে আমি মলে তুইও মর্ব্বি?"

"তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শুধু এই জন্মের না কি?"

"কি ভাবছ মলেও এর হাত এড়াতে পার্ব্বে না—এই নয়?"

"আমি যদি তোকে তালা'ক দিই!"

"ওঃ তালাক অমনি দিলেই হল কি না! তা দেবার আগেই আমি চক্ষু বুজব, তখন মজা টের পাবে।"

সর্দ্দারও হাসিয়া ফেলিল, রাণীও হাসিতে লাগিল। সর্দ্দার মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিল—খোদা রাণীকে আমার বাঁচিয়ে রেখো—তাকে যেন আমি সুখী কর্ত্তে পারি। খোদার পায়ে তাহার করুণ প্রার্থনা পঁহুছিল কি না জানি না; কিন্তু তাহার অদৃষ্টলক্ষ্মী তাহার এ প্রার্থনায় অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন।

৯।

জন্মদুঃখী আসাদের কপালে দাম্পত্যজীবনের বিমল সুখ বেশী দিন সহিল না। সহরে দুরন্ত মহামারী প্লেগ দেখা দিল। লোকের পর লোক মরিতে লাগিল। আজ যে সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান, কাল সে আর নাই, ধরাধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সহরশুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত ভীত উৎকণ্ঠিত। কাল কখন ডাক পড়ে, তার ঠিকানা নাই। মাতা পুত্র—পতি পত্নী—আত্মীয় স্বজন ইহাদের মধ্যে কোনটীকে কখন লইয়া যাইবে, তারও কিছু স্থিরতা নাই। মৃত্যুর কাছে স্নেহ নাই, ভালবাসা নাই, মায়া নাই, ধর্ম্ম নাই, মৃত্যু অম্লানবদনে আসিয়া সব শেষ করিয়া দেয়। পুত্রের মাতৃশোক, মাতার পুত্রশোক ও আত্মীয়-

স্বজনের বিয়োগব্যথায় মৃত্যু ভুলে না ; দাবানলের মত স্মৃতি প্রকট করিয়া অধিনী শ্মশান করিয়া দেয়।

এবার বুঝি রাণীর পালা—সে শয্যাশায়িনী হইল। সর্দ্দার প্রাণপণে তার সেবা করিয়া মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিতে লাগিল। তার আহার নাই—নিদ্রা নাই—সে দিবারাত্র রোগীর পাশে বসিয়া আছে। যতক্ষণ শ্বাস ; ততক্ষণ আশ, এই-ভাবে সে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাণীর শুশ্রূষা করিতেছে। রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া অলক্ষ্যে তার অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়ে। তার নিজের জীবন দিয়াও যদি রাণী বাঁচে, তার জন্য কাতরে খোদার পায়ে প্রার্থনা জানায়। একবার ভাবে, রাণী বাঁচিয়া উঠিবে, তারপর আবার তার মনে হয়, হয়ত আর কোন ভরসা নাই। একবার আশায় উৎফুল্ল হয় আবার পরক্ষণেই নৈরাশ্যের তীব্র বেদনায় তার বুক ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ আশা ও আশঙ্কার মাঝে ধীরে ধীরে রাণীর জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। আসাদের গগনভেদী হাহাকার মৃত্যুর মর্ম্মভেদী বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল।

১০।

সব ফুরাইয়াছে—দীপ নিভিয়া গিয়াছে। দীনের কুটীরে যে উজ্জ্বল হাসির আলো ফুটিয়াউঠিয়াছিল—রাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনন্ত আঁধারে মিলাইয়া গেল। এখন সব আঁধার, চারিদিক আঁধার, আর সে আলোর চিহ্নমাত্র নাই। রহিল কেবল জ্বালাময়ী স্মৃতি। ভস্মস্তূপ যেমন অগ্নির পরিচয় প্রদান করে, তেমনি গৃহের প্রতি স্থানটী রাণীর পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। ঘরের আসবাব-পত্তর—দেওয়ালে টাঙ্গান ছবি—পরনের কাপড় চোপড়—সর্ব্বত্রই সে তার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সবই যে তাহার স্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল। যেমনি তা ছিল, তা রহিয়াছে ; কিন্তু যে যাদুমন্ত্রে ঘরখানি হাসিত—যার অস্তিত্বে তার প্রত্যেক ইটখানি হৃদয়ের সুখস্মৃতি সঞ্জীবিত করিত—তাহা আর নাই। এখন সেখান হইতে এক বিরাট হাহাকার উঠিতেছে—গৃহের চতুর্দ্দিক খাঁ-খাঁ করিতেছে। আকাশ শূন্য—গৃহ শূন্য—হৃদয় শূন্য—সর্ব্বত্র আঁধার—ঘোর আঁধার। আঁধারে পড়িয়া সর্দ্দার হাহাকার করিতে লাগিল—একবুক কাটা ব্যথা সে কেবল গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

যে ভিক্ষুক একদিন পেটের জ্বালায় স্বদেশ ত্যাগ করিয়া জীবনে উপার্জ্জন সার করিয়া তৃপ্তি পায় নাই, শুধু স্নেহের আশায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়া নিজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—আজ সে স্নেহসুধায় বঞ্চিত হইয়া সে আপনাকে পুনর্ব্বার

দেহসার ভিক্ষকেরও অধম মনে করিতে লাগিল। তার এই জীবনের সব সুখ শেষ হইয়াছে—সব আশা নির্ম্মূল হইয়াছে—সব বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে। কি ভরসায় আর সে জীবন ধারণ করিবে? কা'র জন্য পরিশ্রম করিয়া সে অর্থোপার্জ্জন করিবে? অর্থে তার প্রয়োজন? শুধু দেহরক্ষার জন্য? সে খোদার দেওয়া দেহ খোদাকে ফিরাইয়া লইতে বলিল—বিনিময়ে চাহিল শুধু প্রাণ—যাহা পাইয়া সে আপনাকে রাজ্যেশ্বর অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিয়াছিল। দেহের ভার আর বহিতে সে অক্ষম। সর্দ্দার গৃহত্যাগ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কোথায় গেল, কেহ জানিল না। পরদিন প্রাতে সকলে দেখিল—শূন্য ঘর পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহদ্বার খোলা রহিয়াছে—যেখানে যা সাজান ছিল—সব তেমনি রহিয়াছে—সেখানে নাই কেবল গৃহস্বামী সর্দ্দার। তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সর্দ্দারের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পৃথিবী ঠিক তেমনি চলিতেছে—সূর্য্য তেমনি উঠে, তেমনি ডুবে—নীলাকাশে তেমনি জোৎস্না হাসে—তেমনি মিলাইয়া যায়। কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। ভগবানের রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে সব যায় আবার সব ফিরিয়া আসে। ওলট-পালট হয়—শুধু মানুষের বেলা মানুষ চলিয়া যাইলে আর ফিরিয়া আসে না। সর্দ্দার যাহা হারাইয়াছে, তাহা আর পাইল না। তাহারই সন্ধানে সে গৃহত্যাগ করিয়াছে। মনুষ্য সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছে। তার সে গভীর জ্বালায় কোন শান্তি নাই। ভগবান্ তার মঙ্গল করুন।

(১১)

সহর প্রান্তে একটী কবরের পাশে এক ফকীর বসিয়া আছে। কবরের উপর ঘাস গজাইলে সে সযত্নে তাহা উপড়াইয়া ফেলে। সকাল সন্ধ্যায় তার চারিপাশের জঞ্জাল সরাইয়া দিয়া—সে স্থানটিকে পরিষ্কার ঝকঝকে করিয়া রাখে। দিবসের মধ্যাহ্নভাগে ফকীর একটীবার ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়। তারপর কবরের পাশেই তার বিশ্রাম—কবরের পাশেই তার শয়ন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ভাবে তার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—সে কখন সে স্থান ত্যাগ করে নাই। সে যত্নের ধনের মত কবরটী আগুলিয়া পড়িয়া থাকিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে ফকীর হাসিয়া উত্তর দিত "মৃত্যুর পর, মুক্তির তীর পড়িবে—তারপর অবিচ্ছেদ অনন্ত মিলন। আমি সেইদিনের জন্য এই স্থানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।" উত্তর শুনিয়া তাহারা পাগল বলিয়া হাসিত—সে ভ্রূক্ষেপ করিত না।

১২

ফকীর যথাসময়ে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ক্রোধে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া আসিল। কবরের পাশে যেখানে সে দিবারাত্র বসিয়া থাকিত, তাহার ফিরিবার পূর্ব্বেই সেখানে একটী নূতন কবর প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আর তার আহারের প্রবৃত্তি হইল না। সে ভিক্ষালব্ধ রুটী কয়খানি টান্ মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। কারণ ঐ কয়খানির জন্যই আজ তার প্রিয়স্থানটী বেদখল হইয়াছে—ভিক্ষা করিতে বাহির না হইলে হয়ত এরূপ হইত না। ফকীর কপালে করাঘাত করিতে লাগিল--রাগে শোকে ক্ষোভে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। এইস্থানে সে তার মৃত্যুশয্যা কল্পনা করিয়া মরণের পরে সেই মহামিলনসঙ্গীত শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে। "আমাদের সম্বন্ধ শুধু ইহ জনমের নহে"—একথা আজও সে ভোলে নাই। বড় আশা ছিল, মরণের ঘুম ভাঙ্গিলে সে ও রাণী আবার হাত ধরাধরি করিয়া জাগিয়া উঠিবে। চো'খ খুলিয়া সে দেখিবে—সর্দ্দার তাহারই পাশে, আর সর্দ্দার দেখিবে যে, তার রাণী মরে নাই—সে লতার মত তাহাকেই জড়াইয়া আছে। রাণীর কবরের পাশে আর একজনের কবর হইবে? ফকীরের জীবন থাকতে তাহা হইবে না।

দেখিতে দেখিতে ঘোর কাল মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে রাত্রির আঁধার--মেঘের আঁধারে মিলিত হইয়া কালরাত্রির সৃষ্টি করিল। মেঘের গর্জ্জন বিদ্যুতের অট্টহাসি ও বাতাসের হু হু শব্দে রাত্রির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আরও ভয়ানক করিয়া তুলিল। যেন জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত! ফকীরের হৃদয়েও আজ প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী প্রতিচ্ছবি! তাহার জ্ঞান নাই—বাতাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে—বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সে চতুর্দ্দিকে অনলবর্ষি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ঘোর অন্ধকারে দূরে বিদৃশ্যমান ক্ষীণ আলোর মত যেন কিছু সন্ধান পাইয়া হঠাৎ সে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ফকীর যেন কিছু চিন্তিত। পরক্ষণেই শ্মশানবিহারী প্রেতের ন্যায় সে চঞ্চল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে একবার দাঁড়ায়, আবার চলে—আবার দাঁড়ায় আবার চলে,যেন কি করিবে; কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না—যেন কোন কাজে একবার অগ্রসর হইতেছে—আবার চমকিয়া উঠিয়া পিছাইয়া আসিতেছে—যেন ভয়ঙ্কর কিছু করিবে; কিন্তু করিতে পারিতেছে না। অতর্কিতে কড় কড় করিয়া মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকিয়া

উঠিল, বাতাস হাঃ হাঃ করিয়া উঠিল। প্রকৃতির পরিহাসে ফকীর মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যেন বাঘ এইবার তার শীকার ধরিবে। লোলিহান-জিহ্ব ব্যাঘ্রের মত বসিয়া সে নূতন কবরটিকে খুঁড়িতে লাগিল। মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে, তার ভ্রূক্ষেপ নাই। তারপর মৃতদেহটীকে কবর হইতে টানিয়া বাহির করিল। এইবার তার কাজ শেষ হইয়াছে আর তার কোন কৌতূহল নাই। মৃতের উপর তার কোন হিংসা নাই; সুতরাং সে শব স্কন্ধে লইয়া স্থানান্তরে কিছুদূরে আর একটি কবর প্রস্তুত করিয়া সেটীকে প্রোথিত করিল। নিজের প্রিয়স্থানটী পুনরধিকৃত করিয়া যেমন শোকাতুর প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পাইয়া তার গলা ধরিয়া তার বক্ষে মুখ লুকাইয়া মর্ম্মবেদনা নিবেদন করে—সেইরূপ সে রাণীর কবরের উপর দু'হস্তে আপনার মুখ ঢাকিয়া ঘূর্ণিত মস্তকে ঢলিয়া পড়িল। ক্লান্তি ও উত্তেজনার পর এক প্রাণঘাতী অবসাদে তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

১৩

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবর হইতে মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে, এই কথা সহরময় প্রচারিত হইল। মৃতদেহের অবমাননায় সমস্ত মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সহরবাসী সমস্ত মুসলমান মিলিত হইয়া ফকীরকে কবরস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য ও মৃতদেহের অবমাননার অপরাধে তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য সহর কোটাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিল। সাহেব সদলবলে স্বয়ং তদন্তে বাহির হইলেন। দলে দলে লোক তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিল। অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া সাহেব দেখিলেন, তাঁহার আসামী ভবপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছে। সে কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছে—তাহার চক্ষু কোটরস্থ, মুখ—পাণ্ডুর, শরীর—শীর্ণ—তাহাতে সজীবতার লেশমাত্র নাই।

আসামী সাহেবকে দেখিয়া শীর্ণহস্ত উত্তোলন করিয়া সেলাম জানাইয়া ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিল—"সাহেব একদিন তোমার মত আর একজন বিচারকর্ত্তা আমায় বড় উপকার করিয়াছিল। তাহারই বিচারফলে হিন্দুস্থানে আমি এক অপূর্ব্ব রত্ন পাইয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। তার অনুসন্ধানে আমি শ্মশানবাসী হইয়া এ স্থানে বহুদিন ধরিয়া বসিয়া আছি। স্থানটী আমার নিকট মসজীদ অপেক্ষাও পবিত্র—অপরের এ স্থানে কোন অধিকার নাই। তাই এখানকার মৃতদেহ স্থানান্তরে রক্ষা করিয়াছি। আমি কোন অন্যায় করি নাই।"

বিচারপতি জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন—"তুমি গুরুতর অন্যায় করিয়াছ—কেন এরূপ করিলে?"

উত্তেজনায় আসামী মাটীতে হাতের ভর দিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে উত্তর দিল—"কি অপরাধ করিয়াছি আমি? বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুই মানি নাই এখানে এই আশ্রয়-লাভের জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছি, তবু মানুষ আমাকে শ্মশানের এতটুকু মাটী, দিতে পারে না? আমার কি মানুষের মত কোন দাবী নাই!

সাহেব সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দাবী করিতেছ কিসের—বুঝিতে পারিতেছি না"।

ফকীর অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল "বুঝিতে পারিবে না—একথা বুঝিবার মত হৃদয় তোমাদের নাই। তাহা হইলে পৃথিবী অন্যরূপ হইয়া যাইত। আমার দাবী কি শুনিবে? শুধু এই স্থানটুকু আর কিছু নয়। যতদিন দেশে দেশে নিঃস্ব হইয়া পেশোওয়ারের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—তারপর হিন্দুস্থানে আসিয়া যতদিন এই মাংসপিণ্ডের জন্য পরের দাসত্ব করিতে ছিলাম, ততদিন আমার কোন দাবী ছিল না। তারপর এক শুভক্ষণে এক দেবীর দর্শন পাইলাম। এই দেখ, এই কবরে সে অনন্তনিদ্রায় শায়িত। সে আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল। আমি মানুষ হইলাম। ভিক্ষুক হইয়াও আমি রাজেশ্বর অপেক্ষাও সুখী হইয়াছিলাম। প্রাণের স্ফূর্ত্তি—মনের শান্তি—হৃদয়ের ভালবাসা মানুষের যাহা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু সব পাইয়াছিলাম। আমার সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। আমার সুখে খোদার হিংসা হইল। তিনি আমাকে দেহ দিয়া সংসারে ভিক্ষুক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে তার প্রাণ সঞ্চার করিয়া আমাকে রাজেশ্বর করিয়া খোদার উপর কারচুপী করিল। খোদা তাহাকে অপহরণ করিলেন। আবার আমি ভিক্ষুক হইলাম। দেহের গুরুভার আর বহন করিতে পারিলাম না। সেই মুক্তির দিন—যেদিন সব মানুষ কবর ছাড়িয়া উঠিয়া আবার প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পায়, শুধু তার অপেক্ষায় এখানে—রাণীর এই কবরের পাশে বসিয়া মৃত্যুর আরাধনা করিতেছি। একদিন দিন ছিল যখন, তার কাছ ছাড়া হই নাই। আজ সে মরণের ঘুম ঘুমাইতেছে, এখনও তার কাছ ছাড়া হইতে পারিতেছি না। তার পাশে এ স্থানে রহিবার অধিকার এ পৃথিবীর মধ্যে আছে শুধু আমার। এ আমার ন্যায্য অধিকার—আমি ও মানুষের মধ্যে একজন"। বলিতে বলিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ফকীর কাতরনয়নে

আকাশপানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঈশ্বর তোমার দেওয়া এই মাংসপিণ্ড তুমি ফিরাইয়া লও। মানুষের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমাকে এইটুকু স্থান ভিক্ষা দাও, এইখানে আমায় মরিতে দাও"—সে আর পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে লুটাইয়া পড়িল—সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

আসামীর সাজা বিধান করিতে আসিয়া বিচারপতি বিগলিতহৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ফরিয়াদীর দল নীরবে নত মস্তকে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৪)

দুইটী কবর পাশাপাশি রহিয়াছে। কবর দুইটী ঘেরিয়া একটী সুন্দর হর্ম্ম্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ ইহা হিন্দুমুসলমানের পবিত্র তীর্থস্থান। বিবাহের পর প্রত্যেক নবদম্পতি স্বহস্তে কবর দুইটী সাজাইয়া দেয়। মুসলমানের বিশ্বাস তাহা হইলে নবদম্পতির আর ছাড়াছাড়ি হইবে না, আর হিন্দুর বিশ্বাস, তাহা হইলে স্বামীস্ত্রীর একসঙ্গে অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে। তাই হিন্দুমুসলমানে মন্দিরটীর নাম দিয়াছে—

"রাণীর কবর"।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

নাটকের বিশেষত্ব।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ।)

নাটক অর্থে ক্রিয়া-চিত্র বুঝাইয়া থাকে। নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার মনোভাব কার্য্যে স্পষ্টীকৃত করাই নাটকের উদ্দেশ্য। নাটকীয় ব্যক্তিগণ বাস্তবরূপে পরিগৃহীত হয়। নাটক বিবিধ রকমের হইতে পারে; তাহাদের আকার ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু এক বিষয়ে তাহাদের ঐক্য আছে; তাহা—ক্রিয়াপরম্পরার সহিত নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ভাবস্থ চিত্রের অভিব্যক্তি। ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করা মনুষ্য-প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম—ইহার মজ্জাগত গুণ। অঙ্গভঙ্গী, বাক্য, কিম্বা উভয়ের সমন্বয়ে মানুষ তাহার হৃদয়ের ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিয়া থাকে। উৎসবে, পূজামণ্ডপে ও আনন্দের সময় মানুষের হৃদয়তন্ত্রী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শে বাজিয়া উঠে এবং নৃত্য ও গীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভাব প্রকাশের আর একটী উপায়—অনুকরণ; কিন্তু অনুকরণ ক্রিয়ায় পরিণত না হইলে তাহা নাটকপদ-বাচ্য হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার অনুকরণ নাটকের বীজ। তার পর নাটক যখন সাহিত্যের আকার ধারণ করে এবং সাহিত্যের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন উহা নাট্য-সাহিত্যরূপ বিশেষ নামে অভিহিত হয়।

নাটকের সহিত অভিনয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জাতীয় সাহিত্যের আদি অবস্থায় গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সাহিত্যের প্রথমে নাটকের উদ্ভব দেখিতে পাইনা। গদ্যের বহু পূর্ব্বে কাব্যের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু কোন অতীত যুগের স্বপ্নময় দিবসে কবিত্বসুন্দরী মনোহর বেশে আনন্দ-সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া মনুষ্যজাতির সমক্ষে কোন শুভমুহূর্ত্তক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সভ্য মানবের জ্ঞানালোক সেই নিবিড় অন্ধ-তমস ভেদ করিতে অক্ষম। কোন্ অপরূপ দৈবশক্তি প্রভাবে জড়ে জৈব পদার্থের আবির্ভাব হইয়া এই বিশাল প্রাণি-জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। অভিব্যক্তিবাদ কিম্বা বিজ্ঞান যেমন তাহার সন্তোষজনক

উত্তর দানে অসমর্থ, মানবভাষার প্রথম উদ্ভবনির্দ্ধারণে ভাষাবিৎ সুধীমণ্ডলীর বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ পরাজিত, সেইরূপ কি অবস্থায় কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে মানবহৃদয়রঞ্জন গীত ছন্দোবন্ধে প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান একরূপ অসম্ভব। কিন্তু অপর প্রমাণাভাবে অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বোধ হয় মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমের অস্পষ্ট আনন্দকাকলী, মধুপানমত্ত ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জন, বায়ুহিল্লোলে মৃদু আন্দোলিত সুরভিমণ্ডিত পুষ্প, অমল ধবল তুষারশোভিত অভ্রভেদী গিরিশিখর, দিগন্তপ্রসারিত মহাসিন্ধুর গভীর গর্জ্জন, বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা-শোভিত সুখময়ী উষার অপরূপচ্ছটা, নীলাম্বরে পূর্ণ শশধরের প্রাণোন্মাদকরী শুভ্র সুধাধারা, সমুদ্রাভিমুখপ্রবাহী কলকলনাদি নির্ঝরিণীর শ্রুতিসুখকর মধুর গীতি ও জলপ্রপাতের দূরাগত ধ্বনি—আদি মানবের হৃদয়ে এক অভাবনীয় আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। বোধ হয় সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসেই কবিতার প্রথম জন্ম।

যাহা হউক, নাটকের জন্ম ও নামকরণের বহুপূর্ব্বে গীতিকবিতা কিম্বা মহাকাব্য কিম্বা উভয়েরই উদ্ভব হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক নাটকের বিশেষত্ব কোথায়? অভিনয় কলাকৌশলের সহিত নাটকের সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। উপযুক্ত অভিনেতা নাটকের উপযুক্ত ব্যাখ্যাকর্ত্তা। একটু সামান্য দৃষ্টিতে, একটু ইঙ্গিতে, একটি অঙ্গুলি সঞ্চালনে, একটু সামান্য হাসিতে, তাহার মুখমণ্ডলে ভাবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের হৃদয়ে যে ভাব, যে ধারণা, যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা ব্যাখ্যাকার সমগ্র ব্যাকরণ, শব্দ, শাস্ত্র, ছন্দ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া দর্শকদিগের হৃদয়ে সেইরূপ অব্যক্ত অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করিতে পারেন না। নাটক লিখিতে হইলে কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়; কিন্তু তাই বলিয়া নিয়মের দাসত্ব মানিয়া লইয়া ঘটনাবলীর বর্ণনা করিলে উৎকৃষ্ট নাটক হইবে না। সেক্ষপীয়র জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁহার কয়েকখানি নাটক মানবচরিত্র বিশ্লেষণে, মানবহৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে নিহিত ভাবরাশির পরিস্ফুরণে, বিশ্ব-সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার নাটকগুলির উপাখ্যান ভাগ অপর গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে গৃহীত; কিন্তু লিপিকুশলতা, রচনাবৈশিষ্ট্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনোহর ভাবের সমাবেশ ও তাহার কর্ম্মে বিকাশ তাঁহার নিজস্ব।

ভাব নাটকের প্রাণ। বিষয় নাটকের কঙ্কালস্বরূপ।—মৃত উপেন্দ্রনাথ।

এই বিষয়কে নাটকাকারে পরিণত করিয়া মানবহৃদয়ের ভাবরাশিকে ক্রিয়া ও বাক্যে বিকাশ করাই নাট্যকারের প্রধান কার্য্য। নাটকে মানবহৃদয়ের যে চিত্র প্রদান করা হয়, তাহা কার্য্যকারণপরম্পরায় সমস্ত ঘটনাবলীর সমন্বয় বিধান করিবে। দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী জীবনপ্রবাহের ন্যায় স্রোতঃস্বরূপ অনন্ত প্রবহমাণ; কিন্তু এই জীবন্ত ভাবকে নাটকের অত্যল্পকালীর বন্ধনে সংযত করিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে একখানি নাটক একটি ঘটনা লইয়া হইবে। ইংরাজী নাটকে বিশেষতঃ সেক্সপীয়রের নাটকে দেখিতে পাই, প্রধান ঘটনার সহিত একটি করিয়া অন্তর্ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রধান ঘটনার সহিত অপর ঘটনার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটিকে নিম্নতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে আর এক বিষয় লইয়া সমালোচকদিগের মধ্যে মতবৈষম্য হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, নাটকে কাল ও দেশের একত্ব থাকা উচিত; কিন্তু হিন্দু ও ইংরাজনাটককারগণ এই বিধিবন্ধন মানিয়া লন নাই। এই কৃত্রিম বন্ধনের গণ্ডীর মধ্যে নাটকীয় চরিত্রকে আবদ্ধ রাখিলে নাটকের বিষয়ের লঘুতা আসিয়া পড়ে। কারণ, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে বাস্তব জীবনে এমন খুব কম ঘটনা ঘটে, যাহার বিন্যাসে প্রাকৃতমণ্ডলীর হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষার উন্মেষ হইতে পারে। চরিত্রের পূর্ণতা দেখাইতে হইলে কেবল মাত্র অংশবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। মনুষ্যচরিত্র এমনি একটি জটিল বস্তু যে, দুই একটি ঘটনায় তাহার বিশ্লেষণ করা সুকঠিন। একটী ব্যক্তিকে চিনিতে হইলে তাহার সমস্ত জীবন অন্ততঃ তাহার জীবনের বৃহত্তর অংশ দেখিতে হইবে। ঘটনা বিপর্য্যয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেষ্টনীর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবন পরিণতি লাভ করে। প্রধান চরিত্রগুলির পরিপুষ্টি সাধনের নিমিত্ত—তাহাদের অন্তর্নিহিত মহনীয় ভাবগুলির উন্মেষের জন্য একটা জীবনের বৃহত্তর অংশের বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। কারণ দেখিতে পাই যে, পাপাসক্ত কলুষিত ব্যক্তিও ক্ষণিক উত্তেজনা ও উন্মাদনার বশে কোন জনহিতকর কিম্বা উচ্চাঙ্গের কার্য্য সাধনে সমর্থ হয়; কিন্তু তাই বলিয়া সেই ব্যক্তি আদর্শের উচ্চ আসনে স্থান পাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কেবলমাত্র গোপীগণের সহিত আমোদপ্রমোদ ও রঙ্গরসক্রীড়ার অংশ লইয়া তাঁহার চরিত্র দেখাইতে যাওয়া একটা মস্ত বিড়ম্বনা। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী বীরের জীবনে অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভবপর। কেবল মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশ লইলে তাঁহার দেবোপম চরিত্রের খর্ব্বতা সাধন করা হয়। অতএব

চরিত্র অঙ্কণে যথেষ্ট লিপিকুশলতার প্রয়োজন ; কারণ প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকা চাই যে, যাহা দ্বারা দর্শকবৃন্দের বা পাঠকবর্গের মন আকৃষ্ট হয়। চরিত্রে মানবীয় ভাব পরিপূর্ণ হওয়া চাই। চরিত্র অঙ্কণে যাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে—যিনি শ্রেষ্ঠ নাটককার, তিনি নাট্যোল্লিখিত সামান্য সামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষত্ব আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে সজীব করিয়া তোলেন ; পাকা চিত্রকরের ন্যায় তুলির সামান্য স্পর্শে সমস্ত চিত্রের সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব সম্পাদন করেন এবং শুষ্ক কঙ্কালসার দেহে যেন বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়া জীবন্ত ভাব প্রকটিত করেন। চরিত্র ফুটাইতে হইলে দুই একটি কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। নায়ক কিম্বা নায়িকার রঙ্গমঞ্চে উপযুক্ত সময়ে আবির্ভাব কিম্বা দুই তিনটি ব্যক্তির মধ্যে চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য নিপুণতার সহিত প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অভিনয় দর্শকের হৃদয়গ্রাহী হয়। চরিত্রের একত্ব সম্পাদন করাও বিশেষ প্রয়োজন ; কিন্তু বাস্তব জগতে এমন মানুষ দুর্লভ নহে, যাহার কার্য্যের বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যই তাহার বৈশিষ্ট্য। এরূপ জটিল চরিত্রের অঙ্কণে যেরূপ পাকা হাতের লিপিকুশলতার প্রয়োজন, সেইরূপ দর্শকবৃন্দের উপর ইহার প্রভাবও অসীম। বাস্তব জীবনে প্রত্যেক মনুষ্যের মনোভাবের ক্রমবিকাশ অবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষের জীবন একটা কলের ন্যায় চলে না, নিয়মের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ মানুষ প্রাণহীন, স্পন্দনহীন ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া যায়। মানুষের অদম্য, উৎসাহ, বহুধা বিচ্ছুরিত, মনোনিদী নিয়মপথাবলম্বিনী নহে। স্বাধীনতাই জীবন। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যপদেশে মানুষ নিয়মের লৌহশৃঙ্খল সজোরে ভাঙ্গিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে মিলাইতে চাহে এবং মিলনের প্রচেষ্টাই মানুষ্যচরিত্রে জটিলতা আনায়ন করে। যে নাট্যকলাবিৎ এই ভিতরের মানুষটীকে নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণের ক্রিয়া ও বাক্য দ্বারা ফুটাইতে সমর্থ হন, যিনি মানবমনের এই চিরন্তন ভাবের অভিব্যক্তির সহায়তা করেন, এবং দর্শকবৃন্দের চক্ষুর সম্মুখে এই জটিলভাব আলেখ্যের ন্যায় নিপুণতার সহিত উদ্ঘাটিত করেন, তিনিও ধন্য। নাটকের ঘটনাবলী ব্যক্তিগত চরিত্রের ক্রমবিকাশের সাহায্যে করিবে। এই ব্যক্তিগত চরিত্রসম্বন্ধে যাহা খাটে, সমস্ত নাটক সম্বন্ধেও তাহাই। প্রাকৃতিক জগতে একটি ফুল যেমন আপনি জন্মায় ও আপনিই প্রস্ফুটিত হয় তাহার পাপড়ি যেমন একটির পর একটি করিয়া বিস্তৃত হয় এবং অবশেষে সমস্ত ফুলটি যেমন নয়নানন্দ বিধান করে নাটকের

চরিত্র এবং নাটক সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। নাটকের চরিত্রগুলির যেমন সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ প্রয়োজন, সেইরূপ সমস্ত নাটকের ঘটনাগুলিরও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যেক বাক্যই নাটককে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করাইয়া দিবে, তাহার লক্ষ্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল কতকগুলি চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ নাটক নহে। এইজন্য লেখককে নাটকের উদ্দেশ্যের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নাটকের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দুই প্রকার—হয় বিয়োগ না হয় মিলন। এইজন্য নাটকও সাধারণতঃ দুই প্রকার—বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত। এই উভয় প্রকার নাট্যকলার পার্থক্য দ্বিবিধ। মনোভাবের বিবিধ প্রকার ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপদ ঘটে। সামান্য প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পতিত হইয়া আমরা বিপর্য্যস্ত ও দুঃখিত হই। আমাদের কোন স্বার্থের হানি হইলে কিম্বা কোন আকস্মিক অশুভ ঘটনা সংঘটিত হইলে আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসিতে থাকি; জগৎ অন্ধকার দেখি, আমাদের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে এবং আমরা জ্ঞানহারা হই। এই অস্থিরতার মধ্যে আপনাদের মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলি; চিন্তাশক্তি লোপ পায়; কোথায় গেলে কি করিলে শান্তি পাইব, খুঁজিয়া বেড়াই। তাই এরূপ দুঃখকষ্টে আত্মোন্নতির সাহায্য না করিয়া বরং আমাদিগকে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া যায়, স্বার্থের গণ্ডীকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া মুক্ত স্বাধীনভাব বিকাশের পথ শুধু কণ্টকিত করে না, তাহা চিরতরে রুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে পশুত্বের দিকে লইয়া যায়। কিন্তু যখন কোন গভীরতর শোকের বিভীষিকাময় দৃশ্য আমাদের চক্ষুর সমীপে উদ্ঘাটিত হয় এবং তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আমাদের হৃদয়পটে যুগপৎ আনন্দ মহৃদয়তা ও ভীতির আবির্ভাব হয়। তখন আমারা স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সামান্য গণ্ডীপার হইয়া বিশ্বরাজ্যের উচ্চ উন্মুক্ত মহত্তম ভাব হৃদয়ে পোষণ করি—অশ্রুর পবিত্র গঙ্গাজলে হৃদয় পূত ও সংস্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মন উন্নত ও পবিত্র হয়। ইহাই বিয়োগান্ত নাটকের মহান্ উদ্দেশ্য। মিলনান্ত নাটকের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। ইহাতে আমাদের নৈতিক দুর্ব্বলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্দ্দোষ "শুভ সংযত হাস্যের" অবতারণা করে। কোনও প্রসিদ্ধ ফরাসীলেখকের উক্তি এই যে, যখন আমরা কোন ব্যক্তির কার্য্য দর্শন বা বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করি, তখন অতর্কিতে আমরা সেই ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার উপর কটাক্ষ করি এবং সেই সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করি। হাস্যরসের উদ্ভবসম্বন্ধে এই

দার্শনিক মতের কিছু সত্যতা আছে কিনা জানি না, তবে ইহা নিশ্চিত যে, হাস্যরস জনসাধারণের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি না করিয়া বরং তাহাদের হৃদয়কে যে স্বচ্ছ ও আনন্দময় করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইস্‌কিলাস, সফোক্লিস্ ইউরিপিডিস্ ও এরিষ্টোফেনস্ গ্রীক্‌সাহিত্য এবং সেক্সপীয়র ও বেন্ জন্‌প্রভৃতি লেখকগণ ইংরাজীসাহিত্যে নাটকের এই দুই প্রধান বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। হিন্দুনাট্যকারগণ বিয়োগান্ত নাটকের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং যাহাতে নাটকের শেষাংশ অপ্রীতিকর না হয়, এজন্য একটি বিশেষ বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বীরত্ব কিম্বা প্রণয়ের কাহিনী, বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়টি লইয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের নাটক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

মন্দিরে আসিল সবাই ; কিন্তু, গ্রামপ্রান্তে জীর্ণ পর্ণকুটীর-বাসিনী রমার মাকে ত একবারও দেখা গেল না। দেবতায় তার ত অনাস্থা কোন কালেই ছিল না ; তাই সকলেই ভাবিল যে, অসুখ বিসুখে বোধ হয় সে আজ সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহির হইতে পারে নাই। রমার মা কেন আসিল না, সে খবর কে লইবে, পথে তাহারই জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে বিন্দুর পিসি আজই রাত্রে রমার মার বাড়ী যাইবে ঠিক হইলে, যে যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

২।

মন্দির হইতে ফিরিবার পথে অন্ধকার তার মসীমাখা গা-খানি অনাবৃত করিলেও মহিলাবৃন্দের হাতে এক একটি প্রদীপ থাকায় রাস্তা চলার কোন বাধাই হইল না। যে যার ঘরে যথাসময়ে ফিরিয়া সংসারিক কাজে মনোনিবেশ করিল। বিন্দুর পিসি একবার ঘরে ঢুকিয়া পরক্ষণেই মালা হাতে করিয়া একলাই রমার মার তথ্যানুসন্ধানে চলিল। গ্রামে মেয়ে মহলে পিসির আধিপত্য বড় বেশী ; আর এই আধিপত্য সে আজ একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চালাইতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে জীবনের প্রারম্ভেই তার সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া গিয়াছে ; শ্বশুরকুলে উপযুক্ত অভিভাবক না থাকায় তার প্রথম পিতৃগৃহেই বসবাস ; একবেলা দুটী আতপান্ন সিদ্ধ খাইয়া সমস্ত দিন সে পাড়ায় পাড়ায় মুড়ুলি করিয়া বেড়ায়। তাকে লোকে ভালবাসে, কারো কারো ভয়ও করে ; বিপদে আপদে বিন্দুর পিসি কাছে না থাকিলে কাহারও মনঃপূত হইত না ; কারণ, সে যে গতর ঢালিয়া লোকের সেবা করে। আবার স্পষ্ট কথা কহে বলিয়া লোকের অপ্রিয়ও হয়। চেহারায় তার মাধুর্য্য নাই, মুখে তার কেবলই রূঢ় কথা ; নিরপেক্ষ বিচার সে দিনই করিতেছে। কাজেই গ্রামে সকল পরিবারই গুণে তার আকৃষ্ট, কিন্তু, পের বুলিতে রস নাই বলিয়া পায়তপক্ষে কেহ তাহাকে ঘেঁস্ দেয় না। রের অভিজ্ঞতা পিসির বড় কিছু না থাকিলেও সে সকলেরই নিকট সবজান্তা রূপে পরিচিত। দোষে গুণে হইলেও লোকটা মোটের উপর ভালই ছিল। রর নিন্দায় সে যেমন আনন্দ অনুভব করিত, পাঁচ জনের উপকার করিতেও কখন কুণ্ঠিত হইত না।

রাত্রির আধিক্যে অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল ; বিন্দুর পিসি একলাই সে গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে ; সঙ্গে কেবল তার জপমালা মা। গ্রামপ্রান্তে আসিয়া সে রমার মার [illegible]

মিলন।

মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যা দিনাবসানে তার লজ্জাবিনম্র মুখখানি ঢাকিয়া যখন দেবীপুরে তার ধূসর রংয়ের অঞ্চলখানি বিছাইতে গুট গুট পা ফেলিয়া আসিল, তখন সেখানে মন্দিরে মন্দিরে শাঁক-ঘণ্টার বাজনায় দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতেছে। পল্লীবাসিনী মহিলারা দেবার্চ্চনায় নিমগ্ন; কেহ একাকিনী; কেহ বা সঙ্গে সাথী লইয়া আসিয়াছে। সকলেই স্তিমিতনেত্রে দেবতার নিকট নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য সকরুণ প্রার্থনা করিতেছে। তাদের সমস্ত অকুণ্ঠ বাসনা দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিয়া নূতন করিয়া লুটাইয়া তুলিতেছে। রমণীহৃদয়ে এমন একাগ্রতা বুঝিবা জগতে দেখা যায় না; সকলেই নির্ব্বাক্, নিশ্চল, নিস্পন্দ; কেবল তাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে অন্তর্ধারায় ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া দেবতার চরণ ভাসাইয়া দিতেছে। আজ বৈশাখের প্রথম দিন; তাই মন্দিরে মন্দিরে সকলে মিলিয়া নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষাগুলি জীবন্ত করিয়া লইতেছে। বৎসরের প্রারম্ভেই এ শুভদিনে রমণীমাত্রেই মন্দিরে আসিয়া তাদের অভীষ্টসিদ্ধির জমাখরচটা একবার করিয়া যায়; উহার ব্যতিক্রম পল্লীর কোন ঘরেই হয় না। হিন্দুর চিরন্তন ধর্ম্ম এখনও যে অটুট রহিয়াছে, সে কেবল নারীহৃদয়ের বাঁধনে। দেবতার স্তব স্তুতি যা কিছু, সে সবই সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের তরঙ্গ; কত যুগ অতীতের ঢেউ চলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু, সে তরঙ্গ এখনও উদ্দামবেগে বহিয়া চলিতেছে তার সুখ বা শান্তি সবই উহাতে নিবদ্ধ। বিপ্লবের কথা সে শুনে না, ঘটতে সে ঘটিতে দেয় না; তাই অনাবিল ভাবে হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজার্চ্চনা এখনও বজায় রহিয়াছে। সে পূজা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার কত চেষ্টাই হইয়াছে কিন্তু রমণীহৃদয় কি শক্তির বাঁধনেই বাঁধা যে, উহা এযাবৎ কখনই পরাস্ত মানিল না!

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পূজারীর শাঁক ঘণ্টায় বাজনা থামিয়া গেল পল্লীবাসিনী সকলেই যে যার ঘরে ফিরিল; আশায় কেবলই উৎফুল্ল যে, দে তার নিকট হিসাব নিকাশ বর্ষ-শেষ হইবার পূর্ব্বেই সব ঠিক হইয়া যাইবে

আলোকরেখার সাহায্যে পথ চলিতে লাগিল। কত পথ চলিয়া সে যখন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভিতর হইতে ঘর্ ঘর্ ঘর্ শব্দ তার কাণে পঁহুছিল। দ্বারে আঘাত করিয়াই পিসি "রমার মা, এত রাত্তিরে চরখা কাটচিস্; ঘুম নাই চোখে?" বলিয়া ভয়েই হ'ক বা বিস্ময়েই হ'ক আঘাতটা আরও কিছু জোরে করিল। প্রৌঢ়া রমার মা অসময়ে হঠাৎ দরজায় আঘাত শুনিয়া ত্রস্তগতিতে বলিয়া উঠিল, "কে গা, এত রাত্তিরে,—নারাণী!" নারাণী রমার খেলার সাথী; সে কাছেই অন্য একখানি পর্ণকুটীরে থাকিত। অসময়ে সে কোন কোন দিন খেলার উন্মাদনায় রমার বাড়ী ছুটিয়া আসিত; রমার মা তাই তাকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিল। উত্তরে পিসির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে জোরে ধাক্কা দিয়া "ন্যাকামো রাখ" বলিয়া দরজা খুলিতে বলিল। রমার মা অপ্রতিভ হইয়া অর্গল খুলিয়া দিল। অন্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়াই পিসি তার মন্দিরে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে রমার মা নিজ দৈন্যের কথা পাড়িয়া সূতাকাটা বন্ধ রাখিলে পরদিন হাঁড়ি চড়িবে না, এবং সেইজন্যে তার যাওয়া হয় নাই, বলিল। পিসি কিন্তু এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তা হেন, ধাড়ী মেয়ে ঘরে পুষে রেখেছিস্, তাকে নিয়ে সকলের সাম্‌নে যাবিনি, তাই বল্।" বৃথা বাদবিতণ্ডায় কোন লাভ নাই দেখিয়া রমার মা নিরুত্তর রহিল। একেই দুঃখদৈন্যের তাড়নায় সে জর্জ্জরিত, তার উপর পিসির বাক্যবাণে আরও ক্ষুণ্ণ হইল। সত্য কথার খাতির নাই দেখিয়া সে আবার চরখা ঘুরাইয়া সূতা কাটিতে লাগিল। পিসি উহার ভাবান্তর দেখিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে মালা ছড়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আবার সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৩।

বেদগ্রামে জমীদারবংশে মুখুয্যেদের খুবই প্রতিপত্তি। একে নিকষ কুলীন, তার উপর লক্ষ্মীর কৃপায় তাদের মান সম্ভ্রম অত্যধিক হওয়ায় তারা দেশের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। সৌহার্দ্দ হিসাবে বা কুটুম্বিতা হিসাবে তাদের সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইতে পারিলে লোকে শ্লাঘার কথা মনে করিত। শ্রীধর মুখোপাধ্যায় ঐ বংশেরই একজন মাতব্বর ব্যক্তি ছিলেন। বয়সে নবীন হইলেও বুদ্ধির প্রাখর্য্য বশতঃ প্রবীণের ন্যায় সম্মান পাইতেন। অকাতরে দান, [illegible]

ছিল। জন-সমাজে সেই জন্যই তাঁর এত আদর। কোথায় টোল হইবে, কোথায় ছাত্রাবাস খুলিবে, কোথায় বিদ্যালয় হইবে, কোথায় সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে, এইরূপ জনহিতকর নানা কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। শুধু গতর দিয়া নয়, অকুণ্ঠিতভাবে নিজের অর্থে উহাদের শক্তি সঞ্চয় করিয়া দিতেন। প্রভূত অর্থের মালিক হইলেও সংসারে ঝঞ্ঝাট বড় কিছু ছিল না,—স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা রমাসুন্দরী তাঁর হৃদয়ের কতকটা কাড়িয়া লইয়াছিল। বাকীটা তিনি অকাতরে বিশ্বকে বিলাইয়া দিতেন। কিন্তু, পাঁচ জনের অত মুখচাওয়া বলিয়া বিধি বাদ সাধিল। সংসারে স্বার্থকে যে জলাঞ্জলি দেয়, তার কি কখনও ভাল হয়? নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইতে যে মানুষ পারিল না, সে কি কখনও স্বার্থাভিসন্ধী অন্য সহস্র লোকের ঘোঁট সহিতে পারে? স্বার্থেই স্বার্থ মিল খায়। স্বার্থে নিঃস্বার্থে প্রণয় কি কখন ঘটিয়া উঠে? তাই সংসারে নিত্যই এত বেসুরো আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীধর স্বার্থ ভুলিয়াছিল বলিয়া সংসার তার গণ্ডী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। মানুষের প্রকৃতির সহিত অমিল হওয়ায় সৃষ্ট রাজ্যের স্রষ্টাও বিরূপ হইলেন। শ্রীধরের হঠাৎ মৃত্যু হইল। শোকে, অবসাদে বেদগ্রাম ডুবিল বটে, কিন্তু, হতভাগিনী রমা ও তার মা কি দশায় উপনীত হইল, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব যথেষ্ট থাকিলেও, অসময়ে কেহই তাদের খোঁজ করিল না। পিতার মৃত্যুকালে রমার বয়স দুই বৎসর, আর তার মা সবেমাত্র বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। জমিদারীর কোন কথা তারা জানে না, আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব রমার মা চোখেও দেখে নাই। জীবদ্দশায় শ্রীধর সবই নিজে দেখিত,—স্ত্রী কেবল জানিত যে, সে জমিদারের গৃহিণী। অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া আমলা পেস্কার কে বা কোথায় থাকে, তার কোন খবরই পাইত না। স্বামীর মৃত্যুতে একেবারে নিরাশ্রয়া ভাবিয়া বজ্রাহত তরুর মত আছড়াইয়া পড়িল। কি হবে, কি করিয়া নিজের বিষয় বুঝিয়া লইয়া জমিদারী চালাইবে, তার কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইল না। বিপদের সময় জগতে কপট বন্ধুর অভাব নাই। সত্যের ভাণ করিয়া কপটতা যে প্রচ্ছন্নবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ খবর যথাযথ রাখা বড় সহজ কথা নহে। পুরুষেই তার ঠিকানা করিতে পারে না, তা আবার রমণী। জ্ঞাতিসম্পর্কে রমার মার এক দেবর আসিয়া জুটিল। সেই সব জমিদারী ঠিক ঠাক করিয়া দিবে বলায় তাহাকেই সম্পত্তির প্রতিনিধি নিযুক্ত

করা হইল। রমার মা আশ্বাসের বাণী শুনিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ বোধ করিল। কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় এক। দেবর বরাবরই সুচতুর খেলোয়াড়; রমার মা কখনও সাতে পাঁচে ছিল না, তাই দেবরকে চিনিতে পারে নাই। সে জমিদারী সম্বন্ধে যা বলে, তাই ধ্রুব সত্য মনে করিয়া তখনই তাই করে। সুবিধা বুঝিয়া দেবর কত দলীল দস্তাবেজ রমার মার নিকট সহি করাইয়া লইল, সে তার মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না; বুঝিল কেবল যে, দেবর আমার সম্পত্তির পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। কতদিন আর এমন করিয়া চলিবে? শেষে যখন দেবর দেখিল, যে, সবই তার করায়ত্ত হইয়াছে, তখন ভাজের প্রতি সে কিছু রূঢ়ভাব দেখাইতে লাগিল। রমার মা তাহা বুঝিতে পারিল না; সে কেবল ভাবিল যে, এতটা করিয়াছে, সে যদি রূঢ় হয় ত তাহা মার্জ্জনীয়। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, দেবরের ব্যবহার ক্রমশঃই বিরূপ হইয়া উঠিল। দিনান্তে দুটি শাকান্ন পাওয়া—তাও লাঞ্ছনাভিন্ন জুটিত না; আর দেবর তার রাবুয়ানার চূড়ান্ত করিতে লাগিল। মাসে কত নিরম্বু উপবাসই সে করিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। ক্রমশঃ দেবরের বিসদৃশ আচরণে সে প্রমাদ গণিতে লাগিল, এবং ভাবগতিকেও বুঝিল যে, সম্পত্তি তাঁর নয়। তবুও আশায় বুক বাঁধিয়া দেবরকে সোজা কথায় যখন জিজ্ঞাসা করিল যে, "জমিদারীর হিস্যা কবে আমায় বুঝাইয়া দিবে?" তখন সেও সেই সুরে বলিয়া উঠিল যে "দাদার হিস্যা সবই ত তিনি বিক্রী করিয়া গিয়াছেন; আছে কি যে তোমায় বুঝাইয়া দিব? বসত বাড়ীর অংশ পর্য্যন্তও তাঁর নাই।" হঠাৎ এ অপ্রত্যাশিত বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া রমার মা নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বুঝিল সে, যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। কিন্তু নিরাশ্রয়া বিধবার ত আর উপায় নাই। কাদায় গুণ ফেলিয়া অনাহারে অনশনে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। কপাল না ভাঙ্গিলে সে স্বামিরত্ন হারাইবে কেন? লীলাময় দুঃখের চরমসীমায় মানুষকে আনিয়া তবে তাকে মুক্তির পথে লইয়া যান। রমার মা দেবরের কর্কশ কটূক্তিতে নিষ্পেষিত হইয়া কন্যাকে বুকে করিয়া পার্শ্বস্থিত দেবীপুরে এক ক্ষুদ্র জীর্ণ পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইল। সেই অবধি দেবীপুরেই তার বাস।

৪।

অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষের জন্য আকাশে চাঁদ উঠিয়া ডুবিয়া গিয়াছে,—জ্যোৎস্নার তার কুটস্থ হাসিরাশি অনেক কাল হইল তিমিরে ঢাকা পড়িয়াছে।

রাত্রি কত হইল, তার ঠিকানা নাই; তবে জনকোলাহল থামিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, দ্বিপ্রহরের আর বড় বেশী বাকী নাই। গ্রামপ্রান্তে সেই পর্ণকুটীরে এখনও পর্য্যন্ত ঘর্ ঘর্ ঘর্ চরকা ঘুরিতেছে। চরকার গতি ক্ষিপ্র হইলেও অনভ্যাসের হাতে পড়িয়া শ্রমলব্ধ ফল কিছু কমই হইতেছে। রাত্রে রমা একাই সেই চরকার চালক; পাশে রোগশয্যায় মা তার ছট্ ফট্ করিতেছে। প্রতিদিন চরকা চালাইয়া সূতা কাটা রমাকে কখনও দেখিতে হইত না; মা তার নিত্য নৈমিত্তিকের ভিতর উহা করিয়া লইত। আবার শুধু তাহাই নহে; এতই উহাতে অভ্যস্ত ছিল যে, উৎপন্ন সূতা বেচিয়া অনায়াসে দুজনের দিন গুজরাণ হইত। রমা দুধের মেয়ে বলিয়া তাহাকে কখনও চরকায় বসিতে দিত না। অভ্যাস না থাকিলে কোন কাজ ত ক্ষিপ্র হয় না। রমার তাই সূতা কাটিতে এত দেরী হইতেছে; প্রথম হাতে-খড়ি বলিয়া মিহি সূতা চরকায় আসিতেছে না; মোটা সূতা কাটিয়া কতই বা সে লাভ করিবে? তবুও দুধের বাছা ঘুম শিয়রে রাখিয়া অনন্যমনে চরকায় সূতা কাটিতেছে; রোগ যাতনায় মা যখন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, তখন আবার তাঁরই সেবায় সে নিযুক্ত; একা সে কোন্‌দিকই বা দেখে? ঘুমে তার চোখ ঢুল্ ঢুল্ করিতেছে, কিন্তু, পরদিন প্রত্যূষে সূতা বেচিয়া মার পথ্যের বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে, সে কেমন করিয়া চরকা ছাড়িয়া উঠে? তাই সে গভীর রাত পর্য্যন্ত বসিয়া চরকায় তাহার উপজীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। পাশে রমার মা কখনও তন্দ্রায় অভিভূত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই জ্বরের ধমকে নির্নিমেষনয়নে মেয়ের দিকে দেখিতেছে। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল; রমার শুভ্র মৃণালপেলব হাত দুখানি অবসন্ন হইয়া চরকার গতি মন্দা করিয়া দিল। মা তার আর থাকিতে না পারিয়া রমাকে শুইতে বলিল। "এই কটি সূতা কাটিয়াছি, মা, এখনই শুতে গেলে কাল কি হবে?" বলিয়া রমা মার মুখের পানে চাহিল। "তায় আর বাছা, কত রাত হয়ে গেল, চাঁদ আমার, না হয় আমার পথ্য হইবে না; তোর ক্ষুটি জুটিলেই যথেষ্ট" বলিয়া রমার মা শয্যাপ্রান্তে মুখ লুকাইয়া নিজ ভাগ্যকে আপন মনে ধিক্কার দিতে লাগিল। "তাও কি হয় মা, তুমি অভুক্ত থাকিবে, আর আমি বেঁচে থেকে তা দেখব" বলিয়া রমা ত্বরিতগতিতে পুনরায় চরকা চালাইতে লাগিল। মা তার কতকটা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্ রমা, আজ আর নয়, আমার ঘুম হচ্ছে না" তখন কন্যা অগত্যা শয্যায় শুইয়া পড়িল।

প্রত্যূষেই হাটে গিয়া সূতা বেচিয়া পয়সা আনিলে তবে দিন চলিবে। যোটা সূতায় মার মত পয়সা মিলিবে কি না, সন্দেহ বিবেচনায় বয়স ভোর থাকিতে কয়েকটা কাগজের ফুল করিয়া লইল। ইচ্ছা তার হাটে সূতা বেচিয়া যদি দিনের খরচের মত পয়সা না মিলে ত গ্রামে সামন্তদীঘির পাড়ে বারোয়ারী পূজার মেলায় ঐ ফুলগুলি বেচিয়া বাকীটা অর্জ্জন করিবে। সাধু ইচ্ছায় অন্তরায় বড় ঘটে না, তাই রমা সোৎসাহে ভোরের আলো ফুটিতেই সূতার সম্ভার লইয়া হাটের দিকে চলিল।

৫।

রাত্রি প্রভাত হইতেই হাটের পথে লোকচলাচল আরম্ভ হইয়াছে। বেলা দশটা-মধ্যে হাট শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া অনেকেই বেচা-কেনার সুবিধার জন্য অন্ধকারেই পথ হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। রমাও সেই জন শ্রেণী ভেদ করিয়া ত্বরিতগতিতে চলিতে লাগিল। ক'দিন পরে আজ ভোরে মার জ্বর ছাড়িয়াছে; সে জন্য মনটা তার তত চঞ্চল নাই। বেচা-কেনার কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে হাটের সন্নিকট হইল। এত ভোরে ও উহা জনকল্লোলে মুখরিত। দর দস্তুর, লাভালাভের কথা কেবলই লোকের মুখে; সে শীঘ্র ব্যস্ততাই হাটের জীবন। শ্রমলব্ধ ফলে উপযুক্ত অর্থ মিলিল কি না, মানুষ কেবলই তাই দেখে; হিসাবে কিছু গরমিল হইলেই সে ক্ষুণ্ণ হয়। সংসারে হারজিৎই ক্রমান্বয়ে চলিতেছে; জীবনকে জীবন্ত করিতে এই হারজিৎই মানুষের প্রধান সহায়। রমা নিতান্ত ছেলে মানুষ; বেচা-কেনার হিসাব সে বুঝে না; সূতা লইয়া কত তাঁতির নিকট ঘুরিল; কিন্তু মার মত সূতার দর উঠিল না। কচি মুখের অকৃত্রিম মিষ্ট বুলিতে কোন তাঁতিই দর বেশী দিল না। এ দিক ও দিক করিয়া কত ঘুরিল সে, কিন্তু লাভের গণ্ডা কেহই ছাড়িল না। শেষে যখন ভাঙ্গা হাটে সূতার দর আর উঠিবে না দেখিল, তখন অগত্যা সামান্য পয়সা লইয়া সূতা বেচিল। যাহা পাইল সে, তাতে মার পথ্য করিয়া দিন গুজরান হওয়া ভার। কিন্তু, উপায় ত নাই, উহাতেই তাহাকে চালাইতে হইবে। তবে কাগজের ফুলগুলা আছে, তাহাতে যদি দু এক পয়সা পায়। আশায় বুক বাঁধিয়া সে সেই দুরন্তরৌদ্রে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। ফিরিবার পথে যে লোকেরই সহিত তার আলাপ হয়, তাকেই সূতায় লাভবান্ দেখে; কেবল হার তার নিজের। তবুও বুকটা শক্ত করিয়া ভবিষ্যতের আশায় মনটা দৃঢ় করিল। ক্রমশঃ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি. এ।

বৈঠকী।

মাসিক পত্রত অনেক বাহির হইতেছে। জিজ্ঞাসা করত কেন বাহির হইতেছে; তাহার উত্তর ঠিকমত কেহই দিতে পারিবে না। যে সকল মাসিক-পত্র আছে এবং চলিতেছে, তাহারাই বা কেন আছে এবং চলিতেছ, সে তত্ত্ব আবিষ্কার করা কঠিন; অনেকের জাতিনির্দ্দেশ বা বিশিষ্টতার নির্ণয় একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

পূর্ব্বে প্রত্যেক মাসিক পত্রের অন্তরালে একটা দল, একটা উদ্দেশ্য,—থাকিতই। একটা কোন রকমের প্রচারকার্য্যে সকলেই ব্রতী থাকিতেন। "তত্ত্ববোধিনী" আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রিকা ছিল, উহার ভাষা এবং লিখনভঙ্গী ৺অক্ষয়কুমার দত্তের আদর্শে চলিত। তত্ত্ববোধিনীর লেখকপ্রধানগণ গোড়ার অন্য মাসিকপত্রে লিখিতেন না। "তত্ত্বকৌমুদী" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজ ছিল। "ধর্ম্মপ্রচারক" "কল্পদ্রুম", "ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দুসমাজের মাসিকপত্র ছিল। "বঙ্গদর্শন" বঙ্কিমচন্দ্রের মাসিকপত্র ছিল, উহাতে নব্য হিন্দুয়ানী এবং কোমৎ তত্ত্বের প্রচার হইত। "আর্য্যদর্শন" নব্যশিক্ষিত দলের কাগজ ছিল, কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-বিশেষের কাগজ ছিল না; সোজাসুজি সমাজ-সংস্কারকের দল ইয়োরোপ বিশেষতঃ ফরাসী সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার অনুচিকীর্ষু দলের এবং বঙ্গদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ ছিল। আর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্টতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে "বঙ্গদর্শনে"র পালটা ও সমকক্ষ হিসাবে "বান্ধব" বাহির করিয়াছিলেন।

* * * *

মোটকথা এই আমাদের কিশোর এবং যৌবনকালে একটা উদ্দেশ্য এবং একটা বিশিষ্ট লেখক সম্প্রদায় না লইয়া কোন মাসিক পত্রই বাহির হইত না। যখন সাহিত্যচর্চ্চা সখের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যের বিশিষ্টতার ঘোষণা ও প্রচার উদ্দেশ্যে "ভারতী" বাহির হইয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ী বাঙ্গালার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এমনটি বাঙ্গালার বাহিরে আর কুত্রাপি

হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। এক পরিবারভুক্ত তিন পুরুষ; পিতামহ হইতে পৌত্র দৌহিত্র পর্য্যন্ত প্রায় সবাই সাহিত্যের সকল শাখার শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে আমরা আর দেখি নাই। "ভারতী", "বালক", "সাধনা" প্রভৃতি এই ঠাকুর বাটীর দুন্দুভি,—অতুল্য এবং অপরাজেয়। কেবলই কি পুরুষ; বিদুষী নারীও একাধিক এই এক সংসার হইতে আমরা পাইয়াছি।

* * * * *

ইংরেজি-নবীশের নব্য হিন্দুয়ানী যখন কোমৎ (Comte) তন্ত্রের জাল ছাড়াইয়া কেবল অনুশীলনবাদের বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইল, যখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব কমিতেছিল, Iconoclasm বা ধ্বংসবাদের ভীষণ পরিণতি অনেকের বোধগম্য হইতেছিল, তখন "প্রচার" এবং "নবজীবন" প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই সন্ধিক্ষণে "সাহিত্যে"র উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর দোকানদারী—মাসিক পত্র যেন মনোহারীর দোকান হইয়া উঠিল। মাসিক সাহিত্যের এই স্বৈরিণী বৃত্তির এখনও উপশম ঘটে নাই। বলিতে পার "প্রবাসী" কোন্ সম্প্রদায়ের কাগজ? "তত্ত্ব কৌমুদী"র আসনও "প্রবাসী" লইতে পারে নাই; "ভারতী"র বিশিষ্টতাও প্রবাসীতে নাই। কাজেই বলিতে হয় "প্রবাসী" মাসিক সাহিত্যের মনোহারী দোকান; বিলাতী রুচীতে দোকান সাজান, বিলাতী ভঙ্গীতে সামগ্রীর বিন্যাস। বিলাতে কিন্তু পুরাতন চঙ্গের যেমন মাসিক পত্রের আধিক্য আছে, তেমনই নূতন চঙ্গে সাতফুলের সাজির মতন আধুনিক মাসিক পত্রও আছে। আমাদের "বঙ্গদর্শন", "আর্য্যদর্শন", "তত্ত্ববোধিনী", "তত্ত্বকৌমুদী", "প্রচার", "নবজীবন" নাই; পরন্তু স্বৈরিণী মাসিক পত্রিকার আধিক্য হইয়াছে। ভালটি ছাড়িয়াছি, মন্দটিকে ধরিয়া আছি।

* * * * *

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মৃত্যুর পূর্ব্বে বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যের অধোগতির লক্ষণ দেখিতে পাইয়া, প্রতিষ্ঠাপন্ন জনকয়েক সাহিত্যসেবীর এক সঙ্ঘ রচিয়া নূতন চঙ্গের মাসিক পত্র বাহির করিতে উদ্যত হন। সে উদ্যমের ফলে "ভারত-বর্ষ" বাহির হয়; বিধাতার বিধানে দ্বিজেন্দ্রলাল উহার প্রথম সংখ্যাও ঠিকমত দেখিতে পান নাই। এখন তাঁহার 'ভারতবর্ষ' কেবল সাতফুলের সাজী হইয়াছে; উহার Propaganda বা প্রচার বিষয় নাই, সাধনা নাই, সাধ্যও নাই। আছে কেবল চিত্তবিনোদন চেষ্টা, হিরণ্ময় কাতুকুতু এবং উপন্যাসের মধুষা। "প্রবাসী" এবং "ভারতবর্ষ" এখনকার কাগজের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি

হইবে না। ঐ ছাঁচে সবাই কাগজ বাহির করিতে চাহে—কাগজের উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পয়সা। "বঙ্গদর্শন" ও নবজীবন পয়সা দিয়াছিল বটে, পরন্তু কেবল লেখার জোরে—মনীষার প্রভাবে। এখন পয়সা দেয় ছবীতে এবং বিরংসায় গল্পবাহুল্যে। কথাটা উৎকট হইলেও সত্য।

* * * * *

রাজা রামমোহন হইতে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, কেবশচন্দ্র এমন কি শিবনাথ শাস্ত্রী পর্য্যন্ত প্রথম যুগের ব্রাহ্ম এবং সংস্কারক লেখকগণ Eclecticism বা চয়নবাদের অনুরাগী ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাত ফুলের সাজি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর Lake Poet দিগের Idealism Emotionalism হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রকে আছন্ন করে। পরে এই ভাবুকতা কোমতের (Comte) Humanitarianismকে অবলম্বন করিয়া নবীন চন্দ্রের শেষ তিনখানি কাব্য গ্রন্থে প্রকট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বমানবতার বেদীর উপরে হিন্দুয়ানীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য কালের Tractarian দিগের পন্থা অবলম্বন করিয়া নূতন ভাবের প্রচারে ব্রতী হন। হম্‌ফ্রীওয়ার্ড শারলটব্রণ্ট জর্জ্জএলিয়ণ্ট বুলওয়ার লিটন প্রভৃতি বিলাতে যাহা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগামিগণ বাঙ্গালায় তাহাই সম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতে হইলে উভয় সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়,—দেখাইতে হয় Jane Greyর ছায়া বিষবৃক্ষে কেমন ভাবে পড়িয়াছে.—দেখাইতে হয়, ফার্দ্দিনাল নিউম্যানের যুক্তিপদ্ধতি ভূদেব ও বঙ্কিম, ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র কতটা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মোট কথা এই, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা ও পোষ্টা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ইয়োরোপের সাহিত্যের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ জাতিবৈর ও জাতিপ্রীতির প্রেরণায় কেমন ভাষার ও ভাবের লহর রচিয়া গিয়াছেন; সে সমাচার ও পরিচয় আধুনিক লেখকগণের নাই। বাঙ্গালার নব্য সাহিত্যের ইতিহাস কেহ লিখে নাই, তাহার বিশ্লেষণ কেহ করে নাই। তাই ইঙ্গিতে কথা কয়টী বলিয়া রাখিলাম।

* * * * *

বাঙ্গালার নব্য সাহিত্যের তিনটি শাখা আছে। প্রথম পণ্ডিতী—মুক্তারাম তর্কবাগীশ হইতে বিদ্যাসাগর, মদন মোহন, রামগতি পর্য্যন্ত;—দ্বিতীয় ব্রাহ্ম চয়নবাদের শাখা, রাজা রামমোহন হইতে শিবনাথ পর্য্যন্ত এই শাখার শাখী; তৃতীয় খাঁটি ইংরেজি ভাবানুরূপ শাখা—এই শাখায় মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ

পর্য্যন্ত সকলকে পাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব এই শাখার দুই বিরাট পুরুষ। এখন প্রথম শাখা শুষ্কপ্রায়, দ্বিতীয় শাখা উপেক্ষিত, তৃতীয় শাখা নকলনবীশের উৎপাতে অবনমিতপ্রায়। কোন্ শাখার শাখী—তোমরা ব্যাঙের ছাতার মতন মাসিক পত্র সকল বাহির করিতেছ? তোমরা কোন্ ভাবের ভাবুক? কেমন ঢঙের আভরণ দিয়া মাতা ভারতীকে সাজাইতে চাও? দ্বিজেন্দ্রলালের পরে আর ত তেমন মনীষী লেখক মাতৃচর্চ্চা করিতে সকলকাম হন নাই। রবীন্দ্রনাথ ত এখন অন্য ভাবে ডুবিয়াছেন। তোমাদের ভাব কি? ভঙ্গী কেমন? উদ্দেশ্য কি? শুনিতে পাই, ছোক্‌রার দলে একটা "সবুজ সঙ্ঘ" হইয়াছে, তাহারা বাঙ্গালা গদ্যকে কলকত্তাই ঢঙ্গে ঢালিতে চেষ্টা করিতেছে এবং ইয়োরোপের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের আধুনিক Rigmarole কে বাঙ্গালার কায়াসমেত আমদানী করিতেছে। ইহা টিকিবে না, টিকিতে পারে না, কেন না, ইহা বাঙ্গালীর ধাতুর অনুকূল ও অনুগামী নহে। বিদ্যাসাগরের কৃপায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা প্রভাবে রাঢ়ের লিখনপদ্ধতি গত আশীবৎসর কাল সমগ্র বাঙ্গালায় যেন জাঁতিয়া—গাঁথিয়া বসিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমী সাধুভাষা এখন চট্টগ্রাম হইতে পঞ্চকোট পর্য্যন্ত সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর বোধগম্য, উহার সাহায্যে একটা বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সাহিত্য মরিবার নহে—মরিবে না। কারণ ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত একটা সাহিত্যের ধারা বহিয়াছিল, সে সাহিত্যের পারম্পর্য্য—মাইকেল বঙ্কিম, হেম, নবীন, সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং সে পরম্পরা আমাদিগকে পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্য ও মহাজনী পদাবলীর সহিত মমত্বের হেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছে। হাজার বৎসরে বাঙ্গালীর স্মৃতি যদি নষ্ট না হয়, তবে মধুসূদনের মধুচক্র, বঙ্কিমের আসব আবেশ ও ভাষাগত ললিত কলা নষ্ট হইবে না। সবুজ সঙ্ঘের "কলকত্তাই ঢং" কোন প্রদেশের কোন বাঙ্গালী আমার বলিয়া বুকে ধরিয়া রাখিবে না। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাস—গোবিন্দদাস যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে মধু-হেম-বঙ্কিম, শিশু বাঁচিবেন। ইহাঁরা বাঁচিলে সে জমীর উপরে সবুজ সঙ্ঘের ক্রোটনের চারা কলমের জোরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে। সে শঙ্কা আমাদের নাই। কেবল জিজ্ঞাস্য সাহিত্যে গণিকাবৃত্তির একটা প্রাবল্য কি ভাল? ইয়োরোপের Christendom মরণোন্মুখ, তাহার ঝড়তি পড়তির নকলনবিশী বাঙ্গালার হাটে টিকিবে না। অতএব এখন হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

* * * * *

সাহিত্য,—কাব্য, গাথা, সন্দর্ভ নিবন্ধ,—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার তুল্য; ভিতরে একটা ভাবের ক্রিয়া হইলে তবে ত উদ্গার ঘটে। মাইকেল মধুসূদন ইংরেজি শিখিলেন, খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখনকার ইংরেজের মত দাড়ি গোঁফ সাজপোষাক, পান ভোজন নিখুঁতভাবে অবলম্বন করিলেন। বাঙ্গালার মধুসূদন মাইকেল নাম লইয়া পর হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন; পরন্তু কি জানি কোন্ এক অজ্ঞের প্রেরণার প্রভাব মাইকেল আবার মধুসূদন হইলেন, বাঙ্গালা সাহিত্য মেঘনাদ পাইল, ব্রজাঙ্গনা পাইল, চতুর্দ্দশপদীর আভরণ লাভ করিল। তেমনই রঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মনীষি মণ্ডল, কবি, দার্শনিক, ভাবুক, রসিক সকলই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মতন ভাবও ভাষা, সাহিত্য ও কাব্য উদ্গিরণ করিয়াছিলেন,—অন্তরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতীর সেবাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইচ্ছা করিলে পুরাদস্তুর ইংরেজিনবীশ হইয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রধান হইতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ পলিটিক্সের একটা রাজা হইতে পারিতেন। হইলেন না কেন?

* * * * *

অনেকবার বলিয়াছি;—কেবল আমরাই কেন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, চারি জনেই বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্গবাণীর সেবা করিতে ইহাঁরা ব্রতী হন। ইংরেজিযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের বেদী। Patriotism জাতিপ্রীতি এবং দেশহিতৈষণা,—উহার পবিত্র হোমকুণ্ডে কেবল জাতিবৈরের এবং জাতি প্রাধান্তের চন্দনকাষ্ঠ জ্বলিয়াছে; ইংরেজের মিল্টন আছে, বাঙ্গালারও মিল্টন হইবে, তাই মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, ভূদেব বাঙ্গালার বেকন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার বা ইতালীর মহাকবি দান্তে, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলী,—ইত্যাদি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতা করিবার উদ্দেশ্যেই, বাঙ্গলার ইংরেজি যুগের অভিনব রঙ্গসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এ তত্ত্বটা অক্ষয়চন্দ্র "নবজীবনে" স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবলই ইহাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সাহিত্য যে পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া ফুটিয়াছিল, বাঙ্গালায়ও ঠিক সেই ক্রমানুসারে নব্য সাহিত্যের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। সে টুকুও বলিয়া রাখিব।

সাহিত্য, ১ম সংখ্যা ১৩২৮।

সভ্যতা ও ভারতীয়তা।

মোটামুটি দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, সভ্যতা একটি ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র—মাঝে মাঝে কেবল দেখা দেয়। যতদূর অতীতে দৃষ্টি যায়, আমরা যদি প্রাচ্যজগতের ইতিহাস বেশ করিয়া ধারণা করি ত দেখিতে পাইব যে, সভ্যতা ব্যাপারটার যেমন মাঝে মাঝে অবসান, তেমনি মাঝে মাঝে আবির্ভাব। সুতরাং অন্যান্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের ন্যায় ইহাও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

সভ্যতার একটা যেন জোয়ার ভাটা আছে। কোনও এক দেশ ধরিলে দেখা যায় যে, সেখানে একবার উন্নতির কাল হইতে আর একটি উন্নতির কালের মধ্যে বেশ একটা ব্যবধান আছে। ঐ ব্যবধানটা মোটামুটি এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায়ঃ—

	ব্যবধান (মোট)
ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার	১৩৩০ বৎসর।
„ (গোড়াটি বাদ দিয়াই)	১৫০০ ঐ
মেসোপোটেমিয়া	১৫২০ ঐ
ভারতবর্ষ	১৫০০ ঐ
মেক্সিকো	১৮০০ ঐ

এই যে সভ্যতার একটা ভাটা আসে, আবার একটি জোয়ার আসে, এটা কেন হয়? ইতিহাসে দেখা যায়, যখন কোন এক দেশ সভ্যতার নিম্নতম স্তরে পৌঁছিয়াছে, তখন একটা নূতন জাতি সে দেশে আসিয়াছে। মোট কথা এই যে, উচ্চতম স্তর হইতে কোনও এক জাতি আবার অবনতির দিকে চলিতে থাকে এবং নামিতে নামিতে এমন একটা অবস্থা হয় যে, কোনও একটা নূতন কিছু করিবার অথবা কোনও উদ্ভাবনা বা আবিষ্কারকার্য্যে ইহার কিছুই শক্তি বা সামর্থ্য থাকে না। এমন সময়ে কোনও এক নূতন জাতির আবির্ভাব হইলে দুই জাতিতে ও দুইটি সভ্যতায় বেশ একটু সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সংমিশ্রণ কার্য্য কিছুকাল ধরিয়া চলিলে তবে ঐ পুরাতন ভূমিখণ্ডে নূতন একটি সভ্যতার

বাধা ডাকে। রক্তের সংমিশ্রণ ব্যতীত নূতন কিছুই গড়া যায় না, সভ্যতা আপনা হইতে জন্মাইতে দেখা যায় নাই" (W. M. Flinders Petrie D. C. L., F. R. S. Revolutions in Civilisations 1911. p. 5 and p. 14.)

এইগুলি গেল মিশরতত্ত্ববিদ্ পেট্রির কথা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার একটু ভুল হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাগৈতিহাসিক ভারতের কথা তাঁহার জানা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ তিনি অশোক ও আকবরকে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার দুইটি উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি ভ্রান্ত বলিয়াই ধরা যায়। ভারতীয় সভ্যতা পুনরায় নিজেকে পাইয়াছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়। অশোকের কাল অনুকরণের কাল; তখনও ভারত তাঁহার ধ্যানী সৌম্যমূর্ত্তি তাহার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, তাঁহার কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ফলা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে গুপ্তযুগের ভারতের স্থান যে কতটা, তাহা এখনও কেহ ভাল করিয়া দেখান নাই। তবে এটা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, মধ্যযুগের আরব সভ্যতা হইতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুর এবং ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, আরবরা তৎকালীন গুপ্তযুগের ভারতের নিকট জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র, ভেষজশাস্ত্র, প্রভৃতি নানাবিষয়ে ঋণী ছিল"।

মনীষী পেট্রী সভ্যতার আবির্ভাবের একটা কারণ বেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেটা হইতেছে কোনও নূতন জাতি ও নূতন সভ্যতার আগমন এবং নূতন ও পুরাতনে মিশিয়াই আবার এক বিস্ময়কর সার্ব্বজনীন ভাবের প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সভ্যতার আবার ক্ষয় হয় কেন? এবং কিসেই বা ইহার অবসান?

"সভ্যতা বলিতে গেলে বুঝা উচিত এমন কিছু, যাহাতে আমরা বানরত্বের অবস্থা হইতে প্রকৃত নরত্বে পৌঁছিয়াছি। কিন্তু সেটা বড় কঠিন ব্যাপার। যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা অনেক তপস্যা অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের ফল; আবার এই অর্জ্জিত ধনটুকু রাখাও বেশ কঠিন। বাস্তবিক সভ্যতা, মহৎ অনর্থের মূল। গাভেও যেমন দুঃখ, রক্ষায় ততোধিক। কারণ যদিও আর রোমান সভ্যতা ধ্বংসকারী গথ্ জাতির মত বর্ব্বরের হাতে হয়ত পড়িতে হইবে না, তবু আমাদের মাঝ খানে আশপাশে যে বর্ব্বর রহিয়াছে তাহার হাত হইতে উদ্ধার কৈ? ঊনবিংশ শতাব্দী এই বর্ব্বরের স্বপ্নেই ব্যস্ত ছিল * * এখন কোনও সম্ভ্রান্ত

সভ্যসমাজের ভদ্রমহোদয় তাঁহার প্রমোদোদ্যানের পার্শ্বেই কন্থাসার ভিক্ষুক দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। * * * * কিন্তু বাস্তবিক বর্ব্বরতা কি ঐখানেই এতটা পরিস্ফুট? হক্ কথায় বলিতে গেলে ছিন্নকন্থা ক্ষুধিতজঠরেই বর্ব্বর হয় না। যে বর্ব্বরতায় সভ্যতার নিধন সুনিশ্চিত, তাহা ধনীর বর্ব্বরতা, নির্ধনের নহে। বাস্তবিক ঐ হৃদয়হীন সঙ্গতিপন্ন বর্ব্বরতাই আমাদের প্রতিনিয়ত ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছে। ঐ যে ক্লাব হইতে ভাল সাজগোজ পরিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুটী বাহির হইলেন, আর ঐ যে গরীবটি তাহার শেষ কড়িটা আর একজন নিঃস্বকে দিয়া গেল, এর মধ্যে কপিত্ব বিশিষ্ট কে বল দেখি?

তাহা হইলে যদি সভ্যতা এ রকম ধ্বংসের পথে চলে, তার মূল কি যে জনসাধারণ, অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে নাই? তাহা হইলে গরীবেচারাদের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে মনে রাখা উচিত কেবল শুধু সভ্যতার খোসাটুকু আছে যাদের, তাদের যদি শাঁসটুকু না থাকে, তবে সভ্যতাবিধ্বংসী বিপ্লব অসম্ভাবী" (The Principles of Revolution by R.L. Brown 1920 p, 124-125.)

এই লড়াইয়ের পর এই কথাগুলিই সবার প্রাণে লাগিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছে তাইত আর এক পালা শেষ হয়ে এল নাকি? পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার ঘণ্টা বুঝি বা এই গত রণে বাজিয়া গেল। গ্রীস্ রোমের পথ বুঝি বা পশ্চিম ইউরোপকে অনুসরণ করিতে হয়। তাই পূর্ব্বদিকে আবার নজর পড়িল। ঐ যে দুটি পদদলিত দেশ আছে ও তেকের মধ্যে নিদ্রার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে, ওর মধ্যে বুঝি বাঁচিবার কৌশলটা ইউরোপের চেয়ে ভাল জানা আছে। তাই আমাদের আধুনিক ভাবুকশ্রেষ্ঠ ঋষি রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরিয়া যে সব নানা কথা বলিয়া আসিতেছিলেন হঠাৎ পশ্চিমের আবার সে দিকে নজর পড়িল। পশ্চিম আবার প্রাণভিখারী ও ভাবভিখারী হইয়া ভারতের জন্য বরমাল্য লইয়া ভারতের কবিশ্রেষ্ঠের গলায় বরমাল্য প্রদান করিল। কিন্তু ভারত কি কবীন্দ্রের কথা শুনিয়াছে যে ভারতের ঘাড়ে আবার কি বোঝা আসিতেছে? পুনরায় বিশ্ব মানবের জন্য অয় পতাকা লইয়া বিশ্বের আসরে গিয়া যে দাঁড়াইতে হইবে, এই কথাটি আমাদের রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন! কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতেছি কই? আমাদের আজ এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে,—

"সভ্যতার পর সভ্যতা লীন হইবে; কিন্তু এক বিরাট মানব সভ্যতা লীন

হইবে না। যাহা কালোপযোগী হইয়া না চলিতে পারে, তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। যাহা যুগধর্ম্মের আশ্রয় লয়, তাহা আবার নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের ক্রীটিয় সভ্যতা গেল বটে, কিন্তু উহাই আবার নানা আকারে নানা ছন্দে গ্রীসের সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইল। গ্রীসের শ্বাসরোধ হইল; কিন্তু সারাজগন্ময় তাহারই প্রাণস্পন্দন স্পন্দিত হইল; রোম বর্ব্বর জাতির হাতে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াই আধুনিক ইউরোপ সৃষ্টি করিল। কেবল একজাতি আর এক জাতির স্থান লইতেছে মাত্র, কিন্তু মোট প্রাপ্যটুকু সমগ্র মানবেরই থাকিয়া যাইতেছে। যতই বীজগুলি মাটির নীচে বেশী করিয়া কর্ষিত হইতেছে, ততই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল হইতেছে। কল্দিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, ইউরোপ সকলেই ক্রমান্বয়ে আসিল, কিন্তু মানব সভ্যতার গতি কখনই রোধ হইল না। এই উন্নতির গতিশীল আবর্ত্তে কত মহাপুরুষ কত জাতি কত সাম্রাজ্য কত সভ্যতা তলাইয়া গেল; কিন্তু মানবীয় মহাস্রোত সম্মুখে বহিয়াই চলিল। ফলে সমগ্র মানবের উন্নতিই হইতেছে এবং ক্ষীণস্রোতগুলি যেন যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই মহা স্রোতস্বতীতে পরিণত হইতেছে। উন্নতি কেবল যে সম্মুখের গতির উপর নির্ভর করে তাহা নয়, উহার প্রসারও বাড়িয়া চলে। যেন সমগ্র মানবজাতিকে উহার মধ্যে টানিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে—শুধু যে একটা বৃহৎ মহাসভ্যতা সৃষ্টি করিয়াই ইহা ক্ষান্ত, তাহা নহে; ক্রমশঃ যাহাতে মহত্তর মানবের আবির্ভাব হয়, তাহাই উহার প্রধান লক্ষ্য" (Briffault, The Making of Humanity 1920 p. 27-28) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ মহাসমরের পর অনেকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা অস্তোন্মুখ, তাহাই এই সব কথা যুদ্ধের পর যাঁহারা লিখিতেছেন সেই সকল ভাবুকদের মধ্যে খুবই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পেট্রির পুস্তক যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে লিখিত। এবার আর একটি চিন্তাশীল মনীষীর কথা বলিব। তিনি ইং১৪৯২ সনে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Civilisation, its cause and cure লেখেন। ভারতবাসীর পক্ষে তাঁহার কথাগুলি অমূল্য—

"আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, সভ্যতা একটি ব্যাধিমাত্র। যেমন ছেলেদের কাশী বা হাম হয়, তেমনি জাতিবিশেষের মধ্যে এই ব্যাধি দেখা যায়। তবে তফাৎ এই যে কোনও মানবসমাজকে কখনই এই সভ্যতাব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায় নাই। এই সভ্যতার দশা পাইয়াই হয় তাহাদের ঘাড় ধাঁমিয়া গিয়াছে বা তাহাদের অস্তিত্ব শেষ হইয়াছে। (p 1)

তবে কি ইহার কোনও উপায় নাই। "ইতিহাসে বোধ হয় এই সর্ব্ব-প্রথম (?) সমগ্র পৃথিবীময় এই সভ্যতার ব্যাপ্তি দেখা যাইতেছে; কিন্তু আবার ইহার শরীরের মধ্যেই কতকগুলি সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা যাইতেছে; আর ঐ লক্ষণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং এ যাত্রা আর উহার রক্ষা নাই। এতদিন পর্য্যন্ত অসংলগ্ন অনেক সমাজ নানাভাবে জীবনরক্ষা করিয়া আসিতেছিল কিন্তু আজ প্রথমেই সমগ্র জগতের উন্নতিশীল জাতিমাত্রেই এক বৃহদায়তনের সমাজতন্ত্রের বা শ্রমসঙ্ঘতন্ত্রের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। আজকালকার সংগ্রামশীল সমাজ ক্রমশই যেন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাকৃতিক ও আদিম ভাবের দিকে একটা ভিতর হইতে স্পৃহা জাগিয়া উঠিতেছে। সাহিত্য ও কলার মধ্যে আজ কিছুকাল ধরিয়া যে প্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা আজ বাস্তব জীবনে দেখা দিতেছে। কাহারও মধ্যে ঐ ভাবটি সভ্যতার সমগ্র জটিল কারখানাবর্জ্জনের রূপ ধারণ করিয়াছে, কাহারও মধ্যে উহা কেবল নগ্নস্তন ও খড়মের ব্যবহারে মাত্র পরিণত হইতেছে। বৃহত্তর শ্রমিকসঙ্ঘ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আদিম ভাবাশ্রয় এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে বর্ত্তমান সভ্যতারূপ ব্যাধির কোনও প্রতিকার হইবে, আশা করা যায়। (Carpenter পূর্ব্বোক্ত পুস্তক পৃঃ ৪৯, ১৬শ সংস্করণ)

এই গেল ধীর কার্পেণ্টারের কথা। এখন একবার ভারতবর্ষের দিকে দেখিলে বুঝা যায় কি? বর্ত্তমান ভারত William Archerএর মতে বর্ব্বর ও Sir John Woodroffe এর মতে আধ্যাত্মিক সভ্যতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আর্চ্চার সাহেব মিথ্যা বলেন নাই। পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান সভ্যতার তুলাদণ্ডে তৌল হইলে আমাদের বর্ব্বরতার খাতে পড়িতে হইবে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই বর্ব্বরতাই আমাদের এতকাল ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মিশর ও কল্ডিয়ার সভ্যতা কালে ভারতের ইরিথ্রিয় সভ্যতা ছিল। তাহা ঐ দেশের ও এখানকার সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। গ্রীস্ ও রোমের সভ্যতার হাত হইতেও ভারতের রক্ষা ছিল না। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছিল —গান্ধার এবং অন্ধ্র ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের দিগ্বিজয়ী ভারত। এই সময় বোধ হয় দ্বিতীয়বার ভারত, তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, ভারত দ্বীপপুঞ্জ এবং এমন পলিনেসিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর মেক্সিকো ও পেরু অবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আবার এই সময়ের ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভট্ট প্রভৃতিদের বৈজ্ঞানিক

তথ্যগুলিই যে আরবগণ সযত্নে শিক্ষা করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মধ্যযুগীয় ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল, ইহা ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মধ্যযুগের জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী ও প্রচারক মসলেমগণ যখন ভারতে আহূত হইয়া আপনার মঠ বসবাস আরম্ভ করিল, তখনও ভারত নিজকে ভুলে নাই এবং বিশ্বকে মুক্তিধর্ম্ম উপহার দিল। আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ ও বৃহৎ কলকারখানার (Large scale industry) কালের সহিত ভারতের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যেমন ভারত অজন্তা গান্ধার যুগের সভ্যমানবের বুট পাজমার পার্শ্বে তাহার বর্ব্বর ধুতি ও চাদর নিজকে হারায় নাই, মোসলেম যুগে যেমন তার বর্ব্বর কৃপাণ, তাঁত ও খোল করতাল তার নানক কবীর ও চৈতন্যের হাতে তুলিয়া দিতে লজ্জা পায় নাই, তেমনি আজও বোধ হয় জাতিগত প্রাণরক্ষার একটি প্রধান উপাদান হইবে এই বাহ্যিক বর্ব্বরতা। ইহার সঙ্গে ভারত আন্তরিক উৎকর্ষ কখনই ভুলে নাই ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার আবশ্যকতা বোধ হয় ভারতই প্রথমে পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়াছে। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও জ্ঞান (বুদ্ধ) কে সর্ব্বোপরি স্থান দিতে এক ভারত ব্যতীত কেহই সক্ষম হয় নাই। এই সঙ্ঘজীবন (Group life, ভারতের একটি প্রধান অঙ্গ—হয় ধর্ম্মসঙ্ঘ না, হয় কর্ম্মসঙ্ঘ, তাহা লইয়াই ভারতের জাতের (Caste) সৃষ্টি। যখন এই সঙ্ঘজীবনে জড়তা আসিয়াছে, যখনই জ্ঞানী ব্যাধের নিকট গীতা না শুনিয়া মূর্খ জাত্যভিমানীর আশ্রয় লইয়াছে, তখনই ভারতের অবনতি হইয়াছে। এই ভারতের সঙ্ঘজীবনের একতা করিবার প্রয়াস মহাভারতের কাল হইতে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুযুগে ধর্ম্মসংগ্রামের ও ধর্ম্ম প্রচারের মধ্য দিয়া সেই চেষ্টা চলিয়াছিল। সঙ্ঘগুলি ও বংশগত হইয়া পড়ায় তাহার পর মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগে ও পরের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মধ্য দিয়া এক হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই বর্ব্বরতা ও সঙ্ঘপ্রিয়তা একীভূত হইয়া সমসাময়িক বিশ্বসভ্যতা আপনার করিয়া পুনরায় নূতন সভ্যতার অবতারণ করা নরাবর ভারতবর্ষের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। বেদপূর্ব্ব এরিথ্রিয়-যুগে, বৈদিক আর্য্যযুগে গ্রীস ও রোমীয় গান্ধারযুগে, মধ্যযুগের মুসলমানযুগে যে বর্ব্বরতা ও সঙ্ঘপ্রিয়তা ধরিয়া সর্ব্বসং সংস্কার নিজের করিয়া সমগ্র বিশ্বকে অমৃতের অধিকারী হইবার বার্ত্তা যে ভারতীয়তা শুনাইয়াছে, এই বর্ত্তমান পশ্চিম সভ্যতা কি তাহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে পারিবে?

শ্রীপঞ্চানন মিত্র

শিবরাত্তির শলিতা।

শিবরাত্তির শল্‌তা আমি
জ্বলতে হবে সারা রাতি,
দেবাদিদেব মহাদেবের
আজকে আমি পূজাবাতি!
ক্ষুদ্র বুকে যে টুকু আলো,
আজকেরে প্রাণ! জ্বালো জ্বালো!
এমন দিন জীবনে আর
জুটবে না!
এমন করে আশুতোষের
চরণে আর লুটবে না!

কতদিনের কথা গো সেই
আজ্‌কে শুধু মনে পড়ে,
গহন বনে হারিয়ে পথ
কিরাত যুবা উপোষ করে!
ঘেরল ধীরে আঁধার রাতি,
জাগ্‌ল ধীরে তারার পাঁতি,
মায়া ঘেরা কুটীর কোথা
কোথা দারা,—
নয়নকোণে উথ্‌লে উঠে
মরম—গলা মু'টী ধারা।

ভোলার দু'টী রাঙা চরণ
কেমন করে' ভিজ্‌ল রে।
অজ্ঞানে সে জ্ঞানময়ে
বিল্বদলে পূজ্‌ল রে!

তেমনি ধারা জান্‌ল না সে
সফল কবে সকল আশে,
ভাবনা—ভয় বেদনাচয়
ঘুচ্‌ল রে!
জনমভরা নয়নধারা
পলকে এক মুছল রে!

শিবরাতির শল্‌তা আমি
জ্বলব আজি নিঃশেষে।
দহনটুকু জীবন মম
মরণহারী উদ্দেশে!
আলোয় মোর আজকে কারা
পূজবে শিবে আপনহারা,
আমার সাথে জাগ্‌বে নিশি
মন্দিরে!—
সবাই এস—ক্ষেপাঠাকুর
কখন এসে যান্ ফিরে!

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মিলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঘরে আসিয়াই মার স্বাস্থ্য সংবাদে উল্লাসিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। তার পর ফুলগুলি লইয়া যখন বারোয়ারীর মেলায় যাইবার জন্য মার কাছে গেল, তখন মা সোৎসুকনেত্রে মেয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "তুই ত মা, এখনও কিছু খেলিনি ?" রমা পূর্ব্ব হইতেই এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল ; সে জানিত, মা তাকে ছাড়িবে না ; এতকাল দুঃখ-দৈন্যে কাটিয়া গেল, কখনও ত মা দ্বিতীয়বার বাজারে গিয়া জিনিষ বিক্রয় করে নাই। যাহা হউক, উত্তরে রমাকে ঢোঁক গিলিতে হইল না ; সে বলিল, "পথে বিন্দুর পিসি আমাকে ধরে খুব খাইয়ে দিয়েছেন, এখন আর আমি খাইব না।" এই বলিয়াই ফুল লইয়া বারোয়ারী তলায় যাইবার প্রস্তাব করিল। প্রথমটা মা তাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত থাকিলেও শেষে তারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কালকের সংস্থান হইবে ভাবিয়া রাজী হইল। কেবল যাবার সময় রমাকে বলিয়া দিল, "মেঘ উঠেছে, শীঘ্র চলে আসিস্।" "আচ্ছা, মা" বলিয়া রমা গৃহ হইতে বাহির হইল।

বারোয়ারীতলায় ছেলেবুড়োর মহাভিড়। রমা ফুল হাতে করিয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। আরও কত খেলনাবিক্রেতা নানা ঢংয়ের ছড়া বলিয়া ছেলেদের মধ্যে তাদের পণ্য দ্রব্য নিমিষের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। রমা নিঃশব্দে তাহা দেখিতেছে, আর ভাবিতেছে, আমার এ কয়টা ফুল কে লইবে ? দোকানী সে ত নয়, দোকানদারী বুলি তার ত আসে না ; কাজেই ফুলের গ্রাহক জুটিবে কি করিয়া ! সারা বিশ্বটা জুড়িয়া দোকানদারী চলিতেছে ; যে যত দোকানদার, তার তত কাটতি। রমা বিশ্বের মধ্যে থাকিলেও, বস্তুতঃ সে আজ বিশ্বের বাহিরে ; তাই তার ফুলের তথ্য কেহই লইল না। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছে ; রমা এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমে মাথার উপর মেঘ স্তরকে স্তরকে উঠিয়া আকাশটি ছাইয়া ফেলিল। বৃষ্টি আসন্নপ্রায়। রমা ভাবিতেছে, কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব ? শীঘ্রই বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় মেলা ভাঙ্গিয়া

যাইবার উপক্রম হইল। অত জনতা, নিমেষের মধ্যে পাতলা হইয়া গেল। তবুও রমা নড়িল না। শেষে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়া যখন মেলার শ্রীভঙ্গ করিয়া দিল, তখন রমা কোন গতিকে ফুল কয়টী বাঁচাইয়া ভিজে কাপড়ে হোগলার আচ্ছাদনের এক পার্শ্বে আসিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। এখনও তার আশা, ফুল বিক্রি হইবে; কে যে লইবে, সে তা জানে না; তবে মন তার বল্‌ছে, ফুলের গ্রাহক আস্‌ছে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিল। বৃষ্টির প্রারম্ভেই মেলা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে; এখন সেখানে আর বড় কেহ নাই; যে দুই একজন আছে, তাহারাও গৃহগমনোন্মুখ। হঠাৎ দূর হইতে রমা জুতার মস্‌মসানি শব্দ শুনিতে পাইল; অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছে না; তবে আওয়াজটা ক্রমশঃ যে কাছে আস্‌ছে, তাহা তার বুঝিতে বাকী রহিল না। পথের ধারে ফুলগুলি হঠাৎ আগন্তুকের গায়ে লাগায়, সে চমকাইয়া "কে গা" বলিয়া উঠিল। "বাবু, আমি ফুল বিক্রির জন্য দাঁড়াইয়া আছি।" রমা উত্তর দিল। এ দুর্য্যোগে বালিকার গলা শুনিয়া বাবুর করুণার উদ্রেক হইল; "এত রাত্রে কে তোমার ফুল নিবে?" বলিয়া ভদ্রলোকটি উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া রহিল। "তবে কি আমার ফুল বিক্রী হইবে না?" রমা করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল। "আচ্ছা, আমিই লইব, কই দেখি" বলিয়া আগন্তুক দেশলাই জ্বালিয়া দেখিয়া লইল। কত দাম জিজ্ঞাসা করায় আটটি ফুলে আট পয়সা দিতে হইবে, রমা বলিল। "আচ্ছা, এই নাও" বলিয়া আগন্তুক বালিকার হাতে চারটি টাকা দিল। অন্ধকারে রমা কিছুই দেখিতে পাইল না; সে কেবল বলিল, "এ তো পয়সা নয়, বাবু!" "হাঁ, পয়সাই বটে, তবে আমার নিকট এখন খুচরা নাই বলিয়া তোমায় চারটি ডবল পয়সা দিয়াছি" বলিয়া আগন্তুক দু'চার পা চলিয়া গেল। পরক্ষণেই বালিকা কি করিয়া বাড়ী ফিরিবে ভাবিয়া তাকে পঁহুছিয়া দিবার জন্য ফিরিয়া আসিল। রমা অপ্রত্যাশিত সাহায্যে উৎফুল্ল হইয়া "আবার কেন আপনি আসিলেন?" বলিয়া পথ দেখাইতে দেখাইতে ঘরের দিকে চলিল।

আগন্তুক দেবীপুরের জমিদার ৺রামজীবন চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। নাম রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বয়স আনুমানিক চব্বিশ পঁচিশ; বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে ও চেহারার মাধুর্য্যে ব্রাহ্মণত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বড় মানুষের ছেলে বলিয়া স্বভাবের উগ্রতা কিছুই লক্ষিত হয় না। মাথার উপর তার অভিভাবক কেহ না থাকিলেও আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে সে বেশ সমর্থ। প্রভূত সম্পত্তির মালিক হইয়াও আহারে, বিহারে পরিচ্ছদে

রমেশের কোন বদচাল ছিল না; পিতার আমল হইতে দশ জনকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইয়া আজও সে পূর্ব্বানুযায়ী জীবনটাকে সেই ভাবেই চালাইতেছে। গ্রামের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে অকপট অনুরাগ সে এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আকৃতি সুঠাম সুন্দর ও প্রকৃতি সুন্দর হইলে সংসারে সুখ ও শান্তি পাইতে দেরী হয় না; রমেশ উহা পুরামাত্রায় পাইয়াছিল বলিয়া তার স্বচ্ছ নির্ম্মল দেহে মনটী চিরপ্রফুল্ল হইয়া থাকিত; রূপে গুণে রমেশের মত ছেলে গ্রামে তখন কেহই ছিল না।

রাত্রির অন্ধকারে রমার সহিত পথ চলিতে চলিতে রমেশ তার অনেক তথ্য লইতে লাগিল; রমাও সলজ্জভাবে প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দিয়া গন্তব্য-স্থানাভিমুখে চলিল। অনেকক্ষণ পরে যখন দু'জনে কুটীরপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অন্ধকার এত ঘনাইয়া আসিয়াছে যে, কোলের মানুষ আর চেনা যায় না। রমার মা মেয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। দ্বারে আঘাত পড়িতেই "এতক্ষণ কোথায় ছিলি রমা" বলিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তখনও পর্য্যন্ত ঘরে সাঁঝের আলো পড়ে নাই;—চক্‌মকি ঘসিয়া আলো জ্বালা রমার মার সামর্থ্যে কুলায় নাই। সে তাই অন্ধকারেই মেয়ের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। রমা আগন্তুককে দাওয়ায় বসিতে বলিয়া প্রদীপ আনিতে ঘরে ঢুকিল। পথেই কথা-প্রসঙ্গে রমেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রমার আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই;—যা সে ভিজে কাপড় ছাড়িয়া পরে। সে কারণে দাওয়ায় বসিয়া কেবলই অবসর খুঁজিতেছিল যে, কি করিয়া তাদের দৈন্যের লাঘব করে। সদিচ্ছার প্রেরণায় জগতে কত শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়; এক একটি প্রাণে উহা জাগ্রত ভাবে না আসিলে নরজগতে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এত শীঘ্র ঘটিয়া উঠিত না। রমেশ সেই ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত; তাই রমার দৈন্য তার চোখে পড়িল। পথের ধূলায় বসিয়া কত শত সহস্র কাঙ্গাল দিনরাত করুণকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে,—কটা লোকের কৃপাকটাক্ষ তাদের উপর পড়ে! যার পড়ে, সে ভাগ্যবান্, আর যারা সেই কটাক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আসে, তারাও তাই। রমেশের সৌভাগ্যের সূচনাই সেই বৃষ্টিবাদলে রমার সহিত সাক্ষাতে। দাওয়ায় বসিয়া রমেশ যখন দেখিল, রমার আসিতে দেরী হইতেছে, তখন আর অপেক্ষা না করিয়া একখানি দশ টাকার নোট দরজার পাশে ফেলিয়া নিঃশব্দে সেই অন্ধকারে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

চক্‌মকি খুঁজিয়া প্রদীপ জ্বালাইতে রমার কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সে জানে, আগন্তুক দাওয়ায় বসিয়া আছে; কিন্তু যখন প্রদীপ হাতে করিয়া বাহিরে আসিল, তখন তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মনটা কিছু দমিয়া গেল; আক্ষেপ তার এই, যে লোকটা বৃষ্টিতে তাঁকে এত পথ পঁহুছাইয়া দিল, তা'কে মায়ে-মেয়েতে মিলিয়া একবার হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি জানাইতে পারিল না। বিষণ্ণমনে দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় একখানা কাগজ পড়িয়া আছে, দেখিয়া রমা তাহা তুলিয়া মার হাতে দিল। মা উহা দশ টাকার নোট দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল; আর সেই সঙ্গে রমার প্রদত্ত ডবল পয়সাগুলি টাকা হওয়ায় বিস্ময়ের মাত্রা কিছু বাড়িয়া গেল। অজ্ঞাতকুলশীল কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায়ই বা চলিয়া গেল, তার কোন ঠিকানা করিতে না পারিয়া অর্গল রুদ্ধ করিল। উড়ো বাতাস এমন ভাবে গায়ে লাগিবে, মা তা স্বপ্নেও ভাবে নাই; তাই ক্ষুব্ধ আশার প্রদীপ আবার ধিকি ধিকি জ্বলিতে দেখিয়া ভবিষ্যতের কথা সারারাতই মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল।

৭।

বিন্দুর পিসি মানুষটা দোষে গুণে সমন্বিত; লোকের ভালতেও যেমন সে গতর ঢালিয়া করে, মন্দতেও তেম্নি সে চরকার মত ঘুরিয়া তার অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে। গ্রামের লোকের ভাল মন্দ খবরাখবরি বহন করিতে সে যেমন মজবুত, এমন আর কেহ ছিল না; দৈনিক কাজের মধ্যে তার দুটি আতপান্ন সিদ্ধ করাই ছিল প্রধান কাজ; তাও এত দ্রুত সম্পাদিত হইত যে, দিনের সমস্ত ঘণ্টাগুলা তার ইজারার মধ্যে আসিয়াছিল। সেই জন্যই মালা হাতে করিয়া সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত। বাতাসের ন্যায় গতিবিধি তার সর্ব্বত্র, জমিদারের বাড়ী হইতে জীর্ণপর্ণকুটীর পর্য্যন্ত কোথাও তার যাতায়াত বাকী ছিল না। অযাচিতভাবে লোকের কুৎসা করা বা তাদেরই জন্য ধনীর ভাণ্ডার হইতে অর্থভিক্ষা করা, কোন কাজেই সে পশ্চাৎপদ হইত না। সাহস তার অপরিসীম, কাহারও কটাক্ষ সে গ্রাহ্য করিত না, সুখ্যাতির বাণী সে কাণে তুলিত না। রমার মার নিন্দাও সে যেমন করিয়া বেড়াইত, আবার তার ভাল করিবার চেষ্টাও তেমনি ছিল। এ সব সম্বন্ধে রমার মা কিছুই জানিত না। আহারান্তে বেলা দ্বিপ্রহরে মালা হাতে করিয়া যখন বিন্দুর পিসি রমেশের বাড়ী উপস্থিত হইল, তখন সে সবেমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে; চাকর তার সাম্‌নে বসিয়া বাবুর তামাকু সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। স্নেহপরবশ হইয়াই হউক, বা

আন্তরিকতার ভাণ করিয়াই হউক, বিন্দুর পিসি কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, "এত বেলায় খাস্ কেন, রমেশ; পিত্তি পড়ে অসুখ করবে যে; বাড়ীতে গিন্নি বান্নি কেউ না থাকলেই এমন অব্যবস্থা হয়।" রমেশ তার সদুত্তর না দিতে পারিয়া ঈষৎহাস্যে কথাগুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। এ কথা সে-কথার পর বিন্দুর পিসি রমার মার অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা পাড়িল। রমেশ পূর্ব্ব হইতেই রমার সহিত আলাপে তার অবস্থার আভাস পাইয়াছিল; সেই জন্য সে সাগ্রহে তাদের সকল কথা শুনিতে লাগিল। বিন্দুর পিসি অতিরঞ্জনে বরাবরই পটু; সে রংয়ের উপর রং ফলাইয়া কি করিয়া রমার মার অতটা সম্পত্তি ছারে খারে গেল, তাহা বেশ করিয়া রমেশকে বুঝাইয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেও ভুলিল না যে, যদি তারই সাহায্যে বিষয়ের পুনরুদ্ধার হয়। রমেশ বিন্দুর পিসিকে ছেলেবেলা হইতে চিনিত; তাই সে সব কথা কাণে শুনিলেও পুরামাত্রায় তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। কাজেই হাঁ হুঁ করিয়া সায় দিয়া শেষে বলিল, "আমি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে পারি, যদি রমার মা আমায় মোকদ্দমার সকল খরচা শেষে শোধ দেন; অবশ্য বিষয় উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে, নচেৎ আমি এক পয়সাও লইব না।" আরও বলিল, "এ সম্বন্ধে রমার মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা শুনিয়া পাকা করিয়া বলিব।" বিন্দুর পিসি স্বভাবের প্রেরণায় রমার মার কথা তুলিয়াছিল মাত্র; সে ভাবে নাই যে, তিলও তাল হয়; সংসারে কে কার খোঁজ লয়; আবার পয়সা দিয়া সে খোঁজ লওয়া বিনা প্রত্যাশায় কে করে? অনাথা রমার মার বুঝি বা কপাল ফিরিল, ভাবিয়া সে তার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার নিমিত্ত রমেশের গৃহ পরিত্যাগ করিল। মালা জপিয়া নীরবে তার বৈধব্যযন্ত্রণার অবসান করিতেছিল, কিন্তু, কখনও এমন অননুভবনীয় ঘটনা ঘটিতে সে দেখে নাই; তাই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া উত্তেজনার আরও জোরে মালা ঘুরাইয়া গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। সে শুধু জানিত, অনাথের দৈব সখা; সেই বিশ্বাসেই আস্থা স্থাপন করিয়া রমার মাকে শুভবার্ত্তা জানাইতে ছুটিল। যন্ত্রী তার যন্ত্র কেমন করিয়া চালায়, তা যদি মানুষ জানিত, ত, এত দুঃখদৈন্যে পৃথিবী আক্রান্ত হইত না। রমার মা বা বিন্দুর পিসি, তারা ত আর সংসারের গণ্ডীর বাহিরে নয়; কাজেই অন্তরালে যন্ত্রীর সযত্নচালিত যন্ত্রের খবর তারা পাইবে কি করিয়া? পিসি সে খবর পায় নাই বলিয়া আজকের ঘটনায় কৃষ্ণপ্রেমে সে এত বিহ্বল হইয়া পড়িল।

৮ ।

অযাচিতদানে রমার মার আত্মতুষ্টি লাভ হইলেও সে রাত্রে অন্ধকারে আগন্তুকের কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া মনটা তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল। তবে ভগবানের দান বলিয়া সে কোন ক্রমে উহাকে সুসংযত করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যগুলি পূর্ব্বের মতই সমাধা করছিল। দীনাবস্থা হইলেও সে হঠাৎ পরের দান লইবে কেন? পরিশ্রমের অনুরূপ অর্থ ত আগন্তুক দেয় নাই; তাই তার মনটা থাকিয়া থাকিয়া কেমন একটা খটকায় পূর্ণ হইত। অন্ধকারে সে তাহাকে দেখে নাই, তার পরিচয়ও পায় নাই। পথে রমার সহিত একবার-মাত্র তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—কিন্তু, সেও ক্ষণিকের জন্য; আর তার গলার স্বরও শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু, সে সব ক্ষুদ্র বালিকাহৃদয়ে গাঁথা থাকা বড়ই সুকঠিন। গ্রামের কতলোককে বলিল, কিন্তু, কেহই রমেশের কোন সন্ধান দিতে পারিল না; রমার মার নিকট রমেশ পূর্ব্ববৎ অচেনাই রহিল; আগন্তুক কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানিতে পারিল না।

বিন্দুর পিসির সহিত রমেশের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা রমার মা সবই শুনিয়াছিল। কথাগুলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সে তাতে অমত করিবে না, ভাবিল। তবে রমেশের সহিত সাক্ষাতে সকল কথা শুনিবে বলিয়া তারই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জমিদারের বংশে রমেশের নাম সে অনেকদিন হইতেই শুনিয়াছে, কাজেই তার দ্বারা সে যে প্রবঞ্চিত হইবে না, তা বেশ বুঝিয়াছিল। তবে বিন্দুর পিসির কথা প্রায় ষোল কড়াই কাণা ভাবিয়া আশায় তত উল্লসিত হয় নাই। তবুও প্রাণে একটা ক্ষীণ আশায় রেখা যে একেবারেই ছিল না, তা বলা যায় না আর ক্রমশঃ রমেশের সাক্ষাতের দিন যতই সন্নিকট হইতে লাগিল, ততই রেখাটা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আশা মানবহৃদয়ে কত কুহকজাল বিস্তার করিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত মানুষ তারই মোহিনী শক্তিতে আচ্ছন্ন। দরিদ্রের ছিন্নকন্থার আর ধনীর হীরকখচিত প্রাসাদে প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি দণ্ডে সে কত শ্রেষ্ঠ শিল্পের রচনা করিতেছে, তার ইয়ত্তা কে করে? মানুষ যখন ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন, আশা বিনিদ্র হইয়া তাকে কখনও নাচায়, কখনও কাঁদায়। এমন প্রকৃষ্ট শিল্পী জগতে কি আর আছে। রমার মা চিরদুঃখিনী হইলেও বিন্দুর পিসির কথায় সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তবুও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বেগ অন্যের অলক্ষ্যে চাপিয়া রাখিয়া গৃহকর্ম্ম যথাপূর্ব্ব করিতে লাগিল।

যেদিন প্রত্যুষে রমেশ বিন্দুর পিসির সহিত রমার মার ঘরে আসিল, সেদিন রমা হাটে সূতা বেচিতে গিয়াছে; কাজেই রমেশকে কেহই চিনিতে পারিল না। রমা মুহূর্ত্তের জন্য সেই বৃষ্টির দিনে তাকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু, তাহা হইলেও এতদিন পরে সে আগন্তুককে চিনিতে পারিত কি না, সন্দেহ। যাহা-হউক, রমার মা তাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বসিতে আসন দিল। সেও এ-কথা সে-কথার পর বেদগ্রামে মুখুয্যেদের বিষয়সম্পত্তির কথা তুলিল। ভিতর-কার অনেক কথা সে জানিলেও সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কিরূপে রমার মা আত্মীয়ের নিকট প্রবঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই তথ্য লইবার জন্য অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। রমার মা উত্তরে হাপুস্ নয়নে কাঁদে, আর তার মর্ম্মস্পর্শী কথায় রমেশকে সকল কথা বুঝাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে পিসি ঝঙ্কার দিয়া উঠে, আর বলে, "বুড়োমাগী, কান্না কি! রমেশ বিষয়ের ত হিল্লে করে দিবে, বলেছে।" নিরাশ্রয়া রমার মা আশায় আশ্বস্ত হইয়া আরও কাঁদে, আর তার অন্তরের বেদনা রমেশকে জানায়। রমেশ ক্ষুব্ধমনে শঠের শঠতা ও অত্যা-চারীর অত্যাচার সবই শুনিয়া যাইতেছিল; যখন কানায় কানায় হৃদয়ে তার বিবরণগুলি উছসিয়া উঠিল, তখন আর আবেগে সে স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিল; "আমি আপনার বিষয় উদ্ধার করিয়া দিব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; দেনা পাওনার কথা পরে বুঝিব" যন ঘটাচ্ছন্ন মেঘে বিজলী চমকাইয়া যায়, রমার মার হৃদয়েও সেইরূপ একটা আশার ক্ষীণ রেখা দ্রুত দেখা দিল; সে আনন্দে চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া রমেশের পানে চাহিয়া চাপা গলায় বলিল, "বাবা, তুমি ভগবানের নির্দ্দেশে আজ দরিদ্রের জীর্ণপর্ণকুটীরে আসিয়াছ; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" পরক্ষণে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কথা কহিতে পারিল না। অবসর বুঝিয়া বিন্দুর পিসি ফোড়ন দিয়া বলিল, "সবই রমেশ করে দেবে, তবে খরচা যা লাগবে, তা তখন পরে তাকে দিস।" কথাগুলা রমেশের কাণে পঁহুছিল কি না, জানি না; কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করিল না; এদিকে রমার মা ঘাড় নাড়িয়া তখনই তাহাতে রাজী হইল।

কথায় কথায় বেলা বাড়িতে চলিল, দেখিয়া বিন্দুর পিসি রমেশকে লইয়া রমার মার গৃহ পরিত্যাগ করিল। সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইতে কোন বিপত্তি ঘটিবে না ভাবিয়া রমেশ মোকদ্দমার আয়োজন করিতে ক্ষিপ্রগতিতে পথ চলিতে লাগিল।

রমার মার অদৃষ্টচক্র এখন রমেশের হাতে; সে নিজের ইচ্ছামত চাকা যেমন ভাবে ঘুরাইতেছে, উহা তেমনি ভাবে ঘুরিতেছে। মোকদ্দমার তদ্বির হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে হয়। কয়মাস ধরিয়া সে নিজের জমিদারীর কাজ এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছে; মোকদ্দমার সূত্রপাত হইতেই কলিকাতায় তার বসবাস; ক্বচিৎ দু'চার দিনের জন্য দেশে আসে। অর্থ দিয়া, সময় দিয়া, শরীর পাত করিয়া সে রমার মার হক্‌সীমানার জন্য ন্যায়যুদ্ধ করিতেছে; কত লোকে কত কথা বলে, অযাচিতভাবে কত মিথ্যা দোষারোপ করে, তার অভিপ্রায়ে সন্দিহান হয়, কিন্তু, রমেশ কোন দিকেই লক্ষ্যও রাখে না। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, তাহারই উন্মেষে তার আনন্দ, তা সেটা নিজেরই হউক, আর পরেরই হউক। ভালবাসায় তার বুকটা যে ভরে আছে, তাতে স্বার্থের কণামাত্রও নাই। রমেশকে যে সে অবস্থায় দেখিয়াছে, সে আত্মত্যাগের মহীয়সী শক্তির বাহবা না করিয়া থাকিতে পারে না। রমেশ কিন্তু, অচল, অটল; সঙ্কল্প তার স্থির, বুদ্ধি তার প্রখর, কার্য্য তার ক্ষিপ্র। অকাতরে জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া সে যে মহানুভবতার পরিচয় দিল, জগতে তার তুলনা নাই। মোকদ্দমার হার-জিৎ অবশ্য ভগবানের হাতে; কিন্তু, চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, সে তা প্রাণ ঢালিয়া করিয়াছে।

অকপটহৃদয়ের বাসনায় ভগবান্ জোরে সাড়া দেন; যে মোকদ্দমার শুভফলের আশায় রমেশ এক বৎসর কাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল, হঠাৎ আজ তার জয়বার্ত্তা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত জলের মত হৃদয়টা তার ভাসিয়া গেল। এত পরিশ্রম, এত অনুষ্ঠান, এত উদ্‌বোগ সার্থক হইল দেখিয়া সে সেই দিনই ঐ শুভবার্ত্তা বহন করিয়া দেশে ফিরিল।

যে রমেশ আজ এই দীর্ঘকাল মোকদ্দমার চিন্তায় জর্জ্জরিত ছিল, দেহ যার উহারই জয়াশায় চরকীর মত কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনিয়মে অনিদ্রায় যে অস্থিপঞ্জর সার করিয়াছিল, সে আজ হঠাৎ উল্লাসে আনন্দে স্ফীত-কলেবর হইয়া উঠিল; অধরে তার হাসির শুভ্ররেখা, চোখে তার দুর্ভেদ্য ভাবের ফোয়ারা, আর প্রাণে তার বুকভরা আশা। দেশে আসিয়াই রমার মার কাছে তার বিশ্বজিৎ ঘোষণা করিতে গেল; সেখানে তখনও দুটী জীর্ণ হৃদয় সেই শতধা জীর্ণ পর্ণকুটীরে কোনক্রমে বাঁচিয়া আছে। জীবনে সুখত তাদের অনেকদিনই চলিয়া গিয়াছে; তবে আশার প্রদীপ এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই;

ধিকি ধিকি জ্বলিয়া সে সুদূর ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্য কেবলই তাদের চিত্তপটে আঁকিয়া দিতেছে; কি কুহকেই তারা আচ্ছন্ন! রমেশ যখন কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন রমার মা আহারান্তে কন্যার সহিত সুখ দুঃখের কথা কহিতেছিল। একবার ভাবিল, মোকদ্দমার জিৎ হইয়াছে, তাদের বলিবে না; কারণ, ভগ্নহৃদয় যদি আনন্দে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে ত' কে বিষয় ভোগ করিবে? অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা দিবে ভাবিয়া রমার মাকে "এখনও রায় বাহির হয় নাই" বলিয়া নানা কথার অবতারণা করিতে লাগিল। রমার মা বরাবরই তীক্ষ্ণবুদ্ধি; সে রমেশের কথায়, ভাবে, ইঙ্গিতে, ইসারায় কি যেন কি হইয়াছে, উপলব্ধি করিল। রমেশ যত আশ কথা পাশ কথা বলে, সে ততই জোর করিয়া তাকে মূল প্রসঙ্গে আনিয়া ফেলে; উৎকণ্ঠায় প্রাণ তার কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তার কি আর সবুর সয়? রমেশ বুঝিল, সত্য কথা আর গোপন করা সঙ্গত নয়; তখন উচ্চকণ্ঠে সে তার সাফল্যের কথা বলিল। সে সংবাদে দুটী জীর্ণ হৃদয় কি অপরিসীম আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে, বুঝা যায় না। অনশনক্লিষ্ট, দৈন্যপ্রপীড়িত অধরে হাসির রজতরেখা ত্বরিতগতিতে ছুটিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সেই ভাবে কাটাইয়া রমার মা রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, খবর সত্য ত? উত্তরে রমেশ কেবলমাত্র কহিল, "আপনাকে মিথ্যা খবর দিতে এখানে আসি নাই; তবে আনন্দে একেবারে আত্মহারা না হন, সেইজন্যই কথাটা আমি লুকাইয়াছিলাম।" আরও বলিল, "একমাসের মধ্যে আপনার হিস্যা সব বুঝিয়া পাইবেন, আমি সমস্ত কড়াক্রান্তি আদায় করেছি।" রমার মা তার অদৃষ্টচক্র এমনভাবে ঘুরিয়া আসিবে, তাহা ভাবে নাই; সে কেবলই "রমেশের ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না" বলিতে বলিতে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রমেশ তখনও পর্য্যন্ত দাঁতে মুখে কিছুই করে নাই বলিয়া আর থাকিতে পারিল না; "আবার আসিব" বলিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

১০।

সময়ের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘটনাগুলা নিমিষের মধ্যে কোথায় ভাসিয়া যায়। রমার মার মাথার উপর দিয়া কত ঝড়ই বহিয়া গেল; সে কিন্তু, কিছুতেই টলমল করিল না; বৃক্ষের আগে ও পাছে যেমন প্রকৃতি নিত্য নূতন সৃষ্টিতে তার পরিবর্ধনায় অথবা প্রাপ্তিতে করে, মনে হয়; যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না,

কছুই হয় নাই, রমার মার চিত্তও তেমনি আকস্মিক চাঞ্চল্যের কোন ভাবই দেখাইল না। সে বুঝিল, সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ আছেই আছে; সহসা বিচলিতচিত্ত হইলে চলিবে কেন? হৃদয়টা তাই সে জোরে বাঁধিয়া সংসারের পিচ্ছিল পথে সাবধানে চলিতেছিল; আশার কুহকে পড়িলেও সে একদিনও আত্মহারা হয় নাই, আবার নিরাশায় কখনও হা হুতাশ করে নাই। কেবলই সে লীলাময়ের অচিন্তনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কোনক্রমে দিনগুলা কাটাইতেছিল।

রমেশ তার কথামত একমাসের মধ্যেই রমার মার সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিল; তারই যত্নে আজ কতবৎসর পরে বেদগ্রামে স্বামীর বাস্তভিটায় সে আবার আশ্রয় লইল। রমা এখন সুতা বেচিতে হাটে যায় না; জমিদারের ঘরের মেয়ের মত থাকে,—শুধু তার বিশেষত্ব এই যে, দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া সে দরিদ্রের ক্রন্দনে বিহ্বল হইয়া পড়ে। দুঃখ তার প্রাণের সখা; তাই সে যখনই সময় পায়, তখনই কার কোথায় ব্যথা, তারই তথ্য লইতে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়; উঁচু কথা সে বলে না, জাঁকজমক সে করে না; তাই লোকেও তাকে ভালবাসে।

দেবীপুর হইতে আসিয়া অবধি একা রমেশই রমার মার বাড়ী যাতায়াত করিত; সামান্য খুঁটি নাটি হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করা, সবই সে নিজে দেখিত। মধ্যে মধ্যে বিন্দুর পিসির ও আসা যাওয়া ছিল, কিন্তু, দেবীপুরের আর কেহ বড় তাদের খোঁজা খবর রাখিত না। রমার মা সকলেরই তথ্য লইত,—শুধু লোকমুখে নয়, অবসরসময়ে বিন্দুর পিসির সহিত দেবীপুরে যাইয়া সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিত। এইরূপ ভাবে কতদিন কাটিয়া গেল; রমেশের সুবন্দোবস্তে জমিদারীর আয়ও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। রমেশ কিন্তু, একদিনের জন্যও সে কদ্দমার খরচের কথা তুলে না; রমার মা উহা শোধ দিবার জন্য অহর্নিশি ভাবে, কিন্তু রমেশের ভাব গতিক দেখিয়া সে কথা পাড়িতে আদৌ সাহস করে না। যে দেহপাত করিয়া ঐ দুঃস্থ প্রাণী দুটির জন্য এতটা করিতেছে, তাহার ঋণ কি অর্থে শোধ যায়? তবুও ভাবে, কি করিয়া সে কথা পাড়িবে? অবসর আসিয়াও আসে না; দিনও হু হু শব্দে বহিয়া যায়। পিসি অনেকদিন হইতেই পরিশোধের কথা তুলিয়াছে, কিন্তু রমার মার বাধ বাধ ঠেকে বলিয়া কথাটা বরাবরই চাপাই আছে। বুকের মধ্যে কথাগুলা গুলিয়ে উঠিলেও মুখগুলা ফুটিতে চাহে না; লজ্জায়, সঙ্কোচে কোথায় একপাশে লুকাইয়া

থাকে। কতদিন আর এমন করিয়া চলে? দেনা পাওনার একটা মিট্‌মাট্ হইয়া গেলে রমার মা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে;—তাই সে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও শুভ মুহূর্ত্ত খুঁজিতে লাগিল।

বৈশাখের প্রথম দিনে বেদগ্রামে মুখুয্যেদের বাড়ী একটা ছোট খাট উৎসবের আয়োজন হয়। কর্ত্তাদের আমল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সকলেই নূতন বৎসরের আবাহনে সাগ্রহে যোগদান করে। এ উৎসব এবারে রমার মার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বেদগ্রামে ইতরভদ্র সকলেই নিমন্ত্রিত; আর দেবীপুরে সৌহার্দ্দসূত্রে যারা আবদ্ধ, রমার মা তাহাদেরও সাদর আহ্বান পাঠাইয়াছে। সকাল হইতেই রমেশ ও বিন্দুর পিসি আসিয়া উপস্থিত; আয়োজনের সমস্ত ভার তাদেরই উপরে। রমার মা কেবল নির্লিপ্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—আর রমা উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়া বাল্যসখীদের আনন্দ কল্লোলে একেবারেই মুগ্ধ, মাতোয়ারা। রমেশ মধ্যাহ্নভোজনে বসিলে বিন্দুর পিসি ও রমার মা আসিয়া তাকে এটা ওটা খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল; সেও নিঃশব্দে উহার মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিল। অবসর বুঝিয়া রমার মা মোকদ্দমার খরচের কথা তুলিল, এবং সে টাকা সমস্তই তাকে ফিরাইয়া লইতে বলিল। রমেশ প্রথমটা নিরুত্তর থাকিয়া শেষে বলিল, "সে পরে দেখা যাইবে; সত্য কথা বলিতে কি, এখন আমার সে টাকায় প্রয়োজন নাই; আবশ্যক হইলে চাহিব।" রমেশের যে সে টাকা কখনও দরকার হইবে না, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। পিসি উত্তরে আদৌ সন্তুষ্ট হইল না; সে ভাবিল, রমেশ কেন পরের জন্য এত করিবে? সে তাই বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিল, "তবে এক কাজ কর; রমার ত বয়স হইয়াছে, আর সে দেখিতে শুনিতেও নিরুপমা সুন্দরী, কুল, মেল সবই মিল আছে, তাকে বিবাহ করিলে রমার মার ঋণ পরিশোধ হইবে; নচেৎ ইহকালে ওর এই খোয়ার হইল, আবার পরকালে ওকি তোর ঋণের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিবে?" কথাটা রমেশের মনোমত হইল কি না জানি না; তবে সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; ভাবিল, বোধ হয়, শুধু টাকা লইয়া ঋণ পরিশোধ করিলেই ছিল ভাল; সেই বারোয়ারীর মেলা হইতে আরম্ভ করিয়া মোকদ্দমার শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত সে যাহা করিয়াছে, তাহা কোনদিনই রমার সহিত উদ্বাহবন্ধনের আশায় নহে,—কল্পনায়ও কখনও সে চিন্তা জাগিয়া উঠে নাই। সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে হৃদয়ের ঔদার্য্যই প্রকাশ পায়। এতকাল স্বার্থের কোন গন্ধই তাতে ছিল না, এখনও নাই। বিন্দুর

পিসির কথায় কিছু হক্‌চকিয়ে গিয়ে উত্তর করিল, আমি ত বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি, তা না হলে এতদিন করে ফেলতুম্। বয়সও হইয়াছে, আর বিবাহ করব না।" "তা কি হয় বাবা" বলিয়া পিসি আবার তাকে গ্রেপ্তার করিল; আর সেই সঙ্গে রমার মা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে আমি তোমার ঋণ কি করে শোধ করব? কথাগুলা করুণরসে মাখান ছিল বলিয়া রমেশের প্রাণে গিয়া জোরে ধাক্কা দিল। সে আর কোন ওজর আপত্তি না করিয়া "আচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু, মলমাসে নয়," বলিয়া বৈশাখী উৎসবের আয়োজনের জন্য বাহিরে উঠিয়া গেল।

তার পর এক শুভদিনের গোধূলিলগ্নে বেদগ্রামে মুখুয্যেদের সেই সুবৃহৎ অট্টালিকায় বিবাহ বাসরের আনন্দকাকলী পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রমেশ ও রমা এতদিন মুক্ত বাতাসের মত উধাও হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আজ বিধির নির্ব্বন্ধে তাদের দুটী প্রাণ বাঁধা পড়িল। সে বন্ধন অটুট রাখিবার জন্য সে দিন সারারাতই নহবতের বাজনার সুরে সুর মিলাইয়া মঙ্গলশঙ্খ তাদের মিলনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি এ।

সিন্দূর কৌটা।

প্রতিভাশালী প্রবীণ লেখকের লিখিত মনোরম উপন্যাস এই সিন্দূরকৌটা। এই বইখানি যখন "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছিল, তখনই সকলে অধীর আগ্রহে পড়িয়াছি, এবং পরের মাসে কি হয় জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছি। সুলেখকের লেখার মিষ্টত্বের মোহ এড়াইতে পারি নাই। কেবল একবার নহে, উহা পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইবার পরও দুইবার বইখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। চিত্র ও মানুষগুলি এমন জীবন্ত যে, মনে হয় যেন উহাদের সহিত পরিচিত হইয়া গেলাম। কিন্তু বইখানির শেষাংশ পড়িয়া ক্ষুব্ধ হইতে হয়। প্রবীণ লেখক তাঁর পাকা হাত আঁকিয়া এই এই চিত্র তাঁর পাঠকদের সম্মুখে ধরিলেন কেন? নভেল পড়া একশ্রেণীর পাঠকদের নেশা আছে; কিন্তু নেশা কিছুরই ভাল নয়; বই পড়ার উদ্দেশ্যও কেবল মাত্র এই নেশার খোরাক যোগানো নয়। ভাল পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য মনের উৎকর্ষ সাধন। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে উপন্যাস পাঠ প্রচলিত আছে। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী এমন কি পুত্র পর্য্যন্ত আপন আপন মা, ভগ্নী, কন্যা ও স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট উপন্যাস উপহার দিয়া থাকেন; এবং লেখকের নামই উপন্যাসের উৎকৃষ্টতার শার্টিফিকেট। এ ক্ষেত্রে যদি এই রকম পাকা লেখকেরও নিকৃষ্ট 'প্লট' তাঁদের লেখার গুণে, ভাবে, মাধুর্য্যে ঝক্ ঝকে করিয়া আনিয়া ধরেন, তবে ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এই 'প্লট' যদি কোনও কাঁচা লেখকের লিখিত হইত, তাহা হইলে, হয় তো ইহার কুৎসিত জঘন্যতা সহজেই মার্জ্জিতরুচি পাঠকের মনকে, বিরূপ করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু তা যে পারে না, সে কেবল লেখার গুণে। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আসিয়াও যে লোকে বই ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারে না, সে শুধু লেখকের সহজ সুমিষ্ট লিখিবার গুণে। যিনি যাহাই বুঝুন, নভেল পড়িবার পয়, যদি চিত্রগুলি জীবন্তভাবে ফুটিয়া থাকে, তবে পাঠকের মনেও একটু আধটু দাগ পড়ে বই কি?

তার পর; সিন্দূরকৌটার নায়ক বিজয়, একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবক। সে

কি নারীকে দেখিয়াছে সেই চোখে যে, কেবল মাত্র উন্মাদলালসা পরিতৃপ্তির উপাদানরূপে? এমনই কি অসংযত কাণ্ডজ্ঞানহীন দানব যদিই আঁকিতে হয় তো তেমনি ঘৃণ্যরূপে; অমন মোহন তুলিতে নয়। তার প্রতি আর বিন্দুমাত্র করুণা, বিন্দুমাত্র সহানুভূতি কাহারো থাকিতে পারে না, থাকা উচিত নয়। কিন্তু বইখানিতে কোথাও এমন আভাস নাই যে, পড়িতে পড়িতে বিজয়ের প্রতি ঘৃণা আসে? নারী কি পুরুষের চোখে শুধুই নারী? উপভোগের সামগ্রী মাত্র? তাহাদের ওই পাশবিক উত্তেজনাশান্তির উপাদান মাত্র? একজন শিক্ষিত, সম্পন্ন, ভদ্রলোকের বুক জায়গাটা কি এমনি সারহীন যে, একজন পরস্ত্রীকে সেখানে জড়াইয়া ধরিলেই হইল? তার মনে পড়িবে না,—বাড়ীর কিশোরী সহোদরা ভগ্নীকে,মনে পড়িবে না—কন্যাকে, মাতাকে,—হয়ত বাড়ীতে নিকটসম্পর্কীয়া আরো কত আত্মীয়া আছেন, ইঁহারা কি নারী নহেন? যাহার প্রবৃত্তি এমন দানবীয়, তার সম্মুখে দাঁড়াইতে যে মা-বোনেরও বুক কাঁপিয়া যায়।

তা ছাড়া স্ত্রী যার বর্ত্তমান, এবং কন্যা সন্তানের পিতা যে—পথে একটি দুর্ভাগিনী স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে দেখিয়া সে তো তাহাকে স্নেহাস্পদা ভগ্নীর মত ভাল বাসিতে, হাসিতে, গল্প করিতে সহানুভূতি, দেখাইতে পারিত; ছোট বোনটির মত ব্যবহার এ ক্ষেত্রে অনুপযুক্তও হইত না। সে একজন বিবাহিত সংসারী যুবক; পথে, ঘাটে পরস্ত্রীর উপর লুব্ধ দৃষ্টিতেই বা সে চাহিবে কেন? তা থাকুক না কেন, সে পরস্ত্রীর দেহে অতি অপরূপ রূপযৌবন-সম্ভার। কিন্তু আগাগোড়া দেখা যায় যে, বিজয় কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, ভাই-ভগ্নীর মত, সারল্য তাহার কোন খানেই প্রকাশ পায় নাই। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে; যখনই সে, লৌকিক ভদ্রতার খোলস ছাড়িয়া নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, তখনই ধরা পড়িয়া গিয়াছে যে, তার নিজ মূর্ত্তি কি অদম্য লালসাপূর্ণ, জঘন্য। সে একজন স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়াই মত্ত। তাহাকে একেবারে হোটেলে না তুলিয়া বাড়ীতেও তো আনিতে পারিত। স্বামীর এই কাজে যে স্ত্রী সংবাদটুকুও জানিতে পারিল না, এমন হইত না, যদি না স্বামী একেবারেই মরিতেন! সত্য বটে, মানুষ, মানুষই; দেবতা নহে, এবং মানুষের প্রাণের আরো একটা দিক আছে। আছে বটে, কিন্তু সে এই, অসংযত বিকৃত প্রলাপ নহে, সে পদার্থ অতি মধুর, সঙ্কোচান্ধ, অনাস্বাদিত পুলকের প্রথম অনুভবের একটা নিগূঢ় কম্পন মাত্র। ইহার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করা সুকঠিন সত্য; কিন্তু তাহা রিপুর তাড়না নহে, প্রাণের

ক্ষুধা। বিবাহিত, দুটি সন্তানের জনক যে, তাহারও যদি এ ক্ষুধা মোটে নাই বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে সে কথা যে উন্মাদের কথায় দাঁড়ায়। প্রাণ তো আর মানুষের হাজারটা নয়। এই নরককে নরক করিয়া না আঁকিয়া সোণার ছবি করিয়া যে লেখক কেন আঁকিলেন না, সেই তো আমাদের ক্ষোভ। এই উপন্যাসও যে লোকে অমৃতের আস্বাদে গিলিতেছে, তার কারণ এই যে, নভেল পাঠক পাঠিকামাত্রই অধিকাংশ তরুণবয়স্ক। কাঁচা মগজে উত্তেজনা-কর কিছু একটা পাইলেই ভাল কি মন্দ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে সেটা ভালই লাগে।

তার পর প্রেতিনী সুধীর চরিত্র যে ভাবে আঁকা হইয়াছে, পাশ্চত্য সাহিত্যে হয়তো উহা অশোভন হইত না। সে কি পলকে বিবাহ করে নাই? ছয় মাস কাল তাহারা ত স্বামী স্ত্রী হইয়াই দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে তো নিরীহ হিন্দু বালিকা নয় যে, তাহার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই একটা কুৎসিত "সং"এর সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছে। এই "সং"কে সে তো স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে, কুৎসিত হোক্ বা মন্তপ হোক, সে তো তাহারই পত্নী বটে। আর যাহার রূপ-যৌবনের হিল্লোলে, একজন পথিক ভদ্রলোক কাঁদে পড়িয়া টাল সামলাইতে পারিলেন না, পল যে তাহাতে মুগ্ধ হয় নাই, এটাও স্বাভাবিক নহে; কারণ আর যাই হোক, পল মানুষই তো, দেবতা তো নয়। যে স্ত্রীলোক স্বামীর চেয়ে নেকলেশের মূল্য বেশী বোঝে, খৃষ্টানের স্বাধীন মহিলা হইয়াও আবার ঢং করিয়া অপর পুরুষের প্রতি আত্মনির্ভর করে, তাহাকে প্রেতিনী ভিন্ন আর কোনও সভ্য কথা মনেই আসে না। সে তো নারী, কিন্তু দেহটা কি তার রাজপথ যে, যখন যাহার খুসী, সে দলিয়া যাইবে? নারীর এ শোচনীয় অধঃপতন, যদিই আঁকিতে হয় তো যে কলমে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সব দিক্ বাঁকাইয়া আঁকেন, সেই কলমেই আঁকিতে হয়, মন্দ যেন মন্দ-রূপেই দেখা দেয়। আর বকুরাণী? গ্রন্থকার সকল চিত্রই, অতি জীবন্ত রূপে ফুটাইয়াছেন, এমন কি সুন্দরসিংএর চিত্রটি পর্য্যন্ত; কেবল ঝাপসা হইয়া আছেন বকুরাণী। প্রথমটা, যখন তার স্বামী মানুষ ছিলেন, ততদিন বকুকে বেশ ফুটিতে দেখা গিয়াছে, তার পর আর তাকে ভাল বোঝা যায় না। তা না হইলে, স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, স্বামীর এই এতবড় বিশ্বাসঘাতকতায়, এত বড় অধঃপতনে কত খানি দুঃখ, কতখানি অভিমান হওয়া তার স্বাভাবিক ছিল? সে কিনা আপনা হইতে এই পথে স্বামীকে সাহায্য করিল? স্বামীর সুখ? ভাল,

অনেক স্বামী আছেন, তাঁরা মনে করেন, নরকের পঙ্কে ডুবিতে পাইলেই সুখী হইবেন। তাই বলিয়া স্ত্রী কি তাঁহাকে সেই পথেই সাহায্য করিবে? না তাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য? সুশীতো বিলাসবিভ্রমে ক্ষণিকের অভিনীত প্রেমের নেশায়, নেশা-তুরা; তার রঙীন চশমায় সে যাহা দেখিতেছে, সবই বিচিত্র। সে কখনো ভাল বাসে নাই, ভাল বাসার স্বাদ:জানে না; তার অন্তরের ভিতরকার যে নারী মরিয়া প্রেতিনী হইয়াছে, তার মধ্যে যদি এতটুকুও নারীর চৈতন্য জাগিয়া থাকিত, তো সে বুঝিতে পারিত যে, যে সুখী করার কথায় সে আপনাকে স্তোক দিতেছে, তার নাম সুখী করা নয়, সর্ব্বনাশ করা। দেহের ঘনিষ্ঠতার নামই মিলন নয়, একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের ভাষায় "বড় প্রেম কেবল কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে।" বুঝিত যে না পাওয়ায় দুঃখ কত মধুর। আর ভালবাসার সাধক সংকল্প স্থির, একনিষ্ঠই হইয়া থাকে। বকুকে যদি স্বাভাবিক চিত্রে চিত্রিত করা হইত, তাহা হইলে কি যন্ত্রণা হওয়া উচিত ছিল তার, যখন তার প্রিয়তম স্বামীর চরিত্রে শ্রদ্ধার স্থানে ঘৃণা আসিয়া পড়িল! কি নিদারুণ ঘৃণায়, অভি-যানে, সে সুশীলার হাতে স্বামী তুলিয়া দিল! বৈধব্য ইহা অপেক্ষা তার শত গুণে ভাল ছিল। এই অভিমানের মর্ম্ম তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন—আপাতমধুর প্রেমের চিত্র আঁকিয়া যাঁর হাত পাকা। বকুকেও তিনি স্ত্রীলোক করিয়া তুলিতে পারেন নাই, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নারী সব পারে, কেবল পারে না ঐ কাজটি,—নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া অপরকে স্বামী দান করিতে; পারে বরং যদি অতঃপর স্বামিস্ত্রীর মধ্যে কোনও যোগ না থাকে। যদি স্বামী ইহার পরও স্ত্রীর কাছে আর ভালবাসা বা কৃতজ্ঞতার অভিনয় না করেন। ভালবাসায় যার প্রাণ পরি-পূর্ণ, ভালবাসায় হীন অভিনয় সহ্যকরা বা ভালবাসায় পাত্রের হীনতা অহরহ দেখা কোনও নারীর পক্ষেই সহজসাধ্য নহে। যাহা হইয়াছে তা লইয়া যতই দুঃখের কথা বলি না কেন আর উপায় নাই, কিন্তু শক্তিশালী লেখকদের মূল্যবান্ মস্তিষ্কে, মহৎ কল্পনায় এমনি লজ্জা-গ্লানিকর 'প্লট' আর না ফোটে, ইহা প্রার্থ-নার কথা। নভেল পড়ার আনন্দ যেন মনে নির্ম্মল আনন্দই প্রদান করে। এই ধরণের উপন্যাস ক্রমশঃ যেন বাড়িয়া না চলে, ইহাই আমাদের মিনতি।

শ্রীমতী নীহারবালা দেবী।

মহিষমর্দ্দিনী।

—:০:—

(১)

অসুর অতীতে একদিন
তপশ্চর্য্যা করিয়া অসুর ;
লাভ করি' বিধাতার বর,
তমোগুণে জিনে সুরপুর।
শুদ্ধ সত্ত্ব দেবতার গুণ
অমলঙ্ক শুদ্ধ সৌম্যকর,
আসুরিক তমোময় মেঘে
ঢেকে দিলে বিশ্বচরাচর !
স্বাধিকার লুপ্ত দেবতার
বিতাড়িত স্বর্গ হ'তে সবে ;
দীনতায় দিন যায় কেটে,
অত্যাচার সহিছে নীরবে।
দেবতার মৃত্যু নাই, তাই
পলে পলে মৃত্যু জ্বালা সয় ;
স্থান নাই নিজ বাসভূমে,
চিত্তে সদা অসুরের ভয়।
ধন, মান, সৌভাগ্য সম্পদ
অপহৃত হ'য়েছে সকল ;
আছে শুধু রুগ্ন শীর্ণ দেহ
জরাজীর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল।
ব্যর্থ সে পুরুষকার আজি,
অদৃষ্টের কঠোর পেষণ ;
নিয়তি হাসিছে উচ্চ হাসি,
কি বিকট [illegible] দর্শন !

(২)

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে বিস্তৃত
মহিষাসুরের দণ্ড নীতি ;
প্রতি প্রাণে দিতেছে জাগায়ে,
আসুরিক অত্যাচার ভীতি।
অধর্ম্মের নব অভ্যুদয়—
গাঢ়তর ধূম্র আবরণ ;
আবরিল ত্রিলোকের মাঝে,
জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্ম সনাতন !
বর্দ্ধিত পাশব বল ভবে
মনুষ্যত্ববর্জ্জিত মানব ;
তপোবনে হয় না ধ্বনিত
সুমধুর সামগান-রব।
ঋষিসঙ্ঘ লভিলা বিশ্রাম,
বিশ্বহিতে নাহি আর মন ;
বিলাস-ব্যসনাসক্ত সবে,
ব্রহ্মবিদ্যা ভুলেছে ব্রাহ্মণ !
যাজ্ঞিকের শূন্য যজ্ঞবেদী
বেদমন্ত্র হ'য়েছে নিষ্ফল ;
ধর্ম্ম লোপ, কর্ম্ম লোপ যদি
অমরের মরণ মঙ্গল !
অতীত সৌভাগ্য পিষ্ট আজি,
অদৃষ্টের কঠোর পেষণ ;
নিয়তি হাসিছে উচ্চ হাসি,
কি বিকট ভীষণ দর্শন !

(৩)

অত্যাচার প্রপীড়িত প্রাণে,
ছিন্ন ভিন্ন দেবতার দল ;
নিষ্ফল আক্রোশ শুধু জাগে
বক্ষ মাঝে তুষের অনল !

বাসব করিয়া যুক্তি সার,
দেবগণে ল'য়ে অতঃপর ;
পুরোগামী করিয়া ব্রহ্মারে
চলিলেন যথা হরি হর।
নিবেদিলা প্রাণের বেদনা,
অসুরের ঘোর অত্যাচার ;
চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র বহ্নি, বায়ু,
শমনের গেছে অধিকার।
স্বর্গ হারা দেবতার দল,
বনে বনে করিছে ভ্রমণ ;
চিরানন্দ অমরা নগরী
নিরানন্দে করিছে ক্রন্দন !
শুনি হেন নিদারুণ বাণী
দেবতার মর্ম্মের বেদনা ;
প্রশান্ত সে হৃদয়ের মাঝে,
প্রতি হিংসা লভিলা চেতনা।
সে মুহূর্ত্তে উঠিল কাঁপিয়া,
অসুরের মদ-মত্ত-ভুবন ;
নিয়তি হাসিছে উচ্চ হাসি ;
কি বিকট ভীষণ দর্শন !

(৪)

একতায় বদ্ধ দেবদল
শরীরে ফুটিল তেজোরাশি ;
জনমিলা মহাশক্তি তাহে,
আসুরিক বিধানে সন্ত্রাসি'।
শূলপাণি শূল দিলা তাঁরে,
বিষ্ণু দিলা চক্র আপনার ;
শঙ্খ, শক্তি, শর, শরাসন,
বজ্র, দণ্ড, দিলা যে যাহার।

ক্ষীরোদধি দিলেন তাঁহারে,
দিব্য বস্ত্র, মুকুট, কুণ্ডল ;
রত্ন সহ সিংহ দিলা আনি'
বাহনের তরে হিমাচল।
পশুবল কত তুচ্ছ ভাবি'
হাসিলেন দেবী অট্টহাসি ;
হাস্তনাদে ব্যাপ্ত দশদিক
প্রতিধ্বনি ধায় ব্যোমে ভাসি'।
মদ-মত্ত অসুরের প্রাণ
সে হাসিতে উঠিল কাঁপিয়া ;
সুসজ্জিত সৈন্যগণে ল'য়ে
যুদ্ধহেতু জুটিল আসিয়া।
দশভূজা ফেলিবি বাহিনী,
শূলে কৈলা বক্ষ বিদারণ ;
নিরস্ত্রি হাসিছে উচ্চ হাসি,
কি বিকট ভীষণ দর্শন !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রলেখা।

(১)

বাল্যকাল হইতেই শ্রীমান্ শিশিরকুমার অতিশয় স্ত্রী-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের চৌদ্দপুরুষ হইতে ছাপায় পুরুষের মধ্যে একটি লোকও যে উক্ত জাতির উপর কোনরূপ বিতৃষ্ণ ভাব মনের মধ্যে পোষণ করিয়া গিয়াছেন—এমন প্রমাণ বংশাবলীর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিশিরের পূজ্যপাদ পিতামহ-প্রপিতামহগণ যে কৌলীন্যের দোহাই দিয়া নারীর প্রতি একটু বেশী রূপেই পক্ষপাত দেখাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন আজও সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেই বংশের একমাত্র বংশধর হইয়া তাহার এ রমণীবিদ্বিষ্টতায় আত্মীয় বন্ধুরা নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। মাতা দয়াময়ী কালীবাড়ী ষোড়া পাঁঠা ও সিদ্ধেশ্বরীতলায় যুক চিরিয়া রক্ত বলিদানের মানত করিয়াও পুত্রের দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শিশিরের ষোল বৎসর বয়স হইতে বিবাহের উদ্যোগ আয়ত্ত হইয়া তেইশ বৎসরও যখন অতর্কিতভাবে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, তখনও নববধূ গৃহে আসিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের তৃষ্ণাতুর নয়ন সম্মুখে এই ছেলেটি লেখা পড়া করিয়া হাসিয়া খেলিয়া দিব্য দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। পুত্রের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য মার আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মায়ের অনুযোগ অভিযোগ ও অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া পুত্র, বন্ধুমহলে নিজের অভিমত প্রকাশ করিল। সে প্রাণান্তেও স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না; ভালবাসিতে পারিবে না। শুধু মাকে সুখী করিবার জন্য সে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু পাত্রী লোলকপরা অশ্রুভরা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা বালিকা হইলে চলিবে না। যে ছেলেনার ন্যায় রূপসী হইবে; শেলী বায়রণ্ যাহার কণ্ঠে বিরাজ করিবে—যাহার গতি উদ্যান বসন্ত পবনের মত চঞ্চল ও মনোময়, যাহার হাসিতে চন্দ্রকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, তেমনি একটি নবযুবতী পাইলে তবেই সে তাহার মহাবহিমান্বিত স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে; নচেৎ নহে।" ইংরাজিবিদীশ পুত্রের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনিয়া মা ইংরাজিবিদ্যার "দুখে আগুন" এই অভিসম্পাত দিয়া নীরব চক্ষু মুছিলেন।

(২)

বাঙ্গালীর আশাতীত চাকরী ডিপুটিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শিশির যখন 'বার গ্রামের তের নদীর জল পান' করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আর শিশিরের শুভার্থী বন্ধুবর্গ ঘরের কোণে তাম্রকূট সেবনে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। মাসিক আড়াই শত টাকা উপার্জ্জনের শূন্য গৃহের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রোষিতপুত্রা পতিহীনা দয়াময়ীর গৃহটি গ্রামের বৃদ্ধ পরামর্শদাতাদের কলধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। পুত্রের বিবাহে উদাসীন মাতা যে অচিরাৎ খাস বিলাতি মেমসাহেবের শ্বশ্রূর পদে আধরূঢ় হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অনন্ত নরকের সুব্যবস্থা করিবেন; একথা বলিয়া স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ে ভীতি ও ভাবনার সৃষ্টি করিতেও কেহ পশ্চাৎপদ হইলেন না। এতগুলি আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় দয়াময়ী পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিনব্যাপী অনেক যুক্তিতর্কের পর বাড়ীতে শুভ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মার সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ দিয়া শিশিরের নিকট টেলিগ্রামও প্রেরিত হইল। যথাসময়ে চিন্তামগ্ন উৎকণ্ঠিত শিশির বাড়ী আসিয়া যাহা দেখিল ও শুনিল—তাহাতে তাহার ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই দিনই গোধূলিলগ্নে বিবাহ। কাজেই বিবাহ স্থগিত করিবার কোন উপায় শিশিরের হাকিমী বুদ্ধিতে যোগাইল না। নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের মধ্যে মাকে নিক্ষেপ করিয়া আশু বিপদের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছাও তাহাকে প্রণোদিত করিতে পারিল না। সে তুষের আগুনের মত গুমরাইয়া গুমরাইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "আপাততঃ সে মার ইচ্ছাই পূর্ণ করিবে; বিবাহান্তে স্ত্রীর মুখের দিকে না চাহিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মার ছলনার প্রতিশোধ লইবে" কিন্তু শুভদৃষ্টির পর হইতে শিশিরকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল। চির-স্ত্রীবিদ্বেষী শিশির চতুর্দ্দশী রমার নোলক-শোভিত চন্দনচর্চ্চিত লজ্জাবনত সুন্দর শান্ত মুখখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে মুখ এত কোমল, এতমধুর, স্নিগ্ধ লাবণ্যে মণ্ডিত—একবার দেখিয়া তৃপ্তি হয় না। তাহার কর্ণাভরণের ঈষদ্ দোলন, নোলকের মৃদু সঞ্চালন, বিশাল নয়নের সলজ্জ আনত বিলোকন, মধুনিষ্যন্দী কণ্ঠের অর্দ্ধবিজড়িত সম্ভাষণ অবগুণ্ঠনাকর্ষণের বিচিত্র ভঙ্গীটুকু শিশিরের শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল। সে বিস্মিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল—মানবদেহে এ নবীন সৌন্দর্য্যের মোহন সমাবেশ ভগবান্ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? সে সভয়ে উপেক্ষার সহিত যাহা হইতে এত

কাল দূরে দূরে কাটাইতে চাহিয়াছিল, তাহারই মধ্যে এ অমৃতপ্রস্রবণ অনুভব করিয়া শিশির আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"পাকস্পর্শ" "অষ্টমঙ্গল" প্রভৃতি বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হইবার পর কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্ব্বদিন শিশির সঙ্কোচের সহিত মাকে গিয়া বলিল—"বউকে আমি নিয়ে যেতে চাই? এখন ওর শিক্ষার সময়। আমি বাড়ীতে মাষ্টার রেখে ওর লেখা পড়ার ব্যবস্থা করব"। আত্মীয় বান্ধবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামীর সহিত সুদূর বিদেশে যাইবার কথা শুনিয়াই হউক আর মাষ্টারের নিকট নূতন করিয়া লেখা পড়া শিখিবার আশঙ্কাতেই হউক, রমা শ্বাশুড়ীর কোলে মুখ লুকাইয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে কহিল "আমি তোমার কাছ থেকে কোথায়ও যাব না মা"। মা সস্নেহে বধূর মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া পুত্রকে কহিলেন—"এখনই অতদূরে একটি বউকে পাঠাতে পারব না, যার বাপ টোলের বড় অধ্যাপক, তাঁর মেয়েকে লেখা পড়া শিখাবার জন্যে ভাবতে হবে না। আর গৃহস্থ ঘরের বউকে শুধু লেখাপড়া শেখানই কাজ নয়। রান্না বান্না কাজ কর্ম্ম সবই যে শিখতে হ'বে।" মার কথায় নিরাপচিত্তে শুভহৃদয় শিশির কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল।

(৩)

মানুষ সংসারে যে রসের আস্বাদ হইতে একেবারেই বঞ্চিত থাকে, তাহাকে অল্পে অল্পে সেই রসের আস্বাদ গ্রহণ না করাইয়া হঠাৎ রসের সমুদ্র ছাড়িয়া দিলে সে যেমন ঐকান্তিক আগ্রহে সেই রসসাগরে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, নারী-বিদ্বেষী শিশিরের অবস্থাও তেমনি হইয়া দাঁড়াইল। তাহার এখন আর কাজ কর্ম্মে তেমন উৎসাহ নাই। নিভৃতে বসিলেই মনে পড়ে:—পল্লীর শান্ত শীতল তরুশ্রেণীবেষ্টিত তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে বিবাহসভা; সেই সান্ধ্য সুষমাভূষিত চন্দ্র-তারা-খচিত কৌমুদীস্নাত নীলাম্বরতলে কিশোরী রমার প্রস্ফুটিত পদ্মসন্নিভ ব্রীড়াবিজড়িত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় সুন্দর মুখখানি; আর যুগল নয়নের উৎসুক্য পূর্ণ আনত স্নিগ্ধ স্থির দৃষ্টি। আরও মনে পড়ে—সুষুপ্ত গভীর রজনীর নীরবতার মধ্যে দূরাগত বীণাধ্বনিবৎ রমার অর্দ্ধস্ফুট অমিয় মধুর কথাগুলি।

ডিপুটীগিরি চাকরীতে ছুটীর বড়ই অভাব। এক বৎসরে যে কয়েকটী দিন ছুটী পাওনা ছিল, তাহাও বিবাহব্যাপারেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই বেচারী শিশির নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অগত্যা কাগজের বুকে—

'আমার প্রিয়ার মুখ, চাঁদের সমতুল,
হাসিতে ঝ'রিয়া পড়ে রাশি রাশি কোটা ফুল"। ইত্যাদি—

কবিতা লিখিয়া কোনরূপে মনমরা হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তা'র বড় সাধ হইত, খুব লম্বা চওড়া করিয়া একখানি প্রেমলিপি প্রিয়তমার নিকট লিখিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি কথঞ্চিৎ হাল্‌কা করিয়া ফেলে; কিন্তু সাহস হইত না। তাহার প্রিয়ার বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে শিশিরের মনের মধ্যে একটা খট্‌কা ছিল। বিবাহের পর কয়েকটি রজনীর স্বল্প আলাপের মধ্যে স্ত্রীর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় শিশির ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সাধারণের নিকট তাঁহার যশঃসূর্য্য এখনও অস্তোন্মুখ হয় নাই, পরাজয়ের জল-জীয়ন্ত নিদর্শনও প্রকাশ পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বর্ণজ্ঞানশূন্যা মূর্খ স্ত্রী যদি তাঁহার প্রেম পত্রের মর্ম্ম নিজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অপরের হাতে অর্পণ করে, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার যে ঠাঁই থাকিবে না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শিশির প্রেমপত্র লিখিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। কিন্তু বেশী দিন বিরহী শিশিরকে বিরহবেদনা উপভোগ করিতে হইল না। হঠাৎ বাড়ী হইতে খবর আসিল "তোমার মাতা অত্যন্ত কাতর অবিলম্বে চলিয়া এস।" এবার মার অসুস্থ সংবাদে শিশির ততটা বিচলিত হইল না, কারণ মার কাতরতার সংবাদের ফল একবার সে হাতে হাতেই লাভ করিয়াছে। সে কুলীনের ছেলে লক্ষ্মী-লাভের পর এবার ত সরস্বতীলাভের সম্ভাবনা নহে? মনে মনে কৌতূহলী হইয়া শিশির বাড়ী আসিয়া দেখিল, সত্যই মা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা। রমার অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা—শিশিরের চেষ্টা যত্ন, কিছুতেই মনোরমাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখা গেল না। একদিন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণপাখী বিমানপথে উড়িয়া গেল। মাতৃবিয়োগ-জনিত শোক শিশিরের বক্ষে বড়ই বিষম হইয়া বাজিল; কিন্তু ভূলুণ্ঠিতা রমার "মা" "মা" রবে আকুল আর্ত্তনাদে নিজের হৃদয়ব্যথা ভুলিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ হইতে হইল। যাহারা ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া মনকে প্রশস্ত করিতে পারে নাই, একটি বৎসরের ঘনিষ্ঠতায় পরের মাকে তাহারা এমন করিয়া যে ভাল বাসিতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া শিশির বিস্মিত হইল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল "কেঁদনা রমা, মা যেমন তোমায় স্নেহ যত্ন করতেন, আমিও তাই কোরব"।

(৪)

মায়ের শ্রাদ্ধ শান্তি মিটাইয়া শিশির রমাকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রস্থান করিল। দুই দিন না যাইতে যাইতে তাহার বিশৃঙ্খল ঘর কন্নার মধ্যে এমন একটি লক্ষ্মী-শ্রী ফুটিয়া উঠিল—শিশির তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। রান্না হইতে চায়ের পেয়ালাটিতে—মায় পান সাজার মধ্যেও নূতন একটি আস্বাদ অনুভব করিয়া সে তৃপ্তিপূর্ণহৃদয়ে ভাবিত—"আহা এমন গুণবতী স্ত্রী, লেখাপড়া শিখিয়া ইহার মন যদি উদারতা ও প্রশস্ততা লাভ করিবার অবসর পাইত, তাহা হইলে কত আনন্দের কারণ হইতে পারিত। সেদিন নিভৃতে স্ত্রীকে নিকটে বসাইয়া শিশির স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—"রমা, আমার বড় সাধ হয় তুমি লেখাপড়া শেখো। খুব ভাল ক'রে ইংরাজি শিখ্‌লে দেখ্‌তে পাবে, তার ভিতর কত আনন্দ কত সৌন্দর্য্য লুকান আছে—তাতে মন কত উন্নত হ'বে"। রমা সলজ্জ হাসি হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল "তুমি আমায় যা' শিখ্‌তে বল্‌বে তাই শিখ্‌বো; কিন্তু মাষ্টারের কাছে পড়তে পারবো না। তোমার কাছেই পড়ব। আমার সংস্কৃত খুব ভাল লাগে, মনে হয় ওর ভিতর যা' আছে, আর কোথায়ও বুঝি তা নেই"। স্ত্রীর কথায় শিশির একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিল মাত্র। কিন্তু কয়েক দিনের পর কোন কারণ বশতঃ স্ত্রীর বাক্স খুলিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। "কালিদাসের" "বাণভট্টের" ও "ভবভূতির" বাছা বাছা সংস্কৃত কাব্যগুলি রমার বাক্সের অভ্যন্তরে সযত্নে সজ্জিত রহিয়াছে। এক কলম বাংলা লিখিতে বসিলে সাতবার অভিধান না খুলিয়া যে কথার ভাবার্থ শিশিরের উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবার পথ পায় না, সেই বড় বড় শব্দ লইয়া সংস্কৃত-বাংলা-সংমিশ্রিত কত গদ্য পদ্য রমা রচনা করিয়াছে। শিশির যাহাকে বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ভাবিয়া রাখিয়াছিল—আজ তাহার এ গুপ্ত বিদ্যার পরিচয় পাইয়া সে পুলকিতান্তরে মায়ের কথা স্মরণ করিল—"যার বাপ টোলের বড় অধ্যাপক"—ইত্যাদি।

(৫)

একটি ডাকাতি মোকদ্দমার তদন্ত করিবার জন্য শিশিরকে মফঃস্বলে যাইতে হইল। দশ বার দিন পর সে ফিরিয়া আসিলে তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখখানিতে চিন্তার ছায়াপাত দেখিয়া রমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে আশঙ্কার ঝটিকা বহিল। সে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? না—মনটাই

খারাপ হ'য়েছে ? আমায় বল্‌বে না ? রমার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া শিশির যাহা বলিল, স্বামীর চরিত্রের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাসবতী সরলহৃদয়া রমা প্রথমে তাহা উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও সেটা উপহাস হইয়া দাঁড়াইল না। শিশির অনুতাপজীর্ণ সকরুণকণ্ঠে যা' বলিল, তাহার সারমর্ম্ম—"সে মফস্বলে তাহার চিত্রকর বন্ধু যতীনদার বাড়ী গিয়া তাঁহার অনূঢ়া ভগিনীটিকে দেখিয়া হৃদয়খানি হারাইয়া আসিয়াছে। সে বহু যত্ন বহু চেষ্টায় কিশোরী চিত্রলেখাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারিতেছে না। কয়েক দিনের দর্শনেই শিশিরের হৃদয়ে পরতে পরতে চিত্রলেখার অবয়ব গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে না পাইলে শিশিরের সবই বৃথা—সবই তুচ্ছ। হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও সে চিত্রলেখাকে হৃদয় হইতে মুছিতে পারিবে না। তাহাকে এ জীবনে না পাইলে সে পর জীবনের জন্য তাহারই চিন্তা করিতে করিতে নিদাঘে শিশির বিন্দুর মত শুকাইয়া যাইবে।" শিশিরের কথা শুনিয়া প্রথমে রমা ভাবিয়াছিল—স্বামী বুঝি তাহার মনের প্রশস্ততার পরীক্ষা লইতেছেন। কিন্তু পরে বুঝিল, সত্যই তাহার কপাল পুড়িয়াছে। তাহার সৌভাগ্যসূর্য্য মেঘাবৃত হইয়াছে। রমা অনেক ভাবিল,—নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া অনেক অশ্রু বর্ষণ করিল। দেবতার উদ্দেশে হৃদয়ের অজস্র নীরব নিবেদন প্রেরণ করিল। কয়েক দিনব্যাপী ভাবনা চিন্তার পর তাহার মন অনেকটা প্রশান্ত হইল। সে মনে মনে স্থির করিল—স্বামীর সুখের জন্য—স্বামীর তৃপ্তির জন্য সে চিত্রলেখাকে বিবাহ করিতে স্বামীকে সম্মতি দিবে। বলিবে—"প্রভু আমার, তোমার সুখেই আমার সুখ,—তোমার শান্তিতেই আমার শান্তি ; আমি কোন ছার যে,আমার জন্যই, তোমার বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। আমি তোমাকে সুখী করিব। আমার জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়াও তোমার সাধ পূর্ণ করিব।" স্বর্গীয় হাসিতে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া ধীর শান্ত কণ্ঠে রমা যখন শিশিরকে চিত্রলেখার সহিত বিবাহের অনুমতি প্রদান করিল এবং ইহাতে একটুও দুঃখিত হইবে না বলিল,—তাহার কথা শুনিয়া শিশির বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। রক্ত মাংসে গড়া ক্ষুদ্র মানুষ কি এ সংসারে এতটা স্বার্থ—শুধু একজনের সুখের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারে ? শিশির শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূরিত হৃদয়ে ক্ষণকাল মহিমময়ী দেবী প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া স্ত্রীর হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কোমলকণ্ঠে কহিল "রমা, তুমি দেবী ; আমি আজ চিত্রলেখাকে ভাল বেসেছি বটে ; কিন্তু তোমার এ স্বার্থত্যাগের জন্য তোমাকেও একদিন পুরস্কার দেব"।

(৬)

ছোট বোনটির বিবাহ উপলক্ষে রমার পিতা যখন তাহাকে লইতে আসিলেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও রমা পিতাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত যাতনারাশি অন্তরের অন্তস্তলে লুকাইয়া তাহাকে হাসি মুখেই বোনের বিবাহে যাইতে হইল। বিদায়ের অনতি পূর্ব্বে স্বামীর পায়ে প্রণতা হইয়া রমা অশ্রু-পূরিত কণ্ঠে কহিল—"তুমি চিত্রলেখাকে পেয়ে আমায় একেবারেই ভুলে যেয়ো না। একটু মনে ক'রে আবার এসো"। রমা আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। বার বার করিয়া অশ্রুবিন্দু তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আদরে স্ত্রীর অশ্রু মুছাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শিশির তাহাকে বিদায় করিল।

বোনের বিবাহব্যাপার মিটিয়া গেল, তবুও স্বামীর নিকট হইতে একখানা চিঠি আসিল না—বা একটু আহ্বানবাণী শুনিতে পাইল না; ইহাতে রমা মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর ত ভাল আছে? তিনি কি চিত্র-লেখার চিন্তায় সত্যই রমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন? কিন্তু হায়, রমা যে এখনও লক্ষ যোজন দূরে বসিয়া সূর্য্যমুখী ফুলের মতনই তাহার প্রিয়তমের আশাপথ চাহিয়া উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার সুখের জন্য রমা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে,—যাঁহার হাসি মুখের জন্য রমা স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে,—তিনি যদি রমাকে একবারও মনে না করেন—তাহা হইলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

সেদিন অপরাহ্ণে রমার বাঞ্ছিত দ্রব্য মিলিল। নিভৃতে বসিয়া কম্পিতবক্ষে রমা স্বামীর পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। শিশির লিখিয়াছে—"আমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী রমা, তোমার ইচ্ছায় ও আদেশে আমি চিত্রলেখাকে বিবাহ করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। এই সব গোল মালে যথাসময় তোমাকে চিঠি লেখা হইয়া উঠে নাই। রাগ ক'রোনা লক্ষ্মী? তুমি কাছে না থাকিলে আমার সব শূন্য, সব বৃথা। চিত্রলেখা আমার গৃহের আনন্দরূপিণী হইলেও তুমিই আমার হৃদয়ের মন্ত্র। তুমি সত্বর চলিয়া এস। তোমাকে অবিলম্বে রাখিয়া যাইবার কথা তোমার দাদাকেও লিখিলাম। ইতি একান্ত তোমারই শিশির"।

রমা চিঠিখানা বার বার পাঠ করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে তাহার দুইটি নয়ন হইতে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামীর এ অমৃতসাগরে এত স্নেহ—এত সোহাগ-মাখানো চিঠি খানা,—হায়, চিত্র-লেখার কথা কেন হলাহল ঢালিয়া দি[illegible]

রাত্রে আহারের পূর্ব্বে অসময় কন্যাকে শয্যায় শয়ানা দেখিয়া মা ভাবিলেন—মেয়ে বুঝি মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়াছে। স্নেহময়ী মার চক্ষেও জল আসিল। তিনি কন্যার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন "সেখানে যেতে হ'বে ব'লে দুঃখ কি মা, সেই যে তোমার আপন ঘর-সংসার—আমরা আর ক'দিন"?

(৭)

নিজের চিরন্তন ঘর সংসারের মধ্যে রমা আজ শঙ্কিত-কম্পিত-চরণে প্রবেশ করিয়া দেখিল—সম্মুখেই স্বামী। তাহার হৃদয় ও মন বিষম বেদনাভারে নিপীড়িত হইয়া উঠিল। ইনি সেই স্বামী এক চন্দ্রোজ্জ্বল সন্ধ্যায় মুগ্ধা কিশোরী যাঁহাকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া মনে মনে যাঁহাকে আপনার—একমাত্র অতি আপনার—জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার ভাবিয়া যাঁহার তরুণ মূর্ত্তি হৃদয়ের নিভৃত আবাসে অঙ্কিত করিয়াছিল;—তখন কে জানিত—তাহার কল্পনার স্বর্গ, ধূলি-ধূসরিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে? কে জানিত—তাহার হাস্যোজ্জ্বল বদন মলিনতায় ঢাকিয়া ফেলিবে?

রমার চিন্তাপূর্ণ ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া শিশির কহিল "এমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, রমা? এস, আমার ঘরে এস"। রমা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল—"সে চিত্রলেখা কোথায়?" "চিত্রলেখা আমার ঘরেই আছে। সেখানে গেলে তাকে দেখ্‌তে পাবে" বলিয়া শিশির পুষ্পস্তবকের মতন সুকোমল হাতখানা ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইল। বেপথুমান অসংযতবক্ষে স্বামীর পশ্চাৎ তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া রমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শিশির দুই হাতে তাহার নত মুখখানি তুলিয়া বলিল "চেয়ে দেখ রমা, চিত্র-লেখা এসেছে—এই তোমার সতীন"। রমা চক্ষু তুলিয়া বিস্ময়বিজড়িত নয়নে দেখিল—তাহার পিছনের দেয়ালে রক্ষিত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর অপূর্ব্ব তৈল চিত্র। সে ছবিখানি এতই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর যে, জীবন্ত বলিয়া উপলব্ধি হয়। সে যেন রমার পানে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছিল। একখানি সুনীল বসনে আলেখ্যের সুকুমার তনু বেষ্টিত রহিয়াছে। ভ্রমরকৃষ্ণকেশকলাপ গুচ্ছে গুচ্ছে এলায়িত হইয়া বক্ষস্থল ও বদনমণ্ডলের কিয়দংশ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। একটী পুষ্পিত বৃক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া—পুষ্প চয়ন করিতে যাইয়া তরুণী তাহার বঙ্কিম গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছে। মাথার উপরে প্রভাতের নির্ম্মল আকাশে সবে প্রথম

অরুণোদয়ের সুবর্ণরেখা শাখাপত্রনিবদ্ধ তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। দুইখানি পদপল্লব বক্ষে ধরিয়া শ্যামল তৃণদল কোমল আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে। অদূরে তরঙ্গময়ী নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া ধীর মন্থরগমনে বহিয়া যাইতেছে। বিশ্ব যেন পুলকিত অন্তরে এই নিষ্পন্দ সুন্দরীর ধ্যানমূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া আছে।

রমার বিমুগ্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শিশির মৃদুস্বরে বলিল "এই চিত্রলেখা, একে চিন্‌তে পেরেছ রমা ?" রমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—চিনিতে পারে নাই। শিশির হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বলিল 'তুমি এমন বোকা ; চিন্‌তে পার নাই ? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ"। রমা মুগ্ধহৃদয়ে আবার সেই ভুবনমোহিনীর আলেখ্যটির দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা তাহার বহুদিনের বিস্মৃত কথার একটী আভাস হৃদয়কোণে জাগিয়া উঠিল। বিবাহের অনতিপূর্ব্বে একদিন সে প্রভাতে স্নান করিয়া সঙ্গিনীদের সহিত নদীর সন্নিকটে বাগানে মায়ের শিবপূজার ফুল তুলিতে গিয়াছিল। আসন্ন বিবাহের কথা লইয়া সখীরা তাহাকে উপহাস করায় সে অতিষ্ঠ হইয়া পালাইতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল—বৃক্ষের অন্তরালে "ক্যামেরা" লইয়া একটি অপরিচিত যুবক দাঁড়াইয়া আছে। পরে তাহার পরিচয়ও পাইয়াছিল,—তিনি তাহার ভাবী স্বামীরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। "বড় চিত্রকর" বলিয়া তাঁহার খ্যাতির জন্যই গ্রামের জমীদারতনয়ার চিত্র প্রস্তুত করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিই কি রমার অজ্ঞাতসারে তাহার ছবি লইয়া এ উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন ? কিন্তু এ কি রমার ছবি ? না—না, সে এত সুন্দর হইবে কেমন করিয়া ? এ তাহার ছবি নয় ? শিশির স্নেহবিগলিতকণ্ঠে কহিল "তোমায় আর ভাবতে হ'বে না রমা, এ ছবি তোমারই। যতীনদা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'বে শুনেই গোপনে এ ছবি তুলে নিয়েছিলেন। অনেক দিন ধ'রে অনেক পরিশ্রমের পর ক'দিন হ'ল এটা শেষ ক'রে দিয়েছেন। রমা, তুমিই জয় লাভ করেছ। স্ত্রী জাতির উপর আমার সন্দেহ ছিল,—তারা বুঝি নিজের স্বার্থ ভুলে ভাল বাস্‌তে জানে না ; এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, "এ অধঃপতিত দেশের এখনও তোমরাই গৌরবের জিনিস। তোমরাই দেবী !" শিশির দুই বাহু মেলিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া তাহার ললাটে একটি স্নেহ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া কহিল—"রমা, চিত্রলেখা আমার, আজ তোমার এই পুরস্কার"।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

হে মোর প্রিয়।

তুমি নিদাঘের মধু-প্রভাতের রবি-কিরণে প্রকাশ
হে মোর প্রিয়!
তুমি শ্রাবণের ঘন জলদের আলে লুকায়ে র'য়েছো
হে মোর প্রিয়।
তুমি শরতের নীল-আকাশ ব্যাপিয়া ছড়ায়ে র'য়েছো
হে মোর প্রিয়॥
তুমি শস্য-শ্যামলা ক্ষেত্রের বুকে শয়ান নিয়েছ
হে মোর প্রিয়॥
তুমি ফাগুনের মধু-উজল শোভাতে আপনি বিকাশ
হে মোর প্রিয়।
তুমি বসন্ত-রাতের কোটী ফুলবুকে লুকায়ে হাসিছ
হে মোর প্রিয়।
তুমি প্রভাতের মৃদু-সমীরণ সাথে ভাসিয়া ভ্রমিছ
হে মোর প্রিয়॥
তুমি সন্ধ্যায় ঘন-কনকাঞ্চলে ফুটিয়া উঠিছ
হে মোর প্রিয়।
তুমি নিশার শুভ্র জ্যোছনার মাঝে উজলি ঝলক
হে মোর প্রিয়॥
তুমি আঁধারের প্রতি পরদে পরদে আলোক ফুটাও
হে মোর প্রিয়।
তুমি বারিধির প্রতি ঊর্ম্মি ঘায়েতে হর্ষে নাচিছ
হে মোর প্রিয়।
তুমি কাননের প্রতি নিভৃতকুঞ্জে নীরবে বিরাজ
হে মোর প্রিয়॥
তুমি তটিনীর বন কলতানে ঘিরে আপনি গাহিছ
হে মোর প্রিয়।
তুমি ঘনগর্জ্জন-মুখরিত বনে অভয় বানিছ
হে মোর প্রিয়॥
তুমি চিন্তাব্যাকুল মানবহৃদয়ে শান্তি প্রকাশ
হে মোর প্রিয়।
তুমি আকাশে-ভুবনে-কুঞ্জ-কাননে সতত ভ্রমিছ
হে মোর প্রিয়।

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

সপত্নী।

—:•:—

মৌলিক।

খুঁজিয়া খুজিয়া মেয়ের বিয়ের বয়স পার হইয়া ১৫ বছর বয়সে পড়িল, তথাপি পাত্রের সন্ধান মিলিল না। যদি বা পাত্র মনোনীত হয়, তাহারা এত অধিক টাকা চায় যে, সরোজিনীর পিতার পক্ষে সেটা দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে; আর না হয়ত তাহারা ফিট গৌরবর্ণা, "সাকারা সুন্দরী" কন্যা চায়, শ্যামাঙ্গিনী সরোজিনীকে দেখিয়া অপছন্দ করিয়া ফিরিয়া যায়। পিতা মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই উঠিলেন, যতটা ঝাল পড়িতে লাগিল বেচারী নির্দ্দোষী কন্যার উপরে। কেন সে কন্যা হইয়া জন্মাইল? যদি বা কন্যা হইয়া জন্মাইল, সুন্দরী হইয়া জন্মাইল না কেন? অবুঝ চিন্তাক্লিষ্ট পিতামাতাকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, মেয়ে হইয়া জন্মান, বা সাকারা সুন্দরী না হয়ে জন্মান, দুটোর মধ্যে একটা কাজও তার পরামর্শ নিয়ে হয়নি?

সে যে নিতান্ত কুৎসিতা ছিল, তাহা নহে। ডাগর ভাসা চক্ষুতে টিকোলো নাকেতে ছোট হাঁটী নিয়ে, মাফিকসই গড়নে তাহাকে নিখুত সুন্দরী না বলিলেও কেহ তা বলিয়া কুৎসিত বলতে পারিবেন না। সে যে "দেখতে মন্দ নয়" এটা স্বীকার করিতেই হইবে।

মাতার নিকটে বিনা কারণে সামান্য ত্রুটীতেও তিরস্কৃত হইয়া, পিতার নিকটে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত, ভাইভগ্নীগণের নিকটে উপহসিত হইয়া সে কোন কথার উত্তর করিত না। তাহার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। শুধু একটী বৃদ্ধা দিদিমা ছিলেন, তিনি মাতার দূর-সম্পর্কীয়া খুড়ী হইতেন। তিনিই বালিকার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, এবং কথায় ও কার্য্যে আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহার তরুণ হৃদয়ে যে দুঃখের দাগ পড়িতেছিল, সেটা মুছিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন।

তাহাদের বাড়ীখানি একতলা কোটা বাড়ী। ইটের পাঁচিল ঘেরা। সম্মুখেই একটা আম কাঁটালের বাগান। বাম পাশে ঠাকুরবাড়ী। সরোজিনী

অন্য বিবাহের ক'নের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হইয়াছিল। সে যে পিতা মাতার জ্বালা ত বুঝিতনা এমন নহে; তবে মানুষে নাকি পরের চেয়ে নিজের আঘাতটা বরাবরই বেশী করিয়া ধরে, তাই সরোজিনী তাহার পিতামাতার নিকটে তিরস্কৃত হইলে, সেই ঠাকুর মন্দিরের দ্বারে গিয়া মাথা খুঁড়িত। ঠাকুর এইবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহাদের গ্রাম হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে দমদমা বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। পাত্র সেই গ্রামের জমিদার স্বয়ং। পাত্র অতি সুন্দরদর্শন বি-এ ফেল। পড়িবার বিশেষ আবশ্যক না থাকায় ঘরে থাকিয়া জমিদারী পরিদর্শন করিতেছেন। পাত্র নিজে কন্যা দেখিতে আসিলেন। কেননা বরে মাতা পিতা বা অপর অভিভাবক কেহ নাই। পাত্রের রূপ দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া, পাড়ার লোকেরা অবধি মোহিত হইয়া গেল।

টাকা কড়ি কিছু চাই না, শুধু কন্যাটী চাই। সরোজিনীর পিতা আনন্দে কি করিবেন: ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া বিবাহের দিন স্থির করিতে পুরোহিত ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এমন সময় ভাবী জামাতার সঙ্গে যে বন্ধুটী আসিয়াছিল, সে একটী কথা বলিল, যাহাতে পিতার সমস্ত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। পাত্র বিবাহিত; প্রথমা পত্নী ধনবানের দুহিতা ও পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা; তিনি প্রায় সকল সময়ই পিত্রালয়ে বাস করেন। তিনি পোষাকী, এজন্য একটী আটপৌরে পত্নীর আবশ্যক। তা ছাড়া এবারে তিনি ঝগড়া করিয়া বাপের বাড়ী গিয়াছেন। স্বামীও বলিয়াছেন, তোমার মুখ দেখিতে চাহি না, আমি আবার বিবাহ করিব। তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, বিবাহ করিও।

ভাবী জামাতা রাধাবল্লভের দ্বারে গিয়া শপথ করিলেন—আমি আর সে স্ত্রীর মুখ দেখিব না। গ্রামের অন্যান্য সমুদয় ভদ্রলোকের সম্মুখে, সরোজিনীকে মাথায় করিয়া রাখিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। তার পর কোথায় রাখিলেন, সেটা পরে দ্রষ্টব্য।

বাসরে বরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পুরস্ত্রীগণ মোহিত হইয়া গেল। সকলেই বলিল, সরোজিনীর মা অনেক পুণ্য করিয়া অমন জামাই পাইয়াছেন। আর সরো-জিনী! বসন্তসমাগমে শুষ্কতরু যেমন নবমুকুলিত হইয়া উঠে, তাহার শুষ্ক তৃষিত প্রাণ তেমনি স্বামী প্রেমের আশায় পুনরায় বয়সোপযোগী তরুণশ্রী ধারণ করিল। শত মুখে স্বামীর সুখ্যাতি শুনিয়া, হর্ষে ও গর্ব্বে তাহার প্রাণ পূর্ণ

হইয়া উঠিল। হে রাধাবল্লভ! তুমি আমাকে আমার স্বামীর উপযুক্ত করিয়া দিও।

আমি রূপহীনা, গুণহীনা, আমি কি করে তাঁর মনোরঞ্জন করব, তবে তাঁকে পূজা করতে পারবো। তাঁর সংসার দেখতে পারবো। আর তাঁর সমস্ত কাজ নিজের হাতে করব। স্বামীর পরম সুন্দর শান্তোজ্জ্বল মুখপানে চাহিয়া, তাহার তখনিই ফুলশয্যা রাত্রি আসুক মনে হইতেছিল। কি সুন্দর পা'দুখানি। কোলে নিয়ে টিপিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল। স্বামী যাই অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেছিলেন, সে অমনি অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সতৃষ্ণ নয়নে স্বামীর মুখ দেখিতেছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়সের পর হইতে বর খুঁজিয়া না পাওয়ার দরুণ অদ্যাবধি সে ক্রমাগত পিতামাতা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেরই নিকটে অনাদর পাইয়া আসিয়াছে। স্বামীর নিকটে আদর ও স্নেহ প্রাপ্তির আশায় ও আনন্দে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সমবয়স্কারা এক সে ব্যতীত সকলেই বিবাহিত। সে তাহাদের সমস্ত স্বামীর কথা উদগ্রীব হইয়া শুনিত।

২

শুভক্ষণে না অশুভক্ষণে, বিবাহ হইয়া গেল। বরবধূ বিদায়ের সময় মাতা-পিতা কন্যার মাথার উপর হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বিদায়ের কালে, আদরিণী কন্যাকে অনর্থক কত অনাদর করিয়াছেন, মনে করিয়া তাঁহাদের নেত্র অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সরোজিনীর পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কন্যাকে বলিয়া দিলেন, মা সুখে দুঃখে বিপদে আপদে আজ, যাহার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিলাম, সর্ব্বদা তাঁহার অনুগমন করিবে।

সরোজিনীকে সে কথা দ্বিতীয়বার বলিয়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিবাহরাত্র হইতেই সে স্বামীর চরণে আপনাকে বিকাইয়াছিল।

বর খুবই অল্পবয়স্ক। প্রথম পক্ষেরই মত। এজন্য অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের আগ্রহাতিশয্যে খুব বাজনা প্রভৃতি করিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন। বরবধূ যখন গিয়া স্বগ্রামে পৌঁছিলেন, তখন বেলা ১২টা প্রায় বাজিয়া গিয়াছে। বরবধূ গিয়া পিঁড়ীতে ও দুধে আলতার পাথরে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময় বাহির হইতে একখানি পাল্কি আসিয়া অন্দরার মুখে প্রবেশ করিল; সঙ্গে একজন দ্বারবান্। বর যেন অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সরোজিনী ঘোমটার অন্তরালে ইহাও লক্ষ্য করিল যে, পাল্কির অধিরোহিণী খুব

সুন্দরী। সে নামিয়া অন্য কথা কাহারও সহিত না কহিয়া বরাবর স্ত্রী-আচারের স্থানে গিয়া অতলোকের সম্মুখেই বরের হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া গেল। বরও বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন। বিবাহবেশে সজ্জিতা বধূ সেইখানে একা দাঁড়াইয়া রহিল। অনুভবে বুঝিল, ইনিই সপত্নী। যদি এখনো ইঁহার উপর এত ঝোঁক, ইত্যাদি নানা চিন্তায় প্রায় ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইবার পর, অনেক ডাকাডাকির পরে বর ত দর্শন দিলেন; বড় বড় চক্ষু তখনও জলে টল টল করিতেছে। তাড়াতাড়ি স্ত্রী-আচার সম্পাদন করিয়া স্বামী পুনরায় সপত্নীগৃহে গমন করিলেন। অনেকে পরামর্শ করিয়া তাহাকেও সেই ঘরে দিয়া আসিল। তাহারা বুঝিল না যে, আজীবন জ্বলিয়া মরিবেই, ভগবান্ যাহার জন্য অহোরাত্র জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ড সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে আজই এ আগুনে ফেলা কেন?

ক্রমে সহিয়া গেলে এ দৃশ্য চক্ষে পড়িলে ততটা নূতন ও বিষময় ঠেকিত না। ছায় মূঢ়া বালিকা! কাহার পূজার জন্য পুষ্প চন্দন নৈবেদ্য সাজাইয়া কাহাকে দেহমন্দিরে অধিষ্ঠান করাইয়া পবিত্র হইবে মনে করিয়াছিলে! সে কি পূজার যোগ্য! পূজার যোগ্য হইলে, নিজের ক্ষণিকের প্রতিশোধলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য, আজীবন কালের জন্য তোমার কুসুমসুকুমার তরুণ জীবনকে এ দুঃখের জ্বালা সহিবার জন্য বিবাহ করিত না।

সরোজিনী নিতান্ত বালিকা ছিল না। স্বামীর সপত্নীপ্রেম দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইল! সকলে তাহার মত সহিত পারিত কিনা জানিনা, কিন্তু তাহার স্বভাবের একটী প্রধান মাধুর্য্য ছিল, সেটী তাহার অসাধারণ সহ্য গুণ। সেজন্য অশেষ রকম যন্ত্রণা সহিয়াও সে মরে নাই; এবং মরে নাই বলিয়াই ভবিষ্যতে সুখী হইয়াছিল।

৩

স্বামীর নাম বিজয় গোপাল। সম্মুখে পূজা আগত। পূজার কাজ সারিয়া এবারে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন; প্রথমা পত্নী সরোজার সাধ, এজন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত। কি একটা প্রয়োজন হওয়াতে সরোজিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সরোজিনী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। একমাস পূর্ব্বে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, মাতার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে, মনে করিয়া বিজয়বাবু স্নেহ ও আদরের স্বরে ডাকিলেন, "সরোজিনী" সরোজিনী পদশব্দেই বুঝিয়াছিল স্বামী; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই উঠে নাই। এখন স্বামীর

কণ্ঠের স্নেহের স্বরে তাহার দুঃখ যেন দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল। সে খুব জোরেই কাঁদিয়া উঠিল। স্বামী নত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া খাটে বসাইলেন, তাহার পর নিজের কাপড় দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। স্বামীর হস্তস্পর্শে তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর যেন বিদ্যুতের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। এ রকম আদর তাহার ভাগ্যে কদাচ ঘটে না। তবে সমস্ত সংসার মাথায় করিয়া রাখিয়া, দাস দাসী প্রভৃতি সমানে চালাইয়া, সকলের আহার তত্ত্বাবধান করিয়া সে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বামী যে তাহার সহিত কোন মন্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে। তবে তাঁহার ব্যবহারটা যেন অনেকটা জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায়। গহনা, কাপড়, জিনিষ পত্র, সপত্নী ও তাহার সমতুল্যই হইত। সে ত তাহা চাহিত না। সে চাহিত স্বামী, কিশোরী স্ত্রী আর কোন্‌কালে স্বামীর নিকটে ভ্রাতৃস্নেহের প্রত্যাশা করে! সে নিজে যতটুকু সময় পাইত, স্বামীকে নিকটে পাইলেই তাঁহার সেবা করিত, সেটা অবশ্য ভগ্নীভাবে নহে—পত্নীভাবে। আহারের সময় বামুন সত্ত্বেও দুইবেলা স্বহস্তে রাঁধিয়া স্বামীর মনের মত করিয়া তাহাকে খাওয়ান, স্নানের সময় স্নানের উপকরণ সমস্ত স্বহস্তে গুছাইয়া দেওয়া, তাহার নিত্য কর্ম্ম ছিল।

সপত্নী বড় একটা ও সব চাহিত না। সে নিজের বেশবিন্যাস লইয়াই থাকিত; স্বামীর সবটুকু নিজে অধিকার করিয়া, নিতান্ত যেন দয়া করিয়াই স্বামিসেবার অধিকারটুকু সরোজিনীকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সরোজিনী তাহার এ সকল অভাবনীয় অন্যায় দুঃখের জন্য স্বামীকে দোষী করিত না। সে বলিত, তাহার অদৃষ্টই মন্দ। নতুবা এমনই বা ঘটিবে কেন? স্বামীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত।

আজ হঠাৎ স্বামীর নিকটে পত্নীর ন্যায় আদর পাইয়া তাহার যেন আনন্দে কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল। নিতান্ত চেষ্টা করিয়া কণ্ঠস্বরটাকে কোনরকমে বশে আনিয়া সে উত্তর করিল, তোমরা পশ্চিম যাবে আর আমায় এখানে একলা ফেলে যাবে, ঠিক করেছ কেন?

"এইজন্য এত দুঃখ, তা তুমি যদি যেতে চাও, দেখি একবার বড় বৌকে ব'লে, তার আবার মত হবে কিনা, তা ছাড়া তুমি গেলে সংসার দেখবে কে?

"বড়বৌ কি বলবে, তার মতামত না নিয়ে তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারনা কেন, তোমার কি নিজের একটা স্বতন্ত্র মতামত নেই? আর আমিও কি তোমার বিয়ে করা বৌ নয়!"

কিছু অপ্রতিভ হইয়া বিজয়বাবু উত্তর করিলেন, "না আমি সে কথা বলছিনে, তবে তুমি না হয় নাই বা গেলে এবারে; আসছে বারে তোমায় নিয়ে যাব নিশ্চয়।

হঠাৎ অতিমাত্র রাগিয়া উঠিয়া সরোজিনী বলিয়া উঠিল, তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে বলে? তা বেশ। তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি ব'লেছ। কিন্তু আমিত বিবাহিতা স্ত্রীর অধিকার একদিনের জন্যও পাইনি, এবং চাইও নি। কিন্তু তুমি নিজের কর্ত্তব্য আমার ওপরে কি করেছ, একদিনের জন্য কি তোমার মনে, একটা নির্দ্দোষী বালিকার ইহকালের সুখ নষ্ট করলাম বলে অনুতাপ হয় না! তুমি কি এতই নিষ্ঠুর, এতই পাষাণ! আমার রূপই নেই, কিন্তু আমি কি এতই কুৎসিত যে, তুমি আমায় ফেলে পালাবার চেষ্টা করছ? তোমার বড় বৌ সুন্দরী, কিন্তু আমিও ত বিয়ে করা বৌ।

সম্বদ্ধভাষিণী স্বভাবতঃ শান্তস্বভাবা সরোজিনীর নিকটে হঠাৎ এরূপে তিরস্কৃত হইয়া, এবং তিরস্কারগুলি, তাঁহার ন্যায্য পাওনা জানিয়া বিজয়বাবু রাগিয়া উঠিলেন; মানুষের স্বভাবই এই যে, নিজের দোষ অপরে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে, যে দোষটা দেখাইয়া দেয়, তাহারই উপর রাগটা গিয়া পড়ে। বিজয়বাবু বলিলেন, "তোমার কিসের অভাব রাখিয়াছি, যা বড় বৌ বা তোমার চেয়ে কি রাজার হালে আছে যে, তুমি তার পেতে হিংসা কর? সেও একদিনের জন্যও তোমার নাম উচ্চারণ করে না।

তুমি আমার রান্না কর, তা সেটা না করিলেই পার। এইবার থেকে রান্নাঘরের দিকে তুমি যাবে কি, তুমি আছ আর আমি আছি?

"উল্টা বুঝিলি রাম" শুনিয়া সরোজিনীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নিতান্ত কাতরভাবে কহিল, "নাগো না তা বলছিনা, আমার গহনা কাপড় বা পয়সা কিছুরই অভাব তুমি রাখনি, আমার যে জিনিসের অভাব, সেটা ভগবান্ ভিন্ন কেহ ঘুচাইতে পারিবে না। তুমি ভুল বুঝে আর আমার দুঃখ বাড়িও না। আমি যে কত দুঃখ সইছি, সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। আর ভগবানের অনুগ্রহে যেন বুঝতেও না হয়। যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা কর; বলিতে বলিতে সে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল, দুইহাতে দুই পা ধরিয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। মুখ যেন তুলিতে চাহে না, অনেকক্ষণ পরে অশ্রুসিক্ত মিনতিপূর্ণ কাতরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমায় একলা ফেলে যেও না। তোমাদের

ঝি-চাকরেরও ত দরকার হবে, আমায় নাহয় তাই মনে করে নিয়ে চল। সব কষ্ট তোমার মুখ দেখে সয়ে আছি, দোহাই তোমার, আমার সে সুখটুকু থেকে বঞ্চিত করো না। আমার আর সংসারে কে আছে? মাতৃহীনা আমি, সেদিন যা গিয়েছেন, তোমার মুখ দেখে সব সয়ে আছি, তুমি গেলে আমি বাঁচব কি নিয়ে? তোমার প্রতি কাজে কাছে পাই, তোমায় সর্ব্বক্ষণ দেখতে পাচ্চি,এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি এর চেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশা করি না।

বিজয়বাবু ধীরে ধীরে তাহার যুগলবাহুবেষ্টন হইতে নিজের চরণদ্বয় মুক্ত করিয়া তাহার কথায় মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সরোজিনী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। জোর করিয়া স্বামীর সঙ্গে যাইতে চাহিয়া তাহার নারীত্ব সম্মানে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সে অপমান যেন কিছুতেই মন হইতে যাইতেছিল না। সে যেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল। স্বামী যদি তাহা না বুঝিতে পারিয়া থাকেন; স্বামী যদি মনে করিয়া থাকেন—ছি ছি কি লজ্জা! মনে করিয়া লজ্জায় তাহার আকর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল।

ছি! ছি! ঝি ঘৃণা কি লজ্জা, সে যে ফুলশয্যা রাত্রি হইতে স্বামীর উপর সমস্ত সত্ব ছাড়িয়া দিয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রে একা বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছে। ফুলশয্যার দিন রাত্রে সপত্নী এমনি হিষ্টিরিয়া আমদানী করিলেন যে, সেদিন সমস্ত রাত্রির মধ্যেও স্বামীর একবারও সাক্ষাৎ পায় নাই।

আর আজ কিনা সে নিজে নিতান্ত দীনহীনের মত স্বামীর সহিত বিদেশে যাইতে চাহিতেছে। কিন্তু কেন সেটা—সেটা যে নিতান্তই নিরুপায় হইয়া দাবানলদগ্ধা হরিণীর ন্যায় এ বাড়ীর স্মৃতি ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইতে চায়; এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত সে একদিনও এমন সুখ কি শান্তি পায় নাই, যাহার জন্য সে এ বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করিতে পারে।

কথায় আছে, স্ত্রীলোক স্বামীকে যমকে দিতে পারে, তবু সতীনকে ভাগ দিতে পারে না, আর আজ কি না সে নিশ্চিন্তমনে জীবনসর্ব্বস্ব—ইহকালের সুখ, পরকালের ভরসা—স্বামীকে পরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। কিন্তু স্বামী কি তাহার? না সেইই পর—সেইই তাহার সপত্নীর আসন জুড়িয়া বসিতেছিল, তাহার স্বামী তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বুঝি ভাল কাজই করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ যে অতি অন্ধকার। সে যে কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইতেছে না! কেন্দ্রচ্যুত অভিশপ্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায়

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সে কোথায় ছুটিয়াছে; কোন্ অসীম অনন্তে তাহার গতি হইবে? স্বামী ত পরের—সংসারে লোক মার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকে, মাতাও পরলোকে। সন্তানাদি হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাও খুব অল্প।

মরণই কি তাহার ভাল ছিল না? দীঘির জল কি সুন্দর কি স্বচ্ছ! এখানে ডুবিয়া মরিলে আর কে জানিবে! স্বামীও মনে খুব আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু একবার সেই মুখখানি না দেখিয়া মরা হয় না। আপনার অজ্ঞাতসারে তাহার পা যেন জলের দিকে টানিতেছিল। হঠাৎ তাহার সঙ্গে যে প্রতিবেশিনী ননন্দা কাপড় কাচিতে আসিয়াছিল, তাহার সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। হ্যাঁলা বৌ কত জলে যাচ্ছিস, সাঁতার জানিসনি কিছু না, ডুবে মরবি শেষটা, বলিয়া হাত ধরিয়া টানিল।

সরোজিনীর যেন চমক ভাঙ্গিল। মাথায় কাপড় টানিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় কাচা সারিয়া বাড়ী আসিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিতে হইবে। গন্তব্য স্থান হইল, প্রথমে সিমলা, পরে লাহোর ও পথে আগরা বেনারস প্রভৃতি।

(৩)

সিমলা পাহাড়, লাহোর দিল্লী প্রভৃতি দেশ বেড়াইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বিজয়বাবু কাশীতে দিন কতক থাকিবার মনস্থ করিলেন। এই সময়ে প্রথমা পত্নী সরোজারও শরীর একটু অসুস্থ হইয়া পড়িল। নানা দেশ বেড়াইয়া নানারূপ নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া সরোজিনীর মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হইল, আরও এখানে আসিয়া সে স্বামীকেও প্রায় সর্ব্বক্ষণই নিকটে পাইত। আরও তাহার অসামান্য ধৈর্য্য ও সহগুণে, তাহার নিঃস্বার্থপর প্রেমে বিজয়বাবুও নিজের অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন; তিনি দেখিতেন, সরোজা নিজের বেশ বিন্যাস, নিজের সুখ সচ্ছন্দতা লইয়াই চিরকাল ব্যস্ত।

স্বামীর সামান্য বিষয়ও ভাবিবার অবসর তাহার থাকে না। কিন্তু সরোজিনী! সে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও, প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়াই যেন নিতান্ত ভক্তের ন্যায় তাঁহার পূজা করিতেছে। একাগ্র ভক্তি ও সেবাতে ভগবানেরই আসন টলে, তা মানুষ ত কোন ছার।

এই সময় কাশীতে বসন্তের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে হইতে পলায়ন মনস্থ করিয়া আজ নয় কাল করিতে করিতে হঠাৎ একদিন

বিজয়বাবুর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাথা হইয়া অত্যন্ত জ্বর আসিল। অতিমাত্র ভীত হইয়া সকলে ডাক্তার আনাইলেন। সকলে যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, ডাক্তারও তাহাই বলিলেন। খুব খারাপ রকমের অতি সংক্রামক বসন্ত। বাড়ীর সকলেই দূরে দূরে থাকিবেন, বলিয়া নার্স পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। চাকর ঝী যাহারা দেশ হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা ব্যতীত সকলেই পলাইয়া গেল। সরোজা কখনই রোগশোকের মধ্যে যাইতে চাইত না। তাহার প্রকৃতিটী যে ঠিক কি রকম ছিল, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। শত মধ্যে একটা সে প্রকৃতি দেখা যায় কিনা সন্দেহ। স্বামীর মারাত্মক রোগের কথা শুনিবা মাত্র সে যেন অতি মাত্র কাতর হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে যে পুরাতন দাসী আসিয়াছিল, সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া অপর গৃহে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া খুব খানিক ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া তারপর সে বেশ শান্ত ভাবই অবলম্বন করিল।

কাঁদিল না সরোজিনী। সে অশ্রুহীন পলকহীন শুষ্কনেত্রে হৃদয়ের স্পন্দন অবধি রুদ্ধ করিয়া, রোগীর মুখপানে চাহিয়া আহার নিদ্রা অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সমুদয় ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিত। কাঁদিবার শক্তি তাহার ছিল না। অতি চিন্তায় তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

নার্স ও ডাক্তারদিগের সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও সে রুগ্ন স্বামীর শয্যা প্রান্ত হইতে উঠিত না; তাহার কেবল মনে হইত, সে ভগবানের নিকটে এতই কি অপরাধে অপরাধিনী, যে, ভগবান্ তাহাকে এত শাস্তি দিয়াও, সংসারের সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না। অবশেষে তাহার জীবনের একমাত্র আশা ভরসা স্বামীর চরণসেবা, সে অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিতে চান্? তিনি কি রকম নিষ্ঠুর দয়ালেশশূন্য ভগবান্, কেন, তাহার কি স্বামীর চরণে ভক্তি নাই? যদি স্বামীর পায়ে একাগ্র ভক্তি থাকে, যদি একনিষ্ঠচিত্তে সে স্বামীকেই ইহ পরকালের দেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকে, তবে সেই স্বামি ভক্তিরূপ অমোঘ অস্ত্রের বলে, সে স্বামীর জীবনের জন্য ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতেও পশ্চাৎপদ নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের মত বিষ তুলিবার শক্তি তাহার নাই কেন? সে ত তাহা হইলে সচ্ছন্দে একটু মাত্রও ঘৃণা না করিয়া মুখে করিয়া সমস্ত বসন্তক্ষত দেহের পুঁজ রক্ত পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে।

সরোজার স্বভাবটা যে কিরকম ছিল, ঠিক বলা যায় না। পিতামাতা ও

স্বামীর অত্যধিক আদরের জন্যই হউক, বা তাহার প্রকৃতিগত স্বভাব বলিয়াই হউক, সে রোগ শোকের দিকে কখনই ঘেঁষিত না।

তাহার পিতামাতার অসুখের সময়ও সে কখনো দেখিতে যাইত না। এ সময়ে রোগীর গৃহে না আসিবার তাহার অছিলাও ঘটিয়া গিয়াছিল। সে তখন সন্তানসম্ভবা, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার ভয়ে সে রোগীর ঘরে বেশী না আসিলেও সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না।

মানুষের স্বভাবের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব যে, সুসময়ের উপকার প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়। কিন্তু অসময়ের বন্ধুকে লোকে প্রাণ দিয়া প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করে। বিজয়বাবু তাহার রোগযন্ত্রণা-কাতর নয়ন যখনই উন্মোচন করিতেন, তখনই পদতলে অবস্থিতা সরোজিনীর উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত। অতি গভীর প্রেম ও মমতাপূর্ণ স্বরে, রোগীর শরীরে কোথায় কি যন্ত্রণা হইতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া, শিক্ষিত নার্সের ন্যায় নিপুণহস্তে সে যখনই যাহা আবশ্যক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তাহা সম্পন্ন করিত। প্রথম প্রথম স্বামী নয়ন উন্মীলন করিয়াই সপত্নীকে খুঁজিতেন, সেও দ্বিধা জ্ঞান না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত। প্রায়ই নানারূপ ওজর শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া স্বামী আর তাঁহাকে খুঁজিতেন না। যতটা ঝোঁক গিয়া পড়িল—সরোজিনীর উপর। সরোজিনীর প্রাণপণ সেবা প্রাণপণ যত্নে স্বামীর সুখ সাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা স্বামীর চক্ষু এড়াইল না। তিনি ক্রমশঃ সরোজিনীর উপরে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

স্তন্যপায়ী শিশু যেমন প্রতিকার্য্যে প্রতিক্ষণে মাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, বিজয়বাবুরও সেই দশা হইল। সব সময়েই সরোজিনীকে চাই। সরোজিনীও খুব আনন্দের ও তৃপ্তির সহিত স্বামীর সেবা করিত। এরূপ ভাবে নিজত্বের ন্যায় স্বামীকে সে কখনও পায় নাই।

সরোজিনীর ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে বিজয়বাবু নিতান্তই বাঁচিয়া উঠিলেন, সরোজিনীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারের কথা মনে করিয়া আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি গন্ধহীন পলাসের রূপে ভুলিয়া সরোজিনীকে দূরে ঠেলিয়া ছিলেন। তাঁহার মত মূর্খ কয়জন আছে! যাক, তিনি যে দিন থাকিতে থাকিতে শুধরাইতে পারিলেন, ইহার জন্যও ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ। একদিন হঠাৎ তিনি সরোজিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, সরোজিনী! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে উচিত মত ব্যবহার করি-

তুমাই বলিয়াই সেই পাপে আমার এত শাস্তি, তুমি যদি ক্ষমা কর, আমি শীঘ্রই সেরে উঠব।

সরোজিনী এ সম্ভাষণে অবাক্ হইয়া গেল। সে ইহার উত্তরে কি বলিয়া বুঝাইবে যে, তোমার অপরাধ কি? তুমি ত আমার ইহপরকালের সর্ব্বস্ব, আমি ত তোমার ক্রীড়নক মাত্র। যদি তা সত্ত্বেও নিজেকে দোষী মনে করিয়া থাক, আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি। এত কথা যে তাহার মনে হইতেছিল, সে ইহার একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু তাহার ডাগর ডাগর কাল চোখ দুটী দিয়ে একদৃষ্টে স্বামীর মুখপানে নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল।

বিজয়বাবু আবার সস্নেহে বলিলেন, সরোজিনী! তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি? আমি তোমার কাছে আমার জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি।

এইবার সরোজিনীর মুখে কথা ফুটিল, অতি স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ-কণ্ঠে সে উত্তর করিল—ছি! তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কি! আমিত তোমার দাসী মাত্র। দেবতার কখনও অপরাধ হয়? আমারি বোধ হয় পূজার ত্রুটী হয়েছিল, তাইতে তুমি পায়ে ঠেলেছিলে।

এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার পায়ে মাথা রেখে শীঘ্র মরতে পারি, আমার আর কোন প্রার্থনা এখন নাই।

সরোজা যে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার ভয়ে তাঁহার গৃহে আসিত না, ইহা বিজয়বাবু বেশ লক্ষ্য করিয়াই দেখিয়াছিলেন। এই চিন্তাটা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তিনি সরোজাকে যথার্থ আন্তরিক ভালবাসিতেন। নিতান্ত রাগের মাথায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সরোজিনীকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীর অধিকার তাহাকে কখনো দেন নাই।

যৌবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে সহচরীটি পাওয়া যায়, মানবের স্বতই তাহার উপরে ঝোঁক বেশী পড়ে। এইজন্য মানুষে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যদিও আবার বিবাহ করে, দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে কেমন প্রথমটীর মত কিছুতেই খাপ খায় না। এজন্য দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে দম্পতি খুব কদাচিৎ সুখী হয়।

সরোজা বরাবরই নিজের সুখটা বেশী বুঝিত। পিতামাতা স্বামী তিনজনেই তাহাতে প্রশ্রয় দিতেন। সুতরাং সে যে স্বার্থপর, অথবা আত্মসার

হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে তাহার খুব দোষ দেওয়া যায় না। বিজয়বাবু এইবার এতদিনে সরোজিনীকে চিনিলেন; এইবার তাঁহার যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল।

সরোজা যে সংক্রামক রোগের ভয়ে, রোগী স্বামীর গৃহে পর্য্যন্ত কদাচ আসিত না, সেই কাল ব্যাধিতে এই সময়ে নিজে আক্রান্ত হইল। অপরিমিত অর্থ-ব্যয়ে এবং সরোজিনী, ও সদ্যোরোগমুক্ত স্বামীর শ্রান্তিহীন আলস্যহীন সেবাতেও সে এই অল্প বয়সেই জবাব দিতে চলিয়া গেল। বিজয়বাবু একে তখন সবে মাত্র দারুণ রোগ হইতে উঠিয়াছেন, তাহার উপরে সহসা এ অচিন্তনীয় শোকের আঘাত পাইয়া যেন কি একরকম হইয়া গেলেন। আর সরোজিনী বেচারা! আজ প্রায় দেড়মাস হইয়া গেল, চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করা ব্যতীত সুনিদ্রা কাহাকে বলে সে প্রায় বিস্মৃত।

সরোজার দাহকার্য্য সমাপন করিয়া বিজয়বাবু যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার মাথার চুল রুক্ষ, চক্ষু রক্তবর্ণ; চক্ষে অস্বাভাবিক দীপ্তি। সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কেহ কোন কথা না বলিয়া সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে শ্মশানে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনেন নাই। সরোজিনী এফবাটী মিছরীর পানা ও এক-খানি পাখা লইয়া আসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল, ও সরবতের বাটীটা হাতে দিতে গিয়া বলিল, খাও যা হবার তাত হয়ে গেছে, আর ভেবে কি করবে বল, বলিয়া যেমন হাত সরাইয়াছে, স্বামীর অবশ শিথিল হস্ত হইতে পাথরের বাটীটা পড়িয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

স্বামী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি এখন নিষ্কণ্টক হলে কেমন না? তুমি তার মৃত্যু কামনা করছিলে আমি ঠিক জানি।

"তুমি আমার সুমুখ থেকে সরে যাও, তোমায় দেখলেই আমার মনে হচ্চে, যেন তোমার জন্যই সে মরল।" সরোজিনী এ অতর্কিত অন্যায় আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া সদ্যমৃতের ন্যায় পাংশুবর্ণ করিয়া দিল। ধীরে ধীরে পাখাটা সেখানে রাখিয়া অবনতমুখে সে প্রস্থান করিল।

এক ডাক্তার ব্যতীত সেদিন তাঁহার সহিত কথা কহিতে কেহ সাহস করিল না। আর সরোজিনী! সে সেদিন অনাহারে মাটীতে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। এ কি অন্যায় আঘাত! ক্ষত স্থানে তপ্ত ঘী পড়িলে যেমন

মর্ম্মান্তিক জ্বলনে জ্বলিয়া উঠে, তাহার স্বামি-প্রেমাকাঙ্ক্ষী প্রাণ আজ তেমনি আঘাত পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আর সহ্য হয় না। এইবার মরিতেই হইবে। কিন্তু তার আগে একবার ঐ সর্ব্বদুঃখবিনাশী পাদুখানি বুকে না চাপিয়া ধরিতে পারিলে, মরণেও শান্তি পাইবে না। ওগো আর কিছু সে চাহে না, সে যে নিতান্ত অনাদৃত উপেক্ষিত জীবন লইয়া জন্মিয়াছে, তাহা সে ভাল রকমেই জানে; যে পথের ভিকারী হয়, তাহারও মনে মনে রাজা হইতে সাধ যায়, আর তাহার পক্ষে স্বামীর প্রেম-আকাঙ্ক্ষা করাটা কি এতই দুর্লভ, এতই দুরাশা!

একবার জীবনের সাধ মিটাইয়া ও-মুখখানি দেখিয়া লইতে হইবে। আর একটী চুম্বন! জীবনের প্রথম ও শেষ একটী চুম্বন। স্বামী দোষী নহেন, কেহ দোষী নহে, দোষী তাহার অদৃষ্ট। নতুবা সেওত বিবাহিতা স্ত্রী বটে।

ডাক্তার আসিয়া নিদ্রার ঔষধ দিয়া স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ পদক্ষেপে সে গিয়া সুপ্ত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। স্বামী তখন গভীর নিদ্রিত। বসন্তের চিরস্থায়ী ক্ষত চিহ্ন সত্ত্বেও সে মুখ কত সুন্দর। সে মুখ নত করিয়া অতি ধীরে ধীরে স্বামীর ললাটে ও ওষ্ঠে চুম্বন করিল। সুরাপায়ীর বহুদিন পরে সুরা আস্বাদনের ন্যায় চুম্বনের নেশা যেন ছুটিতে ছিল না। স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ আশঙ্কায় শেষে অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, সে পদতলে গিয়া বসিল। পা দুখানি বুকে লইয়া তাহার যত পুরাতন ব্যথা যেন জাগিয়া উঠিল। চক্ষের জল আর থামে না। শত শত পারিজাতস্পর্শের ন্যায় স্বামীর চরণের সুকুমার স্পর্শ ত্যাগ করিয়া উঠিতে তাহার প্রাণ যেন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সহসা বৈঠকখানাস্থিত ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। ভোর পাঁচটা বাজিল, আর সে এ ঘরে আসিয়াছে তখন রাত্রি ১টা। কি শীঘ্রই সময়টা কাটিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কোন রকমে মিটাইয়া, আর একবার জীবনের মত পাদুখানি বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিয়া উঠিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে টেবিলের উপর একখানি চিঠি রাখিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিজয়বাবুর তখন নিদ্রা প্রায় ভঙ্গ হইয়াছে। সরোজিনীর গৃহ হইতে প্রস্থান দেখিয়া, তাঁহার দিনের বেলার কথা মনে পড়িল। আহা! নির্দ্দোষী বালিকা সেত কোন অপরাধ করে নাই। সে কেবল বিনা অপরাধে শাস্তি পাইয়াই আসিতেছে, উঠিয়া বসিয়া চোক মুছিতে মুছিতে টেবিলের উপর পত্রখানায়

দৃষ্টি পড়িল। এতরাত্রে চিঠি কিসের মনে করিয়া চিঠিখানা খুলিয়া পড়িলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

চিঠিতে লেখা ছিল—স্বামী আমার, আমিত এ জনমে তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না, বা নিজেও সুখী হইলাম না; অতএব অভিশপ্ত প্রেতের ন্যায় এ উদ্দেশ্যহীন জীবনের শেষ করা ভাল নহে কি?

তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত অপরাধ তুমি মার্জ্জনা করিও, ভগবানকেও আমার উপর একটু দয়া করিতে বলিও, আশীর্ব্বাদ করো, পরজন্মে যেন সুখী হই।

ইতি প্রণতা—সরোজিনী।

বাড়ীতে অন্ধি সন্ধি সমস্ত খুঁজিয়া স্পষ্ট দেখা গেল সে বাড়ীতে নাই; কিন্তু কাশীর সমস্ত দুর্গম রাস্তাও ত সে চেনে না, সে কোথায় যাইবে? একজন বলিল, গঙ্গার সমস্ত পথ ধরিয়া যাও, নিশ্চয় এখনও ঘাটে পৌছায় নাই।

বিজয়বাবু নিজেও বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন এক হুলস্থুল বাধিয়া গেল। সকলে যখন নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, শুধু জলপুলিশের খোঁজা বাকি রহিল। ফিরিলেন না শুধু বিজয়বাবু। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, হয় তাহাকে ফিরাইব, নহে ত আমিও তাহার পথানুসরণ করিব। স্ত্রীঘাতী মহা-পাতকী তিনি। সাধ্বী সতী স্ত্রীকে একদিনের জন্যও সুখ দেন নাই। অব-শেষে নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তবে সে মরণের পথে চলিয়াছে।

চারিদিকে তখনও খুব অন্ধকার রহিয়াছে। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার চক্ষে পড়িল—একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক যেন অতি সঙ্কুচিতভাবে সেই ঘাটের দিকে আসিতেছে। তিনি একটু পাশ কাটাইয়া বসিলেন। যে আসিতেছিল, সে কোন দিকে না চাহিয়া বরাবর সিঁড়ী বাহিয়া গঙ্গাগর্ভে নামিতে লাগিল। এই সময় তাহার মাথার ঘোমটা সে ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া দিল, এবং অনুচ্চস্বরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বদিকে চাহিয়া কি বলিতে বলিতে আর এক সিঁড়ী নামিল।

আর একটা সিঁড়ী মাত্র বাকি আছে। উষার অল্প অল্প সোনালী আলোকে বিজয়বাবু তাহার মুখ স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। পিছন হইতে মনুষ্যপদশব্দ পাইয়া যেমন সে তাড়াতাড়ি নামিবে, অমনি বিজয়বাবু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সরোজিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল স্বামী। কিছু না বলিয়া সেই-খানেই বসিয়া পড়িল, এবং লোকটী বা লজ্জা কিছু মাত্র গ্রাহ্য না করিয়াই বলিল;—

তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মুক্তি দাও, অন্তত দয়া করে নিতান্ত দীন ভিখারী মনে করেও মুক্তি দাও। আমি তোমার সঙ্গে এমন কি শত্রুতা করেছি বা তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, মরণের সময়ও তুমি বাধা দিতে এসেছ। মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখে মরা খুব সৌভাগ্য না করলে হয় না—আমি সে সৌভাগ্য চাই না—আমি মরতে চাই। আমার মৃত্যুর অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরোনা।

বিজয়বাবু এ সমস্ত তিরস্কারপূর্ণ অনুযোগগুলি বিনা প্রতিবাদে হজম করিয়া শুধু মাত্র বলিলেন,—সরোজিনী, আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্চে। তুমি বাড়ী চল, তোমার কোলে মাথা দিয়ে না শুলে মাথাধরা সারবে না।

তা ছাড়া, ২।৪ দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। সরোজিনী তোমার পায়ে পড়ি, তোমার অযোগ্য হতভাগ্য স্বামীকে আর একবার ক্ষমা কর।

বহুদিনের অনিয়মে রাত্রিজাগরণে, অস্বাভাবিক মানসিক পরিশ্রমে সরোজিনীর মাথা ঘুরিতেছিল। সে কোন উত্তর না করিয়া স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বিজয়বাবু অতি সন্তর্পণে শিশুর ন্যায় তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহখানিকে কোলে করিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

শ্রীমতী মণিমৃণালিনী দেবী।

শেষ দেখা।

[গল্প]

(১)

দেবচরণ মাঝি পল্লীগ্রামের মানুষ। তার বাড়ী ভাঙ্গরখালী। শুধু তার কেন,—তার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, সকলেরই নিবাস সেই গ্রামে; তাই সেই গ্রামটীর সঙ্গে দেবচরণের সম্পর্ক জন্মাবচ্ছিন্ন তো বটেই, যেন জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই।

গ্রামটী ছাড়িয়া দেবচরণের আর কোথাও যাওয়া হইয়া উঠিত না। আবার গ্রামের সকলেই তার এমন সুন্দর, বিশুদ্ধ 'দেবচরণ' নাম থাকিতে—তাকে খালি বলিত 'দেউচরণিয়া'।

গ্রামের ধারে মস্ত নদী।

(২)

দেবচরণ বাল্যকালে গ্রামের 'বাবু'দের বাড়ীর ছেলেপেলের সঙ্গে খেলা করিত'—আর পাঠশালায় বাংলা পড়িত। 'বাবু'দের বংশধর শ্রীমান্ শশাঙ্ক মোহন রায়ের সঙ্গে সেই সময় দেবচরণের খুব বন্ধুতা হইয়া উঠিল।

শশাঙ্ক দেবচরণকে আদর করিয়া ডাকিতেন,—"দেবু" অথবা "দেবু-ভাই"; আর দেবচরণ শশাঙ্ককে ডাকিত "শশী বাবু" শশাঙ্ক শেষটায় "দেবু"কে দিয়া 'বাবু' ছাড়াইয়া শুধু "শশীভাই" বলিয়া ডাকানো ধরাইয়াছিলেন।

তথাপি কিন্তু 'মানুষের' সম্মুখে দেবচরণ শশাঙ্ক বাবুকে ওরূপ ভাবে ডাকিতেই পারিত না,—যদিও শশাঙ্ক তাহাকে সর্ব্বদাই "দেবু" বা "দেবু ভাই" বলিয়াই ডাকিতেন।

ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিংসা হইল গ্রামের বংশী মণ্ডলের। তাহার খুব ইচ্ছা ছিল, গ্রামের এই ভবিষ্যৎ জমীদারটীর সু-দৃষ্টিতে থাকা; কিন্তু সে দেখিল যে, তাঁহার সমস্ত 'দৃষ্টি'টাই খালি 'দেউচরণিয়ার' উপর; সে দৃষ্টির এতটুকু রশ্মিও যেন অপরের উপর গড়িবার উপায় নাই! বংশীর যেন সে-টা নিজের "গাঁটের" পয়সা খরচ হইতেছে বলিয়াই মনে হইত।

বংশীও মাঝি ; তবে পাঠশালায় পড়িবার সময় সে 'মাঝি'টা বদ্‌লিয়া নাম করিয়া লইয়াছিল 'মণ্ডল'

তখন শশাঙ্কর বয়স ১০। ১১ বৎসর, দেবচরণেরও তাই। বংশীর বয়স ১৫। ১৬ বৎসর।

বংশী সমস্ত মাঝিদিগকে বলিয়া দিল,—"তোমাদের দেউচরণিয়া এখন 'দেবু' হ'য়েছে ; এরপর 'বাবু' হবে গাড়ী চ'ড়বে।"

(৩)

তার পর শশাঙ্ক একটু বড় হইয়া গেল সহরে পড়িতে ; সহরের নাম কেতাবপুর,—খুব জম্‌কালো জায়গা। সেখানে গাড়ী আছে, ঘোড়া আছে,—অনেক বড় বড় বাড়ী ঘর, বড় বড় রাস্তা আছে। গ্রাম হইতে সহর প্রায় দশ ক্রোশ দূর।

কেতাবপুর সহরে শশাঙ্ক ইংরেজী পড়ে ; দেবচরণ তখন গ্রামের পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়া নৌকাতে 'বাহির' হয়,—মাছ ধরে।

তবু যখন দুই বৎসর ইংরেজী শিখিয়া শশাঙ্ক সেবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন সকলের অপেক্ষা বেশী উৎসাহ হইল দেবচরণের, যেন শশাঙ্কের বাড়ী আসিবার মতন অত-বড় একটা ঘটনা পৃথিবীতে সচরাচর ঘটিতেই দেখা যায় না।

সমস্ত রাত্রি নৌকা 'বাহিয়া' দেবচরণ সে-দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে মাছটি পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া 'বাবু'দের বাড়ী আসিল ; শশাঙ্কর মাতা ও শশাঙ্ককে প্রণাম করিয়া মাছটী তাঁহাদের পায়ের কাছে রাখিল।

—মাতার চক্ষুতে জল আসিল।

শশাঙ্ক বলিল,—"দেবু ভাই, আমায় ভোল-নি তো ?"

দেবচরণ কাঁদিয়াই ফেলিল;—এবার আর সে 'শশী ভাই' বলিয়া ডাকিতেও পারিল না, সে যে শশাঙ্ককে ভুলিয়া যায় নাই,—ভুলিতে পারেই না, এ কথাও বলিতে পারিল না।

শশাঙ্কর মাতা বলিলেন,—"দেবু,—বাবা! আজ দুপুরে এখানেই দুটো' খেয়ে যেও।"

* * * * *

দেবচরণ যখন 'বাবু'দের বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তখন বেলা প্রায় ৪টা।

(৪)

শশাঙ্ক রাস্তা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া তার পর দেবচরণকে বলিলেন,—"দেবু ভাই,—রোজ কিন্তু একটী বার ক'রে আস্‌বে,—যে ক'দিন আমি বাড়ী আছি।"

দেবচরণের চক্ষু দুটী আবার জলে ভরিয়া আসিতেছিল,—সে কি-একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু,—

তখনই দেবচরণ দেখিল—সম্মুখে বংশীমণ্ডল, সে সেই রাস্তায় কোথায় যাইতেছিল।

শশাঙ্ক বাবুর সাম্‌নেই বংশী বলিল, "কি হে দেবু 'বাবু'! গাড়ী চ'ড়্‌ছ কবে?"

শশাঙ্ক ওষ্ঠ চাপিয়া রুষ্ট মুখখানি বংশীর দিক হইতে ফিরাইয়া লইলেন।

ছিদাম মাঝি বৃদ্ধ,—শশাঙ্ক বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিল। দেবচরণ সম্পর্কে ছিদামের নাতি; শশাঙ্ক আর দেবচরণ উভয়ে ছিদামকে বলিত 'ছিদাম দা'; ছিদাম শশাঙ্ককে বলিতেন—'কর্ত্তা দাদা'।

ছিদাম ছিল মাঝিদের মধ্যে মাতব্বর। বংশী যখন দেবচরণকে বিদ্রূপ করিয়া 'দেবু বাবু' আর 'গাড়ী' চড়িবার কথা বলিল, ছিদাম তখন সেখানেই ছিল। কট্‌-মট্‌ করিয়া ছিদাম বংশীর দিকে চাহিল—যেন বলিতেছে 'সাবধান!

মুখে ছিদাম বংশীকে কিছুই বলিল না।

সে-দিন সন্ধ্যায় ভারি ঝড়-ঝট্‌কা হইল। শশাঙ্ক বাবু বৃদ্ধ পাইক 'আবদুল-দা' কে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—আজ রাত্রিতে যেন 'দেবু ভাই' আবার নৌকায় না-বাহির হয়।

* * * * *

সেবার কেতাবপুর সহরে যাইবার সময় ভাঙ্গরখালীর প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার দুর্লভ রায়ের একমাত্র পুত্র শশাঙ্ক মোহন কেন-যে গ্রামে এত লোক থাকিতে মাঝি-পাড়ার 'দেউচরণিয়া' কে কয়েক দিনের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা জানাইয়া 'জিদ' ধরিয়া বসিলেন,—তা গ্রামের কেহই বুঝিতে পারিল না।

প্রতিবাদ করিবে কে?—দুর্লভ রায়ের নামে বুঝি পৃথিবীই সশঙ্কিত হইত, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটী-তো দূরের কথা।

শশাঙ্ক বলিয়া দিলেন 'ছিদাম দা' দু-চার দিন পরে গিয়া দেবচরণকে লইয়া আসিবে।

তাহাই স্থির হইল।

(৫)

কেতাবপুর অতি সহর।

শশাঙ্ক এখানে গ্রামের সমস্ত বাধা,—ধনী-দরিদ্রের সমস্ত পার্থক্য,—মানুষে-মানুষে সমস্ত ব্যবধান,—পশ্চাতে ফেলিয়া বিস্তীর্ণ জনপদের মধ্যে আসিয়াছেন; তাই প্রকাশ্য রাজপথে বিড়ম্বনা-ভীত দেবচরণকে নিজের মতন ভাল জামা-জুতা পরাইয়া, নিজের সঙ্গে জোর করিয়া, বসাইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চলিয়াছেন।

গাড়ী যেখানে একটু থামিতেছে, সেখানেই 'বেচারি' দেবচরণ নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত সহর,—নামিয়া যাইবেই-বা কোথায়? তাই আবার যখন শশাঙ্ক জোর করিয়া বসাইতেছে, তখনই দেবচরণ বসিয়া পড়িতেছে।

* * * * *

শশাঙ্কর বাসার দ্বারে গাড়ী আসিতেই দেখা গেল, সেখানে ছিদাম দাঁড়াইয়া।

'ছিদাম দা' কি ভাবিবে,—ছিঃ! তখন লজ্জায় দেবচরণের সুন্দর শ্যামল মুখখানি 'কালো' হইতেছিল!

শশাঙ্ক ছিদামকে বলিলেন,—"ছিদাম-দা, যা' দেখ্‌লে,—বংশী মোড়লকে গিয়ে ব'লো কিন্তু!"

দেবচরণেরও তখন একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,—সে ততক্ষণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল; বলিল,—"ছিদাম-দা, বংশীকে ব'লো যে, দেউচরণিয়া, দেউচরণিয়া,—গাড়ীত চ'ড়ছে, গাড়ীত চ'ড়ছে।"

সজোরে বুকে 'চাপড়' দিয়া দেবচরণ এই কথা বলিল।

ছিদাম মাঝির চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গিয়াছিল। সে বলিল,—[illegible] দেখ্‌লেম্। কর্ত্তাদাদা! এই কি আমার শেষ দেখা!'

তার পর শশাঙ্ক দেবচরণকে ছিদামের সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

* * * * *

শশাঙ্ক মনে মনে ভাবিয়া রাখিলেন, যদি কোন দিন তাঁহার ক্ষমতা হয়, তবে তিনি দেবচরণকে ভাল 'জাল' কিনিয়া দিবেন, ভাল নৌকা করিয়া দিবেন,—ভাল ক্ষেত-খামার করিয়া দিবেন, ভাল বিবাহ দিয়া দিবেন।

আর 'ছিদাম-দা'কে? তাকে মোটেই নৌকায় বাহির হইতে দিবেন না, তাকে 'জালের' সুতা কিনিয়া দিবেন,—সে বসিয়া খালি 'জাল' বুনাইবে, আর অপর সব ছেলে-দিগকে 'জাল' বুনানো শেখাইবে।

(৬)

আরও দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

এখন শশাঙ্কর বয়স ২২। ২৩ বৎসর, এর মধ্যে আর তিনি দেশে আসিতে পারেন নাই।

শশাঙ্ক এম্-এ পাশ করিয়া পিতার ইচ্ছা-মত কিছু দিন নানা-প্রদেশ দেখিয়া বেড়াইয়াছেন; তার পর এবার তিনি যখন বাড়ী আসিলেন, তখন বৃদ্ধ পিতা দুর্লভচন্দ্র রায় তাঁহার সমস্ত জমীদারীর ভার আর সংসারের যত কাজ, এই একমাত্র পুত্রের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নিজে 'অবসর' লইলেন; ভাবিলেন,—"আর কেন?"

* * * * *

প্রজাদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সাম্‌নে সেদিন দুর্লভ রায় তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে বলিলেন, "দেখ, আমি দুষ্টের যেমন দমন করিছি, তেমনি শিষ্টের পালন করিছি,—ভগবান্ জানেন করিছি কি-না! তুমি 'শিষ্টকে' চিন্‌বে ও তাকে পালন ক'রবে,—তা আমি জানি; তবে তুমি 'দুষ্টকে' চিনে চ'লতে পার্‌বে কি না, জানি-নে; তাই দেখবার জন্য আরো ক'দিন আমি এ সংসারে থাক্‌বো; তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে,—।"

পুত্রের দিকে চাহিতে দুর্লভ রায়ের চক্ষু অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শশাঙ্ক তখন ঝর্-ঝর্ করিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন,—তিনি কোন কথাই কহিতে পারিলেন না।

পিতার দিকে তাকাইয়া শশাঙ্ক কখনই কথা কহিতে পারিতেন না,—আর আজ-তো তাঁহার কণ্ঠই রুদ্ধ!

* * * * *

কিন্তু শশাঙ্ক তাঁহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষুতেই দেখিতে পাইলেন,—'দেবু-ভাই' আর 'ছিদাম-দা' আজ উপস্থিত প্রজাদের মধ্যে নাই; আর পিতা যখন তাঁহাকে 'দুষ্টকে' চিনিয়া চলিবার বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন বংশীমণ্ডল তাহার ঝাঁকড়া চুল আর 'কমরে-বাঁধা' লাল গামছা সহ নবীন জমীদারের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সরিয়া পড়িতেছিল।

কেন যেন শশাঙ্কর মনে হইল, গত রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে!

(৭)

সে-দিন সন্ধ্যায় শশাঙ্ক একাকী গেলেন, দেবচরণের পর্ণকুটীরে,—তাদের খোঁজ লইতে।

বংশীমণ্ডল সেখানে দাঁড়াইয়া।

সে নবীন ভূম্যধিকারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল;—তার মুখে একটা জয়োল্লাস!

* * * * *

শশাঙ্কর মুখখানি তখন বিবর্ণ হইতেছিল। বংশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে? দেবচরণ আর ছিদাম কই?"

বংশী বলিল,—"তারা গত রাত্তিরে 'কর্ত্তার' (শশাঙ্কর) জন্য নদীতে মাছ ধ'রতে গে-ছিল, রাত্তিরে ভারি ঝড়,—তারা দু-জনে নৌকো ডুবে,'—আজ বিকেলে তাদের দেহ পাওয়া গেছে,'—প্রাণ বোধ হয় এতক্ষণও বেরোয় নি, তবে এখন কি হ'য়েছে,—নদীর কূলে তাদের দু'জনার হাত থেকে তাদের ধরা মাছ দুটো নিয়ে আমি 'কর্ত্তার' জন্য—।"

তখন, দুর্লভচন্দ্র রায়ের পুত্র শশাঙ্ক মোহন বোধ হয় পদাঘাতে বংশীর ঝাঁকড়া চুল-বিশিষ্ট মস্তকটী গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না; ভীষণ স্বরে বলিলেন,—"কি।"

* * * * *

তারপর শশাঙ্ক ভীম বেগে নদীর দিকে ছুটিলেন,—তখন আবার 'সোঁ-সোঁ করিয়া ঝড় উঠিয়া আসিতেছিল। শশাঙ্কর সুন্দর মুখখানি তখন সেই সান্ধ্য আকাশের মতনই মেঘাচ্ছন্ন; ঝটিকাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি ছুটিয়াছেন,—তার আগে যাইবেন সেই নদীর কূলে,—'শেষ দেখা' যে হয় নাই!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

শিবাজীর নৌবহর।

সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সেনাবলের ন্যায় নৌবলও প্রয়োজন। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবছত্রপতি এই সত্যটিও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোঁকনের উপকূল ভাগ অধিকৃত হইবার পরই শিবাজী নৌশক্তি গঠনে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন—পেশবা মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরা আরবসাগরে কেবল বাণিজ্যতরী ভাসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সেকালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে, আরবসাগরের তীরদেশে ও পারস্য উপসাগরের সন্নিহিত প্রদেশে জলদস্যুর বিশেষ উপদ্রব ছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য-বণিকেরা পণ্য সম্ভার-সংরক্ষণের জন্য বাণিজ্যপোতের পাহারায় রণতরীর বহর নিযুক্ত করিতেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে ভারতসমুদ্রে পাশ্চাত্যশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। এ স্থানীয় জাঞ্জীরার হাবশী সর্দারেরাও শিবাজীর সময় পর্য্যন্ত আপনাদের নৌশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিজের শক্তি কোঁকনের উপকূলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শিবাজী কোঁকন বিজয়ের অব্যবহিত পরেই নৌবহর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা সাধী ও পতাকিগণ যে অতুল সামরিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার নৌসৈনিকেরা সেরূপ যশোলাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ সামরিক কৌশল তাহাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত স্বাভাবিক সম্পত্তি; নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের মোটেই ছিল না। শিবাজী নিজে একবারের অধিক সামুদ্রিক অভিযোগে যোগদান করেন নাই। সভাসদ নৌবিভাগের দুইজন অধিনায়কের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথম দরিয়া সারঙ্গ জাতিতে মুসলমান, দ্বিতীয় আরা নায়ক। ইনি জাতিতে ভাণ্ডারী বা ধীবর। খুব সম্ভব শিবাজী ধীবরদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ নাবিক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন—কারণ মহারাষ্ট্র অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহারাই সমুদ্রগমনে অভ্যস্ত ও নৌচালনায় নিপুণ। আলবনে শিবাজীর একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির মস্তকে কোলীজাতীয় ধীবরদিগের

সাধারণ শিরস্ত্রাণ। সম্ভবতঃ শিবাজীর নাবিকেরা সকলেই এইরূপ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিত। দরিয়া সারঙ্গ ও আরানায়ক ব্যতীত দৌলত খাঁ নামক আরও একজন মুসলমান সেনাপতি শিবাজীর নৌবহরে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সভাসদের মতে শিবাজীর বহরে বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০০ রণতরী ছিল। তিনি শিবাজীর রণতরীর মধ্যে গলিবত ও গুরবের সঙ্গে তরাণ্ডী, তারু শিবার, মচেবা ও পগারের নাম করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাদের সকল গুলিকে রণতরী আখ্যা দেওয়া যায় না। গলিবত ও গুরব যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সভাসদের উল্লিখিত অন্যান্য তরণীগুলিতে বোধ হয় বাণিজ্য ভিন্ন অন্য প্রয়োজন সাধিত হইত না।

সভাসদ শিবাজীর রণতরীর যে সংখ্যা দিয়াছেন, তাহাও অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মণ বলেন—The fleet of Shivaji had by this time (1675) been ncreased to Fifty seven sails of which fifteen were grafs, the est gallivats all crowded with men" (ক) অর্থাৎ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর রণতরীর সংখ্যা ছিল—৫৭, ইহার মধ্যে ১৫ খানি গুরব ও বাকী সব গলবত। সকল রণতরীতেই বহু মাল্লার ভিড় দেখা যাইত। ইংরেজ পর্য্যটক ডাক্তার ফ্রায়ারে ষড়পত্তনের পথে দণ্ড রাজপুরীর দক্ষিণে একটি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত গম্ভীর উপসাগরে শিবাজীর নৌবহর দেখিয়াছিলেন। ঐ বহরে ছোট বড় ৩০ খানি তরণী ছিল। আডমিরালের তরণীর মাস্তুলে তিনি একটি শ্বেত পতাকা দেখিয়াছিলেন। (খ) স্থলপথে কিন্তু শিবাজীর সেনাদলে শ্বেত পতাকা ব্যবহারের কথা শোনা যায় না। অধ্যাপক সরকার শিবাজীর পোতসংখ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—The English reports never put their number above 160, and usually as 60 only (গ) অর্থাৎ ইংরাজবণিকদিগের রিপোর্টে শিবাজীর রণতরীসংখ্যা কখনই ১৬০র অধিক দেখা যায় না, সাধারণতঃ৬০খানি মাত্র তরণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, শিবাজীর বহরে সর্ব্বসাকুল্যে ছোট বড় ২০০খানির অধিক রণতরী ছিল না, সভাসদের

(ক) Or the—Fragments P. 53

(খ) Fryer P. 116

(গ) Sarkar—Shivaji (first Ed.) P. 336.

প্রদত্ত সংখ্যা উক্ত লেখকের প্রশংসাজনিত অত্যুক্তি মাত্র। এই রণতরীগুলিও আকারে ও গঠনে ইংরাজরণতরী অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ছিল। তরণীর অধ্যক্ষ ও নাবিকেরাও যে তরণীচালনায়, রণনৈপুণ্যে এবং অস্ত্রবলের হিসাবে ইংরাজ কাপ্তেন ও নাবিকদিগের তুলনায় অত্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সত্য বটে দুই একবার শিবাজীর নৌসেনাপতিগণ পর্ত্তুগীজ জাহাজ আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়াছিল; কিন্তু সাধারণতঃ পর্ত্তুগীজেরা সংখ্যায় এত কম ছিল যে, ইহাতে মারাঠা নাবিকদিগের রণকৌশলের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিবাজী স্থলযুদ্ধে আপনার সেনাপতিগণের উৎকৃষ্টতর রণ-কৌশলের উপরই নির্ভর করিতেন, সেনাসংখ্যায় মুঘল ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান নরপতিগণের সমকক্ষতা লাভের আশা তিনি কখনও করিতে পারেন নাই, কিন্তু জলযুদ্ধে তিনি নৈপুণ্যের অভাব সংখ্যার বলে পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এ আশা সফল হয় নাই। সুরাটের ইংরাজকুঠীর বড়কর্ত্তা (President) সদম্ভে বলিয়াছিলেন,—

One good English ship would destroy a hundred of them without running herself into great danger.

একখানি ইংরেজ রণপোত নিজেকে বিশেষ বিপন্ন না করিয়াই একশত মারাঠা রণতরী ধ্বংস করিতে পারে। তাহার গর্ব্ব যে একেবারে অসার নহে, তাহা কোঁকণের সন্নিহিত সাগরে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে।

শিবাজীর রণপোতগুলির মধ্যে 'গুরব' ও 'গলবতই' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'গুরব' পালে চলিত আর গলবত চলিত দাঁড়ে। এই তরণীগুলির গঠন এমন কদর্য্য ছিল যে, সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হইলে গুরব ও গলবত অতি প্রবল ভাবে দুলিতে থাকিত। গুরবে ৯ হইতে ১২ পাউণ্ডের গুটি কয়েক কামান থাকিত। সভাসদের উল্লিখিত অন্যান্য তরণীগুলির মধ্যে তরাণ্ডী পালওয়ালা বড় নৌকা; শিবার দুই মাস্তলের চেপটা তলাওয়ালা নৌকা; শিবারে আবার পাটাতনও থাকিত না; আর পগার সাধারণ ছোট নৌকা (canoe) ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য এই সকল তথাকথিত জাহাজ লইয়া ইংরাজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির সহিত জলযুদ্ধে অগ্রসর হইলে যে পরাজয় হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

ভারতসাগরে মারাঠার নৌ-শক্তি স্থাপনের উদ্যম নিষ্ফল হইলেও ইহাতে শিবাজীর দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা না

থাকিলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নৌ-শক্তির জন্য সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্যপোত বহরের বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য তিনি কতকগুলি বাণিজ্যতরণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাণিজ্য পোতগুলি মারাঠা পণ্য লইয়া আরবের উপকূলে গমন করিত। কালক্রমে বহু মারাঠা বণিক মস্কট প্রভৃতি আরববন্দরে আপনাদের পণ্যবীথি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু সে শিবাজীর তিরোধানের বহু পরে। শিবাজীর রণতরী বহরের সাধারণ কর্ত্তব্য ছিল—জলদস্যুর উপদ্রব নিবারণ। মারাঠা সেনাদল পীয়র দেশ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। মারাঠা নৌ বহরের খরচও সাধারণতঃ নির্ব্বাহিত হইত পীয়র দেশ-লুণ্ঠনলব্ধ আয়ে। তদ্ব্যতীত আরও দুইটি কাজের জন্য শান্তির সময়েও রণতরী ব্যবহৃত হইত। সে কালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন—রাজা। দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া উঠিলে রাজা আমদানী শুল্ক কমাইয়া দিতেন, বাজার দামও সেই সঙ্গে কতকটা কমিয়া যাইত। স্থলপথে যেমন বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইত, জলপথেও তেমনি দেশী বিদেশী জাহাজে বহু পণ্য আমদানী রপ্তানী হইত। এই জাহাজগুলি মারাঠা বন্দরে শুল্ক দিয়া সরকারী দস্তক লইয়া যাইত। আবার অনেক জাহাজ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ফাঁকি দিয়া বিনা দস্তকেই চলিয়া যাইত। রণতরীর অধ্যক্ষেরা সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দেশী—বিদেশী কোন বাণিজ্যতরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা দস্তক চাহিতেন। দস্তক দেখাইতে পারিলে আর কোন গোল হইত না, না দেখাইতে পারিলে জরিমানা দিতে হইত, না হয়ত জাহাজ বাজেয়াপ্ত হইত। এই কারণে মারাঠা সরকারের সহিত ইংরাজ বণিকদিগের কয়েকবার মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল।

সেকালে কোন দেশের উপকূলে ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে জাহাজ ডুবিয়া গেলে তাহা ঐ দেশের সরকারী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। এই প্রকারে দৈবলব্ধ সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করা ও উদ্ধার করাও রণতরীর অধ্যক্ষদিগের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। ইংরাজদূত অস্কিণডেন শিবাজীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রের উপকূলে নিমগ্ন ইংরাজ বাণিজ্যপোত ও পণ্যদ্রব্য যেন তিনি দাবী না করেন। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে শিবাজী এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হয়েন নাই।

শিবাজীর মৃত্যুর পরে আংগ্রিয়াগণ তৎপ্রতিষ্ঠিত নৌশক্তি অব্যাহত

বাধিয়াছিলেন। পেশবা বালাজী বাজীরাওয়ের সহিত আংগ্রিয়া বংশের অন্যতম প্রতিনিধির বিরোধ হইলে তিনি তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধনের সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ইংরেজের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। আংগ্রিয়ার উপদ্রবে ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজেরা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং দুই একবার তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এতদিন এই চেষ্টা সফল হয় নাই; কিন্তু এইবার পেশবার সাহায্যে ইংরেজের অভিলাষ পূর্ণ হইল। গৃহবিবাদের ফলে মারাঠা নৌশক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। পেশবাদিগের নিজেদেরও নৌবহর ছিল; কিন্তু তাহারা শিবাজীর নীতি সম্যক্ ভাবে বুঝিতে না পারার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক, আরবসাগরে মারাঠা শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কখনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

যে নয়ন একদিন দেখেছিল তা'রে,
একদা যে আঁখিপথে বাহিরিল প্রাণ;—
শ্রান্ত সে নয়ন আজি, পায় না তাঁহারে খুঁজি'
উঠিছে মরম ভেদি' সকরুণ তান!

২

এ নয়ন হারাইল যদি তার আলো,
এ জীবন যদি তার হারাল জীবন;—
এ নয়নে, এ জীবনে আর কোন্ প্রয়োজনে,
যাতনা-কাতর দেহে করিব ধারণ?

৩

হে বায়স, জগতের উপকারী পাখি!
তব পাশে সকাতরে করি এ মিনতি,—
মোর এ নয়ন তুলে, নিয়ে যাও কুতূহলে,
যেথা সে আমায় ভুলে করিছে বসতি!

৪

তার সেই সুকোমল চরণের তলে
বারেক রাখিও শুধু নয়নযুগল,
দেখিবে সে এ সংসারে যে আঁখি হেরিল তারে,
সেই আঁখি তারি তরে লুটায় ভূতল!

৫

তার পর সে যখন দারুণ ঘৃণায়
চরণে দলিয়ে যাবে নয়ন আমার;
তখন সে অর্ঘ্যখানি সফল গৃহীত জানি
করিও বিহঙ্গ তুমি আনন্দে আহার!

৬

জীবের জীবন ওগো কুঞ্জ সদাগতি!
সকরুণ নিবেদন আছে তব পায়,—
মোর এ বুকের মাঝে তব যে কণিকা রাজে,
বারেক বহন করি' লও আজি তায়।

৭

যথায় বিরাজে মোর হৃদয়ের রাণী
নূতন খেলার ঘর পাতিয়া আবার,
মোর এ পরাণখানি তাহার চরণে দানি
কয়ো তারে দু'টী কথা হইয়া আমার।

৮

সরায়ে জলদসম চিকুরের ভার,
শ্রবণের মূলে ধীরে কহিও চুমিয়া,—
অলক্তক পায়ে তারা পাদপদ্ম রঞ্জিবার
আমি নারি তাই মোর সারা হৃদি দিয়া?

৯

মেখলা বলয় আদি রত্নভূষণ
শোভাময় দেহ তার শোভে অনিবার,
শত ভাবে শত মতে পারি নাকি সাজাইতে
জীবন যৌবন মোর দিয়ে উপহার।

১০

রক্তিম কপোল পরে রক্তিম চন্দন
শোভে যথা রক্তোৎপল অরুণের লেখা,—
বিনিময়ে তার হায়, ভাল না কি শোভেতায়,
অমিয় চুম্বনগুলি ভালবাসা মাখা!

১১

নীরব হইও বায়ু! এ শুধু কহিয়া;
যদি সে উপেক্ষাভরে ফিরায় বদন,—
ফুল যথা পূজা হ'লে ফেলে দেয় নদী-জলে
তেমতি জানিয়া প্রাণে করিও গ্রহণ!

১২

মরমে গাঁথিয়া যদি না রহিত স্মৃতি
বড় সুখময় তবে হইত ভুবন,—
কাল-সাপিনীর মত স্মৃতি যে গো অবিরত
বাড়ায় মরম-জ্বালা করিয়া দংশন!

১৩

হা প্রেয়সী, চেয়ে দেখ বিরহে তোমায়
জীর্ণ শীর্ণ এত মোর শরীর পরাণ,—
মৃত্যু এসে ফিরে যায়, মোরে না দেখিতে পায়,
শোনে না আমার হায়, কাতর আহ্বান!

১৪

সুবুদ্ধি-তস্কর বাতি নিবায়ে প্রথমে
সকল-সম্পদ যথা শেষে অগহরে,—
তেমতি হে মনচোর! জ্ঞান-বুদ্ধি দীপ মোর
নিবায়ে হৃদয়-নিধি নিলে চুরি করে!*

৺ জীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

* লেখকের কৈশোর রচনা যথাযথ সঙ্কলিত হইল।

রাজা রামমোহন রায়।

তাঁহার ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ।

চার অন্ধের হাতী দেখার গল্প সকলেই জানেন। হাতী কুলাও নয়; কলাগাছও নয়; বড় মুলাও নয়; বড় রশিও নয়; অথচ প্রত্যেকটারই কিছু কিছু সাদৃশ্য উহাতে রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ঠিক করিতে গিয়া অনেকেই এরূপ ভুল (?) করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের লেখকও জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, তাঁহার মত (চিন্তা) অভ্রান্ত সত্য, তবে সহৃদয় তত্ত্বেচ্ছু পাঠকের সুবিধার জন্য তিনি এই মাত্র বলিতে পারেন যে, তিনি সরল ভাবে যাহা ভাবেন, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আর অন্ধের যদি বুঝিবার শক্তি থাকে যে সে অন্ধ, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারেন যে, তিনি ঐ চার জনের দলের একজন নন, যদিও নিজে নিজের "for point" ঠিক করা কঠিন।

আমরা রামমোহন রায়ের কথা থেকেই রামমোহনের ধর্ম্ম স্থির করিব, এবং স্থির করিব যে, তিনি হিন্দু ছিলেন,—হিন্দু শব্দের পূর্ব্বে 'সংস্কৃত' অথবা 'ব্রহ্মজ্ঞানী' জুড়িয়া দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করি না, কারণ প্রত্যেক ধর্ম্ম, কেবল ধর্ম্ম কেন, প্রত্যেক বস্তুই আমরা সংস্কৃত অবস্থায় পাইতে চাই, 'ব্রহ্মজ্ঞানী' ও যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না প্রত্যেক আদর্শ হিন্দুই 'ব্রহ্মজ্ঞানী' এবং ব্যাকরণবলে বলা যায় 'ব্রাহ্ম', বলিয়াছিলাম ও 'ব্রাহ্ম' ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত এক সভায়। কিন্তু কোন হিন্দুকে 'ব্রাহ্ম' বলিয়া অভিহিত করা নিষ্প্রয়োজন, নির্ব্বাচনও সহজ নহে। কাজেই আমরা রামমোহন রায়কে এরূপ অর্থে 'ব্রাহ্ম' বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলেও, বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম বলিতে আমরা, যাহা বুঝি, তাঁহাকে তাহার একজন বলিব না, এমন একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে আনিয়া ফেলিব না, তিনি এই হিসাবে ব্রাহ্ম ছিলেন না, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় তিনি মানিতেন না, যেহেতু ব্রাহ্মসম্প্রদায় ব'লে কোন সম্প্রদায় স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না।

কলিকাতার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নামক কোন "ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রশ্নের উত্তর-দানোপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ

বেদাদি শাস্ত্রানুসারেই ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন। বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে তিনি একখানা চিঠিতে অতি সংক্ষেপে তাঁহার আত্মচরিত লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, অবশ্য সাহেবের অনুরোধানুযায়ী। তাহার একজায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন, হিন্দু-ধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত; তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বচনানুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ।" *

ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি সংস্কৃত হিন্দু—প্রকৃত—আদর্শ হিন্দু হইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তথ্যভাষী ছিলেন, তথ্যকথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিকৃতই হইয়াছিল, অধিকাংশ—অত্যধিকাংশ লোকই হিন্দুধর্ম্মের সার ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহারা তাহাদের দেবদেবী পূজার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছিল, গ্রীক্ ও রোমীয়দের চেয়েও হীনতর হইয়া পড়িয়াছিল—হিন্দু-ধর্ম্ম অনেকটা আচার-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ সকলেই ভাবিতেন যে, বেদে দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাই সমর্থিত হইয়াছে; "বেদে বলে ভুমি ত্রিনয়না" এরকম প্রবচনও প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। (এর চেয়ে অবনতির বিষয় আর কি হইতে পারে!) রামমোহনরায় বঙ্গদেশে বেদ-বেদান্ত চর্চ্চার পুনরুদ্দীপনা করেন।

তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই পরব্রহ্মের উপাসক, অন্ততঃ হওয়া উচিত; তিনি ছিলেন। "গায়ত্র্যা পরব্রহ্মোপাসনাবিধানম্" ও "গায়ত্রীর অর্থ" তদ্‌রচিত এই দুইগ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রী জপদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়, এবং ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন যে গায়ত্রী জপ করেন, তাহাতে অজ্ঞাতরূপে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়। লোকপূজা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, রামমোহন

* এই প্রবন্ধে আমি শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের যথেষ্ট, অন্যান্য স্থান হইতেও যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তবে যে সকল কথা নগেন্দ্র বাবু উল্লেখ মাত্র করিয়াই ছাড়িয়াদিয়াছিলেন অথবা যেসকল কথা হইতে তিনি স্বপ্রয়োজনানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি সেই সকল কথার ভাবার্থ আমার বোধানুযায়ী গ্রহণ করিয়াছি।

রায় সংস্কৃত, আরবি, পার্শি, উর্দু, বাঙ্গালা, ইংরেজী, গ্রীক্, ল্যাটিন, হ্রেক, এবং হিব্রু এই দশ ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রথম গ্রন্থখানির বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদও আছে।

নগেন্দ্র বাবুই রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যারপর নাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও তিনি আপনাকে চিরজীবন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকালে গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দকে যারপর নাই ভক্তি করিতেন। এক সময়ে তিনি ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। পৈতৃক বিষয়ে আপনার সত্বরক্ষার মোকদ্দমাতে তিনি আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়াও তিনি হিন্দু আচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধুদিগকে স্পষ্টরূপে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না হয়। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতশরীরে ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। রামমোহন রায় বলিতেন, আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম—আদর্শ হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

এখন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বর্ত্তমানে আমরা 'ব্রাহ্মসমাজ' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা "নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে (এবং) ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অত্যন্ত মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে।" এমতাবস্থায় স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে উহার-সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব কি ছিল! এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমাদিগের তিনটী বিষয় বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত উপাসনামন্দিরের উপাস্য কে! দ্বিতীয়তঃ উপাসক কে? এবং তৃতীয়তঃ উপাসনার প্রণালী কি?

১ম প্রশ্নের উত্তর। রামমোহন রায়ের (প্রত্যেক হিন্দুর, প্রত্যেক বৌদ্ধের, প্রত্যেক মুসলমানের, "প্রত্যেক খৃষ্টানের) উদ্দিষ্ট উপাস্য দেবতা "ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, অনাদি, অনন্ত, অগম্য, অপরিবর্ত্তনীয় ."নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ" পরব্রহ্ম।

দ্বিতীয় কথার উত্তর। "যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য রামমোহন রায়ের উপাসনা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। জাতি সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, সামাজিক পদ এসকলের কিছুই বিচার নাই। ট্রষ্ট ডীড, পত্রে ইহাকে বলা হইয়াছে A place of public meeting of all

sorts and descriptions of people, without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner.

উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এখানে সাম্প্রদায়িক ভাবে উপাসনা চলিবে না, "যে কোন জীব বা পদার্থ, কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বক্তৃ অসংগীতে বিদ্রূপ, তাচ্ছীল্য বা ঘৃণার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, (এবং সকলের উপরের কথা) যাহাতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।" জাতীয় জীবন প্রবুদ্ধ করিবার, স্বদেশবাসীদিগকে পরধর্ম্ম (খৃষ্টানধর্ম্ম) গ্রহণ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে? (রাজনৈতিক বিভাগে রামমোহন রায়ের কর্ম্ম ভারতবাসী ভুলিতে পারিবে কি?)

উপর্য্যুক্ত বিবরণগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, একপ্রকার 'সম্মেলন'প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায়ের কি মহদুদ্দেশ্য ছিল, এবং এই সম্মেলনকে যে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামক একটা বিশেষ সম্প্রদায়ে পরিনত করিতে চান নাই, তাহাও প্রতীত হয়। ট্রাষ্ট ডীডে তিনি এই সম্মেলনমন্দিরকে 'said message or building' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে কোন সমাজ হইতে পারে না, পরম ব্রহ্মের উপাসক যাঁহারা হইয়া গিয়াছেন (হইতে পারিয়াছেন) তাঁহারা 'ব্রাহ্মসমাজ'ভুক্ত হইয়া সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মসমাজ'ভুক্ত করিতে যাওয়া যে কথা algebraর a, b, c কে King Primer a. b, c মনে করাও সেই কথা (একজন বালক মেট্রিকুলেশন ক্লাশের আপন দাদাকে Algebraর অঙ্ক করিতে দেখিয়া সত্যই তাই মনে করিয়াছিল)।

উপসংহারে বলি, আর একদিনের মত কিন্তু আরও বেশী কথায় বলি, এস এস ভাই তুমি,তুমি হিন্দু হও কি মোস্লেম হও, তুমি ব্রাহ্মণ হও, কি চণ্ডাল হও ; তুমি শুচি হয়ে, যে ভাবেই কর না কেন তুমি পূজা, এস আমরা সকলে মিলে প্রণত হই সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের চরণে,"ভারতের ভাগ্যচক্রের সঙ্কটময় পরিবর্ত্তনে—যখন চারিদিক অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবৃত—জাতীয় জীবন

মৃত * * * * (তখন) যে মহাত্মার অভ্যুদয়ে ভারতে নবযুগের সূচনা হইয়াছে, * * * * ভাবী ইতিহাস লেখক বর্ত্তমান জাতীয়জীবন স্রোতের উৎপত্তি ও স্থিতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাঁহার বিরাট মূর্ত্তি-সমক্ষে লেখনী ত্যাগ করিয়া করযোড়ে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিবে—যিনি ভারতের পরমধন লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীকুঞ্জলাল দত্ত।

গুলিস্তাঁর গুল-সৌরভ।

গত মাঘ সংখ্যা সাহিত্যে বোস্তা ও গুলিস্তাঁর মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবির গুলিস্তাঁর গুল-সৌরভ পৃথিবীর চারিধারে বিস্তৃত হইয়া কিরূপ আমোদিত করিয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। গুলিস্তাঁ কবি শেখসাদীর সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রতিভার চরমোৎকর্ষতার হিসাবে—কবির রচনাবলীর মধ্যে গুলিস্তাঁ প্রথম ও বোস্তাঁ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রলব্ধজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পর্য্যটন-কালীন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানবচরিত্র অধ্যয়ন ও ইহাদের সহিত ঈশ্বরানুরাগ, পবিত্র রুচি কবির আজন্ম প্রকৃতিগত ছিল বলিয়াই তাঁহার পক্ষে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর মতসর্ব্বগুণান্বিত কাব্য রচনা সম্ভব হইয়াছিল। বাল্যে কবির তরুণ হৃদয়-ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরানুরাগ ও জ্ঞানান্বেষণের বীজ গুপ্ত হইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া পরে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হয়। বোস্তা কবির জীবন-বৃক্ষের সুরভিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প, গুলিস্তাঁ এই বৃক্ষের সুস্বাদু ফল। সংসারযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সংসারতাপদগ্ধ মানব, পথভ্রান্ত পথিক, প্রিয়জনবিয়োগকাতর এই বিশাল মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় আসিয়া শান্তিলাভ করে ও তত্ত্বান্বেষী এই বোধিদ্রুমতলে আসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পায়।

যে যুগে শেখ সাদী আবির্ভূত হন, সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্য দেশে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নিদর্শন অতি অল্পই ছিল, যাহাকে আদর্শ করিয়া

কবি সাহিত্য-জগতে অগ্রসর হইতে পারিতেন। কবি তাঁহার অনামুষী প্রতিভাবলেই উৎকৃষ্ট ও আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া পারস্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যই আদর্শ সাহিত্য রূপে সম্মানিত। কবির জীবন-বৃক্ষের প্রস্ফুটিত পুষ্প ও সুস্বাদু ফল গুলিস্তাঁর অবিনশ্বর গুল-সৌরভে জগৎ সৌরভে আকুল। সাদীর সুগঠিত বাক্য বিন্যাস শব্দচয়ন, অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সুষমা, ইন্দ্রজালময়ী কাব্য মায়ার বিচিত্র বিকাশ, বর্ণনার বিচিত্রভঙ্গী, নানা বিষয়িণী রচনার মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াই ক্ষান্ত নহে, ভাবের অনুভূতিতে, উন্মেষণে, মানব-চরিত্র অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সকল শ্রেণীর পাঠক কবির, কোমলকান্ত পদাবলীর মধুর ভাবে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন; ধীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচক তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ সমালোচনা ভুলিয়া কবির বর্ণনার সৌন্দর্য্যে, দার্শনিকতামণ্ডিত নীতি-কথা ও ভাবের প্রবাহে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। সাদীর সৃষ্ট-সাহিত্য স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত, উপভোগের বস্তু, সমালোচনা করিবার নহে।

সাদির গুলিস্তাঁর গোলাপ, কৃত্রিমপাথায় বদ্ধ কারুকার্য্যময় কৃত্রিম গোলাপ নহে—ইহা কবির মানস-প্রকৃতির উর্ব্বর ক্ষেত্রজাত কণ্টকাচ্ছন্ন অকৃত্রিম গোলাপ বৃক্ষের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত প্রস্ফুটিত গোলাপ। তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপরূপ অনেক কণ্টক যদিও কবির গোলাপবৃক্ষে আছে, কিন্তু গোলাপ, কণ্টকের বহু উর্দ্ধে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ ছড়াইয়া দিগন্ত মাতাইতেছে। সে কণ্টকে বিষ নাই বা সেই ভ্রমরগুঞ্জরিত, বুলবুলঝঙ্কৃত গোলাপের কুঞ্জে বিষধর সর্প লুক্কাইয়া নাই। সে গোলাপ-কুঞ্জ আত্মসমাহিত কবির পবিত্র আত্মার বেদী। বসন্তের মধুর ও উজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত সৌরভপূরিত গোলাপ-কুঞ্জের দিকে আজও জীবন-পথের পথিক আনন্দ-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। পথিক দেখে যে ভগবানের আশীষে মানবাত্মার সানন্দের জন্য উদ্যানরচয়িতার প্রাণই গোলাপ পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি তাঁহার উর্ব্বরমস্তিষ্কপ্রসূত সুচিন্তাগুলি স্তোত্রনাপূর্ণ ভাষায় সুপ্রযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিন্তাগুলি সারবান্ ও অমূল্য বলিয়া ইহা হইতে সার সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। উদ্যানস্থিত অসংখ্য কুসুম-রাশির মধ্যে কোনটী বর্ণরাগে উজ্জ্বল, কোনটী বা সুগন্ধে ভরপুর অথবা বাক্স-স্থিত মণিমুক্তাবলীর মধ্যে কোনটী সুন্দর, কোনটী বা অতিশয় সুন্দর ও অত্যুজ্জ্ব

ইহাদের মধ্য হইতে যেমন উৎকৃষ্টতর বস্তু নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়, তেমনি গারস্তের পুণ্যশ্লোক সাধু কবির গুলিস্তাঁ হইতে কতকগুলি নয়নানন্দ সুরভিপূর্ণ গুল চয়ন করিতে পারা যায়। গুলিস্তাঁ সুগন্ধি পরিমলপূরিত প্রস্ফুটিত গোলাপে পূর্ণ। ইহা হইতে কতকগুলি গুল চয়ন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। প্রথম অধ্যায় রাজকীয় ব্যবহারবিষয়ক। গল্পচ্ছলে কবি উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, হিংস্র শার্দ্দূল যেমন কখনও মেষপালনে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অবিচারী অত্যাচারী রাজা কখনও প্রজাপালন করিতে পারেন না। যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করেন, তাঁর রাজস্ব দুগ্ধ দিয়া সর্প-ভীতিক্রয় করায় তুল্য। প্রজার জন্যই রাজার আবশ্যক, রাজার জন্য প্রজা নহে; প্রজারাই রাজ্যের ভিত্তি এবং রাজা সৌধ; প্রজারা বৃক্ষকাণ্ড—রাজা বৃক্ষ। বৃক্ষ কাণ্ড হইতে শক্তি সংগ্রহ করে, সৌধ মৃত্তিকা মধ্যস্থ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এই নীতিটী কবি গল্প-চিত্র মধ্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; আমরা এই চিত্রটী পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম:—

পারস্য দেশে এক অত্যাচারী ও অবিবেচক নরপতি ছিলেন। প্রজারা তাঁহার অত্যাচারে এতই উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, একে একে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে লাগিল। প্রজাগণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে রাজস্ব সংগ্রহ হইল না, ক্রমশঃ ধনাগার শূন্য হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া নিকটবর্ত্তী কোন রাজা, রাজ্য আক্রমণ করিবে, এইরূপ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। শাহনামার যে অংশে জাহকের রাজ্য নষ্ট ও ফরিদুনের রাজ্য প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত আছে, রাজার সম্মুখে সেই অংশটী পাঠ করিয়া শুনান হইতেছিল। রাজমন্ত্রী বলিল, মহারাজ! ফরিদুনের রাজ্য ছিল না, ধন-বল ছিল না, সৈন্য-বল ছিল না—তবুও তিনি কি প্রকারে হৃত-রাজ্য শত্রু রাজার কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন? রাজা বলিলেন, আপনারা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রজারা ফরিদুনকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রেমের চক্ষে দেখিত; সুদৃঢ় প্রেম-রজ্জুই ফরিদুনকে তাহার হৃত-রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিল। রাজমন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! রাজার প্রতি প্রজার প্রেমানুরক্তিই যদি ফরিদুনের রাজ্য-প্রাপ্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আপনি কেন রাজ্য হইতে প্রজাগণকে বিতাড়িত করিতেছেন? অবশ্য আপনার যদি রাজত্ব করিবার বাসনা না থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, মন্ত্রিবর! কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজারা রাজার অনুরাগী হয়?

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! প্রজাপুঞ্জকে বশীভূত ও অনুরক্ত করিবার দু'টী উপায় আছে; সে উপায় দু'টী হ'চ্চে রাজাকে ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হইতে হইবে। তাহা হইলে প্রজারা পরম শান্তিতে রাজকীয় কৃপার ছায়ায় পরম সুখে বাস করিবে। মহারাজ! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এ দু'টী গুণের কোনটীই আপনার নাই। জ্ঞানীরা বলেন, অবিচারক, অত্যাচারী রাজা, হিংস্র শার্দ্দূল সদৃশ, কখনো প্রজাপালন করিতে পারেন না; যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করেন, তিনি নিজ রাজ্য-ভিত্তি ধ্বংস করেন জানিবেন।" মন্ত্রীর উপদেশ রাজার মনঃপুত হইল না; তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কিছুকাল পরে এই রাজার খুল্লতাত ভ্রাতারা গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাদের পিতৃ-রাজ্য প্রার্থনা করিল; যে সকল প্রজা রাজার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহারা সকলে বিপক্ষ রাজার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে প্রেমশূন্য অত্যাচারী রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

দরবেশের গুণাবলী অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, যাহারা ভগবানের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া জগৎরাজ্যের বাহিরে আসেন, তাঁহারাই যথার্থ দরবেশ। এই অধ্যায়ের একটী চিত্র এইরূপ :—

এক উজীর মিশর দেশের সাধু জুনমুনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে আমি সুলতানের অনুগ্রহ লাভের আশায় ও তাঁহার ক্রোধের ভয়ে দিনরাত তাঁহারি কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছি। ইহা শুনিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধু জুনমুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি সুলতানকে যেরূপ শ্রদ্ধা কর, আমি যদি ভগবানকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিতাম, তাহা হইলে আমি একজন প্রধান ভক্ত হইতাম।

সন্তোষের উপকারিতা নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, সন্তোষের মত শ্রেষ্ঠ ধন দৌলত ইহ সংসারে আর নাই। স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তির কেহ কোন প্রকার হিত বা অহিত করিতে পারে না। এই উপদেশপূর্ণ গল্প-চিত্রটী আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

এক অপুত্রক রাজা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এই মর্ম্মে একখানি উইল প্রস্তুত করান যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিবস প্রাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম নগরের তোরণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে; তৎক্ষণাৎ যেন তাহারি মস্তকে রাজমুকুট, হস্তে রাজদণ্ড দিয়া রাজত্বের ভার

অর্পণ করা হয়। রাজার মৃত্যুর পরদিবস প্রাতে নগর-তোরণ-দ্বারে এক ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমন্ত্রী এবং সভাসদ্‌বর্গ একত্র হইয়া এই শতগ্রন্থি-যুক্ত ছিন্নবাসপরিহিত ভিখারীর হস্তে রাজদণ্ড দিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। ভিখারী সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড হস্তে সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে কতকগুলি পারিষদ্ এই ভিখারী রাজার আদেশ অমান্য করিতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী রাজারা চারিপার্শ্ব হইতে রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভিখারী রাজার সৈন্যদল, ধনাগার শূন্য করিয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইল।

বিপদে পড়িয়া ভিখারী রাজা হতাশ ভাবে রাজ্যের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজার ভিখারী-জীবনের এক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুর অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সে অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিল, "বন্ধু, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিন পরে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া আমি অতিশয় সুখী হইলাম। আবার বলি, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, দুঃখের পর সুখ, কুঁড়ি হইতে ফুল ফুটে, আবার পরেই ঝরিয়া যায়—কখনো দেখি বৃক্ষ পত্রপুষ্পশূন্য, আবার দেখি বৃক্ষ পত্রপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া মানবের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ভিখারী রাজা বলিল, "বন্ধু! তুমি কি বলিতেছ, আমার এ অবস্থায় আনন্দ করিবার কিছুই নাই।

তোমার সহিত শেষ সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমার একমাত্র চিন্তা ছিল যে কেমন করিয়া দিনের আহার জুটিবে; আর আজ আমাকে রাজত্বের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহাই যদি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, বন্ধু, তা হলে আমি অতি কষ্টের মধ্যে আছি জানিবে। এই রাজ-জীবন অপেক্ষা ভিখারী-জীবনই আমার শ্রেষ্ঠ। আমি বুঝিয়াছি যে, সন্তোষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছুই নাই; স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তির কেহ কোন প্রকার অনিষ্ট বা ভাল করিতে পারে না।

মৌনাবলম্বনের উপকারিতাবিষয়ক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নীরবে কর্ম্ম করাই ভাল, যেহেতু তোমার কর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেনা। এতদ্বিষয়ক গল্প-চিত্রটী এইরূপ :— ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

নিবেদন।

"Learn to separate head-learning from soul-wisdom"

(১)

বুদ্ধি তোমায় যত্নে মাথায় রাখি
হৃদয় সভায় আসন তোমার নাই ;
সেথায় আমি সঙ্গে যা'দের থাকি,
তা'দের সাথেই থাকতে যেন পাই।

বিজ্ঞ তুমি, কওনা কথা বেশী,
যাহার যেটুক প্রাপ্য তাহা বোঝো ;
বাড়াবাড়ির তুমি চিরদ্বেষী,
সূক্ষ্ম বিচার অহরহই খোঁজো—

মান্য তুমি, সবার চেয়ে বড়,
শ্রদ্ধাভরেই কচ্চি স্বীকার ভাই !
শিরে তোমার চরণ দুটী রাখো
হৃদয় দাবী ক'রো না—দোহাই !

(২)

তর্ক, তুমি বেড়াও বুদ্ধি জুড়ে,
এদিক্‌পানে ছটকে এসো না ;
প্রত্যয়েরে ঘুমুতে দাও সুখে
বিরুদ্ধে তা'র উচ্চে হেসো না ;

বল্‌ছি তুমি মস্ত 'অরেটর'
বক্তৃতা দাও সদর টাউনহলে,
কথার ঝাঁজে সবার লাগে ডর,
চমক লাগাও বিপুল শ্রোতার দলে—

সেই খানটাই মানায় তোমায় ভালো,
অন্দরেতে ভুলেও ঘেঁসো না—
প্রীতি হেথায় মগ্ন গানের ঝোঁকে,
দোহাই তা'রে ভালবেসো না !

(৩)

অন্তরে-মোর নিত্যসাথী যা'রা
গ্রাম্য তা'রা, নেহাৎ গাড়াগেঁয়ে ;
তর্ক-বিচার চায় না তা'রা মোটেই
কুসংস্কার আছেই তা'দের ছেয়ে।
তা'দের মতে নির্ঝর কয় কথা,
চাঁদকে তারা মানুষ ভেবেই ভোলে ;
পেয়াল মতন আপনি কাঁদে, আবার
পরমসুখে হৃদয়-দোলায় দোলে !

এদের নিয়েই একরকমে আমার
চলছে জীবন কালের তরী বেয়ে—
মোটের ওপর মনের সুখেই আছি
মনের মতন সুহৃদ গুণিন্ পেয়ে !

(৪)

বিশেষ কোনো কুঞ্জবীথীর পাশে
বাতাস-দোদুল পুষ্প বালায় চাহি'
নৃত্যপরা অপ্সরীদের দেশে
যায় যদি মন ভাবের তরী বাহি'—
তখন না হয় তোমরা গুণো বসে
পাপ্‌ড়ি তাহার দশটা কিম্বা ছটা
বিচার ক'রো নামটা কি সেই ফুলের,
বর্ণটা তা'র সবুজ কিম্বা কটা ;
দোহাই শুধু নাড়িও না তাল ঠুকে
করতে প্রচার রক্তচোখে চাহি'—
'ফুলের সঙ্গে অপ্সরীদের কোথাও
আত্মীয়তার বিন্দু-সুবাদ নাহি' !

(৫)

বুদ্ধি, তুমি সবার চেয়ে বড়
সবিনয়েই কচ্চি স্বীকার তাই,
মাথায় তোমায় স্থান দিয়েছি আমি
হৃদয় দাবী ক'রোনা—দোহাই !

তোমার সীমায় রাজ্য কর তুমি
প্রয়োজনের গণ্ডী দিয়ে ঘিরে ;
মাঝখানের এই বাড়াবাড়ির দেশে
ভুলেও কভু চেয়ো না ভাই ফিরে।

এই দেশটার অধিবাসী যা'রা
হিসাবের জ্ঞান মূলেই তা'দের নাই—
কোথেকে যে কোন্ কতটা আনে
যতই ভাবি—অবাক্ হয়ে যাই !

(৬)

হৃদয়-গীতি হৃদয় দিয়েই বুঝো
বুদ্ধি দিয়ে খুঁজো না তা'র মানে ;
নয়ন যখন দেখে কানন-শোভা
কর্ণ যেন না চায় সেদিক পানে।

কর্ণ, তাহার শোনাই যে গো কাজ,
দেখার যা' কাজ—আঁখিই যেন করে ;
নয়ন যেন শ্রবণ-পথে না যায় !
আপন পথে চলেই যেন মরে !

পরশ-হরষ বুঝ্‌লে না, তাই বলে'
নাকটা যেন নালিশ নাহি জানায়—
যেদিক্ থেকে যেটাকে যায় পাওয়া
সুখ যে আছে সেদিক্ থেকেই মানায় !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সাহিত্য ৩১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩২৮।

রূপের আকাঙ্ক্ষা।

ভক্ত সাধক কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন,—

"তেঁই শ্যামারূপ ভালবাসি,
কালী জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালোকালী
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।"

আবার মায়ের আর একজন ভক্ত "ভোলাদাস" বলিতেছেন,—

"মাকে ভাবিতে ভাবিতে এখন আমার নয়নাদি ইন্দ্রিয়গুলি অতি দুর্দ্দম প্রবণাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। নয়নদ্বয় এখন মায়ের সেই সুধামাখা রূপ-মাধুরী পান না করিয়া জীবন ধারণে অসমর্থ হইতেছে। মায়ের শ্রীমুখমণ্ডলের সেই স্নেহনিষ্যন্দী নয়নত্রয়, সেই দয়া মমতা-গাথা সস্মিত ওষ্ঠাধর, সেই সমুৎফুল্ল গণ্ডযুগল সন্দর্শনের জন্য আমার নয়ন এখন আত্মহারা হইতেছে।" *

সাধকের এই প্রবল রূপতৃষ্ণার মূল কোথায়? যিনি যত উচ্চাঙ্গের সাধক হইবেন, তিনি ততই বাহির হইতে চিত্তবৃত্তি গুটাইয়া লইয়া অন্তরে সমাধিস্থ হইবেন।

শ্রুতি বলেন,—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ।
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"॥ কঠোপনিষৎ

যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) নিজের আত্মার মধ্যে দেখেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তিলাভ করেন, অন্যে পারে না। আবার ভক্তকবি রামপ্রসাদও গাইয়াছেন,—

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে'
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।"

* "ভোলাদাসের দুর্গোৎসব"—বঙ্গবাসী পূজার সংখ্যা, ১৩২৮।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে, এই "হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে" কয়জনে ডুব দিতে পারেন? আবার যিনি ডুব দিতে পারেন, তিনিই বা কতক্ষণ ডুব দিতে পারেন?

ধীর ব্যক্তি যে প্রণালীতে আত্মস্থ হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহার নাম অধ্যাত্মযোগ।

শ্রুতি বলেন,—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥" কঠোপনিষৎ

সেই পুরাণ পুরুষকে সহজে কেহ দেখিতে পায় না; তিনি আমাদের হৃদয়-গুহায় অতি সঙ্গোপনে লুক্কায়িত হইয়া আছেন। কেবল ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে হর্ষ শোক অতিক্রম করা যায়।

এই অধ্যাত্মযোগ অতি কঠোর সাধনা। ইহাতে রূপরসাদি বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া লইয়া আত্মায় সমাধি করিতে হয়। বিবেক—বৈরাগ্য ও শমদমাদি সাধনসম্পন্ন অধিকারী ব্যক্তিই এই অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিতে পারেন। এই অধ্যাত্মযোগের চরম ফল—নির্ব্বাণ মুক্তি।

কিন্তু যাঁহারা এই যোগমার্গের অধিকারী নহেন, তাঁহারা সেই অধিকার-লাভের জন্য ভগবানের সাকার রূপের উপাসনা করেন। তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের রূপাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, আবার যিনি যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া পরমাত্মায় সমাধিলগ্ন হইতে পারেন, তিনিও সমাধিভঙ্গ হইলে ভগবানের রূপদর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। কারণ সেই অমৃতের স্বাদ পাইয়া তিনি কিছুতেই রূপরসাদির আকর্ষণে মুগ্ধ হইতে পারেন না, তাই রূপরসাদির মধ্যেও সেই পরম বস্তুকে খুঁজিয়া বেড়ান।

এতদ্ভিন্ন যাঁহারা ভক্তিপথের সাধক, ভগবানের সাকার রূপই তাঁহাদের একমাত্র উপজীব্য। তাঁহার সাকার রূপ আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের অনুরাগের বিকাশ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারাও নিম্ন স্তরের সাধক নহেন। রাম-প্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণ জগন্মাতার সাকার রূপাবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হৃদয়ের অসাধারণ অনুরাগ দ্বারা বিশ্বেশ্বরী

জগদম্বাকে সাধারণ মায়ের মত আপনার জন করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই, রামপ্রসাদ কখনও মাকে ভক্তের ন্যায় পূজা করিতেছেন, কখনও সরলপ্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের সঙ্গে কত আবদার করিতেছেন, কত খেলা ও কৌতুক করিতেছেন, কখনও মায়ের নিকট হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিতেছেন, আবার কখনও বা মাকে অভিমানভরে গালি দিতেছেন।

"কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানসশিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা-শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণচাতকের তৃষা-ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম করে।
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে।"

এখানে কালো রূপে মুগ্ধ ভক্তহৃদয় প্রেমে গদগদ, দু'নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে।

"মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কিগো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥"

এখানে ভক্তের মায়ের চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব।

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব ক'রে কয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥"

এখানে সরল শিশুর ন্যায় আবদার।

"আমি কি আটাশে ছেলে।
ভয়ে ভুলব'নাকো চো'ক রাঙ্গালে॥"

এখানে ভক্ত সন্তান মাতার সহিত ঝগড়া করিতেছেন।

"মরি গে এই মনোদুঃখে
ওমা মা বিনে দুঃখ বলব কাকে॥
একি অসম্ভব কথা, শুনে যা কি বলবে লোকে।

ঐ যে পরমা জগদীশ্বরী
তার ছেলে মরে পেটের ভুখে ॥"

এখানে ভক্ত ছেলে মায়ের কাছে অনুযোগের সহিত নিজের [illegible] জানাইতেছেন।

"মায়ের এমি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥"

এখানেও সেই অনুযোগের ভাব।

"মা মা ব'লে আর ডা'কব না।
ওমা দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।"

এখানে ভক্তের পূর্ণ অভিমান।

"মা বলে ডাকিসনা রে মন
মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দেখা দিত
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥"

এখানেও সেই অভিমান ও কৌতুক।

"এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা করে যাব।"

এখানে সেই কৌতুক পুরামাত্রায় চড়িয়াছে।

"বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে।
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সবাই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে ॥"

এখানেও মায়ের সঙ্গে সন্তান পরিহাস করিতেছেন।

"মা বসন পর,
বসন পর গো মা বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি।"

এখানে মায়ের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমনভয় রেখেছি॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি॥"

এখানে ভক্ত সন্তানের মায়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর।

ভক্ত এইরূপে জগদম্বাকে গর্ভধারিণী মায়ের মত সেবা করিতে করিতে কখন কখন দেখিতে পান, মা আর কেহ ন'ন। তিনি জগদীশ্বরী জগন্মাতা। মায়ের ঐশ্বর্য্যভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া রামপ্রসাদ গাইতেছেন,—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তা জান না॥"

জগন্মাতার প্রতি ক্ষুদ্র মানবত্বের আরোপ করিয়া সেবা করিলেও সাধকের মন সেই ক্ষুদ্র ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না। তাই রামপ্রসাদ গাইতেছেন,

"এমন দিন কি হবে তারা:
যবে তারা তারা তারা ব'লে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥

হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ না মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা।"

ভক্ত সাধক এখানে ভাগীরথী বাহিয়া যাইতে যাইতে যেন অদূরে সাগর গর্জ্জন শুনিতেছেন। তাঁহার জবা বিল্বদলে, ভোগরাগে নৈবেদ্যে তুষ্ট রূপ-লাবণ্যময়ী মা যে প্রকৃত "নিরাকারা" তিনি যে সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করেন, এখানে ভক্তের মনে তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে ডুব দিয়া "রতন মাণিক্য" হস্তগত করিয়াছেন।

কিন্তু রামপ্রসাদ জ্ঞানযোগীর প্রার্থনীয় নির্ব্বাণ মুক্তি কামনা করেন না। তাই তিনি গাইয়াছেন,

"নির্ব্বাণে কি আছে বল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।"

তাহা হইলেও রামপ্রসাদের ন্যায় পরা ভক্তির সাধন করিতে করিতে পরিশেষে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়।

আর এই পরাভক্তিসাধনের যে ফল, জ্ঞানসাধনেরও সেই চরম ফল।

"ভক্তেশ্চ যা পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

দেবীগীতা।

জগন্মাতার ভাবগর্ভ সাকার রূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধক কিরূপে মায়ের নির্গুণ ভাবে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, পূর্ব্বকথিত "ভোলাদাস" তাহা এই ভাবে বলিতেছেন,—

"মা'এর ঐ রূপ সন্দর্শন কালে পৃথক্ ভাবে নিজের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, নিজের দেহাদি সংজ্ঞাশূন্য ও ক্রিয়াবিহীন হইয়া চিত্রপুত্তলীর আকারে পরিণত হয়। তখন আমি দ্রষ্টা, মা দৃশ্য এ অনুভবের অবকাশ থাকে না, তখন কেবল মা'ই হউন অথবা কেবল আমি হই, এক'তত্ত্বমসি' উদ্ভাসিত হয়। অতএব ইহা উপাসনারই অন্তর্গত ব্যাপার, ভক্তির কাষ্ঠাপ্রাপ্তির দশাও এই ভাবে হয়।"

মায়ের পরমভক্ত ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবেরও এই প্রকার ভাব সমাধির কথা শুনা যায়। সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা।

রামপ্রসাদের ন্যায় আরও একজন ভক্ত কবি জ্ঞানযোগীর নির্ব্বাণমুক্তি চান না। তিনিও রূপরসগন্ধ স্পর্শাদির মধ্যে থাকিয়া, রূপরসগন্ধ স্পর্শ শব্দের সাহায্যে ভগবানের উপাসনা করিতে চা'ন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বাহু ধরে
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমায় অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত

সমস্ত সংসার মার লক্ষ্য বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে, দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝ খানে।
মোহ মোর মূর্ত্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে দলিয়া।"

রবীন্দ্র নাথও সাকারোপাসকের ন্যায় মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়া নানা বর্ণ-গন্ধময় চন্দনসিক্ত সুগন্ধি কুসুমসম্ভার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগ্য বস্তু দ্বারা, দৃশ্য গন্ধ পানের মাঝখানে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। তবে সাকারোপাসকের এই সকল উপাসনার উপকরণ বাস্তব, আর তাঁহার উপকরণগুলি রূপক মাত্র। কিন্তু কবির কল্পনা হইলেও তাঁহার এই রূপের আকাঙ্ক্ষা যে আন্তরিক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গীতাঞ্জলিতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

তিনি তাঁহার হৃদয়ের বাঞ্ছিতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধ বরণে, এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস চিত্তে সুধাময় হরষে
এস মুগ্ধ মুদিত দু'নয়নে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে॥"

আবার—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুর'ব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥"

আবার—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি

বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয় পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥"

ভক্ত কবি কেবল সেই অরূপের মধ্যে রূপ দেখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, রামপ্রসাদের মত তিনি ভগবানের সহিত অনেক মানবীয় ভাবের সম্বন্ধ পাতাইয়া আলাপ করিতেছেন।

"সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হত ভাগিনী!
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী॥"

এখানে কবির ভগবানের প্রতি প্রেমিকা বা নায়িকার ভাব।

"আসন তলের মাটীর পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"

এখানে ভক্ত সাধকের দৈন্য।

"প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখোনা ঢাকি!
এসেছি, হে নাথ,
পরাতে রাখি॥"

এখানে ভক্ত ভগবানের সহিত কৌতুকচ্ছলে সম্বন্ধ পাতাইতেছেন।

"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে।
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে,
ভিখারী হৃদয় হা রে,
তোমারি করুণা মাগে।
কৃপা নাই পাই
শুধু যাই
সেও মনে ভাল লাগে॥"

এখানে ভক্তের তীব্র দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও দৈন্য।

"জননী তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে।
জননী তোমার মরণহরণবাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে যুগে যুগে॥"

এখানে মা'য়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া সন্তানের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তিনি এখন মায়ের ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ।

বিশ্বকবির এই সকল ভাবের কোমলতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধক কবি রাম প্রসাদের ভাবের বৈচিত্র্য ও হৃদয়ের সরলতা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"এর সাধনা করিতে করিতে বিবেক বৈরাগ্য-লব্ধ নির্ব্বাণ মুক্তিপথ তাঁহার জন্য নহে, ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া, অরূপের রূপ সাধনার রাগিণীতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধিয়া তাহার সুরে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, রূপের আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। এ দেশের সাধকগণ আর্টের সাহায্যে সেই আকাঙ্ক্ষার পুষ্টি সাধন করিয়া ভগবদারাধনার এক উৎকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ।

বাঙ্গালীর বল।

শ্রীমান্ রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য সুললিত রচনানৈপুণ্যের জন্য বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার অশেষ অধ্যবসায়পূর্ণ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল "বাঙ্গালীর বল" নামক নূতন বহি বাহির হইয়াছে, এবং বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্যই শ্রম সার্থক হইতে পারে না; বাঙ্গালীর নিকট আদর পাইলেই শ্রম সার্থক হইবে। কিছু কিঞ্চিৎ অদল-বদল, পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন, সংশোধন-পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন থাকিলেও, গ্রন্থখানি আদর লাভের যোগ্য হইয়াছে। যিনি এই বহুতথ্যপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ইহাতে জানিবার ও ভাবিবার কথার অভাব নাই। কি সেকালে, কি একালে কোন কালেই বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব থাকা স্বীকার করা যায় না। বিগত জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধেও বাঙ্গালী বাহুবলের পরিচয় দিয়া সমগ্র সভ্য সমাজের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বাহুবলকেই একমাত্র বল মনে করিলে মানবের ইতিহাসকে বড় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিতে হয়। এখন সুধীসমাজ সে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া ইতিহাসের নূতন ধারা প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার জন্যই সকল সভ্যদেশে পুরাতত্ত্বের অনুশীলন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ লাভ করিতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা এক অভিনব পথে ধাবিত হইতেছে। এই পথে বাঙ্গালীর বলের তথ্যানুসন্ধান আরম্ভ হইলে আরও অনেক বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। সেকালের বাঙ্গালী ইতিহাস রচনা করিত না বলিয়া পুরাতত্ত্বে আস্থাশূন্য ছিল না। একালের অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পুরাতত্ত্বে আস্থাশূন্য। তাঁহাদের বাঁধা বুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বুলি এই যে, ইতিহাসে সত্যের সন্ধান লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আর এক শ্রেণীর বুলি এই যে, ঠাকুরদাদার আমলে দুর্গোৎসব হইত, বেশ হইত, তাহা জানিয়া লাভ কি? তাহাতে কি আমার বর্ত্তমান দারিদ্র্য দূর হইতে পারে? এই শ্রেণীর পুরাতত্ত্ববিমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রভাব বাঙ্গালীর ইতিহাসচর্চ্চাকে অনেকটা পঙ্গু

করিয়া রাখিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকে উৎসাহ দিয়াছেন, হাল মন্ত্রি-সমাজের সুমার্জ্জিত শাসনসময়ে তাঁহাদিগের নিকট এ পর্য্যন্ত ততটুকু উৎসাহও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কলিকাতায় যে ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল, তাহাতেও ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালীর বলের ন্যায় গ্রন্থ এই শ্রেণীর সংকীর্ণ নীতিপ্রিয় সুশিক্ষিতের নিকট তেমন সমাদর পাইবে বলিয়া আশা করিতে সাহস হয় না। কিন্তু যাঁহারা দেশের লোক, দশের অভ্যুত্থানের জন্য আগ্রহপূর্ণ, তাঁহারা অবশ্যই এরূপ গ্রন্থের সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না। এই শ্রেণীর গ্রন্থসঙ্কলনের প্রয়োজন আছে, একখানি গ্রন্থে সে প্রয়োজন পর্য্যাপ্তরূপে সিদ্ধ হইয়া যায় নাই। আরও চাই,—এমন গ্রন্থ আরও আবশ্যক। ভ্রম ত্রুটি মতভেদ কালে সংশোধিত ও মীমাংসিত হইয়া যাইবে;—এখন যে যেমন করিয়া পার, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার কথা শুনাও। তাহার সময় আসিয়াছে বলিয়া এই বহিখানি সময়োচিত হইয়াছে। রসসাহিত্য-রসিক বাঙ্গালী পাঠক উপাখ্যানপ্রিয়। বহিখানি উপাখ্যানের ভাষায় রচিত। সে ভাষা রঙ্গে ব্যঙ্গে অশ্রুপাতে পুলকোদ্গমে, কলকল্লোলে ও তাণ্ডবলীলায় সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ভূমিকা লিখিয়া তাহার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হিন্দু বিধবা।

(১)

দেখনা সমাজ দেখনা চাহিয়া
করুণা আকুল প্রাণে,
গৈরিকবসনা আভরণহীনা
ক্ষুদ্র বালিকাটী পানে।
অষ্টম বরষে গৌরী-দান পুণ্য
লভিতে উহার পিতা,
সপ্ততিবয়স্ক কুলীনের সনে
ক'রেছিল বিবাহিতা।
না বুঝিতে বিয়ে না চিনিতে পতি
বৎসর না হ'তে গত,
একদা শ্মশানে সাজিল যোগিনা
চির জনমের মত।

* * *

(২)

রাঙ্গা সাড়ী তরে কাঁদে যে বালিকা
গৈরিকে ঢাকিবে কায়!
একবার মাত্র হবিষ্যের বিধি
পাঁচ বার সেই খায়!
সীমন্তে সিন্দুর অধরে তাম্বুল
খোপায় কুসুম হার—
অলক্তে রঞ্জিতে পদতল দু'টী
নাহি আর অধিকার!
বিধিরা সাজিয়া বসনে ভূষণে
ছুটে বিবাহের বাড়ী

অশুভদর্শনা অভাগিনী কাঁদি
ভূমিতলে গড়াগড়ি।
আজ একাদশী তার পক্ষে বিধি
নির্জ্জলা উপাস জ্বালা,
হায়, শাস্ত্রবিধি কেমনে বুঝিবে
অষ্টমবর্ষীয়া বালা?

(৩)

হে সমাজপতি জ্ঞানী গরীয়ান্
বুঝিলে কেমন রীতি,
পত্নীর বিয়োগে নাহিক তোমার
চির ব্রহ্মচর্য্য বিধি!
প্রবৃত্তি দমনে অক্ষম হে বৃদ্ধ!
নানা মত ষত্নবান,
পঞ্চম পক্ষের নবোঢ়া পত্নীর
ভাঙ্গিতে মধুর মান!
নারীকুল তুচ্ছ স্বেচ্ছাক্রীড়নক
ফেলে রেখে যাবে তারে,
তব খেলাশেষে উচ্ছিষ্ট করিয়া
চির জনমের তরে!
ভস্ম করি তা'র জীবনের সাধ
তোমার চিতাগ্নি মাঝে,
বিধান তোমার আসিবে ফিরিয়া
যৌবনে যোগিনী সাজে!

(৪)

নানা চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় রসে
রসাল রসনা যার
কেমনে ভাবিবে একাদশীক্লেশ
ক্ষুদ্র বাল বিধবার?
সঘোল স-অণ্ড মৎস্যমুণ্ডকুল
দু'বেলা চর্ব্বণরত!

ভাব কি একবার বিধবাকুলের
হবিষ্যের সুখ কত ?
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দারুণ নিদাঘে
কাতরা লুণ্ঠিতাভূমি।
করুণনয়নে চাহ কি একবার
নিদয় সমাজ তুমি,
ভাব তব সম রক্ত-মাংসে গড়া
তাদেরো শরীর মাঝে,
তোমারি মতন ইন্দ্রিয়নিচয়
এখনো সজীব আছে ?

(৫)

হে সৌভাগ্যবতী সধবানিচয়
সকল সোহাগ আশা,
অশুভদর্শনা বিধবা বলিয়া
কি হেতু কুঞ্চিত নাসা ?
তোমাদেরি মত সৌভাগ্যগর্ব্বিতা
সেও ছিল এক দিন,
সুশান্ত সৌন্দর্য্য সুষম ও কায়া
ছিল না ভূষণহীন।
ফুটন্ত গোলাপ পাইত সরম
হেরি ও বদনখানি,
আজি মর্ম্ম তাপে বিশুষ্ক মলিন
নয়নে ঝরিছে পানি।
মর্ম্মক্ষতে দাও সান্ত্বনা প্রলেপ
ভুলাইয়া দাও জ্বালা,
ওত ঘৃণ্যা নহে হায় অভাগিনী—
পতিহীনা হিন্দুবালা।

(৬)

বৃথায় নাহিক প্রাণের বাঁধন
প্রেমের মিলন মধু,

শাস্ত্রের দোহাই সমাজশাসন
মিলনের মূল শুধু।
অষ্টমবর্ষীয়া পত্নীর যথায়
একাশীতিবর্ষীয় পতি,
সেথা দেখিবারে নহে কি দুরাশা
ব্রহ্মচর্য্য 'মূর্ত্তিমতী'?
সারাটী জীবন বিফল করিতে
কার আছে অধিকার?
সংসারের জ্ঞান নাহি একবিন্দু
পাপহীনা বালিকার?
সে কি নহে নারী? নারীর কর্ত্তব্যে
আসেনি কি ধরাধামে?
নির্দয় সমাজ করুণ নয়নে
চাবে না কি ওর পানে?

(৭)

আপনি সংযতা নিষ্কামকর্ম্মিষ্ঠা
ধর্ম্মনিষ্ঠা নিরুপমা,
পরের কল্যাণে কর্ম্মরতা সদা
ধরাতলে দেবীসমা।
হৃদয়ে স্থাপিত পতির মূরতি
মগ্না সদা পতিপ্রেমে,
একমাত্র আশা প্রেমের স্মরণে
মিলিবে পতির সনে।
পার কি পুরুষ ওর সম তুমি
পত্নী পরলোকে যার,
চির ব্রহ্মচর্য্য একনিষ্ঠ প্রেমে
সম হিন্দুবিধবার?

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস—

বাঙ্গলার জাতিবিজ্ঞানের কয়েকটি গোড়ার কথা।*

মানুষের বাহিরের আকৃতি, চিন্তা করিবার শক্তি, মানসিক প্রবৃত্তির বিকাশ, ভাষা, ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি নীতি এবং অনুশাসন—এই গুলির উপর নির্ভর করিয়া জাতি বিজ্ঞান বা Ethnology সম্পূর্ণ ও সমস্ত ভাবে দাঁড়াইতে পারে। আমাদের দেশে জাতিবিজ্ঞান বলিলে সাধারণতঃ যেন মনে হয় যে, উহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, চণ্ডাল, নাপিত, ধোপা—প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণীর সম্বন্ধেই একটা বিস্তৃত আলোচনা, কারণ আমরা 'জাতি' এই কথাটিকে (Yoological প্রাণিবিজ্ঞানের Race অথবা Sub-species হিসাবে কখনও চিন্তা করি নাই, আমাদের নিকটে তাই জাতি ও বর্ণ এই দুই শব্দই Caste-এই কথাটিরই প্রতিশব্দ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে 'জাতি' শব্দের ব্যবহার করিলে বৈজ্ঞানিক Ethnology বা জাতিতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না।

বাঙ্গালার জাতিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগকে সমস্ত বাংলাদেশের লোকের যে Physical type অর্থাৎ শারীরিক আকৃতি, সেইটিকে আমাদের অনুসন্ধানের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিতে হইবে। পরে, Psychological অর্থাৎ মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া, ধর্ম্ম ও সমাজের ভিতর দিয়া এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নিজস্ব যে সকল প্রথা আছে, সেইগুলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া যতগুলি সম্ভব Ethnic strata অথবা জাতীয় স্তরের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি সমস্ত বাংলা দেশের যে একটি সাধারণ আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা বলিলাম—সেটিকে সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে অবশ্য অন্ততঃ তিনটি জাতীয় স্তরের প্রমাণ তাহা হইতে পাওয়া যাইবে—সন্দেহ নাই; সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু আমার মনে হয় মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের অনেক মতবৈষম্য সত্ত্বেও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর বিভিন্নতা অনুসারে বংশপারম্পর্য্য

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিজ্ঞান সমিতিতে (৩রা মার্চ্চ ১৯২২) পঠিত।

(Law of heredity) ও জীবনসংগ্রামের উপযুক্ততা এই দুইটি বিবর্ত্তনের প্রধান কারণকে অবলম্বন করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির জাতি সৃষ্টি হয়, এ বিষয়ে কোন মতভেদের কারণ নাই এবং থাকিলেও তাহা সুযুক্তির সহিত এ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বাংলাদেশকে যে আমি একটা জাতির আবাসস্থল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি—সেটা সম্বন্ধে অনেকেই হয়ত তর্ক তুলিবেন, কারণ প্রাণি-বিজ্ঞানের নিক্তিতে মানববিজ্ঞানকে ওজন করিয়া বলিতে গেলে, এমন কি সমস্ত পৃথিবীর জাতিবিজ্ঞানের সহিত বাংলার জাতিবিজ্ঞানের সমাবেশ করিতে গেলে একথা কখনই বলিতে পারা যাইবে না যে, বাংলার সমস্ত লোক একটি জাতি হইতেই উদ্ভূত এবং তাহাদের আকৃতিগত ও মানসিক কোন প্রকার বৈষম্য নাই।

জাতিভেদের উৎপত্তি কিংবা শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক প্রমাণাদি সম্বন্ধে এখানে কোন কথা উল্লেখ না করাই ভাল। কারণ বাংলাদেশে জাতি বা বর্ণভেদ প্রথমে সৃষ্ট হয় নাই এবং এখনও প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্র স্থল পঞ্জাব, রাজপুতনা, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে যে ভাবে বর্ণভেদ প্রচলিত আছে, বাংলা দেশে সে ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক মধ্যদেশে এখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবই শূদ্র। আবার আরও একটি কারণে পৌরাণিক প্রমাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না; সেটি হইতেছে এই যে, কোন কোনস্থলে যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন Ethnic group জাতি হইতে উৎপন্ন এক একটি সংঘ বলিয়া মনে হয় আবার তেমনি কোন কোন স্থলে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এরূপ বচনও দেখা যায়। দ্বিতীয়টিকেই যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই মনে হইবে যে, বিভিন্ন বর্ণগুলি একই প্রাথমিক জাতি হইতে উৎপন্ন। প্রথম শ্রেণীর শাস্ত্রানুশাসন মানিলে বর্ণভেদ বংশগত এবং জাতিগত বলিয়া মনে হইবে; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুশাসন মানিতে হইলে বর্ণভেদকে কর্ম্মগত বা Individualistic বলিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে এই কর্ম্ম বা পৌরুষগত জাতিভেদকেই উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন হইতে আমরা এ সত্যে উপনীত হইতে পারি। সুতরাং আমরা বর্ণ-ভেদকে

জাতিগত বৈষম্যের খুব বড় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার 'ভারতীয় আর্য্যজাতিসমূহ' শীর্ষক পুস্তকে কপিল কেশ-যুক্ত ব্রাহ্মণগণের যে বর্ণনা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন—সেরূপ প্রমাণ—সংখ্যায় এত অল্প যে, তাহার উপর কোন জাতি-গত বৈষম্যের ভিত্তিস্থাপন করা যায় না আর এক কথা এ স্থানে বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না; যদি বৈদিক সভ্যতা শুধু ব্রাহ্মণ—কিংবা নর্ডিক শ্রেণীর ইন্দ-ইউ-রোপীয়গণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যুগে এ দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা নিশ্চয়ই পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের হইতে অনেকটা বিভিন্ন ছিল; কিন্তু তবুও কি করিয়া তাহারা বৈদিক সভ্যতার মধ্য যুগেই একেবারে ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া এক প্রকাণ্ড সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গণে পরিণত হইল? যাহাই হউক্ আমরা বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।

কেবল বাংলা দেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই এই এক প্রধান অসুবিধা যে, প্রাচীন কালের কোন কঙ্কাল পাওয়া সম্ভবপর নহে। আবহমান কাল হইতে এখানে শবদাহের ব্যবস্থা থাকায় প্রাচীন সভ্যতার যেটুকু ইতিহাস মানুষের অস্থি, করোটি প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, সেটুকু সম্বন্ধে আমাদের প্রমাণ একেবারেই নাই।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে 'আর্য্য' সভ্যতা বলিয়া থাকি, উহার বিস্তারের পূর্ব্বে বাংলাদেশের অধিবাসিগণের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তবে এ অনুমানও বোধ হয় অনেকটা সত্য যে, বাংলাদেশে আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত অধিবাসিগণের আকৃতিগত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালীগণের শারীরিক আকৃতি দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যে দুইটি উৎপত্তি-বাদ প্রচলিত হইয়াছে, আমরা সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ স্যার্ হারবার্ট রিশ্‌লির মঙ্গল-দ্রাবিড়ীয় উৎপত্তিবাদ। আমাদের সর্ব্ব প্রথমে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, যে কোন মানবজাতির উৎ-পত্তির বিষয় অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে Eugenics অর্থাৎ প্রজনন বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যগুলি মানবজাতির সম্মিশ্রণের ফলাফলের উপর কতদূর কার্য্যকারী হইতে পারে, সেটা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এখানে প্রজননবিজ্ঞানের দুই একটি

প্রাথমিক পরীক্ষিত সত্য আপনাদের সম্মুখে প্রথমে বলিয়া রাখিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। একই Species অর্থাৎ গণের অধীনে যে সকল Variety, race অথবা জাতি আছে, তাহাদের পরস্পরের সম্মিলনে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহাদের পারম্পর্য্য অর্থাৎ Heredity সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাতা ও পিতা ইহাদের প্রত্যেকের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লইয়া যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর অপরিবর্ত্তনীয় ফলস্বরূপ যে প্রকারের জীবনসংগ্রামের সৃষ্টি হয়, তাহাতে যাহারা জয়ী হইবে, তাহারাই শুধু পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে। যে সকল সন্তান মাতা ও পিতা উভয়েরই লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহাদের কি অবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন না; তবে আমাদের ইহাই মনে হয় যে, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ পরিবেষ্টনীর দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মগুলি খাটিবে। Sir Isaac Taylor এর Origin of the Aryans নামক পুস্তকে এই বিষয়ের অতি বিস্তৃত আলোচনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ মেণ্ডেলের পারম্পর্য্যবাদের প্রাথমিক নিয়ম হইতেছে এই যে, একদল সন্তান মাতার শারীরিক ও মানসিক লক্ষণাক্রান্ত, একদল পিতার লক্ষণ-সম্পন্ন এবং আর একদল মাতা ও পিতা উভয়ের লক্ষণ পাইবে। আবার আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ উর্দ্ধতন পুরুষগণের কাহারও শারীরিক অথবা মানসিক লক্ষণ পাইতে পারে। ইহাকে Atavism বা Reversion বলা হয়। আমরা বাংলায় ইহাকে 'প্রত্যাবর্ত্তন' বলিতে পারি।

স্যারহারবার্ট রিস্‌লির মঙ্গল-দ্রাবিড়ীয় উৎপত্তিবাদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহার যথার্থতা স্থির করিতে চেষ্টা করিব।

১ম। কোন বাঙ্গালীই দেখিতে ঠিক্ মঙ্গল কিংবা ঠিক দ্রাবিড়ীয় জাতির মতন নহে। আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, রিস্‌লি 'দ্রাবিড়' এই শব্দটির এখানে অপব্যবহার করিয়াছেন, কারণ তিনি দ্রাবিড় অর্থে Pre-Dravidian অথবা নিষাদজাতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। ভেদ্দা, ইরুলা, কুরুম্বা, তোয়ালা, প্রভৃতি নিষাদগণের শারীরিক আকৃতির সহিত দাক্ষিণাত্যের সুবিস্তৃত-সভ্যতার-মূলীভূত তামিলভাষী দ্রাবিড়গণের শারীরিক আকৃতির কোন সাদৃশ্য আছে, একথা কোন মানববিজ্ঞানবিদই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং কোন বাঙ্গালীকে ঠিক কোন নিষাদের মতন দেখিতে কিনা

সে কথা আমরা এখনও ঠিক্ ভাল বুঝিতে পারি নাই। মেণ্ডেলের পারম্পর্য্য বাদ জীব ও উদ্ভিদ্‌জগতে এবং এমন কি মানবজাতির মধ্যেও যখন কোন কোন স্থলে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের মধ্যে কাহারও ঠিক্ মঙ্গোলীয়নের মতন এবং কাহারও কাহারও ঠিক্ নিষাদের মতন আকৃতি হওয়া উচিত ছিল। যদি রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচ্‌বিহারের রাজবংশী, পলিয়া ও কোচ, যাহারা আজ কাল হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়—তাহাদিগকেই সাধারণ বাঙ্গালীর আদর্শ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙ্গালীকে মঙ্গল জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; সেইরূপ যদি একজন অষ্ট্রিয়াক্ কিংবা ভোগাল শ্রেণীর তাতারকে দেখিয়া রুশিয়ার সাধারণ জাতিগত আকৃতির আদর্শ ঠিক করা হয়—তাহা হইলে রুশিয়ায়ও মঙ্গল রক্তের একটা ধারা আছে বলিতে হইবে। আবার স্যার হারবার্ট রিজলির মতন যদি সাঁওতাল পরগণার মালে ও মাল পাহাড়ীগণকেও বাঙ্গালী শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া শারীরিক দৈর্ঘ্য ও নাসিকার মাপের গড় ধরিতে হয়, তবে যে বাঙ্গালী মুণ্ডা প্রভৃতি আষ্ট্রেলিয়—ভোদ্দা জাতির সহিত সমান জাতির আসন পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

২য়। নীলচক্ষু ককেশীয় জাতিগণ ছাড়া আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কি মঙ্গল কি নিষাদ—ইহার কোন জাতির মধ্যেই নীলচক্ষু দেখা গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কেবল মঙ্গল ও ককেশীয়জাতির সম্মিশ্রণে উৎপন্ন জাপানের আইনুগণের মধ্যে নীলচক্ষু পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে নীলচক্ষু বিরল হইলেও, কিছু কিছু দেখা যায় এবং নীলচক্ষুর সঙ্গে লাল চুলযুক্ত কয়েক জন বাঙ্গালীকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।

৩য়। মঙ্গল ও নিষাদ কোন জাতিরই দাড়ি ও গোঁফের অভাব। কিন্তু বাঙ্গালীর এত সুপ্রচুর লোমশতার কারণ কি? দাক্ষিণাত্যের কোন অরণ্যবাসী নিষাদগণেরই লোমের প্রাচুর্য্য দেখা যায় না; কেবল টোডাদিগের যথেষ্ট গোঁফ দাড়ি আছে—যাহারা জাতিবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, টোডাগণকে নিষাদ জাতির মধ্যে ফেলা যায় না।

এই সকল বিভিন্ন শারীরিক চিহ্ন হইতে স্বাধীন ভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত Haddon এর কথাই সব চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

"Nevertheless nobody can deny the evidence of the obvious physical differenees between Caucasians, African Negro

oes, Mongols, Australians and soon It is precisely the general picture that speaks powerfully and directly to the eye." তাই আমারও মনে হয় বাঙ্গালীর শরীরিক আকৃতিকে একটী ককেশীয়, একটী মঙ্গোলীয় এবং একটি নিষাদের শারীরিক আকৃতির পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাইব যে, ককেশীয় জাতির সহিত বাঙ্গালীর যতটুকু সাদৃশ্য, মঙ্গলীয় বা নিষাদ জাতির সহিত তাহার শতাংশের একাংশও নহে।

এখন আমরা দ্বিতীয় উৎপত্তিবাদের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। অধ্যাপক হ্যাডন্ ও চন্দ এই দ্বিতীয় মতাবলম্বী। ইঁহারা বলেন যে, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় এবং গুজরাটে যে একটা সুপ্রশস্তমস্তকবিশিষ্টতার ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বৈদিক আর্য্যগণ হইতে পৃথক্ অন্য আর একটা জাতির সংমিশ্রণের পরিচায়ক। এই পরবর্ত্তী জাতিকে তাঁহারা পামীরীয় জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ হিন্দুকুশের দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব্বাংশে এখন যে জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের আকৃতি অনেকটা এইরূপ:—শরীরের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় পাঁচ ফুট ৬ইঞ্চিরও অধিক, গায়ের রং শ্বেত রক্তাভ অথবা শ্বেত, মাথার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের ৩।৪ তিন চতুর্থাংশের অধিক, নাসিকা খুব সরু না হইলেও লম্বা এবং অনেক স্থলে কিছু বাঁকা অর্থাৎ axquiline এই জাতির লোকদিগকে ইটালীয় মানববিজ্ঞানবিদ্ পরলোকগত পণ্ডিত জিওত্রিদারুগেরি Homo Alpinus Armens pamiriensis নাম দিয়াছেন। ইহাদের সহিত একদিকে যেমন মধ্য ইউরোপীয় আল্পীয় জাতি অর্থাৎ Alpine race র সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি এশিয়ামাইনর, পারশ্য, আর্ম্মেনিয়া, এবং হিন্দুকুশের পূর্ব্বাংশে তাক্‌লামাকান মরুভূমি এবং তারিম নদীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড আর্ম্মেনীয় জাতির ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সহিতও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। পামীর প্রদেশে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও সুগোলমস্তিষ্কবিশিষ্ট একদল লোক বাস করিত এবং তাহাদের সভ্যতাও যে ঐ স্থানে সে সময়ে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ রাফেল পাম্পেলীকৃত Pre historic Civilisations of Anau নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য। সে স্থানে যে সকল প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব করোটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, সেই প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত একই রকমের মানবজাতি পূর্ব্ব তুর্কিস্থান ও পামীর প্রদেশে বাস করিত। পণ্ডিত Aurel Stein খোটান ও চীনতুর্কিস্থানের যে সকল প্রাগৈতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলির

সাহায্যে T. A. Jyoce এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খোটান ও চীন-তুর্কিস্থানের লোকেরাও আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত Home Alpinus অর্থাৎ সুগোলমস্তিষ্ক আল্পীয় জাতি বিশেষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রভৃতি বলিতে চাহেন যে, এই পামীরীয় বা আল্পীয় জাতিই বৈদিক আর্য্যগণের ভারতে আগমনের পরে এদেশে প্রবেশ করে এবং পঞ্জাব ও মধ্যদেশ বৈদিক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত দেখিয়া পূর্ব্বদিকে এবং পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বাংলা ও গুজরাটে প্রবেশ করে। এইরূপেই তাঁহারা গুজরাটী ও বাঙ্গালীগণের সুগোলমস্তিষ্কতার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিবার আছে। স্যার হারবার্ট রিস্‌লির মাপ অনুসারে দেখা যায় যে, বাঙ্গলা দেশে অন্ত্যজনীচশ্রেণীর হিন্দু হইতে ক্রমেই যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই বেশী গোলমস্তিষ্ক পাওয়া যায়। তবে ইহার কারণ জাতিগত বৈষম্য কিনা তাহা আমরা জানি না। অনেকে মনে করেন যে এমন কি, একই সমাজের ভিতরে যাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির বেশি কর্ষণ করেন, তাঁহারা পারম্পর্য্য হিসাবে সুগোলমস্তিষ্কতার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ফ্রান্সে ইহার কিছু কিছু প্রমাণও যে না পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। যাহাহউক, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণী ছাড়া অনেক দূরে নামিয়া গেলে আমরা আকৃতিগত বৈষম্যও যে দেখিতে না পাই, তাহা নহে। আমি অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি যে আমাদের দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে জেলে, কৈবর্ত্ত ও নমঃশূদ্র এই তিন শ্রেণীর ভিতরে উঁচু ও সোজা নাক এবং Transparent brown অর্থাৎ শ্বেতাভ মেটে রংএর যতটা অভাব, সাহা, বারুই, নাপিত, বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে ততটা নহে। ইহাতে জাতিবৈষম্যের কথাটা স্বভাবতঃই মনে আসে। বস্তুতঃ জাতি হিসাবে দেখিতে গেলে বাঙ্গালা দেশে আমরা তিনটি স্তরের লোক দেখিতে পাই।

১ম। নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব্ব, মধ্যমাকারের মস্তকবিশিষ্ট মলিন মেটে রংএর লোকের সংখ্যাই সকলের চেয়ে বেশী। ইহাদিগের কোন বিশিষ্ট দলে ফেলা যায় না। ইহাদের আকৃতি দেখিলে অনেকটা ভূমধ্য জাতীয় লোকদের কথা মনে হয়। ভূমধ্যজাতীয় বুকেশীয় জাতি কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বহু যুগ বাস করিলে তাহাদের চেহারা যে রকম হওয়া সম্ভব, ইহাদিগকে ঠিক সেই অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহাদিগকেই আমি Pergali like বা সাধারণ বাঙ্গালীর মোটামুটী চেহারা বলিতে চাই। ইহাদের আকৃতির মধ্যে মঙ্গলীয়, বা নিষাদীয়,

এমন কি নর্ডিক বা আল্পীয় জাতির কোন বিশিষ্টতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

২য়। নর্ডিক আকৃতির লোক বাঙ্গালীর ভিতরে অল্প বিস্তর কিছু কিছু আছে। সরু ও লম্বাটে মাথার সহিত মুখটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, নাক সরু এবং নাকের ছিদ্র ছোট। ইহাদের অনেকের গায়ের রং ময়লা মেটে রকমের হইলেও মুখে চোখে উত্তরদেশীয়দিগের মতন একটা মোটামুটিভাব দেখা যায়।

৩য়। চেহারা লম্বা, গোলমস্তকবিশিষ্ট, চেপ্টা ধরণের মুখ, নাক লম্বা এবং কিছু ছড়ান,—এই রকমের চেহারা যেন পশ্চিম বঙ্গের নিজস্ব। পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত এই পার্থক্যটি অনেকেরই বোধ হয় চোখে পড়িবে। পার্শী-রীয় জাতির সঙ্গে এই ধরণের বাঙ্গালীদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

আমার মনে হয় নর্ডিক জাতির শাখাবিশেষ ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা বর্ত্তমান ইন্দ্ আফগান জাতি—বঙ্গ দেশে প্রথম সভ্যতার বীজ উপ্ত করে; এবং যে মধ্যমাকারবিশিষ্ট, মলিন মেটেরংএর মধ্যমাকার মস্তকবিশিষ্ট জাতির কথা প্রথমে বলিলাম, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশ অধিকার করিয়াছিল। তাহারা বাস্তবিক ভূমধ্যজাতি হইতেই উৎপন্ন কিনা তাহার প্রমাণ এখনো সংগৃহীত হয় নাই। তবে দুই একটি বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখা যায়, যে সকল মেয়েলীব্রত এবং ছড়া এ দেশে প্রচলিত আছে এবং যেগুলির অধিকাংশই বেদবিহিত আর্য্যসংস্কারের বাহিরে, সে-গুলির ভিতরে আমরা সর্ব্বদাই সওদাগর এবং বণিকের গল্প দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের বণিক্ ও সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে (বিশেষতঃ যাহারা সহরে থাকিয়া বাণিজ্যাদি করে) অনেক শ্বেতাভ রংবিশিষ্ট সুন্দর পুরুষ ও স্ত্রী আমাদের চোখে পড়ে। (এই দ্বিতীয় অনুমান আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্রের)। ইহা হইতেই অনুমান হয় যে, বহু প্রাচীন যুগে এদেশে একদল লোক ছিল, যাহাদের সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ যাত্রা অভ্যাস ছিল।

কাহারও কাহারও আবার ধারণা এই যে নর্ডিক বা ইন্দ্ ইউরোপীয় মহাজাতির অন্তর্গত ইন্দ্ আফগান জাতির সহিত বাংলা দেশের অধিবাসী প্রাচীন অসভ্য অষ্ট্রেলীয়—ভোদ্দা জাতীয়গণের সংমিশ্রণে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি প্রজননবিজ্ঞানের যে কয়টি মূলসূত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, এ মত বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তাহা

হইলে একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সেটা হইতেছে এই যে, যখন আর্য্যগণ বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তখন যদি দেশে কেবল অসভ্য বর্ব্বরগণের বাসই থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের সম্মিলনে কখনও বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মত বুদ্ধিমান্ জাতির সৃষ্টি হইতে পারিত না; সমস্ত দেশব্যাপী অসভ্যদের সহিত অতি সামান্য কয়েকজন সভ্য জাতীয় লোকের মিশ্রণে কখনও সভ্যতার দিকটাই প্রবল হইয়া উঠিতে পারিত না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর ভিতরে আমরা যে এংলো ইণ্ডিয়ান্ সমাজ দেখিতে পাইতেছি, তাহারা এতদিন জাতিহিসাবে বাঙ্গালীদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের জাতিবিজ্ঞানের ভূমিকাস্বরূপ দুই একটা কথা বলিতে যাইয়া আজ আমি কেবল শারীরিক আকৃতির দিক্ হইতেই প্রশ্নটিকে দেখিয়াছি। ভাষা, ধর্ম্ম ও সমাজের ভিতর দিয়া না গেলে এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

মোটামুটি অল্প কথায় বলিতে গেলে ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, অষ্ট্রেলীয়-ভোদ্দা অথবা নিষাদজাতীয় লোকদের যদি কোন চিহ্ন বাঙ্গালীদের ভিতর আছে বলিয়া মনে হয়, তবে সেটা আমি যাহাদিগকে আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বের লোক বলিয়াছি—তাহারা যখন বাংলা দেশ অধিকার করিয়াছিল, হয়ত তাহার পূর্ব্ব যুগের। তাহার পরে সে নিষাদরক্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোন বীজাণুবিদ্‌ই বোধ হয় তাহার সন্ধান করিতে পারিবেন না।

অধিকাংশ প্রাগৈতিহাসিকগণের মতেই ভারতের প্রথম আর্য্যোপনিবেশ খৃষ্টের জন্মের প্রায় পনর শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল;—সেই অনুসারে হিসাব করিলে মনে হয় খৃঃ পূঃ প্রায় ১০০০ অব্দে বাংলা দেশে প্রথম আর্য্য সংস্কার ও আর্য্যরক্ত প্রবেশ করে।

শ্রীশিশির কুমার হর।

স্মৃতি ও সমাজ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিবেচনা স্মৃতিশাস্ত্রের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া উল্লেখযোগ্য। কারণ ভক্ষ্যাভক্ষ্যের সহিত ধর্ম্মের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মনু যাজ্ঞবাল্ক্যপ্রভৃতির সংহিতায় অতিবিস্তৃতভাবে এই বিষয়ের বর্ণনা দেখা যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের সমস্ত বিবরণ লিখিতে হইলে একখানা অতি-বিস্তৃত গ্রন্থ হইতে পারে। কারণ দেশভেদে, যুগভেদে ও বয়োবস্থাদিভেদে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের প্রভূত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে আমরা অবশ্যজ্ঞাতব্য কতি-পয় বিষয়ের আলোচনা করিব।

মৎস্য ভক্ষণ।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের অধিবাসী সদাচারসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ স্মরণাতীত কাল হইতে মৎস্য ভক্ষণ, এবং দেবপিতৃলোক উদ্দেশে হব্য কব্যরূপে মৎস্য দান করিয়া আসিতেছেন, উহা শাস্ত্রানুমোদিত অথবা অনাচারপ্রাপ্ত, তাহাই প্রথ-মতঃ বিবেচনা করিতে হইবে। যদিও পূর্ব্বকালে এই বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিবচনের আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই, তথাপি অধুনা ধর্ম্মবিপ্লবকারীদিগের আস্ফালন-নিবারণার্থ এতদ্বিষয়ের শাস্ত্রীয় মীমাংসা হিন্দুমাত্রের গোচরীভূত করা আবশ্যক হইয়াছে।

যাঁহারা গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন নাই, সুতরাং মুনিবচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না, শাস্ত্রার্থবিশারদকার নিবন্ধকারদিগের সিদ্ধান্ত জানেন না, তাদৃশ কতিপয় ধৃষ্টলোক ছাপার পুস্তক হইতে দু একটা মাত্র বচন মুখস্থ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, মৎস্য ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য; সুতরাং মৎস্যভক্ষণের পাপেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ পতিত হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহাদের আর ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনার প্রয়োজন কি?

এই শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্য লোকদিগের মুখমুদ্রণার্থপ্রায়ে মৎস্যের ভক্ষ্যতা প্রতিপাদন করিতে হইতেছে।

সাধারণতঃ মৎস্য ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য, তাহাই প্রথমতঃ বিবেচনা করা যাউক। মনু বলিয়াছেন যে, যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তাহার (ভক্ষ্যের) মাংসভুক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, যেমন বিড়াল মূষিকভুক্; সুতরাং মৎস্য-ভোজীকে সর্ব্বমাংসভুক্ বলা যায়, কারণ মাছে সমস্ত মাংসই খাইয়া থাকে; তাহার শরীর সর্ব্বমাংসময়, কাজেই মৎস্যভোজীকে সর্ব্বমাংসভোজী বলা যায়; অতএব মৎস্য ভক্ষণ করিবে না। (১)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করিলে তিন দিবস উপ-বাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (২)

এই দুইটিমাত্র বচনের প্রতি লক্ষ্য করিলে মৎস্য মাত্রই অভক্ষ্য বলিয়া প্রতি-ভাত হয়। কিন্তু প্রদর্শিত বচনের পরেই পুনরায় মনু বলিয়াছেন, "পাঠীন (বোয়াল) রোহিত, রাজীব (যাহার শরীরে রেখা আছে) সিংহতুণ্ড (যাহাদি-গের মুখের হাঁ সিংহের মুখের মত বিস্তৃত, যেমন ঘাগট্ ভেউস্ গাগল্ রিঠা, চাইন মাগুর প্রভৃতি) এবং যাহাদিগের শরীরে শল্ক অর্থাৎ আঁইস্ আছে; সেই সকল মৎস্য ভক্ষ্য, সুতরাং দেবতার নৈবেদ্যে এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধীয় অন্নে প্রদেয়। (৩)

এই সকল মৎস্যের ভক্ষ্যতা বিশদভাবে প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে টীকাকার কুল্লুকভট্ট অন্যান্য ঋষিদিগের বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহর্ষি শঙ্খের মতে রাজীব, সিংহতুণ্ড, সশল্ক (আঁইসযুক্ত) পাঠীন ও রোহিত ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে (৪)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পঞ্চনখ (যাহাদের পায়ে পাঁচটি নখ আছে) প্রাণীর মধ্যে শ্বাবিৎ, গোধা, কচ্ছপ, শল্লক (শজারু) ও শশক, মৎস্যের মধ্যে সিংহতুণ্ড, রোহিত, পাঠীন, রাজীব, এবং সশল্কমৎস্য সকল দ্বিজাতির ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৫) ঋষিপ্রবর হারীতও

---

(১) যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মাংস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

(২) মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।

(৩) পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিয়ুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।

(৪) রাজীবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাশ্চ তথৈবচ।
পাঠীনরোহিতৌ চাপি ভক্ষ্যা মৎস্যেষু কীর্ত্তিতাঃ॥

(৫) ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ শ্বাবিৎ গোধাঃ কচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি তু সিংহতুণ্ডরোহিতাঃ॥
তথা পাঠীনরাজীবাঃ সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

স্পষ্টভাষায় সশল্ক যাবতীয় মৎস্যের ভক্ষ্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। (৬) ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে পাঠীন ও রোহিত মৎস্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেই খাদ্য, সশল্ক প্রভৃতি মৎস্য শ্রাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলেও খাদ্য। (৭) শ্রাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে পাঠীন রোহিত খাদ্য নহে, এই মতটি কুল্লুকভট্ট খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—শ্রাদ্ধে প্রদত্ত রোহিত পাঠীন শ্রাদ্ধভোক্তারই খাদ্য, শ্রাদ্ধকর্ত্তারও খাদ্য নহে, রাজীব প্রভৃতি সর্ব্বদা সকলেরই খাদ্য। এই ব্যাখ্যা..... মুনিসম্মত নহে। (৮) সুপ্রসিদ্ধ ভবদেবভট্ট প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ নামক স্মৃতিনিবন্ধে অভক্ষ্য বিচার-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, মৎস্য সামান্যতঃ নিষিদ্ধ হইলেও মৎস্যবিশেষ ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তিনি ব্যাসসংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নকুল, মূষিক, সর্প, মণ্ডূক ও বিকৃতমৎস্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে। (৯) তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হারীতবচনে ভক্ষ্যান্তর ও আম (কাঁচা) মাংসভক্ষণে ত্রিরাত্রোপবাসের বিধান আছে। (১০) দেবলের মতেও বিকৃত মৎস্য, সর্পশীর্ষ মৎস্য অর্থাৎ যাহার মাথা সাপের মাথার মত ও গর্ভবাসী মৎস্য অভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (১১) এইরূপ আরও অনেক মুনিবচনে নিষিদ্ধ মৎস্য ভক্ষণে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে, তাহা কামতঃ অকামতঃ অভ্যাস অর্থাৎ অনেকবার ভোজন প্রভৃতি বিষয়ভেদে ব্যবস্থা। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, অনিষিদ্ধ মৎস্যভক্ষণে দোষ নাই, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। (১২)

যদি এই মতেই ব্যবস্থা হয়, তবে বৃথা মাংস ভক্ষণে ছাগলের ঋষি যে

---

(৬) সশল্কান্ মৎস্যান্ ন্যায়োপেতান্ ভক্ষয়েৎ॥

(৭) পাঠীনরোহিতৌ মৎস্যবিশেষৌ, তয়োর্হ্যস্যকব্যনিয়োগেন
শ্রাদ্ধাদৌ ভক্ষ্যত্বাভ্যনুজ্ঞায়তে, ন ত্বাহ্নিকে ভোজনে,
রাজীবসিংহতুণ্ডসশল্কানাং সর্ব্বশঃ হব্যকব্যাভ্যামন্যত্রাপ্যনিষু ভিক্ষোজনে।

(৮) এবঞ্চ ভোক্ত্রে যাদ্যৌ ন কর্ত্ত্রাপি শ্রাদ্ধে পাঠীনরোহিতৌ।
রাজীবাদ্যাস্তথানেতি ব্যাখ্যা ন মুনিসম্মতা॥

(৯) নকুলং মূষিকঞ্চৈব সর্পমণ্ডূকমেবচ।
বিকৃতাংশ্চৈব মৎস্যাংশ্চ জ্ঞাত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।

(১০) ভক্ষ্যাণামপ্যামমাংসরুধিরভক্ষণে ত্রিরাত্রম্।

(১১) মৎস্যাশ্চ বিকৃতা নক্রাঃ সর্পশীর্ষা বিলেশয়াঃ।

(১২) অনিষিদ্ধমৎস্যমাংসভক্ষণে তু দোষাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তাভাব এব।

প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য কামতঃ মৎস্য ভক্ষণে ত্রিরাত্রোপবাসের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার বিষয় কোথায় বুঝিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভবদেব বলিয়াছেন যে,..... এই প্রায়শ্চিত্তবিধান চতুর্দ্দশী প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিনে মাংসভক্ষণে বুঝিতে হইবে। কারণ মৎস্য যদি সাধারণতই অখাদ্য হয়, তবে তিথিবিশেষে মৎস্যভক্ষণ নিষেধ অনর্থক হইয়া পড়ে। (১৩)

আর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মৎস্য প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ যদি নিষিদ্ধ না হয়, তবে মনু মাংসকে "অসুরান্ন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে ভবদেব বলিয়াছেন, মনুর এই বচনে আম মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ অন্যান্য শাস্ত্রেও আম মাংসই "অসুরান্ন" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১৪)

পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনেও আম-মাংস ভক্ষণে ত্রিরাত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহারই বচনান্তরে "যুক্তি যুক্ত" অর্থাৎ পক্ক সশল্ক প্রভৃতি মৎস্য খাইবার উপদেশ আছে। সুতরাং শল্করহিত, রেখারহিত, বিকৃত এবং আম মৎস্য মাংস ভক্ষণেই নিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মাংস দ্বিজাতির সর্ব্বতোভাবে ভক্ষ্য।

পূর্ব্বোক্ত দেবলবচনে বিকৃত মৎস্য শব্দে নোনা মাছ, শুষ্ক মাছ, প্রভৃতি অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এই বৈদিক নিষেধেও শুষ্ক মাংসের প্রতিষেধ দেখা যায়। শুষ্ক মৎস্য মাংস কলঞ্জ নামে

---

(১৩) "বৃথা মাংসং ন ভোক্তব্যমন্যত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অন্যথা ভক্ষয়ন্ বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমং চরেৎ" ইতি
ছাগলেয়েনোক্তং যদপি "মৎস্যাংশ্চ কামতো ভক্ষ্য
সোপবাসস্ত্র্যহং বসে"দিতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তং,
তৎসর্ব্বং নিষিদ্ধচতুর্দ্দশ্যাদিবিষয়ম্।

(১৪) যচ্চ মনুনোক্তং—

"যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্দেবানামমৃতা হবি"রিতি
তদপ্যামমাংসাভিপ্রায়েণৈব, আমমাংসস্যৈব শ্রাদ্ধসান্নত্বেন
নানাগমেষু প্রসিদ্ধত্বাৎ।

প্রসিদ্ধ। এমন কি, শঙ্করদিগ্বিজয়ের একটি গল্প পাঠে জানা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য কলঞ্জভোজনশীল ব্রাহ্মণদিগকে পতিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই স্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শল্করহিত মৎস্যের মধ্যে যাহাদের মুখ বিস্তৃত ও শরীরে রেখ অর্থাৎ ডোরা আছে, সেইগুলি খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে বাইম্ মাছ অখাদ্যশ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রকরণে বর্ম্মি মৎস্য রোহিত প্রভৃতি মৎস্যের ন্যায় ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। বর্ম্মি মৎস্যই যে বাঙ্গালার বাইম্ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা আয়ুর্ব্বেদবিদ্ চিকিৎসকগণ অবগত আছেন। কারণ উক্ত বর্ম্মি মৎস্য অনেক রোগীর পক্ষে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৌধায়নের বচনে বৃহচ্ছির অর্থাৎ যে মাছের মাথা বড়, সেই মাছ, বিশেষরূপে খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (১৫)

বেদভাষ্যকার সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতার ভাষ্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্থলে মৎস্যভক্ষণের যে নিষেধ দেখা যায়, তাহা রাজীব সিংহতুণ্ড প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত মৎস্যবিষয়ে বুঝিতে হইবে। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, মনুবচনে "সর্ব্বশ" এই পদ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এই সকল মৎস্য শ্রাদ্ধে এবং প্রাত্যহিক ভোজনেও ভক্ষণীয়। (১৬)

সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রিনিবন্ধের পরিশেষখণ্ডে শ্রাদ্ধপ্রকরণে শ্রাদ্ধীয় বস্তু পরিবেশন প্রসঙ্গে একটি পৈঠীনসীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ বচনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া তাহাদের জন্য মাংস, পিষ্টক, দধি, মধু, ঘৃত, পায়স কৃসর (খিচুড়ী) ফলের রস প্রভৃতি ও মৎস্য পরিবেশন করিবেন। এই স্থলে গ্রন্থকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত পৈঠীনসীবচনে সামান্যতঃ মাংসের বিধান করিয়া পুনরায় বিশেষরূপে মৎস্যের উল্লেখের দ্বারা ঋষি বুঝাইয়াছেন যে, সমস্ত মাংসের মধ্যে মৎস্যের মাংস পিতৃলোকের নিরতিশয় তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। (১৭) যাজ্ঞবাল্ক্য সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, হবিষ্যান্নের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের

---

(১৫) মৎস্য : সহস্রদংষ্ট্র-চিলি-চিমি-বর্ম্মি-বৃহচ্ছিরোমশকবিরোহিতর জীবাঃ। প্রথম প্রপাঠকঃ। ৫ খ। অ। ১৫৮ সূত্র।

(১৬) অত্র মৎস্যানিষেধো রাজীবসিংহতুণ্ডাদিব্যতিরিক্তবিষয়ঃ। * ০ ০ এতে শ্রাদ্ধে নিত্যভোজনে চ ভক্ষ্যা ইত্যর্থঃ।

পরাশর মাধব ৩ অ। ৭১৭পৃ এসিয়াটিক মুপু।

(১৭) পৈঠীনসীস্মাহ—ব্রাহ্মণানলঙ্কৃত্যমাংসাপূপদধি মধুঘৃতপায়সকৃসর-

এক মাস তৃপ্তি হয়, পায়সের দ্বারা এক বৎসর তৃপ্তি হয়। মৎস্য, হরিণ, মেষ, লাবতিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষী, ছাগ, চিত্রবর্ণমৃগ, কৃষ্ণবর্ণমৃগ, কৃষ্ণসার, বন্যশূকর ও শশক এই সকলের মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে যথাক্রমে এক এক মাস বৃদ্ধি অনুসারে পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। এই স্থলে মিতাক্ষরা টীকাকার বলিয়াছেন যে, অত্রত্য মৎস্য শব্দে ভক্ষ্য মৎস্য পাঠীন প্রভৃতি অভিপ্রেত হইয়াছে। (১৮) ইহার পরেই আবার কথিত হইয়াছে যে, গণ্ডারের মাংস মহাশল্ক অর্থাৎ চিংড়ী মাছ, মধু, অন্ন (নীবার প্রভৃতি) লোহামিষ (রক্ত ছাগের মাংস) মহাশাক (কালশাক) ও বাধ্রীনসের মাংস এই সকল দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে এবং গয়াক্ষেত্রে ও মঘাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি হয়। (১৯)

সুপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রদর্শিত বচনাবলীর সমানার্থক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। গোভিলের ব্রহ্মসূত্রে পিতৃলোকের তৃপ্তিকর বস্তু নির্দ্দেশ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, পাঠীন প্রভৃতি মৎস্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের দুইমাস তৃপ্তি হয়। (২০) কূর্ম্মমাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে সাতমাস তৃপ্তি হয়। (২১) অনন্তর অক্ষয্যপ্রকরণে অর্থাৎ পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তিকর শ্রাদ্ধীয় বস্তুবিধায়ক প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, "মহাশল্কমৎস্য পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদক" (২২)

ফলবিকারানিতি মৎস্যাংশ্চোপসাদয়েৎ। উপসাদয়েৎ পরিবেশয়েৎ।
মৎস্যগ্রহণঞ্চ মাংসেষু মৎস্যানাং সাতিশয়িত পিতৃতৃপ্তিকরত্বদ্যোতনার্থম্।
(এসিয়াটিক্ সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক ১৩৬৭ পৃ)

(১৮) দ্বিত্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্।
মাৎস্যা হারিণকৈরভ্রশাকুনচ্ছাগপার্ষতৈঃ॥
ত্রৈণরৌরববারাহশাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ॥
মৎস্যো ভক্ষ্যঃ পাঠীনাদিস্তস্যেদং মাংসম্।
(১৯) খড়্গামিষং মহাশল্কং মধুমন্নন্নমেব চ।
লোহামিষং মহাশাকং মাংসং বাধ্রীনসস্য চ॥
যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে মঘাসু চ ত্রিশেষতঃ।
তদা বর্ষা ত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ নিশেষতঃ।
(২০) মাসদ্বয়ং মৎস্যৈঃ। ৮। ষষ্ঠী খণ্ডিকা।
(২১) সপ্তকৌর্ম্মেণ। ৮। ৬।
(২২) মহাশল্কঃ * ৫ ৯ । ৬ষ্ঠ সপ্তমী খণ্ডিকা।

গোভিলসূত্রের ভাষ্যকার স্বর্গীয় পূজ্যপাদ উপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় মহাশল্কশব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের মত উপন্যস্ত করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

যথা "বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, মহাশল্কশব্দের অর্থ রোহিত প্রভৃতি মৎস্য। কেহ বলেন, ইহার অর্থ রোহিত মৎস্য। কারণ ব্রহ্মপুরাণের বচনে দেখা যায়, পুত্র প্রভৃতি বংশধরগণ শ্রাদ্ধে রোহিতমৎস্যের মাংস দান করিয়া পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি সম্পাদন করে, এবং গৌরীর পুত্র অর্থাৎ অষ্টবর্ষ বয়সে পরিণীতার গর্ভজাত পুত্র শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি দান করে।

ঋষি পুলস্ত্য বলিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র শল্ক, যাহাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার চিহ্ন আছে, যাহার ললাটে খড়্গাকার পদার্থ আছে, এবং যাহার বর্ণ শুক্ল, সেই মৎস্য মহাশল্ক নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই অর্থই সঙ্গত"। (২৩)

সামাজিক মহোদয়দিগের ইহাও জানা আবশ্যক যে, যে বর্ণের পক্ষে যে বস্তু খাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) সেই বস্তুর দ্বারা দেবতার এবং পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিবেন। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই। ভগবান্ রামচন্দ্র ইঙ্গুদীফলের পিণ্যাক অর্থাৎ খৈল, এবং বদর ফলের দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া ইহাই ভক্ষণ করুন, সম্প্রতি আমরা ইহাই খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছি। পুরুষের যাহা খাদ্য, তাহার পিতৃগণ এবং দেবগণও সেই অন্নই পাইবার যোগ্য। (২৪) মানবের খাদ্য বস্তুর মধ্যেও কতকগুলি পদার্থ বিষ্ণুর নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় মোটামোটি বলা হইয়াছে যে, অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যরূপে ব্যবহার করিবে না। এই স্থলে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,

---

(২৩) মহাশল্কো মৎস্যবিশেষঃ। স রোহিতাদিরিতি বাচস্পতি মিশ্রঃ।
রোহিতমৎস্য ইত্যপরে। তথাচ ব্রহ্মপুরাণে—
"রোহিতমিষমুৎপন্নং দত্ত্বা তু স্বকুলোদ্ভবঃ।
অনন্তং বিপ্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা॥ ইতি
একশল্কোঽর্দ্ধচন্দ্রশ্চ ললাটে খড়্গসংযুতঃ।
শুক্লবর্ণশ্চ যো মৎস্যো মহাশল্কঃ স উচ্যতে"॥ ইতিপুলস্ত্যোক্তস্তু মুক্তঃ

(২৪) ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ং।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥
(শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত রামায়ণ বচন)

যে জাতির পক্ষে যাহা সাধারণতঃ অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, যেমন রশুন প্রভৃতি, তাহাই অভক্ষ্য শব্দের প্রতিপাদ্য, রাত্রিতে দধি প্রভৃতি অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বিষ্ণুসংহিতায় অতঃপর বলা হইয়াছে, ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যেও বিষ্ণুর নৈবেদ্যে ছাগীর দুগ্ধ, মহিষীর দুগ্ধ, পঞ্চনখের বরাহের এবং মৎস্যের মাংস দেয় নহে। বিষ্ণুর নৈবেদ্যে মৎস্য প্রভৃতি অদেয় হইলেও নিজের খাদ্য মৎস্য প্রভৃতি বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া খাইতে হইবে, কারণ বিষ্ণুর প্রতি অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য এবং জল মূত্রের তুল্য বলিয়া মৎস্যসূক্তে উক্ত হইয়াছে। (২৫)

তবেই দেখা যায় মনু, যাজ্ঞ-বল্ক্য, বিষ্ণু শঙ্খ, হারীত, গোভিল প্রভৃতির মতে অধিকাংশ মৎস্যই খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং মেধাতিথি, কুল্লূকভট্ট, গোবিন্দরাজ, বিজ্ঞানেশ্বর, হেমাদ্রি মাধবাচার্য্য, ভবদেব ভট্ট, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ বিশদভাবে মুনিবচনগুলির ব্যাখ্যা করিয়া মৎস্যের ভক্ষ্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বর হিন্দুস্থানবাসী, হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্য দাক্ষিণাত্যবাসী, ভবদেব ভট্ট, কুল্লূকভট্ট, ও রঘুনন্দন বাঙ্গালী। ভট্ট মেধাতিথি কোন্ দেশে এবং কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তদ্‌বিষয়ের কোনও সুমীমাংসা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার লিপিভঙ্গী হইতে তাঁহার অনেকটা বাঙ্গালীভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'ভাষ্যই' স্মৃতি শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রথম ভাষ্য বলিয়া মনে হয়। একাদশাধ্যায়ের শেষভাগে লিখিত একটি শ্লোক পাঠে জানা যায়, "মনুর স্মৃতি অতীব সম্মানের পাত্র, মেধাতিথির ব্যাখ্যাই তাহার সমুচিত টীকা, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ সেই উপাদেয় ভাষ্য পুস্তক দেশে কুত্রাপি অখণ্ডরূপে পাওয়া যায় না। মহারণের পুত্র রাজা মদন দেশান্তরের নানা স্থান হইতে

---

(২৫) নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে। ৬৫ অ ১২। ভক্ষ্যেষ্বপ্যজাসহিষীক্ষীরে। ১৩
পঞ্চনখসৎস্য-বরাহমাংসানি চ। ১৪। সূ। বিষ্ণুসংহিতা।
নাভক্ষ্যমিতি যদ্বর্জ্জ্যং যদভক্ষ্যং স্বরূপতো লশুনাদি তদ্বেদ
ন দেয়ং, নতু রাত্রৌ দধ্যাদ্যপি (একাদশীতত্ত্ব)
অনিবেদ্যং ন ভোক্তব্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ যদ্ভবেৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
অনেন স্বয়ং ভোজ্য মৎস্যাদিদেয়মিত্যুক্তম্।
বিষ্ণ্বচনেন তু অন্যে কেষিদং নিষিদ্ধম্। আহ্নিকতত্ত্ব।

আনীত পুস্তকের দ্বারা ইহার জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। ঈদৃশ প্রাচীন ভাষ্যকারের মতেও মৎস্যভক্ষণের অনর্থকারিতা প্রকাশ পায় না।

মৎস্য যদি সকল দেশের দ্বিজাতির পক্ষেই খাদ্য হয়, তবে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুস্থানী এবং দাক্ষিণাত্যবাসী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে মৎস্যভক্ষণ হইতে বিরত, শুধু বিরত কেন, মৎস্যের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাযুক্ত দেখা যায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অপরিজ্ঞাত কোনও কারণে দীর্ঘকাল মৎস্য ব্যবহারের অভাবই এই ঘৃণার কারণ; ইহার সহিত শাস্ত্রীয় শাসনের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রে যাহা বিশিষ্ট খাদ্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাহাও মানুষ খায় না, পক্ষান্তরে যাহা নিতান্ত অখাদ্য, তাহাও খাইয়া থাকে। এক বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই বিষয়ের প্রভূত নিদর্শন দেখা যায়। গোধার (গুইসাপ) মাংস শাস্ত্রে পবিত্র খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, অথচ উহা সভ্যসমাজে এখন কেহই ভক্ষণ করে না। বন্য শূকর ভক্ষণ করিতে নিষেধ নাই; কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে উহা কেহই ভোজন করে না। কূর্ম-মাংস শাস্ত্রতঃ নিষিদ্ধ নহে, পূর্ব্ববঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ উহা ভক্ষণ করেন; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে উহা নিতান্ত অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কলিকাতা প্রদেশে শাস্ত্রনিষিদ্ধ শামুক এবং কাঁকড়া খাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-ধৃতহারীতবচনে মাছের কাঁটা, শামুক 'শঙ্খ' ঝিনুক ও কড়ি এই সমস্ত দ্রব্যের অন্যতম ভক্ষণে পঞ্চগব্যপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। (২৬) শিষ্টপরম্পরাগৃহীত একটি বচনে শুষ্ক মৎস্য, অনাগতার্ত্তবা স্ত্রীর গর্ভান্ন, সিং (জিওনা) মাছ, কাঁকড়া, গজার মাছ ও অবীরার (পতিপুত্ররহিত স্ত্রীর) পক্কান্ন ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। (২৭) যাহা হউক এই বিষয়ের আর অধিক পল্লবন অনাবশ্যক, মৎস্য, যে, শাস্ত্রতঃ অখাদ্য নহে, তদ্বি-ষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। জৈন প্রভাবে অথবা বৈষ্ণব প্রভাবে মৎস্যের অভক্ষ্যতা বিবেচিত হইতে পারে, ইহার নিশ্চয় কারণ ঠিক করিয়া

(২৬) মৎস্যকণ্টকশঙ্খুকমণ্ডুকশুক্তি কপর্দ্দকান্।
পীত্বা নবোদকৈর্যব পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
পঞ্চ গব্যেন তস্যান্নপানেন ব্রতরূপতাৎ

(২৭) শুষ্কমীনমৃতান্নং শূদ্রী গর্ভটকস্তথা।
অবীরান্নাস্তথা চান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।

বলিবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও শিষ্টসমাজে মৎস্যভক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণ পাঠে জানা যায়, কবন্ধ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিল,—"হে রাঘব! তুমি পম্পাসরোবরের রোহিত, চক্রতুণ্ড (নলমীন) নামক উৎকৃষ্ট মৎস্যগুলিকে বাণের দ্বারা হত করিয়া লৌহশলাকায় ঝল্‌সাইয়া ভক্ষণ কর। এই সকল মৎস্য অকৃশ অর্থাৎ পুষ্ট এবং ইহাদের একটি মাত্র কণ্টক আছে। (২৮) মৎস্য সে কালে খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে রামের প্রতি কখন এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শিত হইত না; এবং অকৃশ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতা-ব্যঞ্জক বিশেষণ-সন্নিবেশেও বাল্মীকির লেখনী হইতে লালা নিঃসৃত হইত না। এমন কি ঋষিযুগে মৎস্য যে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাবশ্যক বস্তু মধ্যে পরিগণিত ছিল, তদ্বিষয়েও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিগ্রহসমর্থ ব্রাহ্মণের পক্ষেও প্রতিগ্রহ পরিত্যাগে বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিয়া কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, ভূমি, মাংস, শয্যা, আসন, ভূষ্টযব ও জল এই কয়টি বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (২৯) তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বাঙ্গালায় মৎস্যের ভূরি ব্যবহারের ফলে অনেক অভক্ষ্য মৎস্যও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাম্রবর্ণ রোহিত শাস্ত্রতঃ নিষিদ্ধ, (৩০) কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ তাম্রবর্ণ রোহিত, মিরকা বা নান্দিন যাহা, শিষ্ট সমাজেও ব্যবহৃত হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই উভয় মৎস্য অনেকেই খাইতেন না।

মৎস্য যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশবিশেষবাসীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এতৎসম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির আচরণ ও তৎসংসৃষ্ট উপদেশও এস্থলে উল্লেখযোগ্য—প্রায় ১৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহীতে এক জন অযোধ্যাবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন,

---

(২৮) রোহিতাংশ্চক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব।
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্ত্বত্র রাম বরান্ হতান্॥
নিষ্কৃত্তকণ্টকান্ পক্বানকৃশাল্লেককণ্টকান্॥
অরণ্যকাণ্ড। ৭৩ সর্গ। ১২।১৩।

(২৯) প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদদ্যাৎ যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্॥
কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধি ক্ষিতিঃ।
মাংসং শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাধ্যেয়ং ন বারি চ॥ ১ অঃ। ২১০-১১।

(৩০) চক্রাঙ্কিতস্তু যঃ কূর্ম্মো রোহিতঃ কণকপ্রভঃ।
শ্বেতপর্ণো বরাহশ্চ ত্রয়মেতন্ন ভক্ষয়েৎ॥ (একাদশীতত্ত্ব)

দ্বাদশস্কন্ধ সটীক ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বেদান্তাদি দর্শনে এবং পাণিনি ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার অতীব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অনেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। অতিথি-রূপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিতেন, গৃহস্বামী কনোজীয়া ব্রাহ্মণ কিনা? কনোজত্ব প্রতিপন্ন হইলেই তিনি নিজের অতিথিত্ব জ্ঞাপন করিতেন, এবং তাঁহার জন্য একটি ইলিশ মাছ আনিতে বলিতেন। তিনি একটি ইলিশ ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার মাছ খাওয়া পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল না, সুতরাং খাবার সময়ে তিনি দুহাতে কাঁটা ছাড়াইতেন। খাবার পর তিনি স্নান করিতেন, কারণ কাঁটা ছাড়ান ব্যাপারে তাঁহার সর্ব্ব শরীরেই উচ্ছিষ্ট লাগিত। তিনি সন্ন্যাসী বিশেষতঃ অযোধ্যাবাসী মাছ খান্ কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, এদেশে আসা অবধি তাঁহার দুগ্ধ সহ্য হয় না, শরীর ধারণের পক্ষে এদেশে মাছ বিশেষ উপযোগী, অতএব তিনি এদেশে অবস্থানকালে মাছ খাইয়া থাকেন।

মৎস্যভক্ষণ পাপজনক না হইলেও স্থানবিশেষে হিংসার অনুমোদন নিবন্ধন ভক্ষকের প্রাণিহিংসাজনিত পাপ অবশ্যম্ভাবী, একথা স্বীকার্য্য। কারণ মৎস্য-জীবী হইতে যে মৎস্য ক্রয় করা হয়, উহাতে তাহার মৎস্যবধের অনুমোদন করা হইয়া থাকে। যদি মৎস্যভোক্তা ক্রয় না করিত, তবে জেলেরা মাছ মারিত না। পাতঞ্জল সূত্রে (১।২।৩৪।৩০) হিংসা—কৃত, কারিত ও অনুমোদিত, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অনন্তর বলা হইয়াছে যে, উহা আবার লোভ-জনিত, ক্রোধজনিত ও মোহজনিত হইয়া থাকে, সুতরাং মৎস্যভক্ষণের দ্বারা লোভজনিত অনুমোদিত হিংসা হইয়া থাকে। (৩১)

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ত তীর্থ

---

(৩১) বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।

প্রেমের নিরিখ

শীকারে যাত্রার পূর্ব্বের ভোজ। মার্কুইস ডি বারট্রান ও তাঁহার অতিথিরা ভোজনটেবিলের ধারে বসিয়াছিলেন। উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষ, সুসজ্জিত টেবিল নানা সুস্বাদু ফল ও সুদৃশ্য পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত। প্রেমের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। একবারের অধিক দু'বার ভালবাসা যায় কিনা এই মামুলি প্রশ্ন লইয়া বিষম তর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষ যাহারা একবার মাত্র ভালবাসিয়াছে; সেইরূপ বহু ব্যক্তির উদাহরণ ও অপর পক্ষ যাহারা বহুবার বহুজনকে অত্যধিক ভালবাসিয়াছে, তাহার উদাহরণ দিতেছিলেন। উপস্থিত পুরুষমণ্ডলী অবশেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, রোগের মত ভালবাসারূপ প্রবৃত্তি মানুষকে যখন তখন যতবার ইচ্ছা ততবার আক্রমণ করিতে পারে। উপস্থিত রমণীরা বলিলেন যে, প্রেমের প্রবৃত্তি মানুষের একবার মাত্রই আসিতে পারে, তদতাধিক নহে। একবার যাহার মনে প্রেমের পরশ লাগিয়াছে, তাহার জীবনে একটা চিরদিনের জন্য অনন্ত শূন্যতা আসিবেই, মন এমন বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে যে, মনে হইবে আমার যত কিছু যা ছিল, সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, আর কিছুর স্থান সেখানে নাই—এমন কি স্বপ্ন ও ভুলও সেখানে স্থান পাইতে পারে না।

মারকুইস বহুবার প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন, তিনি এমতের বিষম বিরোধী। তিনি কিছুতেই এই মতে সায় দিতে পারিতেছিলেন না। তিনি বলিতেছিলেন :—

"মন প্রাণ দিয়া বহুবার ভালবাসা খুবই সম্ভব আমার মনে হয়। আপনারা উদাহরণ দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, বহু লোক প্রথম ভালবাসার ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি আত্মহত্যা না করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হয়তো তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়বার ভালবাসিতে হইত, তাঁরা দ্বিতীয়বার ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, এইরূপে দ্বিতীয়বারের পর তৃতীয়বার, তৃতীয়বারের পর চতুর্থবার ও মৃত্যু পর্য্যন্ত আরও কতবার ভালবাসিবার সুযোগ পাইতেন। আমরা যেমন যতবার

ম্যা খাই, ততবারই একটা অসীম আনন্দ লাভ করি, প্রেমেও তেমনি ঘটে। যাঁহারা মাত্র একবার প্রেমে পড়েন, তাঁহারা প্রেমের কৃতদাস হইয়া যান, তাঁহাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমে পড়া না পড়া লোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে।"

সেখানে ভোজে উপস্থিত ডাক্তারই হইয়াছিলেন সালিশ। তিনি মারকুইসের কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "প্রেমে পড়া না পড়া লোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। আমি একটা ঘটনা জানি, সেখানে ৫৫ বৎসর ধরিয়া একজনকে একজন ভালবাসিয়াছিল। একদিনের জন্যও তাহার অতৃপ্তি আসে নাই; মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহা অক্ষুণ্ণ ছিল।"

ইহা শুনিয়া মারকুইসপত্নী উৎসাহে হাত জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন—আঃ, ভারি সুন্দর তো! এরূপ ভালবাসা পাওয়া কি বাঞ্ছনীয়—পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া একজনের অখণ্ড ভালবাসার অধিকারী হওয়া কি সুখের, কি আনন্দের! এই রকম ভাবে ভালবাসা পাইয়া সে নিজকে কিরূপ ধন্য মনে করিয়াছিল ভাবিয়া তাহার কূলকিনারা পাওয়া যায় না।"

ডাক্তার একটু হাসিয়া কহিলেন—"ম্যাডাম, আপনার ভুল হইয়াছে, যে ভালবাসা পাইয়াছিল, সে স্ত্রীলোক নয়—পুরুষ। আপনি তাকে চেনেন। ইনি সেই ঔষধবিক্রেতা মসিয়ে কংকোট আর যে স্ত্রীলোকটী ভালবাসিয়াছিল, তাকেও আপনি চেনেন। সেই ভাঙ্গাচেয়ারসারা মেয়েটী—যে বৎসর বৎসর চ্যাটুতে আসত।" এই কথাতে মারকুইসপত্নী ও অন্যান্য রমণীরা একটু দমিয়া গেলেন ও পু, পু শব্দ করিয়া নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। সাধারণ লোকের প্রেমের গল্প বড়লোকের আড্ডায় কেন? ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"তিনমাস পূর্ব্বে একদিন আমি সেই ভাঙ্গাচেয়ারসারা মেয়েটীর চিকিৎসার্থ যাই। মেয়েটী তখন মৃত্যুশয্যায়। পাদ্রী আমার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে আমাদের দু'জনকে অন্তিম ইচ্ছাপত্রের অছি নিযুক্ত করিতে চাহিল, হঠাৎ আমাদিগকে অছি নিযুক্ত করিতে কেন যে তাহার ইচ্ছা হইল, বুঝিতে পারিলাম না। সে নিজেই তাহার কারণ বলিতে যাইয়া নিজের জীবনকাহিনী বলিল। সে এক অদ্ভুত মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস। তাহার মাতা পিতা উভয়েই ছিলেন ভাঙ্গাচেয়ারসারা। সে কখনও এক যায়গায় বহুদিন বাস করে নাই। ভবঘুরের মত তাহার পিতামাতার সঙ্গে সে ছেলে বয়স হইতেই বহু

যায়গায় ঘুরিয়াছে। নোঙরা অবস্থায়, ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হইয়া, শতছিন্ন ঝুলি পরিয়া কত সহরে যে সে গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। সহরের বাহিরে তাদের মাল-বোঝাই গাড়ী ঘোড়া কুকুর রাখিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছেলেকে খেলিতে ছাড়িয়া দিয়া বাপ-মা সহরের সমস্ত ভাঙ্গাচেয়ার মেরামত করিয়াছে। তাহার বাপমা বেশী কথা কহিতেন না, কেবল "চেয়ার, ভাঙ্গা-চেয়ার, ভাঙ্গা-চেয়ারসারাবে গো" এই ছিল তাঁহাদের ডাক।

খেলিতে খেলিতে সে যখন দূরে চলিয়া যাইত, বাপের কর্কশ ধমকে তাহার চমক ভাঙ্গিত। কোনও দিন সে স্নেহের আদর পায় নাই। বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাজের বাড়তিও আরম্ভ হইল। ভাঙ্গাচেয়ার বহিয়া আনা ও ফিরাইয়া দেওয়া তাহার একটী কাজ দাঁড়াইল। এইরূপে পথে বহু ছেলের সঙ্গে তাহার আলাপ হইতে লাগিল; কিন্তু এই সকল ছেলেদের বাপমা যখন দেখিত, তাহারা তাহার সহিত কথা কহিতেছে, তখন ছেলেরা খুব বকুনি খাইত। মাঝে মাঝে রাস্তার দুষ্ট ছেলেরা তাহাকে ঢিল ছুড়িয়া মারিত। একবার একটী দয়াবতী রমণী তাহাকে একটী পেনী দান করেন, সে তাহা খুব যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।

তখন তাহার এগার বৎসর বয়স। একদিন সে গোরস্থানের পাশ দিয়া সহরের মধ্যে যাইতে যাইতে দেখিল, বালক কংকোট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। তাহার এক খেলার সাথী তাহার সম্বল দুইটী পেনী লইয়া পলাইয়াছে। বালকের সেই ক্রন্দন দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা ভীষণ আলোড়ন হইয়া গেল। তাহার সমস্ত কল্পনা ওলটপালট হইয়া গিয়াছিল। এতদিন তাহার যে একটা ধারণা ছিল যে, গৃহবাসী ছেলেরা কত সুখী, তাহাদিগকে দুঃখ, দৈন্য, ও অভাবের মধ্য দিয়া যাইতে হয় না, সেই ধারণা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে বালকের নিকটে যাইয়া নমস্কার করিয়া তাহার দুঃখের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাকে তাহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দান করিল। বালকটী বিনা সঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে বালিকা-প্রদত্ত সেই অর্থ গ্রহণ করিল। অর্থ পাইয়া বালকের কান্না থামিয়া গেল। এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া বালিকার মনে এত আনন্দ হইল যে, আনন্দ আতিশয্যে সে বালককে চুম্বন করিল। বালকও তাহাতে বাধা দিল না, সে টাকা পাইয়া তাহাই দেখিতে ব্যস্ত। বালিকা যখন দেখিল, এ চুম্বনে সে বাধা পাইল না, তখন সে চুম্বনে চুম্বনে বালকের মুখ ছাইয়া ফেলিল। ইহার পর বালককে একটী প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া সে দৌড়াইয়া পলাইল।

তাহার মনের মধ্যে কিসের চিন্তা, কিসের ভয় তখন জাগিয়াছিল। তাহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ সে তাহাকে একেবারে উজাড় করিয়া দিয়াছিল জন্যই কি সে তাহাকে অত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, না তাহার প্রথম পুরুষচুম্বনের স্পর্শে সে মাতাল হইয়া গিয়াছিল? ইহার গূঢ় রহস্য কে বলিতে পারে? মাসের পর মাস তাহার মনকে সেই বালকটীর কথা ও গোরস্থানের সেই কোণটীর কথা জুড়িয়া বসিয়াছিল। সেই বালকটিকে পুনর্ম্মিলনের সময় আবার কিছু দিবে এই আশায় বাপ-মায়ের পকেট হইতে সে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চুরী করিয়া রাখিত। পুনর্ব্বার সে যখন সেই গোরস্থানের কোণায় ফিরিয়া আসিল, সে বালকটীকে সেখানে দেখিতে পাইল না। বালকটীর পিতার ঔষধের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইল। দুইটী বড় বড় লাল নীল জলে ভরা গোলাকার বোতলের মাঝখানে বালক তখন বসিয়াছিল। সেই উজ্জ্বল রঙ্ চঙ্গা বোতলের ধারে তাহাকে বসিতে দেখিতে পাইয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। আজন্ম তাহার মনে সেদিনের দেখার কথা মনে ছিল।

পরবৎসর তাহারা যখন আসিয়াছিল সে বালকটীকে দেখিতে পাইল স্কুলের প্রাঙ্গণে মার্চ্ছেল খেলিতে। সে দৌড়াইয়া গিয়া দুহাতে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া এমন আত্মহারা হইয়া চুম্বন করিল যে, বালক অস্বস্তিবোধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকের কান্না থামাইতে এবারও সে তাহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তাহাকে দিল—সে অর্থ অতি সামান্য, মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক। আর সেই অর্থ দেখিয়া সেই বালক চুপ করিল। সে যেন হাতে চাঁদ পাইল, কোন হীরকখনির যেন সে মালিক হইয়া গেল, এমনি ভাবে সে সেই অর্থের দিকে তাকাইতে লাগিল।

এই অর্থপ্রাপ্তির পর সে তাহাকে যত ইচ্ছা তত আদর ও চুম্বন করিতে দিল। তাহার পর চার বৎসর ধরিয়া সে বালককে তাহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দিয়া আসিয়াছে। বালকও জানিয়া শুনিয়া চুম্বনের মূল্যস্বরূপ তাহা গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমবার তিরিশ ছাউস, দ্বিতীয়বার দুইফ্রাঙ্ক দিয়া তৃতীয়বার তাহার সম্বল ছিল মাত্র বার ছাউস—এই সামান্য বার ছাউস দিতে যাইয়া লজ্জায়, দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে যে এবার ইহার অধিক কিছু সংগ্রহ করিতে পারে নাই, জানাইল। পরের বার সে পাঁচ ফ্রাঙ্ক আনিয়া দিয়াছিল—আনন্দে তাহার মুখে হাসি ধরিতেছিল না। সে ঐ

বালক ছাড়া দুনিয়ায় আর কাহারও কথা ভাবিত না, বালকও তাহার আগমন প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত। সময় সময় বালক নিজে যাইয়াও তাহার সহিত দেখা করিত। ইহাতে তাহার মনে কি যে আনন্দ হইত, তাহা বলিবার নহে। হঠাৎ সে একদিন দেখিল, গ্রামে বালক নাই। সে বহুকষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিল যে, বালক বোর্ডিংস্কুলে গিয়াছে। সে শীঘ্রই তাহার বাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইল এবং নানারকম যুক্তি পরামর্শ দিয়া যাহাতে বালক ছুটীর সময় বাড়ীতে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিল। এক বৎসরের চেষ্টায় সে সফলকাম হইল। দু'বৎসর পরে যখন দু'জনের দেখা হইল, তখন সেই বালক তাহাকে এক রকম চিনিতেই পারিল না। বালক বড় হইয়া গিয়াছে, দেখিতে, আরও সুন্দর হইয়াছে। তাহার পিতলের বোতাম আঁটা ইউনিফর্ম্মে তাহাকে এত চমৎকার দেখাইতেছিল যে, সে যেন নূতন মানুষ। বালক কংকোট যেন তাহাকে কোনও দিন দেখে নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাহার দিকে একবারও না তাকাইয়া চলিয়া গেল। এই তাচ্ছিল্য দেখিয়া দু'দিন ধরিয়া সে আকুল হইয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হয় নাই—চিরজীবন ধরিয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ছিল এবং এই ভালবাসার জন্য তাকে ভুগিতেও হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরই সে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে পারিত না; কংকোটও কোনও দিন ভুলক্রমে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিত না। সে কংকোটকে পাগলের মত ভালবাসিত জানিয়া শুনিয়া যে, ভালবাসার প্রতিদান সে পাইবে না। তবুও সে ভালবাসার আনন্দে তাহাকে ভালবাসিত। তাহার নিজের মুখের কথা শুনুন :—

"সেই একমাত্র পুরুষই জীবনে আমি দেখিয়াছি আর নয়।"

তাহার পিতামাতা মারা গেলেও সে পূর্ব্বের মত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তার মনটী সারা সময় গাঁয়ের মধ্যেই পড়িয়া থাকিত। একদিন সে গ্রামে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, কংকোট একটী যুবতীর বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হইয়া ঔষধালয় হইতে বাহির হইতেছে। এ যুবতী কংকোটের স্ত্রী। সেই রাত্রিতেই সে নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একজন লোক দেখিতে পাইয়া তাহাকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া কংকোটের ডাক্তারখানায় শুশ্রূষার জন্য লইয়া আসে। কংকোট তাহার ভিজাকাপড় খুলিয়া ফেলিল। সে তখন চিনিতেই পারে নাই সে—কে? ঔষধবিক্রেতা কংকোট কঠোরস্বরে

কহিলেন—"তুমি পাগল, আস্ত পাগল, এইরকম পাগল না হলে এরকম কাজ করিতে পারে না। ঔষধবিক্রেতার কথার শব্দ পাইয়াই তাহার যেন পুনর্জীবন লাভ হইল, সে আনন্দসুখে বহুক্ষণ সেখানে পড়িয়া রহিল। পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ দিতে চাহিলে কংকোট কিছুতেই তাহা লইল না।

তাহার সারা জীবনটা এইরূপে কাটিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই সে কংকোটের কথা ভাবিত ও খাটিয়া মরিত—তাহাকে দেখিবার আশায়। তাহাকে দেখিবার আশায় সে কংকোটের দোকানে ঔষধ কিনিতে আরম্ভ করিল। এই সুযোগে কংকোটের সহিত দুই চারিটা কথা কহিবার অবসর তাহার মিলিত। এইরূপে ঔষধ কিনিয়া প্রকারান্তরে সে কংকোটকে তাহার অর্জ্জিত অর্থ দিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বসন্তকালে সে মারা গিয়াছে। মৃত্যুকালে সে অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদের বলিয়া গিয়াছে—যাহাকে সে আজীবন ধরিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে তাহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিতে। আজীবন সে কাজ করিয়াছে এই উদ্দেশ্য লইয়া, যাহাতে মৃত্যুকালে সে কংকোটকে তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কিছু দিয়া যাইতে পারে। তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে তাহার সৎকারের জন্য পাদরীকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দিয়াছি। বাকী টাকা লইয়া পরদিন সকাল বেলায় কংকোটের ওখানে গেলাম। তখন কংকোটের প্রাতর্ভোজন সবে সমাপ্ত হইয়াছে। কংকোটপত্নী খুব মাতব্বরের মত টেবিলের পাশে বসিয়া নিজে যে, যে সে লোক নয়, এই ভাব দেখাইতেছেন। তিনি খাইয়া খাইয়া বেদম মোটা হইয়াছেন। শরীরে এত রক্ত হইয়াছে যে, ফাটিয়া বাহির হইতে চায়।

আমি যাইতেই আমাকে তাহারা সাদর সম্ভাষণ করিয়া কফি পান করিতে দিল। তারপর ধীরে ধীরে আমি কম্পিতস্বরে ভাঙ্গাচেয়ারসারার প্রেমের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, এই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইবে, তাহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কংকোট এ কাহিনী শুনিয়া এমনভাবে মেয়েটাকে 'ভবঘুরে, হাঘরে, ভাঙ্গাচেয়ার সারা' বলিয়া উঠিল যে, উহার ভালবাসাতে যেন তাহার সমস্ত জীবন পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত মান প্রতিপত্তি যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জীবনের একটী মহামূল্যরত্ন যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কংকোটপত্নীও বিষম বিরক্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বারবার বলিতেছিলেন—"এই কথা—এই কথা।" কংকোট এই ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা বিরাট কিছু কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার সমাধানে অক্ষম হইয়া ঘরময়

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল—"এর চেয়ে ভয়ানক আর কিছু কি ভাবতে পারেন, মশায়? সে বেঁচে থাক্‌তে—এঘটনা যদি জান্তে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমি তাকে জেলে পুরতাম—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি একেবারে বোকা বনিয়া গেলাম। কি যে বলিব, কি যে উত্তর দিব কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না; কিন্তু আমার পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। আমি বলিলাম "সে তার সঞ্চিত সাড়ে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক আপনাকে দিয়া যাইবার ভার আমাকে দিয়া গিয়াছে, আমি তাহা আপনাকে দিতে আসিয়াছি। আপনাকে যাহা এখন বলিলাম, তাহা আপনার প্রীতিপ্রদ নয় দেখিতেছি, আপনি বোধ হয় ইহা গরীবদুঃখীদিগকে বিলাইয়া দিতে চান। কেমন কি না?

স্ত্রী পুরুষ উভয়ে অবাক্ হইয়া নির্ব্বাক্‌দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি পকেট হইতে সেই অর্থ বাহির করিলাম, কতরকম টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানী যে তার মধ্যে ছিল, তাহার ঠিক নাই। তাহাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি ঠিক করিলেন!" ম্যাডাম কংকোট প্রথম উত্তর দিলেন "মুমূর্ষুর অন্তিমইচ্ছা যখন আমাদিগকে তাহার সঞ্চিত অর্থ দেওয়া, তখন তাহা না লওয়া যায় কি করিয়া!" কংকোটও নেহাৎ নির্লজ্জের মত কহিল—"আমরা নয় না লইলাম, ছেলেমেয়েদের জন্য নয় ইহা দিয়া কিছু কেনা যাইবে।"

আমি শুষ্কস্বরে উত্তর করিলাম "আপনাদের যেরূপ রুচি।" কংকোট বলিলেন—"বেশ, আমাদের টাকাটা দিন, সে যখন দিয়া যাইতে বলিয়াছে, তখন ইহা আমাদেরই প্রাপ্য; আমরা ইহা কোনও সৎকার্য্যে ব্যয় করিব। আমি তাহাদিগকে টাকা দিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

পরদিন কংকোট আমার কাছে আসিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঘরেটা তার গাড়ীখানাতো ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?" আমি উত্তর করিলাম—"কিছুই করি নাই, ঐখানেই পড়িয়া আছে, ইচ্ছা হয় লইয়া যান।" "আমারও এই ইচ্ছা" এই বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। আমি পিছু ডাক দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম "একটী বৃদ্ধ ঘোড়া ও দুইটী কুকুরও তাহার আছে, সে গুলো লইয়া যাইবেন না?" তিনি অবাক্ হইয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,

"না, দরকার নাই, ওসব লইয়া কি করিব?" আমি বলিলাম—"বিক্রী করিয়াও তো কিছু পাওয়া যাইতে পারে।" কংকোট হাসিয়া আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। আমি করমর্দ্দন করিলাম। ঔষধের দোকানদারের সহিত কি ডাক্তারের মন কষাকষি শোভা পায়? কুকুর দু'টা আমিই রাখিলাম, ঘোড়ার ভাগ পাইল পাদরী। কংকোট গাড়ীখানা দিয়া মাল টানাইত, আর যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা দিয়া রেলকোম্পানীর সেয়ার কিনিয়া দেশের উপকার করিল। অখণ্ড প্রেমের এমন কাহিনী জীবনে জানি না।"

এই বলিয়া ডাক্তার চুপ করিয়া উপরের দিকে তাকাইলেন। মারফুইসের মন দ্রব হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইতেছিল। তিনি একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"পৃথিবীতে নারীই ভালবাসিতে জানে, তাহা অস্বীকার করা যায় না"।*

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

প্রেমিকের নিবেদন।

লোকে বলে তুমি মোর খাইয়াছ মাথা,
আমি বলি—তুমি মোরে করেছ মানুষ
লোকের কি চক্ষু আছে! দেখেন দেবতা
আমি পিই নাই সুধা, পিইছি পীযূষ!
তোমারে হারায়ে পুনঃ হয়েছি দেবতা
বহুপূর্ব্বে স্বর্গে ওগো গিয়াছে বারতা!

কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

---

* ফ্রী, দে, মোঁপাসা হইতে।

মনের মত।

১

দেব কুমার ধন অপেক্ষা যশটাই বেশী রাখিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীর যশো গৌরবে গৌরবান্বিতা নন্দরাণী দেবকুমারের মৃত্যুর পর স্বামীর ভীটা ছাড়িল না। ভ্রাতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল—'অন্যের রাজপ্রাসাদে থাকা অপেক্ষা তার স্বামীর পর্ণকুটীরই অধিক সুখপ্রদ।" যতক্ষণ দেহে শেষ নিশ্বাসটুকু থাকিবে, ততক্ষণ এ ভীটা ছাড়িবে না।' নন্দরাণীর কন্যা সুবালা তখন ছয় বৎসরের, সে তাহার মাতুলের সহিত কলিকাতায় আসিল এবং সেই অবধিই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

কয়েক বিঘা জমি ও একখানি আম-কাঁঠালের বাগান ভিন্ন, নন্দরাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য কোনও সম্পত্তি ছিল না। এই সামান্য আয় হইতেই একজন হিন্দুবিধবার কোন রূপে চলিত; তাহার উপর মধ্যে মধ্যে আত্মীয় স্বজনও দু'একজন আসিত। তাহার শ্বশুরের বিশ্বস্ত ভৃত্য কানাই প্রসাদ জমি-টুকু চাষ করিয়া যৎসামান্য ধান্য নিজে লইয়া নন্দরাণীকে সমস্তই দিত। বিপদা-পদে কানাই তাহার একমাত্র অভিভাবকরূপে, তাহারই বাটীর পার্শ্বে বাস করিত।

তারপর কয়টা বৎসর এইরূপেই কাটিল। সুবালা যখন বার বৎসরে পড়িল—সে তখন তাহার মাতুলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নন্দরাণীর নিকট ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ সুবালাকে পাঠাইবার কারণ নন্দরাণী বুঝিতে পারিলেও—সুবালার বিবাহের জন্য কোন ব্যস্ত হইল না।

২

"কৈ গো বালায় মা।" বলিয়া একমলিন বস্ত্রে, রুক্ষ কেশে, গাত্রের অধি-কাংশ স্থানেই গোময় মাখিয়া বুড়ির মা ওরফে কানাইএর স্ত্রী একটী ছোট' চুবড়ী করিয়া কিছু তরকারী লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

বুড়ির মার স্বভাবটী অতি সুন্দর—তাহার মনটী যেমন সরল, পরোপকার করিতে তেমনই মজবুত। নিঃসন্তান হইয়াও বাৎসল্যের পূর্ণ অনুরাগিণী ছিল।

তহার বিবাহের পাঁচ বৎসর পর একটী কন্যা হইয়াছিল। আদর করিয়া কানাই সেই শিশু কন্যাটীকে বুড়ি বলিয়া ডাকিত। কিন্তু বুড়ি দু'দিনের জন্য আসিয়াছিল, আবার সে তার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইল। রহিল কেবল তার স্মৃতিটুকু, তারই মাতার নামের সঙ্গে মিশিয়া, সন্তান হা'রা বুড়ির মা তার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেও, যখন সন্তান পুনঃ প্রাপ্তি সম্বন্ধে একেবারেই নিরাশ হইল, তখন সে প্রায়ই ভাবিত—'লোকের সন্তান হওয়া না হওয়া এও কি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির প্রয়োজন!'

নন্দরাণী রান্নাঘরে ছিল। চির পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া গৃহমধ্য হইতে উত্তর করিল—'কেন গা বুড়ির মা?"

"এই আনাজ গুলো তুলে রাখ" বলিয়া চুবড়ীটা রান্নাঘরের সম্মুখে রাখিল।

নন্দরাণী বাহিরে আসিয়া বলিল "এতগুলো আনাজ আমাদের খাবে কে?"

"কত আর চারটে বেগুন, দুটো পালম শাক আর কপি দুটো বইত নয়।'

"বড্ড কম হোলো নয়? "বলিয়া কৃতজ্ঞতাসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—"তোরা যদি না থাকতিস্, আমাদের কি উপায় হ'ত বল দেখি।"

'তা যদি কথা ই বল্লে ত বলি—আজ কার জন্যে তোমরা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে দুঃখে দিন কাটাচ্ছ তোমার শ্বশুর যা আমাদের করেছেন, সে কথা মনে হ'লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়—তাঁর দয়া এজন্মে শোধত হবেই না—পরজন্মেও থেকে যাবে। যাই মা বেলা হোলো উনি আবার বাজার যাবেন" বলিয়া কোনরূপ উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বুড়ির মা চলিয়া গেল।

আবাল্য সহরে থাকিয়া সুবালার স্বভাবটা পল্লীগ্রামের মেয়েদের সঙ্গে একেবারেই মিলিত না। সে যখন তার মামার নিকট থাকিত, প্রত্যহ বই বগলে করিয়া বেথুনকলেজে যাইত। বৈকালে গড়ের মাঠের বাগানে বেড়াইতে আসিত। এই রকম কেতাপড়া খেলা ধূলায় সে এই কয়টী বৎসর অতি আনন্দেই কাটাইয়াছিল। সংসারের কোন কাজ সে কখনও শিখে নাই। আর মামিও কখন কোন কাজ করিবার জন্য তাহাকে বলে নাই—শিখাইবার প্রয়োজনও মনে করে নাই।

সুবালার মামার অবস্থা ভালই ছিল। গভর্ণমেণ্ট আফিসে ১০০৲ বেতনের কেরাণী! পৈত্রিক আমলের একখানি বাড়ীও কলিকাতায় ছিল। কাজেই গৃহিণীর পরিশ্রম লাঘবের জন্য একটী চাকরাণী রাখিয়াছিলেন। সংসারের

অধিকাংশ কাজই সেই ঝিটী করিত। সেই জন্যই সংসারের কোন কার্য্যে সুবালা লিপ্ত ছিল না। কিন্তু সে তার মাতার নিকট যেদিন আসিল—পরদিনই সকালে নন্দরাণীকে উঠান ঝাঁড় দেওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। ভবিষ্যতে এই সমস্ত কার্য্যের ভার কতক যে তাহারই উপর আসিয়া পড়িবে, সেই চিন্তায় ভীতা সুবালা বিস্মিতনয়নে নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এসব কাজ কি তোমার করতে হয় মা?"

নন্দরাণী হাসিয়া উত্তর করিল—"আমার কি ঝি রাখবার ক্ষমতা আছে মা?"

মাতার কাতরতাপূর্ণ উত্তর শুনিয়া সুবালা বড়ই লজ্জিত হইল। হায় আজ যদি তার পিতা থাকিত, তাহা হইলে বোধহয় এতটা হীন অবস্থা তাদের হইত না। পিতৃহীনা সুবালা অভিমান বিসর্জ্জন দিল,—ভাবিল—যাদের দুবেলা পেট পুরিয়া খাবার সংস্থান নেই, এ অভিমান তাদের সাজে না।' পুস্তকে সে পড়িয়াছিল, কত ধনবানের কন্যা অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়িয়া—অবশেষে অপরের বাটী দাসিগিরীও করিয়াছে। আর তার এসকল কাজ করিতে অভিমান করা কি ভাল? লেখাপড়া শিখিয়া কি,সে এই জ্ঞান লাভ করিল? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সুবালা অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

বেলা যখন দশটা, তখন একখানা বই লইয়া রান্নাঘরের সম্মুখে সুবালা বসিয়াছিল—নন্দরাণী, বুড়ির মার দেওয়া কপিটীর ডাল্না রাঁধিতে ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া ডাকিল 'বৌদি'।

আগন্তুকের নাম বিধুভূষণ। দূর সম্পর্কে সে নন্দরাণীর দেবর হইত। মধ্যে মধ্যে একআধদিন এই রকমেই আসিত।

রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নন্দরাণী বলিল—"ঠাকুর পো যে, হঠাৎ এমন সময়? কোথায় এসে ছিলে?"

"তারণ ভট্টাচার্য্যের মেয়ের বের সম্বন্ধ হচ্ছে আমাদের গ্রামে কিনা—তাই মেয়ে দেখ তে এসেছিলাম বৌদি।"

"কি হোলো?"

"না! সে মেয়ে পছন্দসই নয়।"

"পাত্রটী কি করেন?"

"কিছুই না।—বাপ জমা আছে, তাতেই চলে যায়।"

"বেশত আমার সুবালার জন্যে চেষ্টা দেখ না। আমার কিন্তু কিছু খরচ করবার ক্ষমতা নেই, তাত জান।'

পার্শ্বে উপবিষ্টা সুবালাকে আদৌ বিধুভূষণ চিনিতে পারে নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র সে তাহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তারপর এই কয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।—কাজেই চিনিতে না পারাই স্বাভাবিক। বিধুভূষণ তাহার দিকে 'বিস্ময়'-দৃষ্টিতে চাহিয়া চোখ দু'টী কপালের উপর তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—'এই ধেড়ে মেয়েটা তোমার সুবালা না কি ?"

বিধুভূষণের এ উক্তি তিক্ত ঔষধেরই মত সুবালার বোধ হইল। লজ্জায় সে নতমুখে বইখানির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—সহরের আর পল্লীগ্রামের লোকের সভ্যতার বিষয়। সহরের লোকগুলা যোগ্য সম্মান দিয়া, অপরের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা সবসময়েই একই রকম প্রথায়—শিষ্টাচাররহিত অতি হীনের মতই প্রথম আলাপ করে। এটা যে কেবল শিক্ষার দোষেই এবং সৎসঙ্গের অভাবেই ঘটে, তা আমাদের প্রত্যেক পল্লীর দিকে চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। গ্রামস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে নিষ্কর্ম্মা পুরুষের সংসর্গই অধিক—তাদের সংসর্গে থাকিয়া ভালও মন্দ হয়। আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালীই একটু অবস্থা উন্নতি করিতে পারিলেই অনায়াসে জন্মভূমি ছাড়িয়া সহরে বসবাসের আয়োজন করেন। এইরূপেই ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত পল্লীগ্রামই শিক্ষিত ও ধনীজন-বর্জ্জিত হইয়া বসবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে।

মধ্যাহ্নে বিধুভূষণ আহারে বসিল। হাঁড়ি হইতে থালায় অন্ন ঢালিবার সময় সেই স্তূপাকৃতি অন্ন দেখিয়া সুবালা তাহার মাতার ভ্রমসংশোধনের জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছিল—'মা অত ভাত দিচ্ছ একজনেই ত খাবে ?"

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল 'হোলোই বা একজন—আবার ভাত দিতে হবে। এতে কি হবে ?'

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সুবালা তাহার মাতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বল কি মা—এ যে অগস্ত্য মুনির সমুদ্রশোষণ।'

"চুপ কর। এখুনি শুনতে পাবে।"

সুবালা আর কোন কথা বলিল না। সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না—একজন শীর্ণকায় রোগীর উদরে কি প্রকারে এতগুলি অন্নের

হইতে পারে। বিশ্বাসও করিতে পারিল না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিধুভূষণ তাহার উদরনাযক গহ্বরে সেই অন্নগুলির স্থান দিতে পারিয়াছিল।

আহারাদির পর—সুনিদ্রা দিয়া—বাটী ফিরিবার সময় বিধুভূষণ নন্দরাণীকে জানাইল—'সুবালার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবে।

৪

পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি আর নগদ কিছু টাকা এই ছিল—বনবিহারীর সংসার খরচের সম্বল। যখন তার বয়স ১৪ বৎসর; সেইসময় হইতে সে পিতৃ-মাতৃহীন।—তখন হইতেই সে সংসারে একাকী। সে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, সুশ্রী—বয়স অনুমান বাইশ হইবে। বাল্যকাল হইতেই চাষবাসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বেশ সুদক্ষ হইয়াছিল। গ্রামস্থ অনেকেই চাষবাসের জন্য পরামর্শ করিতে আসিত—বনবিহারীর কাছে। লেখাপড়া কিন্তু সে একেবারেই জানিত না। তাহার পিতা পুত্রকে এটী শিখান বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। আর বনবিহারীর আগ্রহও তেমন ছিল না। এই দুই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় সে একেবারে নিরক্ষর হইল।

বিধুভূষণের চেষ্টা—যত্নেই সুবালার সহিত বনবিহারীর বিবাহ হইল।—বিবাহের পর সুবালা পিত্রালয়ে ফিরিবার সময় তাহার খবরাখবর পত্রের দ্বারা জানাইতে বলিলে বনবিহারী মাথা চুলকাইয়া যখন জানাইল, ও বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ—তখন সুবালার বিবাহের আনন্দটা একেবারে নষ্ট হইল। হৃদয়ে একটা অশান্তি লইয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিল।

সুবালার নিজের ধারণা—সে শিক্ষিতা। আশৈশব সহরে থাকিয়া শেখান-কার আদব কায়দা, যাহাতে সে অভ্যস্ত, তাহা কি বৃথায় যাইবে? নিরক্ষর যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। সংসারজীবন কি করিয়া যে গড়িয়া তুলিলে সুখের হইবে, তাহা স্বামি-গৃহ হইতে প্রথম আসিয়াই সে চিন্তা করিতে-ছিল। হিন্দুস্ত্রীর স্বামী দেবতা—তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে যে স্ত্রী অসমর্থ, তাদের মানব জন্মই যে বৃথা যায়, সুবালা তাহা বুঝিয়াছিল। সে মনে মনে স্থির করিল যতটুকু শিক্ষালাভ সে করিয়াছে—যতটুকু ভাষাজ্ঞান তা'র হইয়াছে, সে স্বামীকে ততটুকুই শিখাইবে। স্বামীর হৃদয় হইতে কুরুচিপূর্ণ ব্যবহার দূর করিয়া, তাহারই মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবেই। যার জীবনসঙ্গিনী সে হইয়াছে,—যেমন করিয়া হউক তাহার মনের মত হইবে ও তাহাকেও নিজের মনের মত করিয়া লইবে। বস্তুতঃ সে হিন্দুনারী হইয়া অনন্তমনে পতিকে

দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিবে কি প্রকারে! ইহা ভিন্ন তাহার অন্যগতি নাই। তাই সে এতদিন ধরিয়া মনে প্রাণে যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতেই আপনাকে গড়িয়া তুলিয়া সে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছে।

দ্বিরাগমনের সময় শ্বশুরালয়ে আসিতে সুবালা কিন্তু একটুও ভীতা হইল না। এমন কি চক্ষের জলও এক ফোঁটা ফেলিল না। সে যেন একান্ত আগ্রহের সহিতই স্বামি-গৃহে আসিল। অনেকেই সুবালার এ আচরণ লক্ষ্য করিল। কেহবা কালের দোষ দিল—তাহাদের সময় শ্বশুরবাটী যাইলে কি প্রকারে কাঁদিতে হইত—যাইব না প্রভৃতি কত আপত্তি করিতে হইত—সে সকলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিল।—আর নববিবাহিতা তরুণীরা বুঝিল, ফুলশয্যার রাত্রেই সুবালা স্বামীর ভালবাসা এতটা অধিক পাইয়াছিল যে, এখন সে শ্বশুরবাটী যাইতে ভীতা নয়। আর অদৃষ্টদোষে যাহারা স্বামি-সুখে বঞ্চিতা, তাহারা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

* * * *

স্ত্রীর একান্ত চেষ্টায়, বনবিহারী মাস কয়েকের মধ্যেই বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া চলনসই বাংলা লিখিতে পড়িতে শিখিল। লেখাপড়ার মধ্যে আনন্দ পাইয়া বনবিহারী বৎসরের মধ্যেই সুবালার মত লেখাপড়া শিখিল। সুবালার যতটুকু সামর্থ্য ছিল, ততটুকুই সে, স্বামীকে শিখাইয়া আনন্দানুভব করিল। বনবিহারী বায়না ধরিল, অতঃপর সে মহাভারতখানি পড়িবে। কার্য্যেও তাই করিল। রাত্রে আহারাদির পর মহাভারতখানি খুলিয়া উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া তাহা পড়িত। একদিন পড়িতে পড়িতে সুবালা বলিয়া উঠিল—'ভীমের কি বীরোচিত চরিত্র দেখো দেখি। প্রত্যেক কার্য্যটী তার কি সুন্দর! নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে, কেমন রাক্ষসের মুখে ব্রাহ্মণের উপকার করবার জন্যে গেল!

"সত্যি বালা, কি ছিলাম আর কি হয়েছি। একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উপকার করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। আর আজ আমাদের কতটা অধঃপতন হয়েছে। সুবালা আর স্থির থাকিতে পারিল না, উত্তেজিত স্বরে বলিল, ওকথা কেন বলছ, আমাদের গ্রামখানি আবার এমন সুন্দর যদি কোন নিঃসহায় কেহ মারা যায়—নিকটে আত্মীয় যদি সে গ্রামে তার কেউ না থাকে, তাহলে অনেক সময় মৃতের সৎকার হয়ে উঠে না। কি বলব' বাঙ্গালীর সে সুখের দিন গিয়েছে—তখন ভায়ে ভায়ে গৃহবিবাদ ছিল না!

আত্মীয়ের ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে মনে হিংসা হোতো না। এখন তার সমস্ত বিপরীত ঘটেছে।

বনবিহারী হস্তস্থিত পুস্তকখানি রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"বিবাহের পূর্ব্বে আমি কি ক'রে কাটাতাম, শুনবে বালা?—আমি লেখাপড়া শিখি নাই সত্য, লেখাপড়ার মধ্যে এতটা তৃপ্তি আছে, তাও তখন জানতাম না। তবুও আমি অসুখী ছিলাম না। চিরকালটাই নিজের কাজে আমি নিজেকে যতটা না নিযুক্ত করেছি—পাড়ার বিপদাপন্নের কাজে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী খাট্‌তে হয়েছে। সে খাটুনিতে কখনও ক্লান্তি আসত না—বরং যেন আনন্দই হ'ত। বাবা ও মার মৃত্যুর পর এমনই নানা কার্য্য করে—আমি অতি আনন্দেই দিনগুলি কাটিয়েছি।

আনন্দে গদগদ স্বরে সুবালা বলিল—"আমাদের এই পল্লীগ্রামে যদি সকলেই তোমার মত 'মন' নিয়ে ঘর করতো, তাহলে বাঙ্গালীর জীবনের মধ্য দিয়ে একটা নূতন রকম হাওয়া ব'য়ে যেত'।

"সে সত্য কথা। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বুঝি তা নয়। সকলকে পরোপকার করবার ইচ্ছা তিনি দিতে বুঝি নারাজ। উপকার ক'রে তার মধ্যে যে আনন্দটা পাওয়া যায়—তাঁর ইচ্ছা নয় বোধ হয় যে, সে আনন্দটা সকলে ভোগ করে। বালা তোমার পরিশ্রমগুণে আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে, অপার আনন্দ পাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছ। তারই পরিবর্ত্তে তোমায় আজ আমি আর একটা জিনিষ দেব। পরোপকারই জীবনের ব্রত করে, এস আমরা সংসারক্ষেত্রে ভেসে বেড়াই। তাতে যে অসীম আনন্দ, তা'দুজনেই ভোগ করব।

"তুমি আমার দেবতা। দেবতারই মত সদ্‌বৃত্তি তোমার অন্তরে পূর্ণ দেখে আজ আমি যে কতটা আনন্দিত হলুম—তা কি বলে তোমায় জানাব, জানি না।"

মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বনবিহারী বলিল,"আচ্ছা বালা, আমি জান্‌তাম—সহরের শিক্ষিতারা হৃদয়হীনা। তারা তাদের নিজেদের ভোগ বিলাস নিয়ে এতটা ব্যস্ত থাকে, অন্যের কথা,—দেশের কথা ভাববার সময় তাদের একেবারেই থাকে না। কিন্তু তোমায় দেখছি অন্য রকম।

ম্লান হাসিয়া সুবালা উত্তর করিল—তুমি অনেকটা ঠিক ভেবেছ। তবে সহরের সকলেই নয়—বেশীর ভাগ বটে। আমি দুঃখিনীর কন্যা, ভোগবিলাস স্পৃহা রাখা কি আমার ভাল? যারা ধনী, তাদেরই শোভা পায়।" মার এমন

সংস্থান নেই যে, তিনি দু'বেলা পেটপুরিয়া খান। তুমি দয়া করে তাঁকে কন্যা-দায় থেকে উদ্ধার করেছিলে—তোমার যে মহত্বের তুলনা কার সঙ্গে দিব জানি না।

বনবিহারী বাধা দিয়া বলিল "আমি এতটা প্রশংসা পাবার যোগ্য নই বাবা। হিন্দুর বিবাহ, ওটা স্বইচ্ছায় হয় না। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ বহু জন্ম থেকে-যায়। কে কার স্ত্রী, কে কার স্বামী, তা পূর্ব হতেই একজন ঠিক করে রাখেন।"

"আমি একটা কথা বলব? রাগ করবে না?"

বনবিহারী হাসিয়া বলিল—"কি বল?"

"যখন আমাদের বিবাহের কথা হয়। শিক্ষাদোষেই বল, আর লেখাপড়া-শেখার গুণেই বল, যখন শুনলাম আমার ভাবী স্বামী চাষবাসের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন।—লেখাপড়ার চর্চ্চা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, তখন কিন্তু মনে ভারি দুঃখ হোলো। অবস্থার কথাও ভাবলাম। বয়স্থা মেয়ে ঘরে থাকলে বিধবা নিরাশ্রয়ার কতটা যে দুর্গতি, গ্রামস্থ পরোপকারী ব্যক্তিরা করে থাকেন এবং ধর্ম্মের কড়া আইনের দু'চারটে কথা শুনিয়ে তাঁরা যে কতটা সর্ব্বনাশ করেন, সেটা জানতাম, তাই সাহস হ'ল না এবিবাহের বিপক্ষে নিজের মত প্রকাশ কর্ত্তে। জীবনের সুখ দুঃখের ভার ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করে বিবাহিতা হলেম। তারপর ভাবলাম কি করে তোমায় লেখাপড়া শিখান যায়। অনেক চিন্তা করে অবশেষে যা' করলাম, তা' জান। এখন দেখছি লেখাপড়া তোমায় না শিখিলেও আমি সুখী হ'তে পারতাম, কারণ তুমি হৃদয়বান্। স্বামী দেবতা আমার—দেবতাকে যোগ্য সম্মান দিতে পারব কিনা জানি না। দেবতার ন্যায় ক্ষমাশীল, দেবতার ন্যায় উদার, দেবতার ন্যায় পরোপকারী হয়েই—আমার অজ্ঞাত কৃত সমস্ত দোষ ঢেকে নিও।"

৫

গ্রামান্তরে কার্য্যোপলক্ষে যাইবার জন্য সকাল সকাল স্নান ও জলযোগ সারিয়া প্রিয় বংশদণ্ডটী লইয়া বনবিহারী বাটীর বাহির হইল। যাইতে হইবে তাহাকে অনেক দূর—জমিদারগৃহে বাৎসরিক খাজানা পরিশোধ করিবার জন্য। বংশদণ্ডটী বগলে লইয়া বনবিহারী ঈষৎ ক্ষিপ্র গতিতেই চলিতে লাগিল।

বেলা তখন ১১টার অধিক হয় নাই। টাকা দিয়া দাখিলাটী লইয়া, জমিদার-গৃহের বাহিরে আসিল। তারপর আবার পূর্ব্বেরই ন্যায় আপনমনে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রামের প্রান্তসীমায়, অধিক লোকের বসবাস নাই।

বনবিহারী সেই স্থানে আসিয়া জনতা এবং কোলাহল শুনিতে পাইয়া সেইদিকে আসিল। উক্ত জনতার মধ্যস্থ এক ব্যক্তির নিকট জানিল এক বিধবার পুত্র, বয়স অনুমান বিশ বৎসর হইবে, গ্রামের এক ব্যক্তির নিকট কিছু কর্জ্জ লইয়াছিল—কিন্তু পরিশোধ করিতে না পারায় কর্জ্জদাতা তাহাকে ও তাহার মাতাকে বিলক্ষণ অপমান ও মধ্যে মধ্যে যুবকটীকে প্রহারও করিতেছে।' বনবিহারী শুনিতে পাইল, যুবকটী কাতরস্বরে বলিতেছে—আর আমায় মারবেন না—দু'দিন খাওয়া নাই।—এখনই মারা যাব।"

তদুত্তরে লোকটী বলিল—তুই মরলেই ত আপদ চুকে যায়।—বদ্‌মায়েস চোর—তুই খেতে পাস না পাস, আমার টাকা শীঘ্র নিয়ে আয়—বলিয়া প্রহারের জন্য হস্ত উত্তোলন করিল।—

যুবকটীর মাতা বলিল—"আর মেরো না গো—অত নিষ্ঠুর হোয়োনা—সামান্য কটা টাকার জন্যে নরহত্যা কোরো না।—'

স্ত্রীলোকটীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে—বলিল তুইতো এর মূল—যদি না মেয়ে মানুষ হতিস, তাহলে আজ তোর মাথা কাটাতুম—চোর মাগী!—দূর হয়ে যা।"

বনবিহারী আর এ লাঞ্ছনা স্থির হইয়া শুনিতে পারিল না। জনতা ভেদ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া—কর্জ্জদাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "কতটাকা পান মশাই?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বনবিহারীর দিকে চাহিয়া সেই লোকটী বলিল, কেন আপনি দেবেন নাকি?"

"দোষই বা কি আমার টাকা কি টাকা নয়!"

"বা, খুব রসিক পুরুষ যে!"

"চিনেছেন দেখছি। দুঃখের বিষয় আপনার মত ছাতুখোরের সাম্‌নে সে পরিচয় দেওয়া বৃথা।"

"মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন মশাই। ভদ্রলোকের সামনে কি করে কথা কইতে হয় বোধ হয় জানেন না।"

"ভদ্রের সামনে যদি থাকতাম—ত সেটা জানবার দরকার হোতো।—যেমন লোক তেমনি সম্মান পাচ্ছেন।"

"কিসে আমায় অভদ্র দেখলেন?"

"নয়ই বা কিসে—নিরাশ্রয়া বিধবাকে সকলের সাম্‌নে এমনই অকথ্য ভাষায়

গালাগালি করছেন—আবার জিজ্ঞাসা করছেন—অভদ্র কিসে! ভদ্রাভদ্র লোকের গায়ে লেখা থাকে না, ব্যবহারেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।"

"বলেন কি মশাই—এরা অতি ছোটলোক—চোর।"

বাধা দিয়া বনবিহারী বলিল "স্বীকার কর্‌লাম তাই। কিন্তু ছোট লোকের সঙ্গে আপনি কি ভদ্র ব্যবহার করছেন? তাদের শিক্ষা আপনাদেরই মত ভদ্রলোকের নিকট হইতে ত পেয়ে থাকে। আর আপনারাই যদি এই শিক্ষা ওদের দেন—চোর ভিন্ন ভাল কি ওরা কোন কালে হ'তে পারবে?"

বনবিহারীর যুক্তিসঙ্গত কথায় লোকটী অল্পক্ষণ স্থির থাকিয়া—যুবকটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আচ্ছা আজ ছেড়ে দিলাম—এক মাসের পর যদি টাকা না দাও, তখন বুঝাপড়া হবে।" বনবিহারী ব্যস্ততা সহকারে বলিল "তা হবে না, একটা নিষ্পত্তি আজ করতেই হবে। এত গুলো গালাগালি উত্তম মধ্যম প্রহার—এটা সুদ হিসাবে শোধ হতে পারে না! আবার একমাস পরে বেচারী-দের সঙ্গে কেন কেলেঙ্কারী করবেন—কত টাকা বলুন আমিই দিব।"

লোকটী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আর লজ্জা দেন কেন মশাই? যা হবার হয়েছে। আমায় ক্ষমা করুন।" বলিয়া সে জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

বনবিহারী যুবকটীকে জিজ্ঞাসা করিল "টাকা ধার করেছিলে কেন?"

"অনাহার থেকে বাঁচবার জন্যে।"

"কত টাকা?"

"পাঁচ টাকা।"

এই সামান্য টাকার জন্য এত লাঞ্ছনা।—তুমি কি কর?

"ম্যাট্রিকুলেসন পাস দিয়েছি—কিন্তু চাকরী মিল্‌ছে না? যা ছিল—সমস্ত খরচ করে লেখাপড়া শিখে—এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছি।—"লেখাপড়ার এত কদর।"

বেলা অধিক হইল দেখিয়া বনবিহারী—নিজ পকেট হইতে পাঁচটী টাকা যুবকের হস্তে দিয়া বলিল "এই নাও দেনা আজই শোধ ক'রে দেবে" বলিয়া বনবিহারী চলিয়া যাইল।

নিজেদের দেশের উপযোগী শিক্ষা না পেয়েই এই—ফল হয়েছে। সময় মত আমার সঙ্গে দেখা করো। নিজেকে চালিয়ে নেবার মত সংসার প্রতি পালন কর—দেশের কাজ করতে শিখে মানবজন্মটাকে সার্থক করবার যে উপায় আমাদের বাড়ীর আশে পাশে পড়ে আছে, তা হাতে কলমে দেখিয়ে দেবো।"

৬

স্বামীর অনুরূপ স্ত্রী। উভয়ের মধ্যে এতটা সদ্ভাব এতটা ভালবাসা জন্মিল বুঝি বা মর্ত্ত্যে তাহা দুর্লভ।

অগাধ স্বামিভক্তি লইয়া—স্বামীর মনের মত হইয়া এবং স্বামীকেও নিজের মনের মত গড়িয়া লইয়া সুবালা তাহার সংসারজীবনটা অতি সুখে কাটাইতে লাগিল। পৃথিবীতে এতটা সুখ যদি মানুষে নারী জীবন ভোগ করিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় স্বর্গে যাইবার বাসনা, মানবহৃদয় হইতে মুছিয়া যাইত। এই ধরাই নন্দনকাননে পরিণত হইত।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সুবালা সংসারের সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তে করিত, তারপর রান্না করিতে আসিত। রন্ধনাদির পর তাহাকে প্রায়ই বসিয়া থাকিতে হইত। বনবিহারী অধিকাংশ দিন চাষের জন্য মাঠে মাঠে ঘুরিয়া পরে গ্রামের যত সব দরিদ্রের—রুগ্নের খোঁজ খবর লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেলা ১টার সময় বাটী ফিরিত। তাহার পর স্নান করিয়া আহার করিত। আহারান্তে স্বামী স্ত্রী কিয়ৎক্ষণ গল্প করিয়া অপরাহ্নে সুবালা সংসার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, বনবিহারী বাহির হইত। এইরূপেই তাহাদের সংসারজীবনটী কাটিতেছিল।

বেলা তখন ১১টা হবে। বাহিরে জ্যৈষ্ঠ মাসের জলন্ত আগুনের মত উত্তপ্ত রৌদ্র। দারুণ গ্রীষ্মে জলন্ত উনানের সম্মুখে বসিয়া সুবালা রান্না সারিয়া উনানটী পরিষ্কার করিতেছে। এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠে বাহির হইতে কাতরতামিশ্রিত স্বরে বলিল "মাগো ভিক্ষা দাও।" সেই কাতরতাপূর্ণ 'মাগো' শব্দ সুবালার কর্ণে পৌঁছাইল। সন্তানহারা জননীর ন্যায় আলুথালু বেশে ললাটের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল—একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে এক রুগ্ন শিশু লইয়া উপস্থিত। সুবালাকে দেখিয়া—রমণীটী আবার বলিল—'দুদিন অনাহারী মাগো দয়া কর। কি কোমল কি হৃদয়স্পর্শী স্বর তার!—

কোমলপ্রাণা সুবালা জিজ্ঞাসা করিল "কোথা থেকে আসছ বাছা—দু'দিন খাওনি।"

"আমাদের বাড়ী এখানথেকে দেড় ক্রোশ দূরে। যা কিছু ছিল, এই ছেলের অসুখে সব খরচ ক'রে এখন এরই হাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছি।"

"তোমার ছেলেটী বড় রুগ্ন দেখছি। ব্যারাম হয়ে ছিল বুঝি?"

"হাঁ মা, আজ দেড় মাস বাছা ভুগে ভুগে এই তিনদিন একটু ভাল আছে।"

"আহা সেই জন্যেই অত রোগা বুঝি। তোমার দু'দিন খাওয়া হয়নি

এখানেই খেয়ে যাও বাছা।—আমি ভাত বেড়ে আনি। আর ছেলেটীর জন্যে দুধও গরম করে দিচ্ছি।”

মকদ্দমায় জিতিয়া, অতুলসম্পত্তি পাইলে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়—দু'দিবস অনাহারের পর অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্ন পাইবার শুভ খবরে রমণীটী তেমনই আনন্দিতা হইল—কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া বলিল ‘মাগো—এত দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি, তোমার মত মা মিষ্টি কথা কেউ বলেনি—একমুঠো খেতেও কেউ দেয়নি। ভগবান্ তোমাদের সুখে রাখুন।”

এ সুখ্যাতি শুনিবার জন্য সুবালা তথায় দাঁড়াইল না। পার্শ্বের বাগান হইতে একখানি কলাপাত আনিয়া রমণীকে ভাত দিল। দু'দিবস অনাহারী—তাহাতে সুস্বাদু ব্যঞ্জন পাইয়া অতি তৃপ্তির সহিত সুবালা যতকিছু রাঁধিয়াছিল—তাহাদের স্বামী স্ত্রীর অন্নব্যঞ্জনগুলি সে একাই নিঃশেষ করিল। রুগ্ন বালকটীর জন্য একবাটী গরম দুগ্ধও দিল।

অতিথিদ্বয় আহারাদির পর চলিয়া যাইতেছে, বনবিহারী বাটী ফিরিল। তখন সুবালা সবেমাত্র রাঁধিবার আয়োজন করিতেছে দেখিয়া বনবিহারী বলিল “আজ রাঁধতে এত বেলা হ'ল বালা?” “একবার রান্না হ'য়ে গেছে—আবার রাঁধতে হচ্ছে তাই খেতে একটু দেরী হবে।—”

“কেন কেউ এসেছিল নাকি?”

“দুদিন অনাহারী অভুক্ত অতিথি এসেছিল। তাদেরই সব খাইয়ে দিয়েছি।

বনবিহারী হাসিয়া বলিল—“এ স্বামীকে অভুক্ত রেখে অতিথিসৎকার করতে একটুও কুণ্ঠিত হলে না বালা! ঠিক এই সময় আমি আগি জেনেও দিতে পারলে!”

“এ যে তোমারই শিখান বিদ্যা প্রভু।—স্বামী দেবতা, তাঁর আদেশ কি ব্যর্থ যায়।—” বলিয়া সুবালা ভক্তিভরে বনবিহারীর চরণে প্রণতা হইয়া সুর করিয়া মৃদুস্বরে গাইল,—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব

* * * * *

আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত
জানিয়ে জানেনা এ মোহ হত কি ত

আমারি ব'লে কেন ভ্রান্তি হ'ল হেন
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

শেষের পথে।

(গান)

আরত বেশী দিন নহে গো,
কবে মুদে আসবে আঁখি
আমার আপন যারা গেছ আগে
স্নেহের স্বরে নিও ডাকি'!
তোমরা বন্ধু ছিলে কত
আজ বুঝেছি বিধিমত
আজ বুঝেছি দুখের দিনে
নিজেই নিজে দেছি ফাঁকি!
তোমরা যবে করতে মানা,
ভাব্‌তেম্ গজিয়েছে ডানা—
উড়ে যাব আকাশ পানে
কাজ কি ধরার খবর রাখি!
এম্‌নি করে ভ্রমে পড়ে'
ছুটে গেছি হাওয়া ধরে'—
মত্ত হয়ে গলা ছেড়ে
করিয়াছি হাঁকাহাঁকি!
নেশা কেটে গেছে এবে—
আর কি হবে ভেবে ভেবে?
এখন কেবল হাত পা মেলে
দড়ির খাটে শুতে বাকি!

কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ.

করেন নাই; রাজপুত্রকে শিক্ষাদানে অবহেলা করিয়াছেন। আচার্য্য বলিলেন, আমার পুত্রগণকে এবং রাজপুত্রকে সমানভাবেই শিক্ষা দান করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বুদ্ধিবৃত্তি সকলের সমান নহে, এই কারণে সকলে সমভাবে শিক্ষা করিতে পারে নাই। পাথরখণ্ড কাটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া যদিও হীরকখণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, তথাপি সকল পাথরই কিন্তু হীরক নয়। এই অধ্যায়ের আর একটী নীতিপূর্ণ চিত্র এইরূপ :—

এক দার্শনিক তাহার পুত্রগণকে উপদেশ দান করিতেছিলেন, বৎসগণ! জ্ঞান অর্জ্জন কর, জ্ঞানের তুল্য মূল্যবান্ কোন জিনিষ জগতে নাই, স্থির জানিবে। পথি মধ্যে ধন দৌলত অপহৃত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানরূপ অমূল্য ধনকে কেহ হরণ করিতে পারিবে না। নির্ঝরের গতি রুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-নির্ঝরের গতি রোধ করিবার উপায় নাই, জ্ঞান অক্ষয়ধন। জ্ঞানী যেখানেই গমন করিবেন, সকলেই সম্মান ও আদর করিয়া তাহাকে উচ্চাসন প্রদান করিবে। কিন্তু মূর্খ আবর্জ্জনার মত এক কোণে স্থান পাইবে।

সামাজিকের কর্ত্তব্য নামক শেষ অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ধন দৌলত, কিন্তু ধন দৌলত সঞ্চয়ের জন্য জীবন নহে। একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ভাগ্যবান্ই বা কে আর দুর্ভাগাই বা কে? দার্শনিকপ্রবর উত্তরে বলেন, সেই ভাগ্যবান্ যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করে; আর সেই হতভাগা যে ফল ভোগ করিবার পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। অতএব এই হতভাগ্যের মত জীবনব্যাপী ধন দৌলত সঞ্চয়ে কোন লাভ নাই।

সাদী সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাশালী কবি হইলেও, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নীতিবিৎ ছিলেন। তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান খুব সাদাসিদা ধরণের; এই নীতি প্রত্যেক গল্প-চিত্রের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট। যেমন অন্যান্য পারস্য নীতিবিদ্‌গণের রচনাতে সুফীসুলভ রূপক দেখিতে পাওয়া যায়, সাদীর নীতিবচনে সুফীসুলভ সেরূপ কোন প্রকার রূপক নাই; কবির নীতি-বচনগুলি মহম্মদপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাদির নীতি উপদেশের মূলতত্ত্ব এই যে, মানব-হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি গুলির অনুশীলন ব্যতীত পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সুখলাভ হয় না; এই সমস্ত উদার নীতি-উপদেশগুলি শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হইয়া কবির রচনাবলীকে নীতি-বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে এবং ইহার মূলতত্ত্বগুলি চিরদিনই জগতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশাসনরূপে

বিরাজ করিবে। অধ্যাপক মোরাবজি ফার্দুনজি মোল্লা ও ইংরাজ মনীষী ক্লসটন বলেন, সুগভীর নৈতিক সত্য সকল সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ সূত্রে গ্রথিত করিয়া অভিব্যক্ত করিতে কি প্রাচীন, কি আধুনিক সময়ের কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য পণ্ডিতই সাদির সমতুল্য হইতে পারেন নাই। *

মৌলানা নুরুদ্দিন জামীউনি ও মহাকবি জামি, যথাক্রমে ১৩৩৪ ও ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুলিস্তাঁর আদর্শে ও অনুকরণে নেগারিস্তাঁ ও বেহারিস্তাঁ রচনা করেন।

গুলিস্তাঁ আদর্শে বেহারিস্তাঁ ও নেগারিস্তাঁ।

কবি বলিয়াছেন, হিজরীর ছয়শত ছাপান্ন বৎসর মুসলমানগণের পক্ষে অতিশয় দুর্বৎসর ছিল, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ যে, সেই বৎসরে তাঁহার কৃপায় ও আঞ্জরেএব † আগমনের পূর্ব্বেই আমার রচনা সমাপ্ত হইল।

গুলিস্তাঁ-সমাপ্তির কাল।

আতাবক আবু বকর্ সাদ্‌বিন্-জঙ্গীর নামে কবি মোস্তাঁর ন্যায় গুলিস্তাঁও উৎসর্গ করেন; মোস্তাঁর উৎসর্গপত্রের ন্যায় গুলিস্তাঁর উৎসর্গপত্র রচনাও অতি চমৎকার। কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর বাক্য বিন্যাস দ্বারা বাদশার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া শেষে তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভের আশায় বলিয়াছেন, "যদি আমার কাব্যের উপর বাদশার অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে ইহা চীনদেশীয় চিত্রশালায় ‡ পরিণত হইবে। আমার স্থির বিশ্বাস, আমার গোলাপ বাগানের সৌরভ সকলেরই চিত্ত হরণ করিবে। যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই বিষাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদেরও মানসিক অবসাদ ঘুচাইয়া মুখে মধুর হাসি ফুটাইবে, হৃদয় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিবে। যেহেতু আমার গোলাপবাগানে বিরক্তিকর কোন জিনিষ নাই, বিশেষতঃ যখন সুখন আতাবক আবুবকর সাদ্-বিন্-জঙ্গীর চিরস্মরণীয় নামের সহিত সংযুক্ত।"

উৎসর্গপত্র।

পারস্য, ইরাণ, তুরাণ দেশবাসীরাই যে শুধু কবি শেখ সাদীর কাব্য নিহিত সত্য-শিব-সুন্দরের মধুর রস উপভোগ করিয়াছিল, তাহা নহে, ভূবাসী ইয়োরোপও এই মধুর রস-উপভোগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অধ্যাপক ইষ্ট উইক (Prof. Eastwick) বলেন, প্রাচ্যেও গুলিস্তা যেরূপ আদৃত, যথেষ্টাধীত ও বহুল প্রচারিত, প্রতীচ্যে কোন লেখকের

ইয়োরোপে গুলিস্তাঁ।

* বাগুয়াতিস-ই-বাদী। Flowers from the Rose Garden of Persia, † যমদূত।

‡ পূর্ব্বকালে চীনদেশজাত চিত্র পারস্যে বিক্রয় হইত এবং মুসলমানে ভারতে চীনদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর অর্জ্জেং পারস্য রাজদরবারে আঁকিয়া উৎকৃষ্ট চিত্র চিত্রশালা পূর্ণ করেন।

গুলিস্তাঁর গুল-সৌরভ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক বণিকের ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ ক্ষতি হইয়াছিল। তিনি পুত্রকে এই ক্ষতির কথা অন্যকে জানাইতে নিষেধ করিলেন। পুত্র পিতার আদেশ শুনিয়া বলিল,আপনি যখন নিষেধ করিতেছেন,তখন অবশ্যই অন্যকে জানাইব না; কিন্তু ক্ষতির কথা গোপন করিয়া, লাভের কথা প্রচার করিলে কি কার্য্য সাধিত হয়? বণিক্ বলিল, এরূপ করাতে দুই রকম যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রথমতঃ অর্থ-ক্ষতির যন্ত্রণা, দ্বিতীয়তঃ প্রতিবেশীর ভৎর্সনা। তোমার ক্ষতির কথা কখনো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জানাইবে না। তাহা হইলে সে মনে মনে সুখী হইয়া ভগবানের নিকট তোমার ক্ষতির জন্য প্রার্থনা করিবে। অতএব হে পুত্র! মৌনাবলম্বন করিয়া নীরবে কর্ম্ম করাই সমূহ মঙ্গলজনক।

প্রেম এবং যৌবন নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, প্রেমিকের চক্ষে তাহার প্রিয়তমা অতি কুৎসিতা হইলেও অতিশয় সুন্দরী। প্রেম-চক্ষু কদর্য্যতারও মধ্যে গুপ্ত সৌন্দর্য্য-রেখা নিরীক্ষণ করে। এই সম্পর্কে কবি লাইলি-মজনুর মধুর প্রেম-কাহিনী গল্প-চিত্রে ফুটাইয়াছেন। এই মধুর চিত্রটী নিম্নে চিত্রিত হইল;—

আরব দেশের কোন রাজার পারিষদবর্গ লাইলি-মজনুর প্রেম কাহিনী ও উন্মত্ততার কথা রাজাকে শুনাইতেছিল। তাহারা রাজাকে বলিতেছিল, বিশিষ্ট জ্ঞানী হইয়াও মজনু মরীচিকাভ্রমে মরুভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল—মোহবশতঃ নিজকে ধ্বংসের পথে উৎসর্গ করিয়াছিল। রাজা মজনুকে ধরিয়া আনিয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত করিবার আদেশ দিলেন; মজনু উপস্থিত হইলে রাজা ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, মানুষ হইয়া তুমি কেন পশুর মত বনে বনে বিচরণ করিতেছ? আর মানব-সমাজ ছাড়িয়া কেন তুমি দূর—অতি দূরান্তে বাস করিতেছ? অশ্রুপূর্ণনয়নে মজনু বলিল, প্রিয়তমা লাইলিকে ভালবাসার জন্য আমার সকল বন্ধুই আমাকে তিরস্কার করিতেছে; হায়! তাহারা যদি একবার আমার প্রিয়তমা লাইলিকে দেখিত, তাহা হইলে আর আমাকে তিরস্কার করিত

না। মজনুর কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, একবার মজনুর মনোহরণকারিণী রূপসী লাইলির অপরূপ রূপ নিজচক্ষে দেখিবেন, যে লাইলির রূপের সুরায় আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া এই হতভাগ্য নিজেকে ছন্নছাড়া ও দৈন্যদশার চরম সীমায় উপনীত করিয়াছে, সেই রূপৈশ্বর্য্যময়ী লাইলিকে রাজদরবারে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর লাইলিকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল। রাজা দেখিলেন, এক শীর্ণা কৃষ্ণবর্ণা কুৎসিতা রমণী—এই রমণী এতই কুৎসিত যে, হারেমে বাঁদীরূপে স্থান পাইবারও অযোগ্য। রাজার মনোমধ্যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মজনু বলিতে পারিয়া বলিল; মহারাজ! লাইলিকে আপনি নিশ্চয়ই কুৎসিতা দেখিতেছেন, কিন্তু হতভাগ্য মজনুর চক্ষু লইয়া দেখিলে, দেখিবেন, লাইলি কি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

জরা ও দুর্ব্বলতা নামক অধ্যায়ে কবি উপদেশ দিয়াছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে যুবতী বধূ গৃহে আনিয়া তাহার মনঃকষ্টের কারণ হইবার আবশ্যক নাই। এতৎসম্পর্কীয় ক্ষুদ্র গল্প-চিত্রটী এইরূপ, এক বৃদ্ধকে সেবার অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে কোন বৃদ্ধাকে বিবাহ করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহার উত্তরে বৃদ্ধ বলিয়াছিল, বৃদ্ধা স্ত্রী লইয়া কি করিব, সে কি আমার সেবা করিতে পারিবে? বরং তাহারই সেবার জন্য একজন দাসীর আবশ্যক হইবে। তখন তাহারা বলিল, তুমিত অবস্থাপন্ন, ইচ্ছা করিলে একজন যুবতী বধূ ঘরে আনিতে পার। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল, আমি বৃদ্ধ, আমার যখন একজন বৃদ্ধাকে পছন্দ হয় না, তখন আশা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণহৃদয়া নব যুবতীর এই জীর্ণ শীর্ণ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধকেই বা পছন্দ হইবে কিরূপে?

শিক্ষার উপকারিতা নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন যে, যদি তুমি তোমার বংশগৌরব বজায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে পুত্রকে অসৎসঙ্গ হইতে রক্ষা কর। এই অধ্যায়ের দু'টী গল্প-চিত্র এইরূপ :—এক রাজা তাহার পুত্রকে এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া আচার্য্যকে অনুরোধ করিয়া বলেন, আপন পুত্রের মত রাজকুমারকে সযত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। আচার্য্য অতি যত্নের সহিত রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার্য্যের সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইল, সে কিছুতেই পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিল না। আর এদিকে আচার্য্য-পুত্রগণের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-গৌরবে দেশ মুখরিত হইল। রাজা একদিন আচার্য্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন

কোন গ্রন্থই এরূপ ভাবে অধীত ও বহুল প্রচারিত হয় নাই। * ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টার্ডম্ সহরনিবাসী বিখ্যাত সাহিত্য-রসিক Georgius Gentius সর্ব্বপ্রথম লাতিন ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ করেন। + তিনি এই লাতিন অনুবাদ দ্বারাই ইয়োরোপীয় সাহিত্য-রসিকগণের সহিত প্রাচ্যের গুলিস্তাঁর পরিচয় করাইয়া দেন; ইহা Rossarum Politicum নামে প্রকাশিত হয়। অনুবাদে মূলের ভাবগত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রতীচ্য-দেশবাসীরা কবি সাদির নামে জয়ধ্বনি করেন। ইহার ফলে ফরাশী ও জর্ম্মণ ভাষায় যথাক্রমে পাঁচখানি ও ছয়খানি অনুবাদ ও প্রচার। অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে অনূদিত পুস্তকগুলি প্রকাশের ইংরাজী সনের সহিত একটী তালিকা প্রদত্ত হইল;—

সাদির নামে ইয়োরোপের জয়ধ্বনি।

ফরাশী অনুবাদকগণ:

ফরাশী অনুবাদ—

(১)	A., du Ryer	১৬৩৪	খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত
(২)	D. Algere	১৭০৪	" "
(৩	Goudin	১৭৮৯	" "
(৪)	Samulet	১৮২৮	" "
(৫)	C. Defremery	১৮৫৮	" "

জর্ম্মন অনুবাদকগণ:—

জর্ম্মন অনুবাদ—

(১)	Adam Oborms	১৬৫৪	" "
(২)	B. V. H. Pergustal	১৮২৬	" "
(৩)	B. Dorn	১৮২৭	" "
(৪)	Ph Walf	১৮৪১	" "
(৫)	K. H. Graf	১৮৪৬	" "

* The Gulistan of Sadi has attained a popularity in the East which perhaps has never been reached by any European work in the Western world. Introduction of Gulistan.

+ Georgius Gentius has the credit of first making known to European readers the Gulistan by his Rossaram Politicum published at Amsterdam A. D. 1651. Prof Eastwick.

রুষীয় অনুবাদকগণ :—

রুষ অনুবাদ

(১) S. Nasarianz ১৮৫৭ " "

(২) Otwnowike ১৮৭৯ " "

ইয়োরোপীয় ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ প্রচারিত হইবার পর প্রাচ্য খণ্ডের গুলিস্তাঁর প্রতি ইংরাজ সাহিত্য-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়; ইহার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী মধ্যে ইংরাজী ভাষায় লণ্ডন হইতে গুলিস্তাঁর আটখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যথা—

ইংরাজী অনুবাদকগণঃ—

ইংরাজী অনুবাদ—

(১) Fr Gladwin ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

(২) Dumoulin ১৮০৭ " "

(৩) Jamcs Ross ১৮২৩ " "

(৪) Lee. ১৮২৭ " "

(৫) Eastwick ১৮৫২ " "

(৬) Dr. Sprenger. ১৮৬১ " "

(৭) Major Anderson ১৮৬৩ " "

(৮) J. T. Platts. ১৮৭৪ " "

ইহা ব্যতীত কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে কয়েক খণ্ড ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। লাহোর, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কায়রো, তুরস্ক, কনষ্টান্টিনোপল, তাব্রিজ, হইতে লিথোগ্রাফ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। শের আলি আফসুস "হিন্দুস্থানের গুলিস্তাঁ" নামকরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম হিন্দি ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে Dr. John Gilchristএর পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় ও তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল মার্কুইস অব ওয়েলেসলীর নামে উৎসৃষ্ট হয়। * ইহার পর পুনা হইতে ১৮৫৫

গুলিস্তাঁর লিথোগ্রাফ সংস্করণ হিন্দি ও বাঙ্গালা অনুবাদ।

* Catalouge of persian, Arabic, postu and Hindustani prepared by Dr. A. Sprenger M. D., Page 198, Catalouge of persian manuscript prepared by prof. E. D. Sachu ph.D. and prof. Hermann Ethe M. A, ph.D page 546.

খৃষ্টাব্দে মুন্সী নিজামুদ্দীন ও দিল্লি হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মির চাঁদদাস কর্ত্তৃক দুইখানি হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। * বঙ্গভাষাতেও গুলিস্তাঁর দুইখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কিন্তু সাদীর জীবন-বৃক্ষ জগতের উত্থান-পতনের সংগ্রামে অচল অটল। কবি যে মহান আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত অননুকরণীয় হইয়া রহিল এবং তাঁহার সৃষ্ট আদর্শই পারস্যের সাহিত্য-জগতে কবির সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যরূপে বিরাজিত।

ইংরাজমনীষী ক্লষ্টন ও পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা অধ্যাপক ব্রাউনের কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। মনীষী ক্লষ্টন লিখিয়াছেন,—Six Centuries have passed away since the gifted sage penned his Gulistan; and his fame has not only contained in his own land and throughout the East generally but has spread into all European countries and accross the Atlantic, where long after the days of Sadi still stood the forests primoval. † অর্থাৎ গুলিস্তাঁ প্রকাশিত হইবার পর ছয় শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কবির যশঃসৌরভ কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমিতেই আবদ্ধ নহে পরন্তু সুদূর প্রতীচ্যের সমস্ত দেশেই বিস্তৃত এবং তিনি এখনও আদি ও প্রতিভার মূর্ত্ত অবতাররূপে জগদ্বাসীর নিকট সম্পূজিত। অধ্যাপক ব্রাউন বলিয়াছেন, No Persian writer enjoys to this day, not only in his own country, but wherever his language is cultivated, a wider celebrity on a greater reputation. His Gulistan and Bostan are generally the first classes * * * while ghozals odes enjoy a popularity second only to those of his fellow townsman Hapidh (১) অর্থাৎ পারস্যের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত সাদীর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিতযশা হইতে পারেন নাই; কবির যশঃ কেবলমাত্র তাঁর জন্মভূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল না, পরন্তু যে দেশে পারস্য ভাষার আলোচনা

* Catalogue of Persian manscripts prepared by Dr, Ethe kept in the India Office Library London.

† Flowers from the Rose Garden of Persia by W. A. Claustan 1889.

(১) Literary History of Persia Vol. II.

হয়, সেই দেশেই তাঁর যশঃ বিস্তৃত। কবির গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত পুস্তক। বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার হিসাবে হাফিজের পরই কবি শেখ সাদীর গজলের স্থান।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

মৃত্যু।

মৃত্যু—এতো সহজ সরল,
কেন চিন্তা, কেন হা হুতাশ?
কেন তবে নয়নের জল?
কেন বৃথা কেন দীর্ঘশ্বাস!
স্বপ্ন—সে যে মৃত্যু-সহচর
স্বপ্ন শেষে আছে জাগরণ—
মৃত্যু—স্থির, স্বপন-সাগর
ভাসে তায় অনন্ত-জীবন!

কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ,

শিশু পণ্ডিত।

অতি শৈশবে আমার মাতৃবিয়োগ হয়। মা যে কি জিনিস, তাহা আমি জানি না। মাতৃবিয়োগের পর আমার বৃদ্ধ পিতামহী আমায় মানুষ করেন, আমি যে বয়সে আমার মাকে হারাই, তখন আমার বিবেচনাশক্তির বিকাশ হয় নাই। সুতরাং আমি মাতৃবিয়োগজনিত দুঃখ কিছুমাত্র অনুভব করি নাই।

লোকের মুখে শুনিয়াছি, যখন আমার মার মৃত্যুতে আমাদের গৃহসংসারে সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তখন আমি খেলায় মাতিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পুতুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। যাহার দুঃখবোধ নাই—সে চিরানন্দময়। মাতৃবিয়োগে আমার কোনরূপ দুঃখ হয় নাই। আমাদের সংসারের উপর দিয়া একটা এতবড় শোকের তরঙ্গ বহিয়া গেল; কিন্তু আমার অনাবিল শৈশবহৃদয় পদ্মপত্রের মত সে তরঙ্গের আঘাতে নিপীড়িত হইয়াও আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার প্রসন্নবদনে তরঙ্গবিক্ষোভ অবহেলা করিয়া উল্লাসে ভাসিয়া উঠিল। পিতামহী বা আমাদের বাড়ীর কেহই আমাকে স্পষ্টাক্ষরে জানিতে দিতেন না যে, আমার মা নাই। একদিন পিতামহীর ক্রোড়ে শুইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আমার মা কোথায়" তিনি প্রত্যুত্তরে তাঁহার শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া ম্লান তারালোক দেখাইয়া ইঙ্গিতে তাঁহার বক্তব্যের আভাস দিয়াছিলেন। আমি তখন অসহায় শিশু। তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া সত্যই মনে করিয়াছিলাম যে, আমার মা আকাশের ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া তারামালায় নিকট বিরাজ করিতেছেন। বিক্ষিপ্ত ঘনমালায় যখন আকাশ ছাইয়া যাইত—কেবল অন্ধকারের ফাঁক দিয়া দুটি একটী তারা জ্বলজ্বল করিত, তখন আমার মনে হইত—আমার মা ঊর্দ্ধদেশ হইতে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। যখন আমার মা ছিলেন, তখন আমি সারাদিন খেলাধূলা লইয়া মত্ত থাকিতাম, পিতামহীর নিকট দিবসে নিদ্রা যাইতাম, তাঁহার নিকটে নাচিতাম, আবার করিতাম, তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিতাম; কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতাম, ততক্ষণ আমার মার কাছ-ছাড়া হইতাম না। তাঁহার বড় বড় দুইটী চোখ করুণায় ঢল ঢল করিত।

অবোধ শৈশবে মাতৃহারা হইয়াও আমি সন্ধ্যায় একটী দুইটী তারায় আমার মার—স্নেহকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া পরিতুষ্ট হইতাম। মনে করিতাম, আমার মা এত দূরে থাকিয়াও তাঁহার অপোগণ্ড-শিশুকে ভুলেন নাই। দূর হইতে কোমল করুণায় আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। দৈবাৎ তারাটি মেঘে আড়াল পড়িয়া গেলে আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। কখনও কখনও ক্ষোভে অভিমানে আমার গণ্ডস্থলে দুই এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িত এবং অব্যক্ত আবেগে আমার ওষ্ঠদ্বয় ফুলিয়া উঠিত। আমি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। আবার বায়ুবেগে যখন মেঘ সরিয়া যাইত, তখন আর আমাকে পায় কে? আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিয়া বেড়াইতাম। পিতামহীর একটী সঙ্কেত আমার শৈশব জীবনকে অচিন্তনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। আমার সমবয়স্কের মধ্যে কেহই 'চন্দ্রমাশালিনী' রজনীর বিমল প্রভা কিম্বা অমাবস্যা নিশীথিনীর তারামালার মৃদু মধুর হাস্য বুঝিতে পারেন না। কিন্তু আমি আমার বুকের উপর হাত দিয়া শপথ করিতে পারি যে,অতি শৈশবে আমি চন্দ্রমা এবং তারকামালাকে যেরূপ চিনিতাম ও বুঝিতাম, অনেক বিজ্ঞ সুরসিক কবিও সেরূপ বুঝেন না বা চিনেন না। কোন অব্যক্ত প্রেরণায় আমার শৈশবের ক্ষুদ্র হৃদয় বিমল চন্দ্রকিরণ-পরিপ্লুত আকাশে ছড়াইয়া মিশাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইত। আবার অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে যখন তারামালা নিভিয়া নিভিয়া ফুটতর হইত এবং জ্বলিয়া জ্বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে ম্লান হইয়া আসিত, তখন আমার ক্ষুদ্রহৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও উন্মত্ততা মাতার আহ্বানে আকাশপথে চলিয়া পড়িয়া অনন্তমুখী হইত। তখন ব্যক্তিত্ব বোধ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু অতি কোরকাবস্থাতেও শিশুর হৃদয়ে যে আত্মবুদ্ধি আছে, তাহা তখন অতি প্রসারিত হয় না। কি অদ্ভুত মায়াবলে আমার অবোধ মন আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারী প্রসারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া চরিতার্থ হইত, তাহা আজিও আমার নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। তবে যতদূর মনে হয়, অনাস্বাদিত মাতৃস্নেহের বিগলিত পীযূষধারা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে আবৃষ্ট এবং পরমানন্দের সুধাসারে দ্রব করিয়া অনন্ত আকাশের চির সৌন্দর্য্যে নীল করিয়া দিত। চন্দ্র তারা এবং উদার আকাশ লইয়াই আমার শৈশবলীলা। সে লীলায় যে কত মাধুরী এবং কত ভাবভঙ্গী, তাহা ভাষায় কিরূপে ব্যক্ত করিব? যদি কোনও ভাগ্যবান্ শৈশবে আমার চক্ষু এবং আমার হৃদয় দিয়া চন্দ্র-তারা-আকাশ দেখিয়া থাকেন, তাহা

হইলে তিনিই আমার শৈশবলীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। অরসিকের নিকট রসের নিবেদন যেরূপ দুরূহ, অন্যের নিকট আমার শৈশবলীলা বুঝাইতে যাওয়াও সেইরূপ। আমি জানি অনেকে আমার বাল্যলীলাকে ছুড়ি দিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তাঁহারা বলিবেন, এও কি সম্ভব! শিশু শিশুর মতন হইবে। ধূলোকাদা লইয়া খেলা করিবে, কখনও কখনও পুতুল লইয়া নাড়াচাড়া করিবে, এইত শিশুর খেলা? তাহার কবিত্ব এবং ভাবুকতা হইল কিরূপে? অঙ্কুরে কখনও রসাল ফলে না। আমি শৈশবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কবি বা ভাবুক হই নাই। তবে স্বভাবদত্ত অনুভূতির বশে বা পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে যে সকল রসাস্বাদন করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম মাত্র। ইচ্ছা হয় আমার উক্তিকে অলীক বা কষ্টকল্পনা-কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। তবে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে নিজের রসবোধ হইয়াছে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। সন্দেশ বলিয়া কোনও জিনিস হইতে পারে না বলিবার পূর্ব্বে সন্দেশের আস্বাদন করা আবশ্যক। তর্ক যুক্তি তর্কে তাহা হয় না, ক্ষণিক অনুভূতির সাহায্যে তাহা হইতে পারে।

পাপিয়ার প্রথম ডাকের সহিত দিগ্বলয়ে যখন প্রভাতের অরুণরাগ ফুটিয়া উঠে, তখন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। তখন হইতেই ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিতাম। দেখিতাম, ঘনান্ধকারে ম্লান রক্তের আভা ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া স্বর্ণের বর্ণ ধারণ করিতেছে। কোথাও নিবিড় রক্তবর্ণ পুঞ্জে পুঞ্জে কৃষ্ণবর্ণের মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। কোথাও হরিৎ এবং পাটল বর্ণ জগৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া অন্তরালে লুকাইতেছে। যে প্রভাতের অরুণোদয় দেখিয়াছে, তাহার বোধ হয় অন্যকিছু দেখিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার মত চক্ষু চাই। নানা বিহঙ্গকূজনের তানের সহিত লয় রাখিয়া কত কত বর্ণ আকাশের গায় ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রভাতী কূজনের প্রতি ছত্রে যে জাগরণ মাখান রহিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বাকাশে রঙ্গের উপর রঙ্গের ছোবে প্রতিফলিত হয়। জীবন-স্পন্দনের একটী ধারা আছে, তাহা সূর্য্য হইতে পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই ধারাটি ঘড়ির দোলনার মত এধার ওধার করিতেছে। আজ আলো, কাল ছায়া, আজ দুঃখ, কাল সুখ, আজ জীবন, কাল মরণ, আজ কম্পন, কাল স্থিতি, আজ সৃষ্টি, কাল প্রলয়, এই সকল ঘটনাবলী একই জীবনাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। ঘটে পটে স্থাবরে জঙ্গমে

যে জীবনীশক্তি ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, তাহাই নিজ নিয়মে কখন জীবন কখনও মরণ কখনও জাগরণ কখনও সুষুপ্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রভাতের অরুণরাগের দ্রুত বিস্ফুরণ দেখিয়া জীবন উদ্যানে যৌবন-কুসুমভাতির কথা মনে পড়ে। আবার সন্ধ্যার ছায়া জরার স্থির সঞ্চারের সহিত উপমিত হয়। মানুষের ভুল এই যে, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টিতে আমার নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। প্রভাতের অরুণালোক কি মহান্ সত্তার অভিব্যক্তি। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী রাঙ্গা রং একইরূপে ফুটিতেছে। দ্রুত স্পন্দনে স্পন্দনে আলোক শক্তিসঞ্চার করিয়া বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের হাত হইতে জগৎকে কৌশলে ছিনাইয়া লইতেছে। মধ্যাহ্নে পাখীর কূজন নানা বিচিত্র তানের পরিবর্ত্তে একঘেয়ে সানাইর পৌরমত ঘুঘুর ডাকেই পরিসমাপ্ত হয়। তখন আলোক দৈনিক আবর্ত্তের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মুহূর্ত্তমাত্র সমভাবে না থাকিয়া মধ্যাহ্নের ঘণ্টাধ্বনির সহিত জগজ্জ্যোতিঃ আলোক উপচয়ের বিবর্ত্তে পড়িয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর গ্রামে নামিয়া আসে। প্রভাতের পূর্ব্বরাগ নবপ্রসূত শিশুর অস্ফুট হাস্য, আর সন্ধ্যার শেষ কাকলীর সহিত পশ্চিম গগনে যে ক্ষীণ আলোক দেখা যায়, তাহা মুমূর্ষুর শুষ্ক অধরে ম্লান হাসির মত ক্ষণভঙ্গুর এবং অলীক। কিন্তু উভয়ই একই সত্তার অভিব্যক্তি। প্রথমটি আরম্ভ, শেষটি পরিসমাপ্তি মাত্র। আরম্ভ হইলেই পরিসমাপ্তি অনিবার্য্য, পরিসমাপ্তি হইলেই পুনরায় আরম্ভের সূত্রপাত। দিবস যামিনী জুড়িয়া আলো ছায়ায় যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাতেই সৃষ্টিতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। আবর্ত্তনবাদ ও ক্রমপ্রকাশবাদ এই দুইটীর মধ্যে প্রথমটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ক্রমপ্রকাশবাদী বলেন, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে একটী সমরেখায় কল্পনা কর। যতদূর যাইবে, ততই রেখা বাড়িয়া যাইবে; কিন্তু প্রথম যে বিন্দু হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, সেই বিন্দুর সহিত দূরস্থিত গন্তব্যপথের ভাবে, ভঙ্গীতে সংযোগ রহিয়াছে। বুঝিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ক্রমপ্রকাশ একটী ধারা ধরিয়া স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বযুগে অতিকায় জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে মস্তিষ্কের চালনায় দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তির বা প্রজ্ঞার বিকাশ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থূলদেহের অপকর্ষ হইয়া মানব ও অন্যান্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন যে, অতিকায় জীবসমূহের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে এমোয়া বা জীবাণুর সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এমোয়া অতি হীন শ্রেণীর জীব। তাহার উৎকর্ষে মানবপ্রভৃতি বুদ্ধিমান্ জীবের সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু মানবজীবনের উৎকর্ষের সহিত মানবদেহ এমোয়ার রূপ জীবাণুতে

পরিণত হইতে পারে, এরূপ ধারণা ক্রমবিকাশবাদীর নাই। উত্তরে বলিব—বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া মানুষ যতই চেঁচামেচী করুক না কেন, সাংখ্যের অঙ্কের ঘাড়ে খচ্চরের মত বিজ্ঞান অতি কায়ক্লেশে অল্পদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। যে পথ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে। লক্ষ্যহীন উর্দ্ধাও ভাবে কত যুগযুগান্তর চলি চলি পা পা করিলে বিজ্ঞান সে পথ অতিক্রম করিবে, তাহা হিসাব নিকাশ করিয়া বলা যায় না। বিজ্ঞান জড়জগতের দুই চারিটি শক্তিকেন্দ্র দেখিয়াছে মাত্র; কিন্তু মরণের যবনিকান্তরালে কিম্বা স্থূল জগতের অঙ্গসঙ্গসুখে যে অন্তর্জগৎ রহিয়াছে,—তাহার পরিচয় বিজ্ঞান আজিও পায় নাই। ইতিহাসে, ভূগোলে, কিমিতিবিদ্যায়, রসায়নে, জীবতত্ত্বে বা উদ্ভিজ্জতত্ত্বে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহা বালকের প্রলাপমাত্র। বৈজ্ঞানিক জগতে এক অদ্ভুত আনেয়া গেলিয়া যাইতেছে। আজ আছে কাল নাই, রাজার ভাণ্ডারে যায়। আজ শত শত বৈজ্ঞানিক যে সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিলেন, কাল তাহা ধূলি ধূলি হইয়া উড়িয়া গেল। আজ যে সত্যের আভাস পাইয়া বৈজ্ঞানিক আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন, কাল সে সত্য মিথ্যার বাক্ চাতুরী বলিয়া প্রমাণিত হইল। আমি বিজ্ঞান জানি না। তত্ত্বমন্ত্রেও বাস ধারি না। আমার স্বচ্ছ কোমলহৃদয়ে জগদ্যন্ত্রের নৈমিত্তিক আবর্ত্তনের যে প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে, তাহা হইতে আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে আবর্ত্তনবাদ। ক্রমোন্নতি চক্রমে উঠিতে অবনতির আরম্ভ হইবেই হইবে। রাষ্ট্রে, সমাজে, সমষ্টি এবং ব্যষ্টিতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। একদিন শৈশবের আকুল আকাঙ্ক্ষায় সান্ধ্য গগনে দুই একটী তারার প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছি। সেদিন পশ্চিমে ঘোর ঘনঘটা সঞ্চিত অন্ধকার জমায়েত করিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণদিক্ হইতে উন্মাদ পবন হুঙ্কারিয়া হুঙ্কারিয়া সেই অন্ধকার আর্দ্রশিশিরে ছড়াইয়া ফেলিতেছে। পূর্ব্বে মেঘের অন্তরালে সঙ্কীর্ণ নীলাকাশের একটি স্তবক তখনও মেঘাচ্ছন্ন হয় নাই। আমি আকুল প্রতীক্ষায় সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া আছি, কখন মানবকরুণাপ্লাবিত মুখজ্যোতি সেই দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া সুদূর গগনপথ হইতে আমার শিরশ্চুম্বন করিবে। মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। বুঝি আমার সমস্ত আশা আজ বিফল হইল। এমন সময় দুইটী তারা দেইদিক্ হইতে ফুটিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। ভাবের আবেশে তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিলাম। এমন সময় আমার কাণে শতবীণা-বিনিন্দিত প্রেমের আহ্বান বাজিয়া উঠিল। কে বলিল বৎস! আইস। দিবসযামিনীব্যাপী

যে আবর্ত্তন দেখিতেছ, তাহাই জীব হইতে শিব পর্য্যন্ত সকলকেই বিবর্ত্তিত করিতেছে। ইহার বাহিরে যাইবার কাহারও হাত নাই। সেই দিন-হইতে আনন্দবাদ আমার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। আজিও সেই মন্ত্রের মৃদু মন্দ ধ্বনি আমার হৃদয়ের কন্দর হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

বৎসরে বৎসরে কেমন সুন্দর বিবর্ত্তন খেলিয়া যাইতেছে। বৈশাখের প্রথম দিবসে খর রবিকর ফুটিয়া নব কিশলয়ের শ্যামকান্তিতে কিরূপ প্রতিফলিত হয়। সে সময় শুষ্কধরণী হইতে যে সৌরভ নির্গত হয়, তাহার মর্ম্ম কয়জন বুঝিতে পারে? অত্যাচারের অতিমানে প্রেম সহানুভূতির উপমায় পরকাষ্ঠা ধরিত্রীর বক্ষ হইতে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে কি মহৎ উপদেশ দেয়। কাল-বৈশাখীর দীর্ঘশ্বাস প্রকোপ, এবং খর রবিকরের বিদারণী তাপের তাড়নায় অধীরা ধরণী প্রকম্পে অগ্নি উদ্গার করেন, পরন্তু মলয় সুহৃদকে নানা কুসুমনিচয় সুষমা কুসুমিত তাহাদিগের সৌরভ বিস্তার করিতে ডাকিয়া আনেন। প্রেম যে চিরস্থায়ী ঔষধ, ইহা বৈশাখের প্রথম দিবসের শিক্ষা। পরে আষাঢ়ের পর মনোহরের সহিত বৃক্ষলতা সহানুভূতির মিষ্ট কান্তি ধারণ করে। কিন্তু আর সেরূপ অত্যাচার এবং অবিচার নাই যে, প্রেমের উৎস উৎসারিত হইয়া ভগবানের চরণতল স্পর্শ করিবে। শিশিরোল্লাসে সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হইয়া নিছক অমিয়রূপে ধরণীর বক্ষে নিপতিত হয়। তাই তাহাতে সরোবরে কমলের সেই আভরণ পদ্ম কুমুদ-কহ্লার আর দেখা যায় না। নববধূ পতি সোহাগ জানে না বলিয়াই অলঙ্কার ভাল বাসেন। কিন্তু গৃহিণীর অঙ্গাভরণ নাই! যাহিলেও তিনি তাহা তুলিয়া রাখেন এবং অপরকে বিলাইয়া দেন। শীতের প্রথমে যখন ধানের গাদা হইতে এক অভিনব সুবাস বিচ্ছুরিত হয় এবং কাটা মাঠে ধূলিরাশি হইতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতে থাকে, তখন পৃথিবীপনার চরমদৃশ্য অভিনীত হয়। সে অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ নাই। সে সুবাস, সে কীড়াভঙ্গী, সে অশনবসনের পরিপাটী নাই। আজ ভাই দুষ্মন্ত দিয়া শীতকাটাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই হয়। মিলনের সোহাগ নাই, সে হর্ষ, সে আকুলতা, সে কলতান নাই; কারণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। বসন্তের বাতাসে ভাবী বিচ্ছেদ সংবাদ পাইয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অবজ্ঞা এবং অনাদরের প্রথম আভাসে ভামিনী চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সে অবজ্ঞা এবং অনাদরকে মানিয়া লইতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাই তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা হয়। সখী মলয় মধুমাস আনিয়া দেয়, চন্দ্রমা

ঢল ঢল জ্যোৎস্নাহারে সুমেরু কুমেরু উরজদ্বয় সুশোভিত করিয়া নায়ককে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করে। চূতমুকুল সৌরভে ফুলশয্যার স্মৃতি জানাইবার জন্য মর্ম্মস্পর্শ সুবাসে দশদিক আকুল করিয়া তুলে। কিন্তু কৃষ্ণ যে মথুরায় যাইবেন। শতগোপিনীর ক্রন্দন তাঁহাকে আটকাইতে পারিবে না। এতদিন যে মধুর বৃন্দাবনলীলা হইতেছিল, তাহা মাধুর্য্যের আতিশয্যে বিবর্ত্তন নিয়মবশে কঠোর এবং রুদ্র ভাবকে-অতর্কিতে আকৃষ্ট করিয়াছে। বৃন্দাবনের তমাল-কুঞ্জে মনোমোহিনী গোপিনীর এমন আকর্ষণীশক্তি নাই যে, বিবর্ত্তন নিরুদ্ধ করিবে। সেই বৃন্দাবন রহিয়াছে, সেই গোপিনী রহিয়াছে, সেই যমুনার স্নিগ্ধ-পুলিনে গোধন চরিয়া বেড়াইতেছে, সেই উন্মাদনাপ্রদায়ক প্রশস্ত বাঁশরী পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু কালা কোথায়? আবর্ত্তনের অপরিহার্য্য বেগে মধুর লীলা রুদ্রলীলায় পরিণত হইয়াছে। শিখিপুচ্ছে এখন এলোকেশ গজাইয়াছে। বন-মালা তনুরক্তমালায় পরিণত হইয়াছে। আর বাঁশরীভ্রমে যাহাকে হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি, তাহা তাঁর নররক্তমাখা খর—তরবারী। তবে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার প্রতিদানে যদি প্রেম দিতে পার, বিচ্ছেদের খর তাপে পুড়িয়া যদি কামগন্ধহীন হইতে পার, তাহা হইলে আবার বৃন্দাবন পাইবে, আবার কালা ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়া বনমালা গলে দিয়া তোমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে। পূর্ব্বে কালার ডাক শুনিয়া তাঁহার বাঁশরী শুনিয়া তুমি কুলমান ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া যাইতে, এবার তোমার ডাকে কালা রাজ্যমান ছাড়িয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে। তুমি সেবিকা না হইয়া সেব্যা হইবে। ইহাও আবর্ত্তন। বর্ষে বর্ষে সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত যে নিত্য বৃন্দাবনলীলা চলিতেছে, তাহা যমুনার পুলিনে নিবদ্ধ নয়। সমগ্র সৌর জগৎ জুড়িয়া উদারসুরে সে লীলার নিত্য বাঁশরী বাজিতেছে। যাহার কর্ণ আছে, সেই নিত্য লীলার বাঁশরীর তান শুনিতে পাইবে। রসিক! দেশে বিদেশের সাহিত্য নাটক পড়িয়া তুমি রস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু জগদ্ব্যাপী নাট্য মন্দিরের যে নিত্য অভিনয় হইতেছে, তাহার রসগ্রহণ করিবার তোমার সামর্থ্য কোথায়? যে আবর্ত্তনের স্রোতে তুমি ডুবিয়া রহিয়াছ তাহার সমগ্র প্রসার বুঝিবার শক্তি তোমার নাই। উদ্‌-ভ্রান্ত স্রোতে এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই। তুমি সে কাষ্ঠখণ্ডে বসিয়া উন্মাদের মত কখন হাসিতেছ, কখন কাঁদিতেছ। আপনার মনে স্বর্গ-নরকের কল্পনা করিয়া কচিৎ তুষ্ট কচিৎ রুষ্ট হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, কি উদার স্রোতে ভাসিয়া তুমি অকূল পাথারে যাইয়া পড়িবে।

সেখানে যাইয়াও যদি তুমি নানা মুখভঙ্গী করিয়া উন্মাদবৎ আচরণ কর, তাহা হইলে জলধর তরঙ্গ-মালা তোমাকে করুণাকল্লোলে একবারও ডাকিবে না। তিমি-তিমিঙ্গল হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উড্ডীয়মান মীনকুল তোমাকে উপেক্ষা করিয়া তাচ্ছিল্যে পরিহার করিবে। কিন্তু তুমি ভাসিয়া চলিয়াছ। কোথায় যাইতেছ, কেন যাইতেছ, তাহার চিন্তা না করিয়া নিরেট মুর্খের মত হাত পা নাড়িওনা। শক্তির কণিকায় আত্মহারা হইয়া তুমি বপ্রক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়াছ। যে প্রাণের মাটি সেখানেই পড়িয়া থাকিবে, তোমার বলক্ষয় হইবে মাত্র। পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগতে একদিন বপ্রক্রীড়ার অভিনয় দেখিয়াছিলাম। মাঝ দরিয়ায় জাহাজে চড়িয়া যাইতেছি, এমন সময় প্রবল তুফান উঠিল। কল বিকল হইয়া গেল। উদ্দাম তরঙ্গবিচয় থরে বিথরে হুঙ্কার করিয়া জাহাজের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। সমুদ্রবক্ষে যে কি এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিল, তাহা বর্ণনার অতীত। মনে হয় মেঘের জটা ছিঁড়িয়া এক কালবীয়ভদ্রের উদয় হইয়াছিল। তাই সমুদ্রবক্ষ তোলপাড় করিয়া পর্ব্বতের মত উচ্চ জলের তাল ক্রুদ্ধ ধূর্জ্জটির রোষকম্পনের অনুরূপ তাণ্ডবে আকাশে উঠিতে লাগিল। সামাল সামাল করিতেই জাহাজ বিদ্যুদ্বেগে দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। আমার জীবনের আশাভাগ করিয়া হতাশে পাষাণ হইয়া গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব স্থির। কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের চালনে উদ্দাম সমুদ্র প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। আবার জাহাজের গতিমুখে শত শত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া তাহার রেখার সৃজন করিল। একটী ছোট পাখী উড়িয়া আসিয়া মাস্তুলের উপর বসিল। সমুদ্রের জলকম্পনে দূর চক্রবালে শুভ্র ঢেউ উঠিয়া পড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া বিলাসগতিতে চলিতে লাগিল। মৃদু মন্দ পবন পরিহাসভরে বহিতে লাগিল। বাহ্য প্রকৃতিতে এইরূপ অসমান শক্তির দন্দ্বলীলা দেখা যায়; কিন্তু তাহা ক্ষণিক চাঞ্চল্য মাত্র। যে আবর্ত্তন মানিয়া প্রকৃতি চলিতেছে, তাহার রেখা মাত্র এদিক ওদিক হয় নাই। ঋতুর পর ঋতু, মাসের পর মাস দিনের পর দিন কিরূপ ধারাবাহিক সূত্র ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবমাত্রেই জীবনের ধারা আছে। শৈশব যৌবন বার্দ্ধক্য জরা সকলেরই আছে। স্বাবলম্বনপ্রিয় কর্ম্মঠব্যক্তি বলিবেন, মানুষ পুরুষকারের বলে সর্ব্বকাজই করিতে পারে। মানুষ অবস্থার দাস নয়। কর্ম্মের বলে নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হওয়া যায়; কিন্তু জন্ম এবং মৃত্যু যখন মানুষের করায়ত্ত নয়, তখন পুরুষকারের গণ্ডী অতি সঙ্কীর্ণ বলিতেই হইবে। কর্ম্মের অপেক্ষা জন্মের প্রভাব

অনেক বেশী। কয়জন প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার সমাধান করিতে পারেন। পিতৃমাতৃ স্বভাবের উপর সন্তানের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আবার প্রত্যেক যুগে যে আবর্ত্ত খেলিতেছে, তাহাকে যুগধর্ম্ম বলে। তাহার হাত এড়ান বড় কঠিন। আমার মনে হয় এক একযুগ অভিনব ভাবের বীজ লইয়া আসিয়াছে এবং সেই সকল বীজ সমস্ত মানব সমাজের চেষ্টা ও উদ্যম নিয়ন্ত্রিত করিয়া চরম পরিণতি লাভ করে। অনন্তের অনন্ত লীলা দেখিলে পুরুষকারের গর্ব্ব লুপ্ত হইয়া যায়। লোকে বলে, সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিয়া পুরীর দেউলের শ্রীবিগ্রহ হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে। অনন্তলীলার চক্রপ্রচক্র বুঝিতে পারিলে মানুষের সমস্ত দম্ভ দুর্ম্মতি পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায়। সৃষ্টিব্যাপী অনন্ত পুরুষ সুদর্শন ঘুড়াইয়া রাখিয়াছেন। তাহার ঘূর্ণনে অন্ধ প্রভাবী সুখ এবং দুঃখের ঘটিতেছে। সেই প্রবর্ত্তিত চক্রের বাহিরে যাইবার অযথা চেষ্টা করিলে শিরশ্ছেদন অবশ্যম্ভাবী। বিরাট লীলা ছাড়াইয়া উঠিবার শক্তি নাই। আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্য লইয়া যে মত্ত হইয়া বেড়াই, তাহার পশ্চাতেও সেই অনন্তবীর্য্য শশিসূর্য্য-নেত্র কালপুরুষের করুণাকটাক্ষ রহিয়াছে। জীব আবর্ত্তনবাদে গা ঢালিয়া দিলে সুখ এবং স্বস্তি লাভ করিবে। নচেৎ পুরুষকারের ধাঁধায় পড়িয়া দম্ভের প্রহেলিকায় আত্মহারা হইয়া দীনশরণ জগতির গতিকে ভুলিলে বিড়ম্বনা মাত্র সার হইবে। স্রোতে গা ঢালিয়া দেও দেখিবে ফলাফলের জন্য তোমার কাতরতা থাকিবে না। তোমার সুপ্তশক্তি-নিচয় পরিস্ফুট হইয়া তোমার কর্ম্মময় জীবনের কাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইবে। তরী ক্ষুদ্র হইলেও অনুকূলস্রোতে পড়িলে তাহার বেগ কোটীগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে। প্রবর্ত্তিত আবর্ত্তের সহিত সংযোগের নাম যোগ।

আমার এই অনুভূতির মূলে আমার শৈশবের সংস্কার। যেদিন পিতা-মহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার মা কোথায় এবং তিনি প্রত্যুত্তরে তারা-লোক দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আমার শিশুহৃদয়ের সমস্ত আকিঞ্চন এবং ব্যাকুলতা মাতার অন্বেষণে তারায় তারায়, বাতাসে বাতাসে, চন্দ্রালোকের রশ্মিতে রশ্মিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। যে অত্যাসক্তি আমার ক্ষুদ্রহৃদয়ের সমস্ত প্রেম এবং অনুরাগকে প্রকাশিত করিয়া উদার আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাই আমার বর্ত্তমান প্রসন্নতার কারণস্বরূপ। মানুষ মেদমজ্জায় তুষ্টি পুষ্টি ভুলিতে না পারিলে, লাভালাভের হিসাব নিকাশ রাখিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে কখনও জগদ্‌যন্ত্রের নিয়ন্তা বা তাঁহার প্রবর্ত্তিত চক্রানুচক্রের সন্ধান

চাহিবে না। চকোর চাঁদের সুধাপান করে। কিন্তু যে নিয়ন্থ তৃণগুল্মাচ্ছন্ন নীড় ত্যজি শিশু-শাবকের মায়া কাটাইয়া আকাশপথে উঠিতে না পারিলে তাহার পক্ষে সুধার স্বাদ পাইবার আশা করা বৃথা। তাই বলিতেছি, সমস্ত প্রেম বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অপ্রত্যাশিত ভাবে কাহাকেও না কাহাকেও উৎসর্গ না করিলে পরিত্রাণের উপায় নাই। যে পাবকশিখার দিকে পতঙ্গবৎ ছুটিতেছ, তাহা হইতে দূরে যাও, নচেৎ পরিত্রাণ নাই। সংসারের বানিগাছে যতই ঘুরপাক খাইতেছ, ততই সংস্কারের ডোর তোমাকে দৃঢ় করিয়া জড়াইতেছে। এক একপাকে তোমার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কমিয়া আসিতেছে। পরিশেষে সংস্কারের ডোর তোমার গলায় জড়াইয়া তোমার অপমৃত্যু ঘটাইবে। এখনও সময় আছে। একবার প্রাণ ভরিয়া উদ-ভ্রান্ত হও। একবার পূরা-ভোরে এবং পূরাদমে সংস্কারের ডোরে টান দাও। তাহা অবশ্যই ছিঁড়িবে। তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা মানবকেই হউক, ভগবানকেই হউক, কাঠকেই হউক বা প্রস্তরকেই হউক, উৎসর্গ কর। যজ্ঞাহুতি জ্ঞানে নিজেকেও উৎসর্গ কর। দেখিবে আবর্ত্তনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। তোমার নিত্য নূতন হইয়া উঠিবে। যে ভাবে ভাবিত হইয়া তুমি সংসারের পথে চলিতেছ, তাহার বিপর্য্যয় ঘটিবে। তুমি নূতন ভাবে, নূতন প্রাণে নূতন দমে মাতোয়ারা হইয়া ধীর-পদক্ষেপে আগুয়ান হইবে। দিন আসিতে ঐ মানব তবু কৈ!

শ্রীসতীন্দ্র চরণ রায়।

বৈঠকী

প্রায় দেড় বৎসর কাল "সাহিত্য" আমাদের হাতে আছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দেহান্তের পর গত পূর্ণ পৌষ মাস হইতে "সাহিত্য" নায়ক-ছাপাখানায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইতেছে। এই দেড় বৎসর কাল শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও, তাঁহার নিজের রুচি বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিছুই লেখেন নাই বা করেন নাই। যে সকল প্রবন্ধ সুরেশচন্দ্র দায় দিয়া সংযোজিত করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে আমরা তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে সেই সঙ্গে দুই একটা নূতন সন্দর্ভ যে দিই নাই, তাহা নহে। আকারে প্রকারে যতদূর সম্ভবপর সুরেশচন্দ্রের শেষ অবস্থায় "সাহিত্য" চলিত, সেই ভাবটা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সত্য বলিতে কি, কোন লাভের আশায় আমরা "সাহিত্যের" ভার গ্রহণ করি নাই। কেবল বঙ্গসাহিত্য-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যপূত চরিত স্মরণ করিয়া তাঁহার স্নেহের কন্যা এবং দৌহিত্র বধূর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ভার কতটা লাঘব করাইবার—লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে আমরা সাহিত্য-পরিচালনটা, ক্ষতি নিশ্চয় জানিয়া সাগ্রহে-গ্রহণ করিয়াছিলাম। লাভ-লোকসানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহাদিগকে আমরা মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হই। ভাবিয়াছিলাম, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কৃপাকণা অনেকেই লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের এই চেষ্টায় সহায়তা করিতে কৃপণতা করিবেন না। যাঁহারা মনীষী লেখক, তাঁহারা সুলভ নিবন্ধ পাঠাইয়া, কাব্যগাথা লিখিয়া, যাঁহারা প্রতিষ্ঠাবান্ সামাজিক পুরুষ, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া এ পক্ষে আমাদের আনুকূল্য করিবেন। বলিতে লজ্জা করে, এমন আশায় আমরা অনেকটা নিরাশ হইয়াছি।

ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা পাঁচকড়ি বাবুর মিত্র ও সখা, নূতন সন্দর্ভ কেবল

তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতে পাইয়াছি। গ্রাহক সংগ্রহ যে তেমন কেহ করিয়া দিয়াছেন, এমন ত মনে পড়ে না। অথচ আমরা এ কথাটা বলিতে ছাড়ি নাই যে, "সাহিত্য" হইতে কোন লাভ আমরা করিব না। কয়েক-বৎসর বাদে যাহাতে সাহিত্যের আয় হইতে বার্ষিক চারিশত টাকা আমরা অক্লেশে বিদ্যাসাগরের কন্যা এবং নৌহিত্রবধূকে দিতে পারি, তেমন আয়োজন করিয়া দিতে পারিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। আমাদের এ প্রত্যাশা এই দেড় বৎসরে পূর্ণ হয় নাই। অতিমাত্র আর্থিক কষ্টি স্বীকার করিয়া আমাদিগকে ঘর হইতে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা গণিয়া দিতে হইতেছে। বিদ্যাসাগরের কোন উপাসক, কোন গুণমুগ্ধ কৃতী বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে আমাদিগকে একটা সুখের কথা বলিয়াও কৃতার্থ করেন নাই। কেবল মনে পড়ে বসুমতীর অধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পোড়ায় এ সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বাবুর লিখিত কথা বলিয়াছিলেন এবং সাহিত্য-ঘটিত ব্যবস্থা দেখিয়া ৺হরি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। রায় বতীন্দ্র মোহন সিংহ বাহাদুর, রায় সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ যে সকল যশস্বী লেখক সাহিত্যে গত দেড়বৎসর কাল লিখিয়াছেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত বান্ধবতাবশতঃ, সুরেশচন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃই লিখিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যতদিন "সাহিত্য" থাকিবে, লিখিতে পারেন।

সুরেশচন্দ্রের দাগ দেওয়া, মডার্ণরিভিউ হইতে প্রবন্ধ ও গল্প ছিন্ন তাহা শেষ হইয়াছে, বৈশাখ মাসের সংখ্যায় নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যানোদিগণের প্রতি আমরা এ জিজ্ঞাসা ও করিতে পারি যে, সুরেশচন্দ্রের "সাহিত্য"কে সজীব রাখিবার উদ্দেশ্য, বিদ্যাসাগরের কন্যা এবং দৌহিত্রবধূর জীবন-যাত্রার ভার নির্ব্বাহণ করা পক্ষে তাঁহারা অতঃপর কে কেমন ভাবে আমাদের সহায়তা করিতে পারেন? এ জিজ্ঞাসার উত্তর কি আমরা সহজ পাইতে পারি? সুরেশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ধারা অব্যাহত রাখিতে হইলে একপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, আর আধুনিক স্বৈরিণী রুচি অবলম্বন করিয়া অধঃপতনে সাত তুলের সাজি বানাইতে হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈঠকী আলাপে আমরা আমাদের মনের কথা অনেকটা ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদের পুরাতন মনের ভাব ও আদর্শ অনুসারে কাজ করিলে,—

তাহা বিকাইবে কি? না বিকাইলে পর্য্যাপ্ত অর্থ মিলিবে না

যে দায়িত্ব স্কন্ধে করিয়াছি, তাহা অনায়াসে বহন করিতেও পারিব না। সাধারণ, পাঠকের রুচি বিগড়াইয়াছে,—এখানেও বিগড়াইয়াছে, বিলাতেও বিগড়াইয়াছে, তবে বিলাতে এখনও ভাবপূর্ণ, সুচিন্তিত সন্দর্ভপূর্ণ-পুরাতন ঢঙ্গের মাসিক পত্র অনেকগুলি চলিতেছে। এখানে যেন ক্রমে ক্রমে সে আদর্শের মাসিক পত্র বিলুপ্ত প্রায় হইতেছে। বিলাতের মন্দটা আমরা পুরামাত্রায় অবলম্বন করিয়াছি, বিলাতের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার বুঝি বা সামর্থ্যও হারাইয়াছি। বিশেষতঃ মনোহারীর দোকান সাজাইয়া মাসিক পত্র বাহির করিতে হইলে গোড়ায় অনেক টাকা ঢালিতে হইবে, বার্ষিক মূল্য চারিটাকার পরিবর্ত্তে দুই-টাকার অধিক করিতে হইবে, তাহাতেও সহসা লাভ হইবে কি না সংশয় স্থল। লাভ না হইলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি গণিতে কষ্ট বোধ হইবে। ঐ ভাবনাই আমাদের অত্যধিক, যদি কিছু তুলিতে পারি-আর যাই পারি, যাহাতে অনায়াসে এই বৃত্তির টাকা রীতিমত যোগাইতে পারি, গরীব বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবিগণের স্কন্ধে যাহাতে বার্ষিক মূল্যের বোঝা বর্দ্ধিত না হয়;—এই দুই দিক্ ঠিক রাখিয়া আমাদিগকে একটা উত্তম পন্থা বাছিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালার পাঠকগণের নিকট এ সম্বন্ধে আমরা পরামর্শ যাচ্ঞা করিতেছি। কোনরূপ সাড়া, কিম্বা পরামর্শ পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি কি? মনে থাকে যেন এই পরামর্শের উপর বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি কটাই সরস থাকা না থাকা নির্ভর করিতেছে। দায়িত্ব একা আমাদের নহে, দায়িত্ব বঙ্গভাষী মাত্রেরই; আধুনিক সাহিত্যসেবী সকলেরই।

সোজা কথা আরও একটু সোজা করিয়া বলিব। আমরা "সাহিত্য"কে লইয়া দেশে দাঙ্গা করিতে চাহি না, উহার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহি না। সুরেশচন্দ্রের ধারা অব্যাহত রাখিতে চাহি, সেই সঙ্গে সুরেশের "সাহিত্যে"র সাহায্যে তাহার জননী এবং পত্নীর অন্ন-পানের চিন্তা দূর করিতে চাহি। "সাহিত্যে"র আয় হইতে তাঁহাদের বৃত্তি মাসে মাসে যোগাইয়া দিতে পারিলে, তাঁহাদের কোন সঙ্কোচ বোধ থাকিবে না, তাঁহারা মনে করিতে পারিবেন, সেই সুরেশই সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। এই সাধটা আমরা এখনও পূর্ণ করিতে পারি নাই। সেই দুঃখ, সেই ক্ষোভ প্রবলভাবে মনে জাগরূক রহিয়াছে বলিয়া আজ বর্ষশেষে এই এক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার বলিতে হইতেছে। যে অনুকম্পাটুকু

পাইলে আমাদের কোন অভিযোগ করিতে হয় না, সে অনুকম্পাটুকু পাইতে পারি কি?

* * * * *

বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যের যাহা হইয়াছে—"প্রবাসী"র শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐ কথায় আছে নীল ও মানব নয়নের পথে বসিয়া! 'প্রবাসী' চোখা চকচকে তকতকে আকার দিয়া সাদাসিধে ছবি দিয়া, নয়নের পথে বাঙ্গালার পাঠক-পাঠিকাদিগের মন ভুলাইয়াছেন। ফলে তাঁহার কাগজ বিকাইয়াছে, তিনি ধনবান হইয়াছেন। টাকাই এখন জীবন সাধনার সার পদার্থ। সাহিত্যজীবনের সার্থকতা এখন টাকার মাপকাটিতে হইয়া থাকে, তাই 'প্রবাসী'র নকলনবীশ চারিদিক্ হইতে কেবল গজাইতেছে। একটু পুঁজি লইয়া যিনিই মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন, তিনিই প্রবাসীর রং-চং বর্ণ-বিলাসের অনুচিকীর্ষু হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। রামানন্দ বাবু আর একটা মন্দ আদর্শ 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিউ'র মারফতে ফুটাইতেছেন। সাহিত্যের গণ্ডীর বাহিরে যাহা, তাহা লইয়া বিবাদ বিসংবাদ চালাইতেছেন। যাহা সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাগজের আলোচ্য, তিনি তাহাকেই মাসিকের আসনে সাদরে বসাইয়াছেন। ইহার ফলে কাগজ বিকাইতে পারে, পয়সা-পয়সা চানাচুরের লোভে অনেকে গ্রাহক হইতে পারে, পরন্তু উহার প্রভাবে মাসিকের অভিপাত ঘটে।

* * * * *

"বঙ্গদর্শনে" "আর্য্যদর্শনে" বিতণ্ডা চলিত, "নব্যভারতে"-"নবজীবনে" বিবাদ চলিত, "তত্ত্বকৌমুদী" "তত্ত্ববোধিনী" ও "ধর্ম্মপ্রচারকে" ঘোর বিচার-বিতর্ক চলিত, পরন্তু সে ছিল—সে বিতণ্ডা সাহিত্য এবং শাস্ত্রগত বিষয় লইয়া, ইউনিভারসিটির চাকরী লইয়া নহে, ইউনিভারসিটির পাশ-ফেইল লইয়া নহে। যাহা নায়ক-বন্ধুমহীতে শোভা পায়, তাহা প্রবাসী-মানসীতে শোভন হয়ই না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরার্থের হীনতা ও ক্ষুদ্রতা যদি মাসিকপত্র সকলে বসন্তরোগের গুটির তুল্য অনবরত ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইলে মাসিক সাহিত্যের গাম্ভীর্য্য ও থাকে না। নিশ্চয় বলিব, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকতা মাত্র করেন, জাতিগত পবিত্রতা গ্রাহ্য করেন, তিনি ব্রাহ্ম হইলেও Respectability র সাধক। নহিলে ভট্টাচার্য্যের বংশধর হইয়া তিনি ব্রাহ্ম সত্ত্বেও চট্টোপাধ্যায় এই কুলীন-যোগ্য উপাধি গ্রহণ করিতেন না। তাই অতি লোভে